Banglapdf.net Presents

মাসুদ রানা

অন্তর্ধান

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

roni060007

মাসুদ রানা ৩৯৩

অন্তর্ধান

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7393-2

মাসুদ রানা

অন্তর্ধান

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

রাজি হলো রানা।
কাজটা এক হিসেবে কঠিন কিছু নয়—একজন
মানুষকে নাম-পরিচয় পাল্টে লুকিয়ে ফেলতে হবে।
কিন্তু মক্কেল নিজেই যদি বেঈমানী করে বসে,
তখন চোখের নিমেষে পাল্টে যায় পরিস্থিতি।
মাসুদ রানার চোখের সামনে ঝরে গেল
চার-চারটে তরতাজা প্রাণ—ওর এজেন্সির
নিবেদিতপ্রাণ চার অপারেটর। প্রিয় শিষ্যদের
শোকে এখন বুকে আগুন জ্বলছে রানার।
সোহানাকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ও
ধুরন্ধর ওই বিজ্ঞানীকে।
কিন্তু সমস্যা হলো, আরও অনেকেই চায় তাকে।
কেউ জীবিত, কেউ বা মৃত অবস্থায়।
আর এর ভিতরে নাক গলিয়ে স্রেফ মরণ
ডেকে আনছে রানা-সোহানা। চলুন পাঠক,
দেখি, ওদের কোনোভাবে বাঁচানো যায় কি না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-393
ANTORDHAN
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

বাহান্ন টাকা

এক

সংবাদপত্রের পাতা থেকে:

দাঙ্গা-পুলিশ কর্তৃক গণবিক্ষোভ দমন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সেইণ্ট লুই, মিসৌরি। এপ্রিল ১৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের প্রতিবাদে টানা তিনদিন ধরে চলতে থাকা গণবিক্ষোভ চতুর্থ দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে তাঁদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে আজ সকালে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্রিয় হস্তক্ষেপে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সারা শহর জুড়ে আন্দোলনরত প্রায় দশ হাজার বিক্ষোভকারীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেড়শোজন দাঙ্গা-পুলিশ নামানো হয় ভোর ছ'টায়। লাঠিচার্জ, রাবার বুলেট এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উন্মত্ত জনতাকে পরাস্ত করে তারা, পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এই অল্পসংখ্যক পুলিশ কীভাবে এমন চমৎকার সাফল্য দেখাল, তা বিস্ময়কর বটে! গত কয়েকদিনে শহরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিল আন্দোলনকারীরা—শুধুমাত্র আগুন এবং লুটপাটের

ঘটনাতেই পনেরো মিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে সিটি কাউন্সিল থেকে গতকাল প্রতিবেদন দেয়া হয়েছিল। এই বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশের বড় ধরনের লড়াই হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তবে তার উল্টোটা লক্ষ করা গেছে বাস্তবে। পুলিশি হামলা শুরু হতে না হতে পড়িমরি করে বিক্ষোভকারীদের পিঠটান দিতে দেখা গেছে; লড়াই তো দূরের কথা, আত্মরক্ষার তেমন কোনও চেষ্টাই লক্ষ করা যায়নি তাদের মধ্যে।

এ-বিষয়ে পুলিশ চিফ রবার্ট ক্রাইসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, 'এটা সত্যিকার কোনও আন্দোলন ছিল না। আন্দোলনের নামে স্রেফ অরাজকতা ছড়ানোই ছিল ওদের মূল উদ্দেশ্য, আমাদের প্রিয় সেইন্ট লুই শহরকে কলঙ্কিত করবার জন্যই নাটক করছিল ওরা। আদর্শ বলতে কিছু ছিল না ওদের, তাই পুলিশকে রুখে দাঁড়াতে দেখে পালিয়ে বেঁচেছে। এ-ধরনের সন্ত্রাসীদের যে-কোনও মূল্যে প্রতিহত করবার জন্য সেইন্ট লুই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সদা-তৎপর রয়েছে...'

'সন্ত্রাসী!' সকৌতুকে বলে উঠল মাঝবয়েসী উচ্চপদস্থ লোকটা। 'ভালই বলেছে! ওদের নাকি আদর্শও ছিল না... এ-ধারণা ওর মাথায় গজাল কী করে?'

'কী বলতে হবে—তা ওকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বললেন পাশে বসা জেনারেল।

'তবে পুলিশ চিফের ধারণাও নেই, আসলে কী ঘটেছে,' বলল তৃতীয় জন, পেশায় সে একজন মিলিটারি অ্যানালিস্ট।

আরও তিনজন রয়েছে প্রায়ান্ধকার রুমটাতে—দুজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং খাকি প্যান্টসুট পরা সুন্দরী এক যুবতী। দুই সারিতে বসানো চারসেট সোফায় বসে আছে সবাই, দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দেয়ালে ঝোলানো একটা চল্লিশ ইঞ্চি এলসিডি টিভি-স্ক্রিনে... সেইন্ট লুইয়ের ঘটনার রেকর্ড করা নিউজ-কাভারেজ চলছে ওটাতে।

এনবিসি'র হাইলাইটস্ শেষ হলো, এবার শুরু হলো সিএনএন-এর প্রতিবেদন। প্রাথমিক সিকোয়েন্সগুলোয় প্রথম দিনের বিক্ষোভ দেখানো হলো। দলে দলে মানুষ নানা রকম ফেস্টুন আর প্ল্যাকার্ড হাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জড়ো হচ্ছে *মেট্রোপলিটন কনভেনশন সেন্টার*-এর সামনে... ওখানেই বসেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন। ধীরে ধীরে বাড়ল জনসমাগম, ভিড়টা ছড়িয়ে পড়ল বাচ স্টেডিয়াম আর ফেডারেল কোর্টহাউজ পর্যন্ত, রাত নাগাদ পুরো শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে গেল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ—বিক্ষোভকারীরা দোকানপাট-যানবাহন ভাঙচুর করছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সবকিছুতে।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনের হাইলাইটসে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে দেখা গেল, সেইন্ট লুইকে মনে হলো যুদ্ধাক্রান্ত একটা নগরী। মেয়রের ভাষণের অংশ দেখানো হলো, তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছেন।

চতুর্থ দিনে পুলিশকে পাল্টা আঘাত হানতে দেখা গেল। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই দেড়শো দাঙ্গা-পুলিশ চালাল মূল আক্রমণটা, তাদেরকে সহায়তা করল স্টেট ট্রুপার ও ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা। টিভির পর্দায় ছোটখাট একটা যুদ্ধের দৃশ্য

ফুটে উঠল—প্রোটেকটিভ ক্লোদিং আর গ্যাস-মাস্ক পরা দাঙ্গা পুলিশ একের পর এক টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ছে, সেই সঙ্গে চালাচ্ছে লাঠিচার্জ; ডাউনটাউনের বিভিন্ন রাস্তা থেকে আন্দোলনকারীদের খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেমোরিয়াল পার্কে বিক্ষোভকারীরা অসংখ্য তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাস গড়েছিল, ওখানে গিয়ে সংগঠিত হবার চেষ্টা করল তারা, কিন্তু সে-সুযোগ দেয়া হলো না। আক্রমণ চালানো হলো পার্কেও—সবকিছু ভেঙেচুরে তাড়িয়ে দেয়া হলো বিক্ষোভকারীদের।

ধারাভাষ্যকারীর উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেখানো হলো পুরো ঘটনাটা। হেলিকপ্টার থেকে ধারণ করা হয়েছে দৃশ্যটা, তাই ক্লোজআপ শট থাকল না; তবে তাতে ঘটনাক্রম বুঝতে অসুবিধে হলো না। দাঙ্গা-পুলিশ পার্কে পৌঁছুতেই খেপে উঠল জনতা, ক্রমাগত পাথর আর কাঁচের বোতল ছুঁড়তে শুরু করল পুলিশের দিকে। অল্পবয়েসী একটা ছেলেকে দেখা গেল হাতে-বানানো একটা ককটেল নিয়ে এগিয়ে আসতে—বোতলের ভিতরটা তরলে ভর্তি, উপর দিয়ে বেরিয়ে আছে সলতে। সেটায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারল ছেলেটা, অগ্রসর হতে থাকা পুলিশ-বাহিনীর সামনে পড়ল ওটা, বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে। মনে হলো এতে খেপে গেছে পুলিশেরা, বৃষ্টির মত টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়তে শুরু করল তারা। পুরো পার্ক ছেয়ে গেল ঘন ধোঁয়ায়, মানুষজন ঢাকা পড়ে গেল তাতে।

হেলিকপ্টারের ক্যামেরাতে এখন আর দেখা যাচ্ছে না কিছু, তাই গ্রাউণ্ড লেভেলে থাকা টেলিভিশন ক্রু-দের ক্যামেরা থেকে দেখানো হলো পরের ঘটনাগুলো। ধোঁয়ার মেঘ থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল আন্দোলনকারীদের—অনবরত

কাশছে, চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে আতঙ্কের ভাব... একটু আগের উন্মত্ত মানুষগুলোর সঙ্গে এদের যেন কোনও মিলই নেই। পার্কের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মিসিসিপি নদীর দিকে হুড়মুড় করে ছুটতে শুরু করল সবাই, কিনারে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল পানিতে। একটু পরেই অন্তত কয়েকশ' মানুষকে ভাসতে দেখা গেল নদীর বুকে, কিলবিল করতে থাকা মানবদেহের কারণে পানিই দেখা যাচ্ছে না ঠিকমত।

নদীর পারে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র পুলিশেরা, আন্দোলন-কারীদের দিকে অস্ত্র তাক করা দেখেই বোঝা গেল, লড়াই শেষ হয়েছে।

'যে-ছেলেটা মলোটভ ককটেল ছুঁড়ল, তাকে খেয়াল করেছেন?' বলল জেনারেল। 'ও আসলে আমাদের লোক। ইচ্ছে করেই ছুঁড়েছে ওটা, পুলিশকে চরম অ্যাকশন নেয়ার একটা অজুহাত তৈরি করে দিতে।'

'ভালই কাজ দেখিয়েছে,' মাথা দোলাল উচ্চপদস্থ লোকটা। 'দেখে মনে হচ্ছিল, সত্যি সত্যি পুলিশের গায়ে আগুন দিতে চাইছে।'

'আন্দোলনকারীদের নেতারা অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে—ওই ছেলে তাদের দলের নয়। পুলিশ বা অন্য কারও ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না তাদের, আন্দোলনকে বানচাল করতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল বলে দাবি করছে ওরা।'

'হুঁ, ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছে ওরা, তাই না?'

'কিছু কিছু মানুষ সবকিছুতেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায়,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল মিলিটারি অ্যানালিস্ট।

'পার্থক্য একটাই—এবার সত্যিই একটা ষড়যন্ত্র ছিল এখানে,' হাসল মাঝবয়েসী লোকটা। 'তবে ওরা যা ভাবছে, সে-কারণে নয়।'

'সবার চোখের সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা,' জেনারেলও হাসল। 'কোটি কোটি মানুষ টিভির পর্দায় দেখেছে সব... পরিষ্কারভাবে। তারপরও বুঝতে পারেনি।'

'হ্যাঁ,' সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল উচ্চপদস্থ লোকটা। 'একেই বলে পারফেক্ট অপারেশন!'

দুই

দ্বিতীয় একটা সংবাদ ছাপা হলো কয়েকদিন পর। সেটা এরকম:

ট্রেইনিং মিশনে আর্মি-রেঞ্জারদের মৃত্যু

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ক্যাম্প রাডার, ফ্লোরিডা। এপ্রিল ২৪। ইউ.এস. আর্মির সিক্সথ রেঞ্জার-ট্রেইনিং ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জর্জ হাসকি তাঁর পনেরোজন রেঞ্জারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। দু'রাত আগে একটি ট্রেইনিং মিশন চলাকালে তারা ফ্লোরিডার জলাভূমিতে ডুবে যায়। নিহতদের সবার পরিবারের

সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন করার জন্য গণমাধ্যমে মৃত্যুসংবাদ প্রচারে বিলম্ব হয়েছে বলে জানানো হয়।

'আমরা এখনও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি,' বলেন ব্রিগেডিয়ার হাসকি। 'জলাভূমিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ করি আমরা, কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। এটা সত্য যে, বছরের এই সময়টাতে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে; তা ছাড়া গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জলাভূমির পানিও বেড়ে গিয়েছিল। তবে এসব কোনও বড় ব্যাপার হতে পারে না, কারণ ওরা "রেঞ্জার" ছিল। এরচেয়েও কয়েক গুণ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলার মত ট্রেইনিং ছিল ওদের। আমরা রহস্যটা ভেদ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি...'

দু'রাত আগে।

এই জলাভূমি আমার বন্ধু—বিড়বিড় করল সার্জেন্ট মাইক হ্যামার। বুক সমান পানিতে রয়েছে সে, তলার ছ'ইঞ্চি পুরু কাদা ভেঙে কষ্টে-সৃষ্টে এগোচ্ছে, এম-১৬ সাবমেশিনগানটা তুলে ধরে রেখেছে মাথার উপর... যাতে ভিজে না যায়। খুবই অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি—কিন্তু এ-ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার ট্রেইনিং রয়েছে তার। সেটাই কাজে লাগাচ্ছে সে, বিড়বিড় করে আউড়াচ্ছে বহুদিন আগে সার্ভাইভাল ইন্সট্রাক্টরের শিখিয়ে দেয়া মন্ত্রটা—কোনও পরিবেশকেই শত্রু ভেবো না, বন্ধু ভেবো; এতে মন শক্ত থাকে... কষ্টের কথা ভুলে যায় শরীর।

সেই ট্রেনিঙের পর বহু বছর কেটে গেছে। এর মাঝে

গ্রেনাডা, পানামা, ইরাক, আফগানিস্তানসহ বহু জায়গায় প্রকাশ্য ও গোপন যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে তাকে, মোকাবেলা করতে হয়েছে কঠিন ও প্রতিকূল অসংখ্য পরিবেশ-পরিস্থিতি। এখন হ্যামার নিজেই প্রশিক্ষক, সারাজীবনের অভিজ্ঞতা বিলিয়ে দিচ্ছে এখনকার নতুন প্রজন্মের কাছে। পিছন ফিরে একবার তাকাল সে, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, শুধু আশা করল, প্রশিক্ষণার্থীরাও একই মন্ত্র আউড়ে জলাভূমির সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করে নিচ্ছে।

না করে উপায়ও নেই। এই জলাভূমি শুধু পানি আর কাদার রাজত্ব নয়; মশা, সাপ আর কুমিরেরও আবাসস্থল। এসবের ভয়ে কাবু থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়, শরীর আড়ষ্ট হয়ে যেতে চায় আতঙ্কে। তাই সবকিছুকেই বন্ধু ভেবে মনকে শান্ত করতে হয়, ভাবতে হয়—প্রকৃতির প্রতিটি বিপদ সৈনিকদের অনুকূলে থাকবে, কোনও ঝামেলা দেখা দেবে না।

পায়ের নীচে একটা ডুবে থাকা কাঠের গুঁড়ি পড়ল, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল হ্যামার, কোনোমতে নিজেকে সামলাল। অস্ফুট স্বরে গাল দিয়ে উঠল সে, হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল। তিন ঘণ্টা পেরিয়েছে এক্সারসাইজের, আরও দু'ঘণ্টা বাকি। রঁদেভু-র দিকে অর্ধেকটার বেশি পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা—কথাটা বাকিদের জানিয়ে সাহস জোগাতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। পুরো এক্সারসাইজটা ভয়েস-সাইলেন্সের মধ্যে করা হচ্ছে, সব ধরনের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। এমনকী আধঘণ্টা পর পর রেডিও কমিউনিকেশনও ইলেকট্রনিক পালসের মোর্স কোড দিয়ে করতে হচ্ছে। কোয়ার্টার মাইল দূরে দ্বিতীয় একটা দল আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগই নেই। সমস্যা শুধু এটুকু নয়, আরও আছে। রাত

ঘনঘোর, নিকষ আঁধারে দশ ফুটও দৃষ্টি চলে না, অথচ নাইট-ভিশন গগলস্ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়নি। ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার চান, তাঁর রেঞ্জাররা আধুনিক যন্ত্রপাতির চাইতে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের উপর বেশি নির্ভর করুক।

আকাশে চাঁদ নেই, এক্সারসাইজের জন্য আজকের রাতটা বেছে নেয়ার পিছনে প্রধান কারণ সেটাই। গতকাল ঝড় হয়েছিল, সেটার প্রভাবও কাটেনি পুরোপুরি, মাথার উপরটা ঢেকে আছে ঘন মেঘে, রাতের আকাশের স্বাভাবিক আভাও তাই অদৃশ্য। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মরা গাছের কাণ্ড, অন্ধকারে আবছাভাবে চোখে পড়ে ধূসর আকৃতি—শুধু সেটুকুর উপর নির্ভর করে আশপাশের পরিস্থিতি আঁচ করতে হচ্ছে সার্জেন্টকে। এমন পরিবেশে সবার মুখে কালো রঙের ক্যামোফ্লাজ অপ্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু তারপরও প্রস্তুতিতে সামান্যতম ছাড় দেয়নি সে, কারণ রাতের মিশনে ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট একটি বাধ্যতামূলক অনুষঙ্গ।

সারা শরীরে লেপ্টে গেছে হ্যামারের ভেজা ইউনিফর্ম, প্রতি পদক্ষেপে পা'দুটোকে টেনে ধরতে চাইছে পিছনদিকে। দাঁতে দাঁত পিষে অস্বস্তিটাকে চাপা দিল সে, এমন সময় সামনে সাদাটে একটা আভা দেখতে পেল। লিউমিনাস ডায়ালের আলো ওটা, সামনে থাকা স্কাউট কম্পাস দেখছে। হেডিং ঠিক করে নিল তরুণ সৈনিক, সামান্য ডানে ঘুরে আবার এগোতে শুরু করল, তাকে অনুসরণ করল বাকিরা। ধমক দেয়ার ইচ্ছেটা খুব কষ্ট করে চাপা দিল সার্জেন্ট—ডায়ালের আলোটা কারও চোখে পড়া উচিত হয়নি; সে যখন দেখতে পেয়েছে, তখন একজন স্পটারও দেখতে পেত। পুরো টিমের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেত এর ফলে। মনে মনে স্কাউটের জন্য শাস্তি ঠিক

করে ফেলল হ্যামার—ফুল ব্যাটল্-গিয়ারে দশ মাইল দৌড়াবে গাধাটা।

কানের কাছে একটা মশা ভন ভন করে উঠতেই বাস্তবে ফিরে এল হ্যামার। শরীরের সমস্ত উন্মুক্ত স্থানে মশা-তাড়ানোর ওষুধ মেখেছে সে, তারপরও কাজ হচ্ছে না; কিছুক্ষণ পর পরই রক্তচোষা পতঙ্গগুলো এসে হামলা চালাচ্ছে মুখে। দু'হাতের থাপ্পড়ে ওগুলোকে মেরে ফেলা গেলে মনে শান্তি পেত, কিন্তু নৈঃশব্দ্য বজায় রাখার খাতিরে করা যাচ্ছে না কাজটা। জোর করে মশার দিক থেকে মন ফেরাল সার্জেন্ট—আজ রাতে মশাকেও তার বন্ধু ভাবতে হবে!

পানির মৃদু আলোড়ন কান পেতে শুনল হ্যামার, তার পুরো টিম ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সামনের মরা গাছগুলোর দিকে। জলাভূমি এখন গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। এম-১৬-টা আরেকটু উঁচু করে ধরল সে, কাজটা সহজ হলো না, একটানা মাথার উপর তুলে রাখায় দু'হাতের পেশিই ব্যথায় টনটন করছে। পানির নীচ দিয়ে কী যেন একটা শরীরের বাম পাশে ঘষা খেলো, নাকে পচা লতাপাতার গন্ধ পেল সার্জেন্ট... একটু কেঁপে উঠল সে।

হচ্ছেটা কী? ভাবল হ্যামার। কারণ ছাড়া হঠাৎ কেঁপে উঠল কেন সে? দীর্ঘ সৈনিকজীবনে স্নায়ুর উপর অবিশ্বাস্য চাপ সইতে হয়েছে তাকে... বারংবার। সেটারই কুফল নয়তো? নার্ভ ভেঙে পড়তে চাইছে?

ধূসর রঙের একটা কুয়াশা ভেসে এল পানির উপর দিয়ে। নতুন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পেল হ্যামার, নাক জ্বলছে। পানিটাকে হঠাৎ খুব বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হলো, শরীরের কাঁপুনিও বেড়ে গেছে, বুকটা চেপে ধরছে কী যেন। সবকিছু

অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করল সে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তাকে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে...।

এখুনি!

হ্যামারের ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই। হঠাৎ করেই আলোকিত হয়ে উঠল সামনেটা। রকেটের মত পিছনে আগুনের রেশ রেখে আকাশে উঠে গেছে অনেকগুলো ফ্লেয়ার, তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চারপাশ। টিমের সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল পরস্পরের দিকে, চমকে গেছে। ফ্লেয়ারগুলো আসলে এক্সারসাইজেরই একটা অংশ, তবে এমনটা যে ঘটবে, তা হ্যামার ছাড়া আর কাউকে বলা হয়নি আগে। হঠাৎ করে চমকে গেলে এদের কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখার জন্য করা হয়েছে আয়োজনটা।

শান্ত থাকো—মনে মনে দলকে নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করল সার্জেণ্ট, যেন টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ আছে তার সবার সঙ্গে। *কোনও কিছুতেই অবাক হয়ো না।*

কিন্তু দলটার জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। বিনা নোটিশে হঠাৎ করে উদয় হলো দুটো জেট-ফাইটার, চক্কর দিতে শুরু করল জলাভূমির উপর, ইঞ্জিনের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। ফায়ার করবে এরা, তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই। হ্যামারের উরুতে একটা ওঅটরপ্রুফ ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার বাঁধা আছে—ওটার সাহায্যে রেঞ্জারদের পিনপয়েণ্ট লোকেশন জানতে পারছে পাইলটেরা, যাতে ভুলক্রমে ওদের উপর আঘাত হেনে না বসে।

তবে এতসব ব্যাপার জানা নেই প্রশিক্ষণার্থী রেঞ্জারদের, অবিশ্বাসের চোখে ফাইটারদুটোকে ফায়ার ওপেন করতে দেখল ওরা। দলটার গা ঘেঁষে চলে গেল দুই সারি ট্রেসার বুলেট,

সেগুলোর পিছু পিছু দু'জোড়া রকেট ছোঁড়া হলো... দলটার দুইশ' গজ দূরে আঘাত হানল ওগুলো। বিস্ফোরণে বিশাল এক গোলার মত উথলে উঠল জলাভূমির পানি, মরা গাছপালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গেল চারপাশে।

'জিসাস!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

চিৎকার করে লোকটাকে চুপ করাতে ইচ্ছে হলো হ্যামারের—করছে কী বোকাটা! সাইলেণ্ট অপারেশনের সংজ্ঞা কি নতুন করে শেখাতে হবে নাকি একে?

'হচ্ছে কী এসব?' উঁচু গলায় বলে উঠল আরেকজন। 'ওরা জানে না, আমরা এখানে আছি?'

চুপ করো, হাঁদারাম! মনে মনে আবার গাল পাড়ল হ্যামার। পুরো এক্সারসাইজের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছ তুমি! অবশ্য মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না তার।

ফ্লেয়ারের ধোঁয়া আর কর্ডাইটের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস, কেমন যেন করে উঠল সার্জেণ্টের পাকস্থলি—বমি আসছে।

'হা, যিশু! রকেটগুলো তো আরেকটু হলে আমাদের গায়ে লাগত!' তৃতীয় একজন মুখ খুলেছে এবার।

পানি ভেঙে দলের সদস্যদের দিকে এগোতে শুরু করল হ্যামার, এদের চুপ করাতেই হবে। নইলে পুরো এক্সারসাইজই ব্যর্থ হতে চলেছে।

পানির তাপমাত্রা যেন আরও কয়েক ডিগ্রি কমে গেছে, কয়েক পা এগোতেই দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল সার্জেণ্টের। শরীর অবাধ্য হয়ে উঠছে, এগোতেই দিচ্ছে না আর। আবার কী যেন পানির নীচ দিয়ে ঘষা খেলো পায়ে, ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল তার বুক, হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে

গেছে।

কেন যেন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে হ্যামারের দেহ, পেশিগুলো কোনও কথাই শুনছে না। হাইপার-ভেন্টিলেশন শুরু হয়ে গেছে—খুব দ্রুত শ্বাস ফেলছে সে। চোখ বন্ধ করে ভয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল হ্যামার—উল্টো করে পাঁচ থেকে এক পর্যন্ত গুনছে, গোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখছে শ্বাসটা। এই পদ্ধতি কখনও বিফল হয়নি... আজ হলো।

শরীরের কাঁপুনি আরও বেড়ে গেছে—দিশেহারা বোধ করল হ্যামার। ঘটছেটা কী? এভাবে ভয় পাচ্ছে কেন সে? ভয় পাবার মত কিছু তো ঘটেনি! এই জলাভূমি তার বন্ধু... এই অন্ধকার তার বন্ধু... মশা-মাছি পর্যন্ত তার বন্ধু... ভয়ের আছেটা কী? চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো হ্যামারের।

দলের একজন আতঙ্কিত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'হা যিশু! কী যেন কামড়েছে আমাকে!' কী আশ্চর্য, একেই দলের সবচেয়ে সাহসী লোক বলে জানে সবাই।

এরা সবাই উঁচু মানের ট্রেইনিং পাওয়া রেঞ্জার, অথচ আচরণ করছে ভীতু খরগোশের মত। কারণটা মাথায় ঢুকছে না হ্যামারের।

আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। 'সাপ! সাপ!!'

পানির নীচে জিনিসটা আবারও ঘষা খেল হ্যামারের শরীরে। ওটা একটা মরা গাছের গুঁড়ি, কিন্তু তা বোঝার মত অবস্থায় নেই সার্জেন্ট। সবকিছু ভুলে সে নিজেও চেঁচিয়ে উঠল, 'কুমির!'

'না!!!'

হঠাৎ করে ফায়ার করতে শুরু করল দলের এক

রেঞ্জার—ফুল অটোমেটিক মোডে রয়েছে তার এমপি-১৬, অঝোর ধারায় বেরিয়ে আসছে গুলি। মাজল্ ফ্ল্যাশের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক আঘাত করছে বুলেটগুলো, কয়েকজন সেই আঘাতে উল্টে পড়ে গেল। বাকি রেঞ্জারদের সম্মিলিত চিৎকারে কেঁপে উঠল প্রকৃতি, সবাই এবার এলোপাতাড়ি গুলি করতে লেগেছে।

একটা বুলেট এসে বিঁধল হ্যামারের হাতে। ধাক্কাটা সামলাতে পারল না সে, তাল হারিয়ে পড়ে গেল পিছনে, তলিয়ে গেল। চিৎকারের ভঙ্গিতে হা করতেই মুখে ঢুকে পড়ল একরাশ কাদাগোলা পানি। কেশে উঠল সার্জেন্ট, তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে সোজা হলো, পানি ভেঙে তুলে ফেলল মাথাটা।

দু'হাতের মুঠোয় অস্ত্রটা সজোরে আঁকড়ে ধরে হাঁক ছাড়ল হ্যামার। 'সিজ ফায়ার! সিজ ফায়ার!!'

কিন্তু প্রচণ্ড আতঙ্কে ভেঙে গেছে গলাটা, আদেশটা বেরুল চিঁচিঁ করে। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল সার্জেন্ট, আবার মুখ খুলল নতুন করে আদেশ দিতে। তবে কথা বলা আর হলো না তার। খোলা মুখটা দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা প্রাণঘাতী বুলেট, হ্যামারের ঘাড়ের পিছনটা ফুটো করে বেরিয়ে গেল।

বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য স্থির রইল লাশটা, তারপর চিত হয়ে পড়ে গেল পানিতে। জলাভূমিকে বন্ধু ভাবছিল হ্যামার... সেই বন্ধুর বুকেই ঠাঁই হলো তার।

তিন

'আমার নাম আন্দালিব সিদ্দিকী। ডক্টর... আন্দালিব সিদ্দিকী।'

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, নিউ ইয়র্ক শাখা। সকাল দশটা। টেলিফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে রেখেছে শাখাপ্রধান জাকির, মনোযোগ দিয়ে শুনছে অপরপক্ষের কথা। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ভারী, বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না—পঞ্চাশ হতে পারে, আবার পঁচিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কথা বলছেন শুদ্ধ বাংলায়, বলার ভঙ্গিতে সম্ভ্রান্ত একটা ভাব রয়েছে।

'জী, বলুন কী সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল জাকির।

'কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি?'

'আমি জাকির হোসেন, এই ব্রাঞ্চের ইনচার্জ।'

'কী! আমি তো মাসুদ রানাকে চাইলাম, আপনাকে দিল কেন?'

'মি. রানা আমাদের ডিরেক্টর, তাঁকে তো ব্রাঞ্চ অফিসে পাবেন না।'

'কিন্তু আমি যে শুনলাম, তিনি নিউ ইয়র্কেই আছেন? সেজন্যেই তো ফোন করলাম এখানে।'

'মি. রানা ব্যক্তিগত কাজে নিউ ইয়র্কে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে

আমাদের যোগাযোগ নেই।'

'কিন্তু তাঁকে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন!' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক। 'আপনারা কোনও কণ্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দিতে পারেন আমাকে?'

'অনুমতি ছাড়া সেটা দেয়া যাবে না। আপনার সমস্যাটা খুলে বলুন আমাকে; যদি মি. রানার ইনভলভ্ হবার মত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তা হলে অবশ্যই জানাব তাঁকে। প্রয়োজন মনে করলে তিনি নিজেই তখন যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। 'সমস্যাটা আমি শুধু মি. রানাকেই বলব।'

'সেক্ষেত্রে আমি দুঃখিত,' বলল জাকির। 'কোনোকিছু না জেনে আমি ওঁকে বিরক্ত করতে পারব না। রাখি, হ্যাভ আ গুড ডে।'

'থামুন, থামুন!' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'কাটবেন না লাইনটা। প্লিজ, আমি খুব বিপদে আছি... মি. রানাকে খুবই প্রয়োজন আমার।'

'তা হলে আমাকে খুলে বলছেন না কেন?'

'খুঁটিনাটি বলতে পারব না, শুধু এটুকু জানুন—আপনাদের এজেন্সির সাহায্য চাই আমি। ফি নিয়ে ভাববেন না যা চান তার চেয়ে বেশিই দেব। শর্ত শুধু একটাই—আমার কেসটা মি. রানাকে ব্যক্তিগতভাবে হ্যাণ্ডেল করতে হবে।'

'সরি, সার। আমাদের ডিরেক্টর নিজে কোনও কেস হ্যাণ্ডেল করেন না সাধারণত। ও-কাজের জন্যে এজেন্সির অপারেটররা আছে।'

'আমার কেসটা উনি নিজেই নিতে চাইবেন, আমি শিয়োর!

আপনি শুধু ওঁর কাছে আমার নামটা বলে দেখুন।'

'কাজটা কী, সেটাই তো বলছেন না।'

'প্রোটেকশন দরকার আমার, মি. জাকির। তবে বডিগার্ডের দেয়া প্রোটেকশন নয়। আমার পিছনে ভয়ানক এক দল লোক লেগেছে, তারা এক ব্যাটালিয়ন বডিগার্ডকেও হাওয়া করে দিতে পারে...'

'তা হলে কেমন প্রোটেকশন চান আপনি?'

'আমি চাই,' রহস্যময় গলায় বললেন ভদ্রলোক, 'পৃথিবীর বুক থেকে আমাকে মুছে দেবেন মি. রানা!'

লোয়ার ম্যানহ্যাটন।

গ্রিনিচ ভিলেজের মারসার স্ট্রিটে ব্রাউনস্টোনে তৈরি পুরনো একটা অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং। লোকেশনটা চমৎকার, উপরদিকের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে হাডসন নদীর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায়। আজ অবশ্য ব্যালকনিতে দাঁড়াবার উপায় নেই, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সেই দুপুর থেকে, থামাথামি নেই।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিল্ডিঙের সামনে এসে দাঁড়াল একটা বি.এম.ডব্লিউ। গাড়িটাকে রাস্তার পাশে পার্ক করে রেখে নেমে এল সুঠামদেহী, দীর্ঘকায়, ঋজু এক যুবক—দেখতে ভারি সুদর্শন। ওভারকোটের কলারটা তুলে দিল সে, তারপর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মাথার উপর একটা খবরের কাগজ ধরে একছুটে এসে ঢুকল বিল্ডিঙের ভিতর।

ওকে ঢুকতে দেখে নীচতলার রিসেপশনিস্ট কাম সিকিউরিটি গার্ড হারপার উঠে দাঁড়াল, 'গুড ইভ্নিং, মি. রানা!'

মৃদু হাসল মাসুদ রানা। নিউ ইয়র্কে এলেই সাধারণত রানা এজেন্সির মালিকানাধীন এই অ্যাপার্টমেণ্টে ওঠে ও, নিয়মিত

আসা-যাওয়ায় লোকটার সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়েছে। বলল, 'খবর কী, হারপার? তোমার ছেলে পুলিশে ইণ্টারভিউ দিয়েছিল না? রেযাল্ট কী?'

'ঈশ্বরের দয়ায় চাকরিটা হয়ে গেছে, সার।'

'বলো কী! এ-তো খুব ভাল খবর!' অবাক হবার ভান করল রানা, আসলে খবরটা আগেই পেয়েছে ও। চাকরি হবার পিছনে ওর কিছুটা অবদানও আছে, যদিও হারপার সেটা জানে না। 'কোনও মেসেজ আছে আমার জন্যে?'

'জী না, সার। তবে আপনার বান্ধবী এসেছেন দুপুরে, উপরেই আছেন।'

'ঠিক আছে।'

লিফটে ঢুকে আনমনে একটা বাংলা গানের সুর ভাঁজল রানা—পুলক অনুভব করছে। জরুরি একটা অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে আমেরিকায় এসেছিল ও পনেরো দিন আগে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং কঠিন কয়েকটা ঝুঁকি নিয়ে গতকাল শেষ করেছে কাজটা, চিহ্নিত করতে পেরেছে বিশেষ একটা চক্রের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের। এদেশে বসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টিতে টাকা ঢালছিল তারা। কঠিন দায়িত্বটা ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারায় মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে ওর। পনেরো দিনের ছুটি পাওনা হয়েছে অ্যাসাইনমেণ্ট শেষে, প্রিয় একজন মানুষকে নিয়ে সেটা কাটাতে পারবে ভেবে ভাল লাগছে আরও।

প্রিয় সেই মানুষটি সোহানা... সোহানা চৌধুরী। বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের আরেক সুযোগ্য, দুঃসাহসী এজেণ্ট। আমেরিকায় অন্য একটা অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে এসেছিল সোহানা, কাকতালীয়ভাবে প্রায় একই সময়ে শেষ হয়েছে ওর কাজ, ফলে ছুটি পাওনা হয়েছে ওর-ও। পেশাগত ব্যস্ততার

কারণে বহুদিন হলো ঠিকমত যোগাযোগ নেই রানা-সোহানার মধ্যে, এবার একই সময়ে ছুটি পাওনা হওয়ায় সময়টা একসঙ্গে কাটাবে বলে ঠিক করেছে ওরা, পুরনো সম্পর্কটাকে ঝালাই করে নেবে। পরিকল্পনা হলো, বাহামার সাগরসৈকতে যাবে ওরা, সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কার করবে, উপভোগ করবে সময়টা। শুধু ছুটি, খেলা আর প্রেম—আর কিছুই না। ইতিমধ্যে সেজন্যে ঢাকায় ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে দুজনই।

টপ ফ্লোরে উঠে বেল বাজাতে যা দেরি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল সোহানা। পুরোদস্তুর বাঙালি গৃহবধূর সাজে সেজেছে ও—মাথায় খোঁপা, হাতে চুড়ি, কপালে টিপ, পরনে সুতি শাড়ি... পেঁচিয়ে কোমরে গোঁজা। তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না রানা।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম সোহানার, হাতদুটো ভিজে, রান্না করছিল... ছুটে এসেছে বেল শুনে। কোমরে গোঁজা শাড়ির আঁচলটা খুলে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'এত দেরি করলে যে? আমি কখন থেকে বসে আছি, জানো?'

অপ্রস্তুতভাবে হাসল রানা। 'সরি, তবে আমার কিছু করার ছিল না। আবহাওয়া খারাপ, তাই স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড ফেরি আজ দেরি করেছে ছাড়তে। রাস্তায়ও প্রচুর জ্যাম ছিল।'

'এসো,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সোহানা। 'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। শাওয়ারটা সেরে নাও, ততক্ষণে রান্না হয়ে যাবে আমার।'

'রান্না!' ঢুকতে ঢুকতে বলল রানা। 'তুমি আবার রান্না করতে গেছ কেন? আমি তো ভাবছিলাম, তোমাকে নিয়ে ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে ডিনার করব।'

'খামোকা বাইরে খাবে কেন? আমার রান্না খারাপ?'

হাসল রানা। 'বাব্বাহ্! একেবারে দেখছি বউয়ের আদর।'

'আমাকে বউ মনে হচ্ছে?' ভুরু কোঁচকাল সোহানা।

ওকে আপাদমস্তক দেখার ভান করল রানা। 'পুরোপুরি! মানিয়েছেও দারুণ। এমন গিন্নি পাওয়ার জন্য পুরুষেরা দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে।'

'...আর সে-প্রার্থনা কবুল হলেও পালিয়ে বেড়াবে কেউ কেউ,' গম্ভীর গলায় বলল সোহানা। কথাটা ঠাট্টার ছলে বলা হলেও কোথায় যেন একটা দুঃখের সুর মিশে আছে।

কী বলবে ভেবে পেল না রানা—সত্যি, বলার কিছু নেইও ওর। অদ্ভুত এক সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে আছে ওরা দুজন—একে অন্যকে প্রচণ্ড ভালবাসে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও বিয়ে নামক চিরবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কখনোই সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। প্রধান বাধাটা হচ্ছে পেশা। এমন একটা বিপজ্জনক পেশায় রয়েছে ওরা যে, কখন কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। দেশের স্বার্থে সারাক্ষণ মরণপণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয় এসপিয়োনাজ এজেন্টদের, ঘর-সংসার করার সময় কোথায়? তা ছাড়া পেশাগত কারণে এমন সব মেয়েদের সান্নিধ্যে রানাকে আসতে হয়, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলেই নয়; নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তেমন কোনও মূল্য নেই সেখানে। বিবাহিত একজন পুরুষের পক্ষে সেটা কীভাবে সম্ভব, স্ত্রী মুখ বুজে থাকুক বা না-ই থাকুক? সোহানার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকতে পারবে না জেনেও ওকে বিয়ে করাটা এক ধরনের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না—রানা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সেটা।

এ তো গেল পেশাগত বাধার দিক। অবশ্য এ-পেশায় যে

থাকতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, ছেড়ে দিলেই হয়। কিন্তু তারপরও রানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়াল হয়ে থাকে দুজনের মধ্যে। মানুষ হিসেবে আজও নিজেকে ভালভাবে বুঝতে পারে না ও। একে একে অনেক মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছে, কিন্তু কেউ ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বাঁধতে চায়নি। আসলে সবাই কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়, ওকে আসলে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। একটা ঘরছাড়া পাগল রয়েছে রানার ভিতরে—কোথাও থামতে চায় না, স্থির হতে চায় না, সবসময় শুধু পালাই-পালাই। আজ এখানে, কাল ওখানে... যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ানোই ওর স্বভাব। ব্যাপারটা আর সবার মত সোহানারও বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাই কোনোদিন চাপ দেয়নি ও রানাকে বিয়ের জন্য, মেনে নিয়েছে অদৃষ্টকে।

সেই থেকে চলছে এভাবে—সম্পর্কটা ভালবাসার, যতটুকু সময় সম্ভব, পরস্পরের সান্নিধ্যে কাটাবার চেষ্টা করে ওরা। ওটুকু নিয়েই সুখী থাকার চেষ্টা করে দুজনে, স্থায়ী কিছুর কথা চিন্তা করে না—অদৃশ্য একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে ওরা ওভাবে। তারপরও নারীর চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা... স্বামী-সন্তান-সংসারের কথা উঁকি দেয় সোহানার অন্তরে কখনও-সখনও, নিজের অজান্তেই তখন বুক চিরে বেরিয়ে আসে হুতাশ।

আজও তা-ই ঘটেছে, বুঝতে পারে রানা। ইতস্তত করে ও বলল, 'সোহানা, আমি আসলে...'

থেমে যায় রানা, বুঝতে পারছে না কী বলবে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল সোহানা। বলল, 'তাড়াতাড়ি শাওয়ার সেরে এসো। আমি যাই, তরকারি পুড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।' পালিয়ে বাঁচল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেডরুমের দিকে এগোল রানা।

খাওয়ার টেবিলে অবশ্য অস্বস্তিকর অনুভূতিটুকুর বিন্দুমাত্র রেশ রইল না। মনের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট যা-ই থাক, সব ভুলে গেছে সোহানা, স্বভাবজাত চপলতা দিয়ে রানাকেও ভুলিয়ে দিল। পরস্পরের সান্নিধ্যে সুন্দর কিছুটা সময় কাটাবে বলে ঠিক করেছে ওরা; যা-হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে মন ভারী করতে চায় না। জোর করে রানাকে ভরপেট খাওয়াল ও, তারপর দুজনে গিয়ে বসল ব্যালকনিতে... হাতে কফির কাপ। বৃষ্টি এখনও থামেনি পুরোপুরি, ঝিরিঝিরি করে পড়ছে, হালকা ছাঁট এসে লাগছে গায়ে। তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করল না ওরা, মেতে গেল গল্পে।

একসময় বিছানায় গেল ওরা, ঘুমিয়ে পড়ল সোহানা। কিন্তু রানার চোখে ঘুম নেই। খাটের হেড রেস্টে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসল ও, নীরবে তাকিয়ে রইল সোহানার দিকে। বৃষ্টি থেমেছে অবশেষে, জানালা দিয়ে আসা অস্তমিত চাঁদের মৃদু আলোয় ওকে অপূর্ব লাগছে রানার। ধবধবে সাদা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা সোহানার, বালিশের উপর ছড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল, তার মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা যেন ঝলমল করছে।

কতক্ষণ এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল জানে না রানা, টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো হঠাৎ করে। সোজা হয়ে তাকিয়ে দেখল, আড়াইটা বাজে। এত রাতে কে ফোন করছে?

আবার রিং হতেই নড়ে উঠল রানা। সোহানার উপর দিয়ে ঝুঁকে ওপাশের বেডসাইড টেবিল থেকে টেলিফোনের হ্যাণ্ডসেটটা তুলে নিল ও, কানে ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যালো?'

'মাসুদ ভাই, আমি জাকির,' ওপাশ থেকে রানা এজেন্সির

নিউ ইয়র্ক শাখাপ্রধানের ত্রস্ত কণ্ঠ ভেসে এল। 'কিছু মনে করবেন না, খুব জরুরি একটা ব্যাপার... নইলে এত রাতে বিরক্ত করতাম না আপনাকে।'

'কী হয়েছে?'

'ফোনে বলা যাবে না, সামনাসামনি কথা হওয়া দরকার। আপনার অ্যাপার্টমেন্টে আসব?'

'এখন?' রানা একটু বিস্মিত।

'জী, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ঢাকা থেকে মেসেজ আছে আপনার আর সোহানা আপার জন্য। আমি আপনার বিল্ডিঙের সামনেই আছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছুচ্ছি ওখানে।'

'ঠিক আছে, আমি ওয়াচম্যানকে বলে দিচ্ছি—তোমাকে যেন ঢুকতে দেয়।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে জানালার সামনে এগিয়ে গেল রানা, সাবধানে পর্দা ফাঁক করে তাকাল নীচে। জাকিরের সাদা লেক্সাস গাড়িটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল, ওটা থেকে একাই নামল শাখাপ্রধান, রাস্তা পেরিয়ে বিল্ডিঙের এণ্ট্র্যান্সের দিকে চলে এল। সন্তুষ্ট বোধ করল রানা—এটা কোনও ফাঁদ নয়, জাকিরকে অস্ত্রের মুখে নিয়ে আসছে না কেউ। বিছানার কাছে ফিরে এসে ইণ্টারকমের রিসিভার তুলল ও, ওয়াচম্যানকে নির্দেশ দিল অতিথিকে উপরে পাঠিয়ে দিতে।

সোহানার ঘুম ভেঙে গেছে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'কিছু একটা ঘটেছে,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'জাকির আসছে আমাদেরকে ব্রিফ করতে।'

'এত রাতে!'

'নিশ্চয়ই সিরিয়াস কোনও ব্যাপার। ঢাকা থেকে মেসেজ

পেয়েছে বলল।'

এরপর আর শুয়ে থাকা চলে না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সোহানা। ব্যস্তহাতে কাপড় পরতে শুরু করল। রানাও একটা জিন্স গলাল পায়ে, উপরে পরল একটা সুতি টি-শার্ট। বেল বাজল, ড্রয়িং রুমে গিয়ে দরজা খুলে দিল ও।

উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল জাকিরকে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখদুটো লাল হয়ে আছে—নিশ্চয়ই ঘুমোতে পারেনি। রানাকে দেখে বিব্রত কণ্ঠে বলল, 'সরি, মাসুদ ভাই...'

'রাতদুপুরে ডিস্টার্ব করার জন্য আগেই একবার ক্ষমা চেয়ে ফেলেছ,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আর প্রয়োজন নেই। ভিতরে এসো।'

ড্রয়িংরুমের একটা সোফায় বসানো হলো জাকিরকে। খুব উত্তেজিত হয়ে আছে ও, সোহানা এক কাপ কফি এনে দিল ওকে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, কী ব্যাপার?'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ওর দিকে তাকাল জাকির। 'ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর নাম শুনেছেন? গতকাল সকালে ফোন করেছিলেন ভদ্রলোক আমার কাছে, আপনাকে চাইছিলেন।'

ঝট্ করে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর সোহানা, বিসিআই-এর প্রথম সারির এজেন্ট ওরা—আন্দালিব সিদ্দিকীকে না চেনার কোনও কারণ নেই। বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের টপ সিক্রেট ওয়াচলিস্টের প্রথম দশজনের একজন এই ভদ্রলোক। ওয়াচলিস্টটা আসলে অসাধারণ প্রতিভাবান ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশিদের একটি তালিকা, যাঁরা বিভিন্ন কারণে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এঁদের দিকে নজর রাখা এবং সম্ভব হলে দেশে

ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অনেক গুরুদায়িত্বের একটি। এভাবে তালিকাভুক্ত অনেক বিখ্যাত মানুষকেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অতীতে, তাঁদের প্রতিভাকে দেশের মাটিতে... দেশের কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অনেক সময় আড়াল থেকে প্রবাসজীবনে ওয়াচলিস্টের মানুষদের নিরাপত্তার দিকটাও নিশ্চিত করে বিসিআই।

তবে উপরে উল্লেখ করা দুটো ক্ষেত্রের কোনোটাতেই পড়েন না ড. সিদ্দিকী। বাংলাদেশে ফেরানো হয়নি তাঁকে, নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা যায়নি। সত্যিকার একজন রহস্যমানব বলতে যা বোঝায়, তিনি তা-ই। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন, দেখা-ই পাওয়া যায় না—নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিংবা দেশে ফিরিয়ে আনতে হলে তাঁর কাছে তো পৌঁছুতে হবে প্রথমে! ওয়াচলিস্টে গত দশ বছর ধরে নাম রয়েছে ভদ্রলোকের, এর মধ্যে হাতে গোনা মাত্র চারবার জনসমক্ষে হাজির হয়েছেন তিনি, সে-সময়ও তাঁর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি বিসিআই এজেন্টরা... বৈরী আমেরিকানদের কারণে।

অত্যন্ত প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী এই আন্দালিব সিদ্দিকী। একাধারে একজন বায়োকেমিস্ট, ফার্মাসিস্ট ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার। শৈশবের গোড়াতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি, বড় হয়েছেন শিকাগোতে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যুগান্তকারী একটা আর্টিফিশিয়াল প্ল্যান্ট-হরমোন আবিষ্কার করেন তিনি—ওটা বেশ কিছু শস্যের ফলনবৃদ্ধির সহায়ক। নোবেলের জন্য নামও পাঠানো হয়েছিল এ-কারণে, শুধুমাত্র বয়সের দিক থেকে

ডাকসাঁইটে বিজ্ঞানীদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন বলে বাদ পড়ে যান। এসব খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ড. সিদ্দিকীর বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি।

এই প্রতিভাবান মানুষটি বিসিআই-এর নজরে আসেন অনেক দেরিতে। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে ফেলেছেন তিনি, ডক্টরেটও করেছেন... এবং পড়ে গেছেন আমেরিকানদের খপ্পরে। ভদ্রলোককে মার্কিন সরকার গোপন গবেষণায় নিয়োগ করেছে জানতে পেরেই আসলে নড়েচড়ে ওঠে বিসিআই—ওয়াচলিস্টে ঢোকানো হয় তাঁর নাম। কিন্তু এর বেশি আর কোনও অগ্রগতি হয়নি ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে। গত দশ বছর ধরে তাঁকে যখের ধনের মত আগলে রেখেছে মার্কিন সরকার, লুকিয়ে রেখেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। বহু কষ্টে একবার ড. সিদ্দিকীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছিল বিসিআই, তাঁকে বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হননি। ঘটনাটার রিপোর্ট পড়েছিল রানা, তাতে লেখা হয়েছিল—ড. সিদ্দিকীর মধ্যে বাংলাদেশের জন্য কোনও দরদ নেই। যুক্তরাষ্ট্রে বড় হয়েছেন তিনি, যুক্তরাষ্ট্রকেই নিজের দেশ বলে জানতে শিখেছেন, ফলে আমেরিকানদের স্বার্থেই নিজের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে চান তিনি। বাংলাদেশ বা অন্য কোথাও যাবার কোনও ইচ্ছেই নেই তাঁর ভিতর।

ড. সিদ্দিকীর এই মনোভাবের পর আসলে আর কিছু করার ছিল না বিসিআই-এর। ভদ্রলোক অবিবাহিত, তাঁর বাবা-মা-ও মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, আত্মীয় বলতেও তেমন কেউ নেই; জন্মভূমির প্রতি দায়িত্ববোধ জাগানোর মত ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল না। অবশ্য তারপরও ওয়াচলিস্ট থেকে ড. সিদ্দিকীর নাম সরাননি বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত)

রাহাত খান, শুভবুদ্ধি উদয়ের অপেক্ষায় থেকেছেন।

চকিতে এসব মনে পড়ে গেল রানার। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল উত্তেজনায়—তা হলে কি সুযোগটা এসেছে? সেজন্যেই রাতদুপুরে হেডকোয়ার্টারের মেসেজ নিয়ে ছুটে এসেছে জাকির?

'খুলে বলো, শুনি।' শাখাপ্রধানকে বলল রানা।

'তেমন কিছু ছিল না ফোনটা,' জাকির বলল। 'দশটার দিকে কল করেন ভদ্রলোক, নিজের নামটা বলেন, তারপর আপনাকে চান। আপনি নেই শুনে চাপাচাপি করতে থাকেন আপনার কণ্ট্যাক্ট ইনফরমেশন চেয়ে। তখন আমিও চাপ দিই তাঁর প্রয়োজনটা জানার জন্য। প্রথমে বলতে চাননি, পরে বললেন—ভয়ানক বিপদে পড়েছেন, আমাদের এজেন্সিকে ভাড়া করতে চান প্রোটেকশনের জন্য। তবে কেসটা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই হ্যাণ্ডেল করতে হবে। আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি।'

'হুম, তারমানে ইনডাইরেক্টলি বিসিআই-এর সাহায্য চাইছেন তিনি আমেরিকা ছাড়ার জন্য,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে, মত পাল্টেছেন শেষ পর্যন্ত!'

'ব্যাপারটা এত সোজা নয়, মাসুদ ভাই,' কাষ্ঠ হাসি হাসল জাকির। 'পুরোটা শুনুন আগে। ড. সিদ্দিকীর আমেরিকা ছাড়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। ভদ্রলোকের চাহিদাটা একদম অন্যরকম। তিনি চান, পরিচয় পাল্টে আপনি তাঁকে এই দেশের ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে ফেলুন... সোজা কথায়, রিলোকেশন।'

থমকে গেল রানা-সোহানা। অজ্ঞাতবাসে যেতে চান ড. সিদ্দিকী? এই দেশেই? চাইলে অবশ্য তাঁকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করা যায়—আইডেন্টিটি চেঞ্জ ও রিলোকেশনের পুরো

সেটআপ রয়েছে রানা এজেন্সির, রয়েছে এ-কাজে স্পেশালিস্ট একটা টিম। দু'বছর হলো এফবিআই-এর *উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রামের* সহায়ক বেসরকারি সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ওদেরকে—কার্যক্রমটার মূল উদ্দেশ্যই হলো গুরুত্বপূর্ণ মামলার সাক্ষীদের নাম-পরিচয় পাল্টে অজ্ঞাতবাসে পাঠানো, যাতে তাদের কোনও বিপদ না হয়। এ-ধরনের বেশ কয়েকটা কেস ইতিমধ্যে হ্যাণ্ডেল করেছে ওরা সাফল্যের সঙ্গে। ড. সিদ্দিকীকে লুকানো কোনও কঠিন কাজ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক আমেরিকাতে রিলোকেটেড হতে চাইছেন কেন? সত্যিই যদি তিনি জীবনসংশয়ী কোনও বিপদে পড়ে থাকেন, তা হলে বাংলাদেশে চলে যাওয়াটাই কি অনেক বেশি নিরাপদ নয়?

সোহানা জানতে চাইল, 'কী ধরনের বিপদে পড়েছেন ড. সিদ্দিকী—সেটা বলেছেন?'

মাথা নাড়ল জাকির। 'না। আসলে কিছুই বলতে চাইছিলেন না। যা-বলার, তা শুধু মাসুদ ভাইকে বলবেন। নিজের প্রয়োজনটা জানিয়েছেন শুধু আমাকে।'

'হুম,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'তারপর?'

'ড. সিদ্দিকী সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আমার,' বলল জাকির। স্বাভাবিক, শুধুমাত্র সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ওয়াচলিস্ট-সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা সম্ভব নয়, বলা বাহুল্য--জাকিরের ও-ধরনের ক্লিয়ারেন্স নেই। 'তাই প্রথমে ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছি—ফেডারেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এ-ধরনের কেস হ্যাণ্ডেল করতে পারে না রানা এজেন্সি। কিন্তু ড. সিদ্দিকী নাছোড়বান্দা, আপনাকে ওর নাম বললেই নাকি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

কাল সকালে আবার ফোন করবেন বলেছেন, কেসটার বিষয়ে আপনি কী সিদ্ধান্ত নিলেন—সেটা জানার জন্য। আমার মনে একটু কৌতূহল জাগল ভদ্রলোকের পীড়াপীড়ি শুনে, আপনাকে বিরক্ত করবার আগে তাই বিকেলে যোগাযোগ করেছিলাম বিসিআই হেডকোয়ার্টারে... ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে কোনও তথ্য পাই কি না দেখার জন্যে...'

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না রানা। বোঝাই যাচ্ছে, বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের নাম শোনামাত্র মৌচাকে ঢিল পড়ার মত অবস্থা হয়েছে হেডকোয়ার্টারে। কী ঘটেছে জানার পর জাকিরকে রাতদুপুরে পাঠানো হয়েছে ওর আর সোহানার কাছে... কেসটা হাতে নেবার জন্যে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের জন্যে কী মেসেজ দিয়েছে ঢাকা?'

'আমার ব্রিফিঙের পর চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাদের।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা—ছুটিটা শিকেয় উঠল। 'ঠিক আছে, তুমি অপেক্ষা করো। আমরা এখুনি কথা বলছি।'

সোহানাকে নিয়ে স্টাডিতে চলে এল রানা, ওখানে একটা স্ক্র্যাম্বলড্ লাইন আছে। ওটা দিয়ে ঢাকায় ফোন করল রানা—সরাসরি চিফের নাম্বারে।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরই রিসিভারে ভেসে এল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'ইয়েস?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল।

কোনোরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'রানা, সার।'

'ইয়েস, এমআরনাইন, আমি তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জাকিরের কাছে শুনেছ সবকিছু?'

'জী, সার।'

'কী বুঝলে?'

'কোথাও একটা গোলমাল আছে, সার। আমেরিকানদের হয়ে এত বছর ধরে কাজ করছেন ড. সিদ্দিকী, যে-কোনও বিপদে তো ওরাই তাঁকে প্রোটেকশন দেবে। আমাদের সাহায্য চাইছেন কেন ভদ্রলোক? বাংলাদেশেও তো আসতে চাইছেন না। কী যেন মিলছে না, সার।'

'হ্যাঁ, রহস্য যে একটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই,' একমত হলেন রাহাত খান। 'তবে সে-কারণে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমরা। ড. আন্দালিব সিদ্দিকী আমাদের দেশের জন্য একটা অ্যাসেট, এতদিন পর যখন ওঁর নাগাল পাওয়া গেছে, সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করো তুমি, এমআরনাইন। দেখো, ওঁকে দেশে নিয়ে আসা যায় কি না।'

'কিন্তু সার...' ভয়ে ভয়ে বলল রানা। 'ড. সিদ্দিকী তো বাংলাদেশে আসতে চাইছেন না, আমেরিকাতেই গা-ঢাকা দিতে চাইছেন।'

'জানি। কিন্তু কেন চাইছে—তা বের করো প্রথমে। তারপর চেষ্টা করবে ওঁকে বাংলাদেশে আসবার জন্য কনভিন্স করতে।'

'ঠিক আছে, সার।'

'কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সোহানাকে আমি তোমার ব্যাকআপ হিসেবে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে তোমার?'

আড়চোখে সোহানাকে দেখল রানা। ঢোঁক গিলে বলল, 'জী, সার।'

'ওকে জানিয়ো—ওর ছুটির দরখাস্তটা আপাতত স্থগিত করে রাখছি আমি... সেই সঙ্গে তোমারটাও।'

'বলে দেব, সার।'

'চোখ-কান খোলা রেখো। ড. আন্দালিব সিদ্দিকী ছোটখাট কোনও সমস্যায় পড়েছেন বলে মনে হয় না। ওঁকে সাহায্য করতে গেলে বড় ধরনের বিপদ মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে।'

'আমি সাবধান থাকব, সার।'

'কী ঘটে না ঘটে, জানিয়ো আমাকে। বেস্ট অভ লাক, রানা।' বলে লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

চার

ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে এল মাসুদ রানা। রানা এজেন্সির কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে মডিফাই করা একটা ফোর্ড টরাস ওটা, প্রথম দর্শনে ধূসর-রঙা গাড়িটার সঙ্গে আর দশটা সাধারণ সেডানের কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে না। অবশ্য এই শেষ বিকেলে পরিত্যক্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাটায় ওটাই একমাত্র গাড়ি।

নিউয়ার্ক, নিউ জার্সি। পরদিন। মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলার পর কেটে গেছে প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা। এর মধ্যে সকাল ঠিক দশটায় আবার ফোন করেছিলেন ড. আন্দালিব সিদ্দিকী—রানা ওঁকে সাহায্য করতে রাজি আছে শুনে এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন তিনি, সঙ্গে দিয়েছেন একটা সেলফোন নম্বর... বিকেলে মাত্র আধঘণ্টার জন্য চালু থাকবে ওটা। জায়গামত পৌঁছে ফোন করতে হবে রানাকে, তারপর দেয়া হবে পরবর্তী নির্দেশনা।

গাড়ি থেকে নেমেই চারপাশে তাকাল রানা। ষাট ফুট উঁচু একটা ওয়্যারহাউস দেখা যাচ্ছে নাক বরাবর, নীচতলার বাইরের দেয়াল শৌখিন আঁকিয়েদের করা রং-বেরঙের গ্রাফিতোয় ভরা। বিল্ডিংটার বাকি অংশ অবশ্য দেখার মত নয়—বয়সের ভারে জর্জরিত হয়ে গেছে পুরোটা। দেয়াল কালচে বর্ণ ধারণ করেছে, জানালার কাঁচ একটাও অবশিষ্ট নেই। ওয়্যারহাউসের প্রকাণ্ড দরজাটা ভাঙা, ফাঁক দিয়ে নানা রকম আবর্জনা চোখে পড়ল। ওখানে বেশ কিছু বড়সড় কাঠের ক্রেট আর কাগজের কার্টনও দেখা গেল—ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে গৃহহীন উদ্বাস্তুরা বসবাস করে ওগুলোর ভিতর... এখনও আছে বোধহয়, কানে আবছাভাবে মানুষের নড়াচড়ার শব্দ আসছে। পুরো এলাকাটাই গৃহহীন আর ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল—আসার পথে দেখেছে রানা।

মাথার উপর কালো মেঘের আনাগোনা, এলাকাটাকে আড়াল করে রেখেছে সূর্যের কাছ থেকে। ওয়্যারহাউসের পিছন দিয়ে নদী বইছে, ওখানে একটা টাগবোটের গুরুগম্ভীর হর্ন বেজে উঠল... আর সেটার পর পরই আকাশে বিজলি চমকাল। তারপরই কড়...কড়...কড়াৎ!

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা—কেমন যেন একটা অশুভ অনুভূতি কাজ করছে ওর ভিতর। আশ্বস্ত হবার জন্য জ্যাকেটের উপর দিয়ে শোল্ডার-হোলস্টারে বাম হাতের কনুই বোলাল ও—যেন ওখানে রাখা নাইন মিলিমিটার হ্যাণ্ডগানটার অস্তিত্ব নিশ্চিত করে নিতে চায়। ইদানীং একটা সিগ-সাওয়ার ২২৫ ব্যবহার করছে ও, ম্যাগাজিনে আটটা আর চেম্বারে একটা মিলিয়ে মোট ন'টা বুলেট ধরে। অ্যামিউনিশনের ক্যাপাসিটি সিক্সটিন-শট সিজেড সেভেন্টি ফাইভের চেয়ে অনেক কম, তবে জিনিসটা হালকা... অ্যাকিউরেসিও অন্যান্য অনেক হ্যাণ্ডগানের চেয়ে অনেক ভাল। কনসিলড্ ওয়েপন হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যেতেই জ্যাকেটের কলার তুলে দিল রানা, বৃষ্টি আসবে খুব শীঘ্রি। ওয়্যারহাউসের ভাঙা দরজার আড়াল থেকে কয়েকটা নোংরা মুখ উঁকি দিল, কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পকেট থেকে নিজের সেলফোনটা বের করল রানা, ডায়াল করল ড. সিদ্দিকীর দেয়া নাম্বারটাতে।

রিং হতে হতে ওয়্যারহাউসের দরজায় কৌতূহলী মুখের সংখ্যা আরও বাড়ল। ওদিকে পিঠ ফিরিয়ে হেঁটে একটু দূরে চলে এল ও।

তিনবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল 'ইয়েস?' কণ্ঠটা ভারিক্কি, তবে কাঁপছে একটু।

'ওয়্যারহাউসটা দেখি বন্ধ হয়ে গেছে!' আগে থেকে ঠিক করা কোড উচ্চারণ করল রানা।

'দশ বছর আগে,' ওপাশ থেকে জবাব এল।

'তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই দশদিনে আবার চালু করা

যাবে?' কোডের শেষ অংশটা বলল রানা।

'নিশ্চয়ই,' একটু স্বস্তি ফুটল যেন ভারী কণ্ঠটাতে। 'ওয়েলকাম টু নিউইয়র্ক, মি. রানা। পথ চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'খুব একটা নয়।'

'গুড। তবে আপনার এজেন্সির যতটা সুনাম শুনেছি, তাতে আরও সুন্দর, আধুনিক কোনও গাড়ি আনবেন ভেবেছিলাম।'

'সেক্ষেত্রে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো না? আমরা ওসব এড়িয়ে চলি। ঠাট দেখাতে গেলে কাজের কাজ হয় না কিছুই, বরং ঝামেলা বাড়ে।'

'আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমার পছন্দ হয়েছে,' বলল কণ্ঠটা। 'আপনি একা এসেছেন তো?'

ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। একটু বিরক্ত হয়ে রানা বলল, 'কেন, সন্দেহ আছে? গাড়ির কথা যখন বললেন, তার মানে তো আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন।'

'গাড়ির সবক'টা দরজা খুলুন, প্লিজ। আমি শিয়োর হতে চাই।'

খুলল রানা।

'এবার ট্রাঙ্কটা।' নির্দেশ এল।

তা-ও খুলল রানা। মাথায় হিসেব কষছে—কোথায় পজিশন নিলে লোকটার পক্ষে গাড়ির ভিতরটা দেখা সম্ভব হতে পারে।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, কথা বলছে না মানুষটা, ফোনে শুধু খসখস শব্দ হচ্ছে। 'হ্যালো?' ডাকল রানা।

অপরপক্ষ নিরুত্তর।

'হ্যালো, ডক্টর? আপনি শুনতে পাচ্ছেন?'

তাও জবাব নেই।

আবার বজ্রপাত হলো কাছে কোথাও। বৃষ্টির তোড় বাড়ছে। ওয়্যারহাউস থেকে কয়েকজন ভবঘুরে বেরিয়ে এসেছে—ময়লা পোশাক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাঁটছে এলোমেলো ভঙ্গিতে। নিশ্চয়ই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, ওকে সহজ শিকার ভেবে এগিয়ে আসছে ছিনতাই করতে।

'হলোটা কী আপনার, ডক্টর?' একটু রাগী স্বরে বলল রানা। 'আমি সাহায্য করতে এসেছি, বৃষ্টিতে ভিজতে নয়।'

এখনও কথা বলছেন না বিজ্ঞানী। নাহ্, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ভদ্রলোককে বোঝানো দরকার—ঠেকাটা তাঁর, ওর নয়। ট্রাঙ্কের ডালা আর দরজাগুলো বন্ধ করল ও। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতে যাবে, এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল ফোনটা। ভারিক্কি কণ্ঠটা বলল, 'বিল্ডিঙের বাম পাশে চলে আসুন। একটা দরজা পাবেন, ভিতরে সিঁড়ি আছে। চলে আসুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়িতে ঢুকল রানা।

'যাচ্ছেন কোথায়?' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী। 'ভিতরে আসুন!'

'আগে গ্যাড়িটা পার্ক করি,' বলল রানা, আড়চোখে অ্যাডিক্ট লোকগুলোকে দেখছে। 'নইলে ফিরে এসে গাড়ির একটা নাট-বল্টুও পাবো না।'

ওয়্যারহাউসের বামদিকে একটা পার্কিং লট আছে, স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে ওখানে নিয়ে গেল রানা, রাস্তার দিকে মুখ করে পার্ক করল, যাতে ইমার্জেন্সি দেখা দিলে দ্রুত বেরুনো যায়। তারপর বেরিয়ে এসে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তালা দিল দরজায়।

বিল্ডিঙের গায়ে লোহার দরজাটা দেখতে পেল ও এবার—এই একটা দরজাই সম্ভবত অক্ষত আছে ভাঙাচোরা

ভবনটার। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে একছুটে দরজার সামনে পৌঁছুল ও; হাতলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা। ওপাশে কোনও বিপদ আছে কি না, জানা নেই। তবে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ও, তাই ফোনটা পকেটে রেখে পিস্তলটা হাতে নিল প্রথমে, তারপর সাবধানে ঢুকল ভিতরে।

দরজার ওপাশটায় আধো-অন্ধকার। আবছাভাবে ছোট্ট একটা ল্যাণ্ডিং দেখা গেল, সামনে স্টেয়ারকেস রয়েছে; ইস্পাতের তৈরি একটার পর একটা ধাপ উঠে গেছে উপরে। রেলিঙে মাকড়সার জালের রাজত্ব। ডানে একটা এলিভেটর ডোরও রয়েছে, ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মোটরের আওয়াজ। পুরো জায়গাটাতেই কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

পিছনে ঘটাং করে শব্দ হলো—দরজাটা আটকে গেছে। মাথা ঘোরাতেই পাল্লার এপাশটায় লাগানো একটা ইলেকট্রনিক লকিং মেকানিজম চোখে পড়ল। দূর থেকে রিমোটের সাহায্যে তালা আটকানো যায়। নিজেকে বন্দি মনে হলো রানার... তালাবদ্ধ একটা জায়গায় আটকা পড়তে কার-ই বা ভাল লাগে?

পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডায়াল করল আবার ও। 'কোথায় আপনি?'

জবাব এল না, তার বদলে মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল এলিভেটরের দরজাটা, ভিতরে জ্বলতে থাকা বাতি থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়ল ল্যাণ্ডিঙে।

এ-ধরনের পরিস্থিতিতে এলিভেটর পছন্দ করে না রানা—ছোট্ট লোহার বাক্সটা মরণফাঁদ হয়ে উঠতে পারে মুহূর্তে। তাই ও বলল, 'ধন্যবাদ, তবে একটু পায়ের ব্যায়াম দরকার আমার। সিঁড়ি ধরে আসছি।'

বলল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো না ও। তাড়াহুড়ো

করতে চাইছে না, বুঝে-শুনে এগোবে। আবছা আলোর সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে নেয়ার জন্য একটু সময় নিল, চোখদুটোয় ছায়া-ছায়া পরিবেশ সয়ে আসতেই সিঁড়ির ফাঁকে বসানো সার্ভেইলান্স ক্যামেরাটা দেখতে পেল ও।

'আপনি দেখছি ফার্স্ট ক্লাস সিকিউরিটি সিস্টেম বসিয়েছেন এখানে,' বলল রানা।

'দুঃখের বিষয়, ব্যবস্থাটা শুধু সাময়িক নিরাপত্তা দিতে পারে। আমার পিছনে যারা লেগেছে, তাদের জন্যে এটা কিছুই নয়।' ফোন নয়, দেয়ালে বসানো লুকানো স্পিকার থেকে ভেসে এল কথাটা। 'সেজন্যেই আপনাকে আমার প্রয়োজন, মি. রানা। আসুন উপরে, আমি অপেক্ষা করছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল রানা, ফোনটা আবার রেখে দিয়েছে পকেটে। দোতলায় একটা লোহার দরজা পড়ল, ওটার দিকে এগোতেই স্পিকারে শোনা গেল, 'ওটা নয়। একদম উপরে চলে আসুন। এখানে আরেকটা দরজা পাবেন।'

ঘুরে আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল রানা। স্পিকারে বলা হলো, 'কিছু মনে করবেন না, তবে আপনি যেভাবে পিস্তল বাগিয়ে উঠে আসছেন, তাতে একটু অস্বস্তি বোধ করছি আমি।'

'কিন্তু আমি স্বস্তি বোধ করছি,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আপনার চেয়ে আমার স্বস্তিটাই বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয় কি?'

হালকা একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। 'আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই, মি. রানা। আমি আপনার জন্য বিপজ্জনক নই।'

'কথা দিচ্ছি—নিশ্চিত হওয়ামাত্র পিস্তলটা সরিয়ে রাখব।'

চুপ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। একটু পরই টপ ফ্লোরে উঠে এল রানা। সামনে একটা দরজা রয়েছে, হাট করে খোলা।

ওপাশে একটা আলোকিত করিডর দেখা যাচ্ছে। করিডরের অপরপ্রান্তে আরেকটা দরজা রয়েছে, সেটা বন্ধ। দরজার উপরে রয়েছে আরও একটা ক্যামেরা। হেঁটে গিয়ে দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর নব ঘুরিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। বার কয়েক চোখ মিটমিট করে আলোটা সইয়ে নিয়ে পা রাখল কামরায়। নানা আকারের অনেকগুলো টিভি মনিটর রয়েছে ভিতরে—সার্ভেইলান্স ক্যামেরার ফিড দেখানোর জন্য। আর রয়েছে একটা মাঝারি আকারের ইলেকট্রনিক কনসোল। তবে রানার নজর কাড়ল কনসোলের সামনে চেয়ারে বসা মানুষটা—দরজার দিকে মুখ করে রয়েছেন তিনি, প্রসারিত হাতে ধরে রেখেছেন একটা কোল্ট .৪৫ সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, ভীষণভাবে কাঁপছে ব্যারেলটা। টেনশন, নাকি ভয়ে—বলা কঠিন।

ড. আন্দালিব সিদ্দিকী!

পাঁচ

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিজ্ঞানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা। ডোশিয়েতে তাঁর যে-ক'টা ছবি আছে, তার সবই কয়েক

বছরের পুরনো। এর মাঝে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ভদ্রলোকের। মোটা হয়েছেন বেশ, দেহটাকে প্রায় থলথলেই বলা যায়। বয়স মাত্র ঊনচল্লিশ হলেও মাথার উস্কোখুস্কো চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে—নিশ্চয়ই টেনশন আর কাজের চাপে। চোখদুটো গর্তে বসে গেছে, মণির সাদা অংশ লাল হয়ে রয়েছে—নির্ঘুম রাত কাটানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত। শেভও করেন না বোধহয় কয়েকদিন থেকে, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরে রয়েছে গাল। অবশ্য এই পরিবর্তিত এবং বিধ্বস্ত অবস্থাতেও পুরনো ছবিগুলোর সঙ্গে চেহারার মিল পাওয়া যায়। সন্দেহের অবকাশ নেই, ইনি সত্যিই ড. আন্দালিব সিদ্দিকী। কেন যেন প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে আছেন ভদ্রলোক, কোল্ট-ধরা হাতের কাঁপুনি সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

'রিল্যাক্স!' নিজের পিস্তলটা নামিয়ে বলল রানা। 'গুলি করে বসবেন না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'আমাকে শিয়োর হতে হবে,' বললেন ড. সিদ্দিকী, 'আপনি সত্যিই মাসুদ রানা তো?'

'আর কে হতে পারি? আর কয়জনকে আপনার ফোন নম্বর, কোড বা ঠিকানা দিয়েছেন?'

'ওসব টরচার করেও জেনে নেয়া যায়।' ডান হাতে কোল্টটা স্থির রেখে বাম হাত দিয়ে কনসোলের একটা বোতাম চাপলেন সিদ্দিকী। ধড়াম করে রানার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল রুমের দরজাটা—আবার সেই ইলেকট্রনিক লক!

বিজ্ঞানীকে আশ্বস্ত করার জন্য পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলল রানা। বলল, 'খামোকা ভয় পাচ্ছেন, ডক্টর। যে-ধরনের সিকিউরিটির ব্যবস্থা রেখেছেন এখানে, তাতে কেউই একা আপনার ওপর হামলা করতে আসবে না। যুক্তি দিয়ে বিচার

করলেই বুঝতে পারবেন, আমি আপনার জন্য কোনও থ্রেট নই।'

'অপ্রত্যাশিত কৌশলই সবচেয়ে কার্যকর হয়,' অনড় ভঙ্গিতে বললেন সিদ্দিকী। 'একা একজনকে দেখে অসতর্ক হয়ে পড়ব, আর সেই সুযোগে আমাকে ঘায়েল করবেন—এমনটা হতে পারে না?' কাটা কাটা স্বরে কথা বলছেন তিনি। 'তা ছাড়া বন্ধু হিসেবে এলেও যুক্তিটা আপনার বিপক্ষে যাচ্ছে। একজন মানুষ যদি থ্রেট হিসেবে বিরাট কিছু না হয়ে থাকে, তা হলে সেই একজন মাত্র মানুষই বা কীভাবে আমাকে প্রয়োজনীয় প্রোটেকশন দেবে?'

'আপনি তো প্রোটেকশন চাননি, চেয়েছেন নাম-পরিচয় পাল্টে হারিয়ে যেতে।'

'সেটা আপনার একার পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব?'

'না,' রানা মাথা নাড়ল। 'এর জন্য অনেক ধরনের প্রস্তুতি লাগে, আমি সকল কাজের কাজী নই। ওসবের জন্য আমার এজেন্সির আলাদা একটা স্পেশালিস্ট টিম আছে, আপনার কেসটাও... যদি আমরা নিই... ওরাই সামলাবে।'

'আমি তো আর কাউকে চাইনি, শুধু মাসুদ রানাকে চেয়েছি!' প্রতিবাদ করলেন সিদ্দিকী।

'চিন্তার কিছু নেই, আমি পুরো সময়টা আপনার সঙ্গে থাকব,' আশ্বাস দিল রানা। 'ভয় পাবেন না, আমি সত্যিই মাসুদ রানা।'

'সেটাই তো নিশ্চিত হতে চাইছি।'

ধৈর্য হারাতে বসেছে রানা। থমথমে গলায় বলল, 'ডক্টর, আপনি আমার সাহায্য চান? তা হলে পিস্তলটা নামান। নইলে ওটা আমি কেড়ে নেব।'

'কেড়ে নেবেন!'

'হ্যাঁ, কেড়ে নেব। তাতে আপনি আহতও হতে পারেন। সেটাই কি চান?'

মাথা নাড়লেন ড. সিদ্দিকী। 'আমি শুধু বাঁচতে চাই।'

'তা হলে সরান পিস্তলটা।'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন বিজ্ঞানী, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে ফেললেন অস্ত্র-ধরা হাতটা। দুর্বল গলায় বললেন, 'আপনি যদি মাসুদ রানা না হয়ে থাকেন, তা হলে এখুনি খুন করে ফেলুন আমাকে। আমি আর টেনশন সহ্য করতে পারছি না।'

পাশ থেকে একটা খালি চেয়ার টেনে বসল রানা। বলল, 'আগেই বলেছি—আমিই রানা। আপনার ভয়ের কিছু নেই। ক্ষতি করবার ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতাম।'

'যদি তা-ই হয়ে থাকেন, তা হলে এক্ষুণি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করুন,' আকুতির মত শোনাল ড. সিদ্দিকীর কথাটা। 'আমি মস্ত বিপদে আছি, এই হাইডআউট আমার জন্য নিরাপদ নয়।'

'অস্থির হবেন না,' রানা বলল। 'আগে পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে আমাকে। কারা আপনাকে খুন করতে চায়? কেন?'

'ওসব জানার প্রয়োজন আছে কি?'

'অবশ্যই। বিপদের ধরন অনুসারে প্রোটেকশন মেথড ঠিক করতে হয়।'

'মেথড তো বলেই দিয়েছি—পরিচয় পাল্টাতে হবে আমাকে... গা-ঢাকা দিতে হবে।'

'তারপরও... বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন, যাতে বুঝতে

পারি—কী ধরনের পরিচয় দেয়া হলে আপনি সবচেয়ে নিরাপদ থাকবেন।'

'তা আমিই বলে দিতে পারি।'

এবার সত্যিই বিরক্ত হলো রানা। 'দেখুন, আমার সাহায্য চাইলে লুকোচুরি করতে পারবেন না। এতে রাজি না থাকলে খামোকাই সময় নষ্ট করছি আমরা।'

হার মানলেন যেন বিজ্ঞানী। 'ঠিক আছে, আপনার কথামতই হবে সব।'

'তা হলে সমস্যাটা গোড়া থেকে খুলে বলুন।'

'বলব... তার আগে...' ঘন ঘন শ্বাস নিতে শুরু করেছেন ড. সিদ্দিকী, কথা আটকে যাচ্ছে।

'কী হয়েছে আপনার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'...অ্যাজমা...আমার ইনহেলার...'

'কোথায় ওটা?'

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন ড. সিদ্দিকী।

তাড়াতাড়ি উঠে গেল রানা। রুমের একপাশে একটা ছোট্ট ক্যাম্প-খাট আছে, পাশেই সাইড-টেবিল, তার উপর পাওয়া গেল ইনহেলারটা। ওটা এনে দিল ও। ইনহেলারটা মুখে লাগিয়ে স্প্রে করতে শুরু করলেন বিজ্ঞানী। তাঁকে স্বাভাবিক হতে সময় দিল রানা, এই ফাঁকে নজর বোলাল রুমটার উপর।

খাট ছাড়াও বেশ কিছু জিনিস রয়েছে ঘরটাতে—একটা মিনি-ফ্রিজ, সিঙ্ক, ছোট স্টোভ, ভাঙাচোরা বইয়ের শেলফ, তার উপরে চোদ্দো-ইঞ্চি একটা টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার। এক কোণে বাথরুমের দরজাও দেখা গেল। খাটের পাশে মেঝেতে স্তূপ হয়ে আছে নানা রকমের কেনা-খাবার। ম্যাকারনি-চিজ, টিনজাত র‍্যাভিওলি-লাসানিয়া, চকলেট, ক্যাণ্ডি বার, পটেটো-

চিপস্, কেসভর্তি কোকাকোলা—সবই রিচ ফুড। ভদ্রলোকের থলথলে দেহের রহস্য বোঝা যাচ্ছে এখন—খাবারদাবারের ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন ড. সিদ্দিকী।

'ক'দিন থেকে আছেন আপনি এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দু'সপ্তাহ,' ইনহেলার নামিয়ে জবাব দিলেন ড. সিদ্দিকী, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিকে নেমে এসেছে।

শেলফে সাজিয়ে রাখা বইগুলো নজর কাড়ল রানার, এগিয়ে গিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে শুরু করল ও। গল্প-উপন্যাস নেই একটাও, সবই তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধের বই—নানাবিধ সব বিষয়ের উপরে। জিয়োলজির বই যেমন আছে, আছে ফটোগ্রাফির বইও। প্রচ্ছদে নগ্ন নারীর ছবি দেখে একটাকে মনে হলো পর্নোগ্রাফি, আবার এর সঙ্গে একেবারে বেমানান হয়ে পাশাপাশি পড়ে রয়েছে একটা কাব্যগ্রন্থ—*কালেক্টেড পোয়েমস্ অভ রবিনসন জেফারস্।*

বইটা হাতে তুলে রানা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কবিতা পছন্দ করেন?'

'খুব। হৃদয়ে শান্তি এনে দেয়।'

পাতা উল্টে একটা কবিতার প্রথম কয়েকটা লাইন জোরে জোরে পড়ল রানা। 'আই বিল্ট হার আ টাওয়ার, হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং—সামটাইম শি উইল ডাই!'

'লাইনটা কী অদ্ভুত খেয়াল করেছেন?' বললেন ড. সিদ্দিকী। 'শাহজাহানের তাজমহলের মত প্রেমিকাকে টাওয়ার বানিয়ে দিয়েছে, আবার তার মৃত্যুও কামনা করছে! পাঠকের মনোযোগ খপ্ করে ধরে ফেলে। এজন্যেই রবিনসন জেফারস্ আমার এত প্রিয়।'

প্রত্যুত্তর দিল না রানা, বই রেখে এবার মনোযোগ দিল

ডিভিডি-র দিকে—মাত্র দুটো ডিস্ক দেখা যাচ্ছে প্লেয়ারের পাশে। আসলে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে মানুষটার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে আইডিয়া নিচ্ছে ও—যদিও তেমন সুবিধে করতে পারছে না। বইগুলোর বিষয় যেমন বিচিত্র, ছবিদুটোর-ও। একটা ক্লিন্ট ঈস্টউডের থ্রিলার, অন্যটা স্যাণ্ড্রা ডি আর ট্রয় ডোনাহিউ অভিনীত পুরনো দিনের বুক-ভাসানো রোমান্টিক ট্র্যাজেডি।

'আপনার সিনেমার পছন্দ তো দেখি ভারি অদ্ভুত!' কৌতূহলী সুরে বলল রানা। 'সম্পূর্ণ বিপরীত ধাঁচের দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি... দু'রকমই ভাল্লাগে আপনার?'

সুস্থ হয়ে উঠেছেন ড. সিদ্দিকী। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'উঁহুঁ, ব্যাপারটা তা নয়। ও'দুটোতে কমন একটা জিনিস আছে—ওটাই আমার পছন্দ। ছোটবেলা থেকেই জিনিসটা আমার একটা স্বপ্ন বলতে পারেন।'

'কীসের কথা বলছেন?'

'বলে দিলে আর মজাটা রইল কোথায়?' রহস্য করলেন বিজ্ঞানী। 'সময়-সুযোগ পেলে নিজেই খুঁজে নেবেন না হয়!'

চাপাচাপি করল না আর রানা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ড. সিদ্দিকীর মুখোমুখি চেয়ারটায় ফিরে এল ও। বসতে বসতে বলল, 'আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে আমি ইমপ্রেসড্, ডক্টর। সিকিউরিটি, খাবারের স্টক, সময় কাটানোর ব্যবস্থা... কিছুতেই খুঁত নেই। এমনকী গৃহহীন, ভবঘুরেদের মাঝখানে কাভার নেয়ার আইডিয়াটাও চমৎকার—এখানে আপনাকে খোঁজার কথা কেউ চিন্তাও করবে না। বিপদের মাঝখানে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এতকিছুর ব্যবস্থা করা সত্যি কঠিন।'

'খামোকা প্রশংসা করবেন না,' বললেন ড. সিদ্দিকী। 'এসব আসলে কয়েক বছর আগেই রেডি করে রেখেছিলাম আমি, ইমার্জেন্সি সামলাবার জন্যে। তখন মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছিল না, তাই ধীরে-সুস্থে প্ল্যান করেই হাইডআউটটা তৈরি করতে পেরেছি।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'বিপদে যে পড়বেন, সেটা তখন থেকেই জানতেন?'

'না। আমি স্রেফ সতর্ক একজন মানুষ, মি. রানা।'

'তাই বলে এতকিছু করে কেউ?'

'করে, যদি...' বলতে বলতে থেমে গেলেন সিদ্দিকী।

'যদি কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব দিলেন না বিজ্ঞানী, সার্ভেইলান্স ক্যামেরার একটা মনিটরে দৃষ্টি আটকে গেছে তাঁর, রানাও ওদিকে তাকাল। ক্যামেরাটা বিল্ডিঙের বাইরে বসানো, স্ক্রিনে পার্কিং লট আর ওর গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ডজনখানেক লোক এগোচ্ছে গাড়িটার দিকে, তুমুল বৃষ্টির কারণে শুধু অবয়ব ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না ওদের।

সেই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট লোকগুলো, ধারণা করল রানা। নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে কিছু চুরি করার তালে আছে। ড. সিদ্দিকী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মনিটরের দিকে। বিড় বিড় করে বললেন, 'করছেটা কী ওরা?'

মুচকি হাসল রানা। 'মতলব যা-ই হোক, সুবিধে করতে পারবে না।'

ঝট করে ওর দিকে তাকালেন সিদ্দিকী। 'মানে?'

'এখুনি দেখতে পাবেন।' পকেট থেকে ফোর্ডের রিমোটটা বের করল রানা, ওটা একটু অস্বাভাবিক—বাড়তি ছ'টা বোতাম

আছে। লোকগুলোকে গাড়ির কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে দিল ও, তারপরই চাপ দিল একটা বোতামে।

মনে হলো লিক করেছে—আচমকা রাশ রাশ সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল ফোর্ডের তলা দিয়ে... চারপাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো, তারপরই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ধোঁয়া ভেদ করে—চোখ কচলাতে কচলাতে পড়িমরি করে পিঠটান দিচ্ছে।

'ইয়া খোদা!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ড. সিদ্দিকী। 'কী করেছেন আপনি?'

'সিরিয়াস কিছু নয়,' হালকা গলায় বলল রানা। 'টিয়ার গ্যাস—অবাঞ্ছিত ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে কার্যকর একটা উপায়। আগামী কয়েক ঘণ্টা নেশা-টেশার কথা ভুলে যাবে ওরা।'

'আপনার গাড়িতে টিয়ার গ্যাস থাকে?' ড. সিদ্দিকীর বিস্ময় যেন বাধ মানছে না।

'শুধু টিয়ার গ্যাস না, আরও অনেক কিছুই থাকে,' হাসল রানা। 'ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড, বিল্ট-ইন মেশিনগান... এমনকী হেডলাইটের পিছনে স্টিঙ্গার মিসাইলও বসানো যায়। বিশেষভাবে মডিফাই করা হয়েছে ওটা—বুলেটপ্রুফ, চেসিসটা আর্মার-প্লেটেড। বুঝতেই পারছেন, আপনাকে অক্ষত রাখার জন্য সেরা জিনিস নিয়েই এসেছি আমি।'

'আমি ইম্প্রেসড্, মি. রানা!' প্রশংসার সুরে বললেন সিদ্দিকী। 'আমরা এখনও তা হলে বসে আছি কেন? চলুন, রওনা হয়ে যাই।' চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেন তিনি।

'এক মিনিট, ডক্টর!' শান্ত কণ্ঠে ওঁকে বাধা দিল রানা। 'এখনও আপনি পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেননি। কীসের বিরুদ্ধে

কাজ করতে হবে, সেটা না জেনে এক পা-ও নড়ছি না আমি।'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন বিজ্ঞানী। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে তিক্ত গলায় বললেন, 'আপনি দেখছি ভারি নাছোড়বান্দা লোক!'

'যা-খুশি ভাবতে পারেন,' বলল রানা। 'তবে আপনাকে আমার দিকটাও চিন্তা করতে হবে। কাউকে নকল নাম-পরিচয় দেয়া একটা বেআইনী কাজ। এফবিআই যদি টের পায়, আমার গোটা এজেন্সি বিপদে পড়ে যাবে। এই ঝুঁকি কেন নেব আমি? সমস্যাটা খুলে বলুন, বিকল্প কোনও পথে ওটার সমাধান করা যায় কি না, ভেবে দেখি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন ড. সিদ্দিকী। 'আপনি কি আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবার কথা ভাবছেন?'

জবাব দিল না রানা।

'লুকোছাপার কিছু নেই, মি. রানা,' থমথমে গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'বিসিআই আর রানা এজেন্সি যে একই জিনিস—তা আমি জানি। জানি বলেই আপনাদের সাহায্য চেয়েছি, কারণ আমি ভেবেছি—বাঙালি একজন বিজ্ঞানীকে আপনারাই সবচেয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য করবেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি বাংলাদেশে যেতে চাই।'

'আপনি কেন ভাবছেন, আপনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমরা পাগল হয়ে গেছি? আপনি গুরুত্বপূর্ণ লোক, তবে নিজেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছেন বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার।' হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, 'কোথায় থাকবেন, কী করবেন সেসব আপনার নিজস্ব ব্যাপার। তার পরেও জানতে ইচ্ছে করে, মা-বাবার দেয়া নাম-পরিচয় মুছে ফেলার মত বিপদে যদি সত্যিই পড়ে থাকেন আপনি, তা হলে

বাংলাদেশে চলে যাওয়াটাই কি অনেক নিরাপদ নয়? ওখানে আপনার সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে...'

'ওটা আমার দেশ নয়, মি. রানা। আমেরিকায় বড় হয়েছি আমি, আমার জন্য এটাই নিজের দেশ। যত বিপদই আসুক, এ-দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

'তা হলে তো শুধু শুধু এসেছি আমি। বাংলাদেশকে যখন আপনি মাতৃভূমিই ভাবেন না, তখন আমরাই বা কোন্ দুঃখে আইন ভেঙে সাহায্য করব বিদেশি এক লোককে?'

'আমাকে ভুল বুঝছেন আপনি,' বললেন সিদ্দিকী। 'বাংলাদেশের প্রতি আমার দরদ নেই—তা তো বলিনি। ওটা যে আমার সত্যিকার মাতৃভূমি, সেটাও অস্বীকার করি না। কিন্তু দেশটা আমার জন্য বিদেশ-বিভুঁইয়ের মত, ওখানকার সমাজ-সংস্কৃতি আমার একেবারেই অচেনা, গিয়ে স্বস্তি পাবো না। তাই যেতে চাই না ওখানে।'

'কথাটা তো একই দাঁড়াল, তাই না? বাংলাদেশকে কিছুই দেবার নেই আপনার।'

'আছে, মি. রানা,' জোর দিয়ে বললেন বিজ্ঞানী। 'এখানে বসেই আমি আমার মেধা-বুদ্ধি বাংলাদেশের উপকারে ব্যয় করতে পারব। আপনি শুধু আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিন।'

যা বলছেন, তা স্রেফ কথার কথা, নাকি ভদ্রলোক সত্যিই আন্তরিক—বোঝার চেষ্টা করল রানা। একটা ব্যাপার ঠিক, কথার মারপ্যাঁচে আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি বার বার। কিছুতেই বলছেন না, কী সমস্যায় পড়েছেন। মার্কিন সরকারের হয়ে গোপন গবেষণা করেন সিদ্দিকী, সমস্যাটা ব্যাখ্যা করতে গেলে টপ সিক্রেট কিছু ফাঁস হয়ে যাবে... সেজন্যেই কি এত

ঢাকঢাক? লোকটাকে আরেকটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েই থমকে গেল স্ক্রিনে চোখ পড়ায়।

পার্কিং লটে আবার ফিরে এসেছে ছায়ামূর্তিগুলো—এবার অবশ্য সংখ্যায় কম, মাত্র চারজন। ভুরু কুঁচকে গেল রানার—নেশার জন্য যত পাগলই হোক, টিয়ার গ্যাসে নাস্তানাবুদ হবার পর সহজে কারও ফিরে আসার কথা নয়। এই লোকগুলো আসছে কেন? এদের চলাফেরার ভঙ্গিও সন্দেহ জাগিয়ে তুলল ওর মনে। না, ড্রাগ-অ্যাডিক্টের মত এলোমেলো পদক্ষেপে হাঁটছে না কেউ। পা টিপে টিপে, সতর্কভাবে এগোচ্ছে মানুষ চারজন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরও অবাক হলো ও—গাড়ির চারদিকে চলে গেছে লোকগুলো... সুন্দরভাবে পজিশন নিয়েছে, এগোচ্ছে সমান তালে। নাকমুখে রুমাল বেঁধেছে ওরা—নিশ্চয়ই টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য।

প্রমাদ গুনল রানা—ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এবার। এরা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট নয়। অ্যাডিক্টদের মধ্যে এমন শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। লোকগুলোর মুভমেণ্ট ঠিক প্রফেশনালদের মত। ভাড়াটে সৈনিক হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কী চায় এরা?

জবাবটা পাওয়া গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। রিমোটটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল রানা প্রতিপক্ষের জন্য—গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুলেই আরেকটা আঘাত হানবে। টিয়ার গ্যাস না, এবার ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ফাটিয়ে ব্যাটাদের অন্ধ আর বধির করে দেবে ভেবেছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। ফোর্ডের দশ গজ দূরে পৌঁছেই থেমে দাঁড়াল রহস্যময় লোক-চারটে, পরস্পরের সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করল, তারপর একত্রে চারদিক থেকে কী যেন ছুঁড়ে দিল গাড়ির নীচে। ছুঁড়েই উল্টো ঘুরে দৌড় দিল।

ড. সিদ্দিকীও দেখছেন দৃশ্যটা, চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'শিট! কী ছুঁড়ল ওরা?'

পাথর হয়ে গেছে যেন রানা। কোনোমতে শুধু বলল, 'বোমা!'

পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। চেসিসের তলা থেকে চোখ-ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে একটা আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠল—রানা আর ড. সিদ্দিকীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল গাড়িটা।

ছয়

সার্ভেইলান্স ক্যামেরার সঙ্গে মাইক্রোফোন আছে, স্পিকারে ভেসে এল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ—বিল্ডিঙের পুরো কাঠামোই যেন কেঁপে উঠল সেই শব্দে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অঝোর বর্ষণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটিতে নেমে এল ফোর্ডের জ্বলন্ত খণ্ড-বিখণ্ড অংশ। ছোট টুকরোগুলোর আগুন অবশ্য বৃষ্টির পানিতে নিভে গেল; তবে মূল ধ্বংসাবশেষটা জ্বলছে এখনও।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভাষা হারিয়েছে রানা আর ড. সিদ্দিকী, স্বাভাবিক হবার সময় পেল না। দ্বিতীয় একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে আবার চমকে গেল ওরা। নীচতলায় হয়েছে ওটা—হাইডআউটের এণ্ট্র্যান্সে! বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে

দেয়া হয়েছে ল্যাণ্ডিঙে ঢোকার দরজাটা। স্টেয়ারকেসের নীচের দিকটা ধোঁয়ায় ভরে যেতে দেখা গেল মনিটরে।

খানিক পরেই ভাঙা চৌকাঠ পেরিয়ে পিস্তল হাতে তিনজন লোক ঢুকল ল্যাণ্ডিঙে। মনিটরে দেখা গেল—একজন এলিভেটরের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে, অন্য দু'জন অস্ত্র বাগিয়ে উঠতে শুরু করেছে সিঁড়ি ধরে। পোশাক-আশাক ময়লা ওদের, মুখে দাড়ি-গোঁফ... তবে রানা পরিষ্কার বুঝতে পারল—এরা ভবঘুরে নয়, ছদ্মবেশ নিয়েছে। ওয়্যারহাউসের কাছাকাছি পৌঁছুনোর জন্যই এ-সাজ। গাড়ি থেকে নেমে এদেরকেই দেখেছিল ও—নিশ্চয়ই ওয়্যারহাউসের সামনের দিকে বসে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

হোলস্টার থেকে সিগ-সাওয়ারটা বের করে হাতে নিল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে বেরুনোর আর কোনও রাস্তা আছে, ডক্টর?'

জবাব দিলেন না সিদ্দিকী, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন তিনি, মনে হলো রানার উপস্থিতি সম্পর্কেই সচেতন নন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছেন স্ক্রিনের দিকে।

'ডক্টর?' ডাকল রানা।

নিরুত্তর রইলেন বিজ্ঞানী।

এক পা এগিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'কী হয়েছে আপনার? কথা বলছেন না কেন?'

ঘোলা চোখে ওর দিকে তাকালেন সিদ্দিকী। 'ওরা এসে গেছে, মি. রানা।'

'কারা?'

'যাদের ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'কাদের কথা বলছেন?'

জবাব না দিয়ে কনসোলের উপর ঝুঁকলেন বিজ্ঞানী। দ্রুত কয়েকটা বোতাম টিপলেন, তারপর আস্তে আস্তে বাম হাতে ঘোরাতে শুরু করলেন একটা ডায়াল।

'কী করছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

এবারও জবাব পাওয়া গেল না, সিদ্দিকী নিজের কাজে ব্যস্ত, ওকে গ্রাহ্য করছেন না। আরও দুজন রুক্ষ চেহারার লোককে উদয় হতে দেখল রানা স্ক্রিনে, বিস্ফোরণের ধূম্রজাল ভেদ করে নীচতলায় এসে ঢুকেছে—এদের হাতেও উদ্যত অস্ত্র... এমপি-৫ সাবমেশিনগান!

হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় খেলল রানার। নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল, 'সিঁড়িতে কি আপনি কোনোরকম বুবি-ট্র্যাপ বসিয়েছেন?'

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না ড. সিদ্দিকী, সোজা হয়ে তাকালেন স্ক্রিনের দিকে। না, বোমা ফাটল না সিঁড়িতে, গর্জে উঠল না কোনও লুকানো আগ্নেয়াস্ত্র। সব আগের মতই আছে। তারপরও কেন যেন হামলাকারীদের ঘাবড়ে যেতে দেখল রানা—এমনভাবে এগোচ্ছে, যেন বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছে না।

বামদিকের একটা মনিটরে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। দোতলার ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেছে প্রথম দুই অস্ত্রধারী, স্ক্রিনে ওদের চেহারা দেখা যাচ্ছে খুব কাছ থেকে। লোকদুটোর মুখ ভেজা—প্রথমে মনে হলো বৃষ্টির কারণে, কিন্তু ভাল করে তাকাতেই বুঝল, ব্যাপারটা তা নয়। দরদর করে ঘামছে ওরা, চেহারায় ভীতির স্পষ্ট ছাপ।

হঠাৎই পাগল হয়ে গেল যেন একজন—রেলিঙের উপর

দিয়ে ঝুঁকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল উপরদিকে, তারপর স্টেয়ারকেসের ফাঁক দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত গুলি শুরু করল তেতলার দিকে। দ্বিতীয়জনের নার্ভও হার মানল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, আতঙ্কিত ভঙ্গিতে গুলি করতে শুরু করল সে ডাইনে-বাঁয়ে।

আরও এক দফা শব্দ শুনে প্রথম মনিটরটার দিকে তাকাল রানা। ল্যাণ্ডিঙের লোকগুলোও পাগলামি শুরু করেছে—একজন গুলি করছে ফাঁকা এলিভেটর লক্ষ্য করে, অন্য দুজন ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া দরজাটার দিকে, বৃষ্টিভেজা শূন্য-পার্কিং লটের দিকে ফায়ার করছে ওরা।

হতভম্ব হয়ে গেল রানা। হচ্ছেটা কী? পাঁচ-পাঁচজন প্রফেশনাল লোক হঠাৎ এমন উন্মাদের মত আচরণ শুরু করল কেন? বিস্মিত কণ্ঠে সিদ্দিকীকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছেন আপনি?'

'আমি! কই, কিছু না তো!' অবাক হবার ভান করলেন ড. সিদ্দিকী, কিন্তু ভদ্রলোক যে সত্যি বলছেন না, তা একটা ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারবে।

তবে এ-নিয়ে কথা বাড়াবার সময় নেই হাতে। স্ক্রিনে প্রথম দুই অস্ত্রধারীকে দেখতে পাচ্ছে রানা—অসংলগ্ন আচরণ করলেও ঠিকই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে তারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে! এমপি-৫ হাতে যে-কোনও মানুষই ভয়ঙ্কর, পাগলরা তো আরও বেশি! তা ছাড়া নীচেও এদের সশস্ত্র সঙ্গী-সাথী আছে, লড়াই করে সুবিধে করা যাবে না। আপাতত পিছু হটাই সবচেয়ে ভাল কোর্স অভ অ্যাকশন।

'পালাতে হবে আমাদের,' ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল ও। 'আর কোনও রাস্তা...'

‘আছে,’ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ড. সিদ্দিকী। ‘আসুন আমার সঙ্গে।’

রানাকে রুমের একপাশে নিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী, একটুও ইতস্তত না করে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন দেয়ালে সাঁটানো ওয়ালপেপার—লুকানো একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল তাতে।

‘ওপাশে কী?’ জানতে চাইল রানা।

‘মেইনটেন্যান্সের একটা ক্যাটওয়াক। ওটা ধরে বিল্ডিঙের অন্যপাশে যাওয়া যাবে। ওখানে এই রুমটার মত আরেকটা রুম আছে, সিঁড়ি ধরে নীচে চলে যেতে পারব আমরা।’

দমে গেল রানা। হামলারত পাঁচজন ছাড়াও ওয়্যারহাউসের মূল অংশে আরও অনেক লোক ছিল—গাড়ি থেকে নামার সময় দেখেছে ও। ওদের মধ্যে ক'জন শত্রুপক্ষের, আর ক'জন সত্যিকার উদ্বাস্তু ছিল—বলা কঠিন। ক্যাটওয়াক ধরে এগোলে আড়াল-বিহীনভাবে লোকগুলোর মাথার উপর দিয়ে যেতে হবে। নীচে নামলেও গিয়ে পড়বে ওদেরই সামনে। উঁচু দরের ট্রেইনিং পাওয়া সব লোক এসেছে হামলা চালাতে, যদি দু'জনের বেশি শত্রু থাকে উদ্বাস্তুদের মাঝে, রানার একার পক্ষে সামলানো সহজ হবে না। ড. সিদ্দিকীর যা অবস্থা, তাতে ওরা আক্রমণ করে বসলে কোনও ধরনের সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবু রানা জিজ্ঞেস করল, ‘যে-পিস্তলটা দেখেছি আপনার কাছে, চালাতে পারবেন ওটা?’

‘নিশানা খুব খারাপ আমার, হাত কাঁপে,’ বললেন ড. সিদ্দিকী।

‘ভয় দেখাতে এলোপাতাড়ি গুলি তো ছুঁড়তে পারবেন?’

‘তা পারব।’

‘তা হলে নিয়ে আসুন।’

দৌড়ে কনসোলের দিকে ছুটে গেলেন সিদ্দিকী। এই ফাঁকে হাতলে মোচড় দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রানা। ওপাশে ছোট্ট একটা ইন্টারনাল ব্যালকনি দেখা গেল—ওখানে দাঁড়িয়ে ওয়্যারহাউসের ভিতরের পুরো স্টোরেজ এরিয়াটা চোখে পড়ে। অপরপ্রান্তে, প্রায় একশ' ফুট দূরে হুবহু আরেকটা ব্যালকনি আর দরজা রয়েছে। ক্যাটওয়াকটা দুই ব্যালকনির মাঝে... একেবারে রেলিং ঘেঁষে। পুরনো, মরচে-ধরা একটা সরু সেতুর মত কাঠামো ওটা, ছাদ থেকে ঝুলছে কালচে হয়ে যাওয়া চিকন শেকলের মাধ্যমে। জিনিসটার অবস্থা দেখে মনে সন্দেহ জাগল রানার—ওদের দুজনের ভার সইতে পারবে এটা? ভেঙে পড়লে কী ঘটতে পারে বোঝার জন্য সাবধানে নীচে উঁকি দিল ও। দোতলায় আরও দুটো ব্যালকনি আছে, নইলে সোজা প্রায় ষাট ফুট নীচে ওয়্যারহাউসের মেঝে।

অল্প যে-সময়টুকুর জন্য মাথা বের করেছিল, তাতেই নীচতলায় মানুষের নড়াচড়ার আভাস পেল। ঝট করে দরজার আড়ালে আবার চলে এল ও, ভাবল—ব্যাটারা ওকে দেখতে পায়নি তো?

ঘাড় ফিরিয়ে ড. সিদ্দিকীর দিকে তাকাল রানা, পিস্তল হাতে নিয়ে কনসোলের সামনে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি। চাপা স্বরে বলল ও, 'ডক্টর! দাঁড়িয়ে কেন? জলদি আসুন!'

কথাটা বিজ্ঞানীর কানে গেছে বলে মনে হলো না, মন্ত্রমুগ্ধের মত অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠলেন, 'ওহ্ গড! করছে কী এরা!'

একছুটে কনসোলের সামনে চলে এল রানা, ড. সিদ্দিকীকে ধরে টান দিতে যাবে, এমন সময় চোখ পড়ল পার্কিং লটের দিকে মুখ করা ক্যামেরার স্ক্রিনটাতে। আঁতকে উঠল রানা দৃশ্যটা দেখে।

প্রবল বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে মোটাসোটা এক লোক এসে দাঁড়িয়েছে লটের মাঝখানে, ফোর্ডের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে একটু দূরে। কাঁধে ধরা চার ফুট লম্বা একটা টিউবের মত বস্তু তাক করেছে সে তিনতলার দিকে, আইপিসে চোখ রেখে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঠিক করছে নিশানা। অস্ত্রটা চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না রানার, ওটা একটা অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার!

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও, ড. সিদ্দিকীর কবজি ধরে টানল ব্যালকনির দরজার দিকে। 'আমাদের পালাতে হবে, ডক্টর! এক্ষুণি!'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দুজনে, ছিটকে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। 'আমার পিছনে থাকবেন,' বলে সরু ক্যাটওয়াকে উঠে পড়ল রানা। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল, সিদ্দিকী ঠিকমতই অনুসরণ করছেন ওকে।

অর্ধেকের মত দৈর্ঘ্য পেরিয়েছে ওরা, এমন সময় রকেট এসে আঘাত করল তিনতলার ঘরটাতে, দেয়াল ভেদ করে ঢুকে গেল ভিতরে। চোখের পলকে ঘটল বিস্ফোরণ—কামরার মধ্যে রাখা সমস্ত জিনিসপত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দুনিয়া-কাঁপানো গুমগুম আওয়াজ শুনতে পেল রানা—কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে উঠল ওর। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল শকওয়েভ, পুরো ক্যাটওয়াকটাই দুলে উঠল তাতে।

তাল হারিয়ে টলমল পায়ে দুই কদম এগোল রানা, রেলিং ধরে স্থির হবার চেষ্টা করল... তবে সফল হলো না। ড. সিদ্দিকী পিছনে ছিলেন, তাই শকওয়েভের আসল ধাক্কাটা তাঁর পিঠে লেগেছে। প্রায় উড়ে এসে রানার গায়ের উপর পড়লেন তিনি। অতর্কিত এই সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীর ভারী দেহের

ওজন সামলানো গেল না, দুজনেই একসঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ক্যাটওয়াকের সরু মেঝেতে। লোহার সঙ্গে শক্তভাবে ঠুকে গেল রানার মুখ-কপাল, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় পেণ্ডুলামের মত দুলছে শেকলে ঝোলানো পুরো ক্যাটওয়াক। ডানদিকে অনেকদূর চলে যেতেই আঁতকে উঠল রানা, গড়িয়ে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে ওদের। কোনোমতে ফ্লোরের গ্রেটিং খামচে ধরে নিজেকে বাঁচাল ও, কিন্তু ড. সিদ্দিকী সেটা পারলেন না। পিছলে যাচ্ছেন তিনি, রানার শরীরের উপর থেকে তাঁর ওজন সরে যাচ্ছে। পড়েই যেতেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে খপ করে এক হাতে ওঁর কলার চেপে ধরল রানা—যুঝছে ভারী দেহটাকে আটকে রাখতে।

শরীরের অর্ধেক ক্যাটওয়াকের বাইরে চলে গেছে বিজ্ঞানীর, রানা বুঝল—এক হাতে তাঁকে টেনে তোলা অসম্ভব। তাই ও চেঁচিয়ে বলল, 'উঠে আসুন, ডক্টর! আমি আপনাকে ধরে রাখছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কসরত শুরু করে দিলেন সিদ্দিকী, কিন্তু কাজটা সহজ হলো না। একবার এদিক, একবার ওদিক—এভাবে দুলেই চলেছে ক্যাটওয়াকটা, বার বার ব্যালান্স নষ্ট করে দিচ্ছে ওদের। মড় মড় জাতীয় আওয়াজ শুনে প্রমাদ গুনল রানা, কাঠামোটা প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। পুরনো, মরচে-পড়া লোহা ওদের দুজনের ওজন, সেই সঙ্গে প্রবল দুলুনি সইতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

'কুইক!' তাড়া দিল ও। 'তাড়াতাড়ি করুন।'

আর একবার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন সিদ্দিকী, অবশেষে পুরো শরীর তুলে আনতে পারলেন ক্যাটওয়াকে। উপুড় হয়ে

আঁকড়ে ধরে রাখলেন দুই কিনার, মুখের রক্ত সরে গেছে।

সামনের ব্যালকনিটা দেখাল রানা। 'ওখানে যেতে হবে আমাদের।'

মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী। 'সম্ভব না। আমি তো ব্যালান্স-ই রাখতে পারছি না। আপনাকে একাই যেতে হবে।'

'বাজে কথা বলবেন না,' চোখ রাঙাল রানা। 'আমাকে ফলো করুন। হামাগুড়ি দিয়ে এগোবেন। যদি মনে হয় পড়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেটিঙের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেবেন আঙুল। ঠিক আছে?'

'আ...আমি পারব না,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন সিদ্দিকী।

'পারতে হবে!' কঠিন গলায় বলল রানা। 'নইলে দুজনেই মরব। আপনি সেটাই চান?'

'ন্...না!'

'তা হলে এগোন। এবার আপনি সামনে থাকবেন। আমি পিছন থেকে সাহায্য করব আপনাকে।'

দোদুল্যমান ক্যাটওয়াকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সাবধানে টপকে গেল বিজ্ঞানীর দেহটাকে, তারপর পিছনে গিয়ে হামা দেয়ার ভঙ্গিতে পজিশন নিল।

'নাউ, মুভ!'

কাঁপতে কাঁপতে উঁচু হলেন ড. সিদ্দিকী, আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। সাহস দেয়ার সুরে রানা বলল, 'রিল্যাক্স, ভয়ের কিছু নেই। শুধু নীচে তাকাবেন না। সামনে দরজাটা দেখছেন? ওটার দিকে তাকিয়ে এগোতে থাকুন।'

ক্রমাগত দুলুনিতে শরীরের ভিতরকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে বিজ্ঞানীর। বললেন, 'আমার বমি পাচ্ছে।'

'ওপাশে গিয়ে করবেন। এখন এগোন!'

রানার চাপাচাপিতে কাজ হলো, হামা দেয়ার ভঙ্গিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করলেন সিদ্দিকী—গতি খুব ধীর। চিন্তিত ভঙ্গিতে পিছনে তাকাল রানা—ধুলো ও ধোঁয়া কেটে গেলেই ডক্টরের কামরাটায় ঢুকবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা দুই পিস্তলধারী, ব্যালকনির দরজাটা দেখে ফেলবে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তারও আগে হার মানবে ক্যাটওয়াকের অবলম্বনগুলো। অনবরত ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে সবক'টা শেকল আর সংযোগস্থল। ওয়্যারহাউসের উপরের টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটার অবিরাম আওয়াজে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সমস্ত নড়াচড়ার শব্দ, নইলে এতক্ষণে নীচের সম্ভাব্য খুনিরা দেখে ফেলত ওদের। অস্ত্রধারী লোকদুটো এসে পড়লে সুবিধেটুকু উধাও হয়ে যাবে।

'কুইক, ডক্টর!' তাড়া দিল রানা। 'তাড়াতাড়ি এগোন।'

ভাগ্য যে ওদের খুব একটা সদয় নয়, সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। ওয়্যারহাউসের গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে ভেসে এল উত্তেজিত একটা চিৎকার।

'ওই যে উপরে... ওইত্তো ওরা!'

প্রায় একই সময় পিছনে দরজা ভাঙার শব্দ হলো—ড. সিদ্দিকীর রুমে এসে ঢুকেছে পিস্তলধারীরা। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে নীচে তাকাল রানা, তিনজন লোক মেশিনগান তাক করছে ওদের দিকে। ব্যালকনির দরজাতেও উদয় হলো প্রথম দুইজনের মুখ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, হোলস্টার থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে সিগ-সাওয়ারটা। কী করবে, ঠিক করে ফেলেছে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে—সচেতনভাবে নয়, ইন্সটিঙ্কট-ই বলে দিয়েছে কী করতে হবে। শরীরের ঊর্ধ্বাংশটা

সামান্য ঘুরিয়ে ব্যালকনির দিকে ফিরল, অস্ত্র-ধরা হাতটা প্রসারিত করে দিয়েছে... গুলি ছুঁড়ল নিমেষে।

প্রথম পিস্তলধারীর কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো, দ্বিতীয়জন কাঁধে নিল আঘাত—আধপাক ঘুরে ভূপাতিত হলো সে।

'শক্ত করে ধরুন!' চেঁচিয়ে সঙ্গীকে নির্দেশ দিল রানা, তার পর পরই শরীর দোলাতে শুরু করল ডানে-বাঁয়ে—দোদুল্যমান ক্যাটওয়াকের দুলুনি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। দু'হাতে রেলিঙ ধরে রেখেছে, যাতে নিজে পড়ে না যায়।

'ইয়াল্লা! করছেন কী?' চেঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্দিকী—বুক মিশিয়ে শুয়ে আঁকড়ে ধরলেন ক্যাটওয়াকের দুই কিনারা।

জবাবটা অবশ্য পরমুহূর্তেই পেয়ে গেলেন তিনি। ক্যাটওয়াক লক্ষ্য করে ছুটে এল নীচের মেশিনগানধারীদের ছোঁড়া একঝাঁক বুলেট—তবে সেই মুহূর্তে দুলুনির ফলে সরে গেছে কাঠামোটা আগের অবস্থান থেকে, মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে বাতাস কেটে চলে গেল বুলেটগুলো, ছাদে গিয়ে লাগল। আবার গুলি করল নীচের লোকেরা, এবারও একই ফলাফল, ব্যর্থ হলো গুলিগুলো। দুলুনি বাড়াবার কারণটা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী।

রানা অবশ্য শুধু দোলনা চড়ছে না, মনে মনে শক্ত একটা হিসেবও করছে—দোদুল্যমান প্ল্যাটফর্ম থেকে স্থির তিনটে টার্গেটকে ঘায়েল করবার হিসেব! স্নাইপিং এবং শার্পশুটিঙে উঁচু মানের ট্রেনিং রয়েছে ওর, দুনিয়ার সেরা শুটারদের একজন বলে অনেকেই মানে ওকে, এ-ধরনের শট নেয়া কেবল ওর পক্ষেই সম্ভব।

বাঁ হাতে ক্যাটওয়াকের রেলিং শক্ত করে ধরে পিস্তল ধরা

ডান হাত নীচের দিকে তাক করল রানা। রিলোড করবার সুযোগ পাবে না, তাই সিগ-সাওয়ারের অবশিষ্ট সাতটা বুলেট দিয়েই লক্ষ্যভেদ করতে হবে ওকে। দোল খেয়ে ক্যাটওয়াকটা সুবিধাজনক পজিশনে এসে পৌঁছুতেই দম বন্ধ করে ফেলল ও, তারপর টিপতে শুরু করল ট্রিগার—মাটিতে একটা কাল্পনিক সরল রেখা ধরে ছুঁড়ছে গুলি।

ফলাফলটা দেখার মত হলো। প্রথম দুটো গুলি মেঝেতে বিঁধলেও তৃতীয়টা সোজা একজন মেশিনগানধারীর চাঁদিতে ঢুকল। চতুর্থটাও ব্যর্থ হলো না, পাশেরজনের মুখের একটা পাশ উড়িয়ে দিল ওটা। শেষ তিনটে গুলি আবার মাথা কুটল মেঝেতে। ততক্ষণে কাজের কাজ হয়ে গেছে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে দুটো প্রাণহীন দেহ, আর দুই সঙ্গীকে পটল তুলতে দেখে তৃতীয়জন ঝাঁপ দিয়েছে মাটিতে—হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাচ্ছে নিরাপদ কাভারের খোঁজে।

কিন্তু এই সাফল্যের মূল্য চরমভাবে গুনতে হলো রানাকে। শেকল ছেঁড়ার বিচ্ছিরি শব্দ শুনে চমকে উঠল ও, মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল—দোলাদুলিতে হার মেনেছে ক্যাটওয়াকের অবলম্বন... সামনের দিকের পর পর তিনটে শেকল ভেঙে গেছে! চোখের পলকে পুরো জিনিসটাই সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। পিছনে আবার শব্দ হলো... বাকি শেকলগুলোও ভেঙে যাচ্ছে।

'হাত ছেড়ে দিন!' চেঁচাল রানা। 'হাত ছেড়ে দিন, ডক্টর!'

'হোয়াট!'

জবাব দেয়ার জন্য সময় নষ্ট করল না রানা, সজোরে লাথি হাঁকল বিজ্ঞানীর পশ্চাতদেশে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্দিকী, নিজের অজান্তেই ছেড়ে দিলেন ক্যাটওয়াকের

কিনারা—দেহটা পিছলে চলে যাচ্ছে সামনে, বাচ্চাদের স্লিপারের মত।

ক্যাটওয়াকে শেকল-ছেঁড়া প্রান্তটা নিচু হয়ে দোতলার ব্যালকনির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল, পিছলানো শেষে রেলিঙের উপর দিয়ে সোজা ওখানে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী। রানাও এটাই চাইছিল। ভদ্রলোককে নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে দেখে এবার ক্যাটওয়াকের রেলিং ছেড়ে দিল ও, ছুটল নিচু দিকটায়।

দূরত্বটুকু পেরোতে পারল না, তার আগেই বাকি শেকলগুলো বিকট শব্দ করে ছিঁড়ে পড়ল। রানা অনুভব করল, গোটা জিনিসটার সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে ও। শেষ চেষ্টা হিসেবে ক্যাটওয়াকের সারফেসে পা ঠেকিয়ে লাফ দিল, লং-জাম্পের ভঙ্গিতে ব্যালকনিতে পৌঁছুতে চাইছে। নীচ থেকে সরে গেল যেন লোহার কাঠামোটা... আসলে বিপুল গতিতে পড়ে যাচ্ছে।

রানা তখন শূন্যে... আচমকা বুঝতে পারল, লাফটা জুতসই হয়নি; ব্যালকনিতে পৌঁছুতে পারবে না ও। পড়েই যাচ্ছিল, চোখের সামনে এমন সময় দেখতে পেল রেলিং। প্রাণপণে হাত ছুঁড়ল রানা, তালুতে ধাতব স্পর্শ পেয়েই খপ্ করে আঁকড়ে ধরল।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল রানার দেহ, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল ও—হাতদুটো যেন খুলে আসবে শোল্ডার জয়েন্ট থেকে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা হজম করল ও, অসহায়ভাবে ঝুলছে এখন দোতলার ব্যালকনির রেলিং ধরে। বুঝতে পারছে, একার পক্ষে নিজেকে টেনে তোলা সম্ভব নয়। ঘর্মাক্ত মুঠি পিছলে যাচ্ছিল আরেকটু হলে, হঠাৎ ওকে ধরে ফেললেন ড. সিদ্দিকী—নিজেকে সামলে নিয়েছেন ভদ্রলোক, এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে।

বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উঠে এল রানা ব্যালকনিতে। সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক আছেন?'

'প্রশ্নটা তো আমারই করার কথা,' বিরক্ত গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'আপনি করছেন কেন?'

হেসে ফেলল রানা ওঁর বলার ভঙ্গি শুনে। 'আমাকে নিয়ে ভাববেন না, এ-সব আমার নিত্যদিনের কাজের মধ্যেই পড়ে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। যা খেলা দেখালেন!'

'এটুকুতে কিছুই হবে না। মাত্র চারজনকে ঘায়েল করেছি, ওদের আরও লোক রয়ে গেছে নীচে।'

'কী করবেন, ঠিক করেছেন?'

'আগে নীচে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!'

এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ঘোরাল রানা। খুলল না ওটা। তালা মারা হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিনের অব্যবহারে জং ধরে আটকে গেছে—বলা মুশকিল। তা নিয়ে অবশ্য মাথাও ঘামাল না ও, পিস্তল রিলোড করে এক গুলিতে উড়িয়ে দিল নবটা। তারপর লাথি দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

'আপনার কোল্টটা আছে?' ঢোকার আগে বলল রানা। 'থাকলে হাতে নিন।'

'সরি,' বিব্রত কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী। 'বিস্ফোরণের ধাক্কায় যখন পড়ে গেলাম, তখন হাত থেকে ছুটে নীচে পড়ে গেছে।'

হতাশায় মাথা দোলাল রানা, আরেকটা ফায়ার-আর্মস থাকলে সুবিধে হতো। তবে এখন আর হা-পিত্যেশ করে লাভ নেই। সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'যা-হবার হয়েছে। চলুন এখন। আমার ঠিক পিছনে থাকবেন।'

দরজার ওপাশের ঘরটা আবর্জনায় ভর্তি, বোটকা একটা

কিনারা—দেহটা পিছলে চলে যাচ্ছে সামনে, বাচ্চাদের স্লিপারের মত।

ক্যাটওয়াকে শেকল-ছেঁড়া প্রান্তটা নিচু হয়ে দোতলার ব্যালকনির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল, পিছলানো শেষে রেলিঙের উপর দিয়ে সোজা ওখানে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী। রানাও এটাই চাইছিল। ভদ্রলোককে নিরাপদে ল্যাণ্ড করতে দেখে এবার ক্যাটওয়াকের রেলিং ছেড়ে দিল ও, ছুটল নিচু দিকটায়।

দূরত্বটুকু পেরোতে পারল না, তার আগেই বাকি শেকলগুলো বিকট শব্দ করে ছিঁড়ে পড়ল। রানা অনুভব করল, গোটা জিনিসটার সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে ও। শেষ চেষ্টা হিসেবে ক্যাটওয়াকের সারফেসে পা ঠেকিয়ে লাফ দিল, লং-জাম্পের ভঙ্গিতে ব্যালকনিতে পৌঁছুতে চাইছে। নীচ থেকে সরে গেল যেন লোহার কাঠামোটা... আসলে বিপুল গতিতে পড়ে যাচ্ছে।

রানা তখন শূন্যে... আচমকা বুঝতে পারল, লাফটা জুতসই হয়নি; ব্যালকনিতে পৌঁছুতে পারবে না ও। পড়েই যাচ্ছিল, চোখের সামনে এমন সময় দেখতে পেল রেলিং। প্রাণপণে হাত ছুঁড়ল রানা, তালুতে ধাতব স্পর্শ পেয়েই খপ্ করে আঁকড়ে ধরল।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল রানার দেহ, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল ও—হাতদুটো যেন খুলে আসবে শোল্ডার জয়েন্ট থেকে। দাঁতে দাঁত পিষে কষ্টটা হজম করল ও, অসহায়ভাবে ঝুলছে এখন দোতলার ব্যালকনির রেলিং ধরে। বুঝতে পারছে, একার পক্ষে নিজেকে টেনে তোলা সম্ভব নয়। ঘর্মাক্ত মুঠি পিছলে যাচ্ছিল আরেকটু হলে, হঠাৎ ওকে ধরে ফেললেন ড. সিদ্দিকী—নিজেকে সামলে নিয়েছেন ভদ্রলোক, এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে।

বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উঠে এল রানা ব্যালকনিতে। সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক আছেন?'

'প্রশ্নটা তো আমারই করার কথা,' বিরক্ত গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'আপনি করছেন কেন?'

হেসে ফেলল রানা ওঁর বলার ভঙ্গি শুনে। 'আমাকে নিয়ে ভাববেন না, এ-সব আমার নিত্যদিনের কাজের মধ্যেই পড়ে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। যা খেলা দেখালেন!'

'এটুকুতে কিছুই হবে না। মাত্র চারজনকে ঘায়েল করেছি, ওদের আরও লোক রয়ে গেছে নীচে।'

'কী করবেন, ঠিক করেছেন?'

'আগে নীচে যাই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!'

এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ঘোরাল রানা। খুলল না ওটা। তালা মারা হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিনের অব্যবহারে জং ধরে আটকে গেছে—বলা মুশকিল। তা নিয়ে অবশ্য মাথাও ঘামাল না ও, পিস্তল রিলোড করে এক গুলিতে উড়িয়ে দিল নবটা। তারপর লাথি দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

'আপনার কোল্টটা আছে?' ঢোকার আগে বলল রানা। 'থাকলে হাতে নিন।'

'সরি,' বিব্রত কণ্ঠে বললেন বিজ্ঞানী। 'বিস্ফোরণের ধাক্কায় যখন পড়ে গেলাম, তখন হাত থেকে ছুটে নীচে পড়ে গেছে।'

হতাশায় মাথা দোলাল রানা, আরেকটা ফায়ার-আর্মস থাকলে সুবিধে হতো। তবে এখন আর হা-পিত্যেশ করে লাভ নেই। সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'যা-হবার হয়েছে। চলুন এখন। আমার ঠিক পিছনে থাকবেন।'

দরজার ওপাশের ঘরটা আবর্জনায় ভর্তি, বোটকা একটা

গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। এখানে আলোও নেই, চাপা অন্ধকার বিরাজ করছে। যতটুকু সম্ভব দম আটকে রাখল ওরা দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচতে, এগোল ধীরে ধীরে, সাবধানে পা ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়লা-জঞ্জাল মাড়িয়ে স্টেয়ারকেসে বেরিয়ে এল। এখানটায় আঁধার আরও গাঢ়। ড. সিদ্দিকীকে ওর হাত ধরে থাকতে বলল রানা, সতর্ক পায়ে নামতে শুরু করল নীচে। ওখানে শত্রুরা যে ওত পেতে বসে থাকবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু আর কোথাও যাবার উপায়ও নেই ওদের। আচমকা হামলা চালিয়ে ব্যাটাদের ক্ষয়ক্ষতি করা যায় কি না, সেটাই চেষ্টা করে দেখতে হবে। তা হলে হয়তো পালাবার একটা রাস্তা বেরিয়েও যেতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাউণ্ড ফ্লোরে পা রাখল দুজনে। ল্যাণ্ডিঙের অপর পাশের দরজাটা দেখে দমে গেল রানা। হাইডআউটের দিকটায় সরাসরি বাইরে যাবার দরজা ছিল, কিন্তু এখানকারটা গেছে উল্টোদিকে... ওয়্যারহাউসের ভিতরে। ঠোঁট কামড়ে করণীয় নিয়ে ভাবল ও—কিন্তু ওখান দিয়েই বেরুনো ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প দেখতে পেল না। বসে থাকলে বরং কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

'এখানেই থাকুন,' ড. সিদ্দিকীকে বলল ও। 'আমি না ডাকলে নড়বেন না।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

দরজাটা দেখাল রানা। 'দেখি, ওপাশটা ক্লিয়ার করতে পারি কি না।'

বিজ্ঞানীকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও, নব মুচড়ে এক ঝটকায় দরজা খুলল, তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল।

ফ্লোরে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, একটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হলো এক হাঁটুতে ভর দিয়ে। সিগ-সাওয়ারটা ক্লাসিক পজিশনে প্রসারিত করে ধরেছে সামনে। মুখোমুখি পনেরো-বিশজন মানুষকে দেখতে পেল, জটলা পাকিয়ে রয়েছে—সবার পরনে উদ্বাস্তুদের মত পোশাক। চেহারাও ময়লা মাখা। গুলি ছুঁড়েই ফেলছিল রানা, নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে থমকে গেল। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে প্রতিপক্ষকে চিনে নিল ও—এরা শত্রুদলের নয়, সত্যিকার উদ্বাস্তু। কিন্তু এভাবে সিঁড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? জবাবটা পেতে এক মুহূর্তও লাগল না। মানুষগুলোর চোখেমুখে ভয় ফুটে থাকতে দেখল রানা, দাঁড়িয়েছেও সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে। এর মানে একটাই হতে পারে—এদেরকে কাভার হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, আসল শত্রু রয়েছে আড়ালে।

পরমুহূর্তেই জটলার মধ্যে একজনকে নড়ে উঠতে দেখা গেল, ওকে থমকে যেতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লোকটা। ভোজবাজির মত তার হাতে একটা মেশিনগান উদয় হতে দেখল রানা, তাক করছে ওরই দিকে!

ফায়ারিং পজিশনে একটুও পরিবর্তন আনল না রানা, শুধু শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঘোরাল একটু—একই সঙ্গে অস্ত্র-ধরা হাতটাও। নিমেষে গুলি করল ও। আতঙ্কিত এক উদ্বাস্তুর কান ঘেঁষে গেল বুলেটটা, অস্ত্রধারী লোকটার কপালে নিখুঁতভাবে একটা তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি করল... সে তখনও নিশানাই স্থির করতে পারেনি।

উল্টে পড়ে গেল লোকটা। উদ্বাস্তুদের মধ্যে চেঁচামেচির রোল শুরু হলো। রানা চিৎকার করল, 'শাট আপ! কেউ নড়বে না!'

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো ধমকটাতে, মুহূর্তেই নীরবতা নেমে এল দঙ্গলটার ভিতরে। সতর্কভাবে পিস্তলটা ওদের সবার ওপর ঘুরিয়ে আনল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আর কে আছে?'

'কেউ না,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল সামনে দাঁড়ানো মাঝবয়েসী একজন পুরুষ। 'তিনজন ছিল ওরা।' গুলি-খাওয়া লোকটাকে দেখাল। 'দুজন আগেই মরেছে।'

হুম, এ তা হলে তৃতীয় মেশিনগানধারী, ভাবল রানা। সঙ্গীদের গুলি খেতে দেখে এই লোকটাই হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়েছিল। তারপর এই গরীব-অসহায় লোকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে এসেছে সিঁড়ির দরজায়, ওকে বিভ্রান্ত করে দেবার জন্য। ভুল বুঝে রানা নিরীহ লোকগুলোর উপর হামলা চালাত, আর ওই ফাঁকে অনায়াসে শিকার করত খুনিটা ওকে। বিসিআই-এর কঠোর ট্রেইনিং-কে মনে মনে ধন্যবাদ দিল রানা, রিফ্লেক্স নইলে এত তীক্ষ্ণ হতো না ওর, শত্রু ভেবে নিরীহ কয়েকজনকে খুন করে ফেলত।

'প্লিজ, আমাদের ছেড়ে দিন,' অনুনয় করল মাঝবয়েসী উদ্বাস্তু। 'আমরা কিছু করিনি। এই বদমাশেরা ঘণ্টাখানেক আগে এসে হঠাৎ আটক করেছে আমাদের। কেন, তা জানি না।'

'কতজন এসেছে?' জানতে চাইল রানা। 'তিনজন এখানে, বাকিরা কোথায়?'

'তেরোজনকে দেখেছি আমরা, নীচে তিনজনকে রেখে বাকি সবাই গেছে উপরে।'

ডানদিকে একটা একজিট ডোর চোখে পড়ল রানার। ওটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'ওপাশটা ওয়্যারহাউসের কোন্ দিকে?'

'পিছনদিক। নদীটা ওপাশেই।'

খুব একটা আশার আলো দেখল না রানা। ওটা যে-দিকই হোক, বেরুলেই বাকি খুনিদের নাগালে পড়ে যাবে ওরা। ব্যাটারা ওপরতলায় আছে, ওখান থেকে অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত কাভার দিতে পারবে। এখানেও অপেক্ষা করা চলে না। নীচের টিমটাকে খতম করেছে বটে, তবে খুব শীঘ্রি মূল দলটা ফিরে আসবে, বিশেষ করে যখন দেখবে ড. সিদ্দিকী ক্যাটওয়াক ধরে পালিয়ে গেছেন। পাঁচজন মারা পড়লেও আরও আটজন রয়ে গেছে, ওর একার পক্ষে এতজন ট্রেইনড্ প্রফেশনালকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

কীভাবে ওদের ফাঁকি দেয়া যায়? ঝড়ের বেগে মগজ খাটাল রানা, হঠাৎ পেয়ে গেল বুদ্ধি।

'নোড়ো না কেউ,' বলে বিজ্ঞানীকে ডাকল ও। 'ড. সিদ্দিকী! বেরিয়ে আসুন!'

চৌকাঠের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি দেখে নিলেন সিদ্দিকী, তারপর এক ছুটে চলে এলেন রানার কাছে।

'তোমাদের একটু সাহায্য চাই আমি,' উদ্বাস্তুদের দিকে ফিরে বলল রানা। 'বিনিময়ে চমৎকার কিছু উপহার পাবে। যদি কথামত কাজ করো, তা হলে আগামীকালই একটা ট্রাক পাঠাব আমি—খাবার আর গরম কাপড় থাকবে তাতে। কী, করবে সাহায্য?'

বোকার মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল উদ্বাস্তুরা। মাঝবয়েসী লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে?'

'প্রথমে আমাদেরকে তোমাদের দুটো ময়লা ওভারকোট ধার দেবে,' বলল রানা, একজিট ডোরটা ইঙ্গিত করল। 'তারপর ওই দরজা ধরে বেরিয়ে পড়বে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছুটতে শুরু করবে যে যেদিকে পারো। ঠিক আছে?'

ওর মতলবটা বুঝতে পারলেন ড. সিদ্দিকী—উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে কেটে পড়তে চাইছে! এতগুলো মানুষ ছোটাছুটি শুরু করলে তার মধ্য থেকে ওঁদের দুজনকে চিনতে পারা সত্যিই কঠিন হবে। প্রশংসার সুরে বললেন, 'স্মার্ট প্ল্যান, মি. রানা!'

'দোয়া করুন, যাতে কাজে লাগে কৌশলটা,' বলল রানা, তাকাল উদ্বাস্তুদের দিকে। 'কী, দেবে না ওভারকোট?'

নড়ে উঠল দুজন, শরীর থেকে খুলে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে ধরল দুটো ছেঁড়া-ফাটা পরিধেয়। ধন্যবাদ জানিয়ে সেগুলো নিল রানা আর ড. সিদ্দিকী। গায়ে চড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবার দৌড়াও সবাই।'

কথাটার অর্থ যেন অনুধাবন করতে পারেনি উদ্বাস্তুরা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'দৌড়াও!' আবার বলল রানা।

একে অপরের মুখ দেখছে এবার সবাই। বোধহয় কে আগে দৌড় শুরু করবে, সেটাই ভাবছে। অবস্থাটা লক্ষ করে পিস্তলটা মাথার উপর খাড়া করে ধরল রানা, ফাঁকা দুটো গুলি চালাল ধাঁই ধাঁই করে।

এতক্ষণে সচকিত হয়ে উঠল মানুষগুলো, উল্টো ঘুরে সবাই পড়িমরি করে ছুটল একজিট ডোরের দিকে। একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার আগে যাবে।

'আসুন,' বিজ্ঞানীকে বলল রানা, তারপর মিশে গেল ধাবমান উদ্বাস্তুদের ভিড়ে।

সাত

একজিট ডোর খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল ভিড়টা। বাইশজন মানুষ... পাগলের মত চারদিকে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়াল রানা, ড. সিদ্দিকীকেও বাধ্য করল। পিছিয়ে পড়লে চলবে না, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে থাকতে না পারলে ওদের দু'জনকে চেনা যাবে। ওপরতলার অ্যাসল্ট টিমের সহজ শিকারে পরিণত হবে তা হলে।

ভারী বর্ষণের কারণে পুরো শরীর ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, কাপড়-চোপড় ভেদ করে দেহের আনাচে-কানাচে ঢুকে যাচ্ছে পানি—খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। তবু গতি কমাল না রানা। ময়লা-আবর্জনায় ভরা একটা খোলা ডাম্পিং এরিয়া পেরোচ্ছে ওরা, আশপাশে একটুও আড়াল নেই। যত দ্রুত সম্ভব, সরে যেতে হবে এখান থেকে—শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে। কংক্রিটের উপর জমে থাকা পানিতে ছপ্ ছপ্ করে পা ফেলে ছুটে চলল ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে একটা চেইন-লিঙ্ক ফেন্স পড়ল, মাঝে একটা ফোকর রয়েছে, ওপাশে... পঞ্চাশ গজ দূরে আরেকটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং—একটা কারখানা। একজন

উদ্বাস্তুকে ফোকর গলে পালাতে দেখা গেল। খুশি হয়ে উঠল রানা, আড়াল পাওয়া গেছে—কারখানা পর্যন্ত যেতে পারলেই একটা কাভার পেয়ে যাবে।

বেড়ার কাছে গিয়ে ড. সিদ্দিকীকে ফোকরের দিকে ঠেলে দিল ও, মাথাটা চেপে নামিয়ে রাখল, যাতে ভদ্রলোক ফোকরের উপরের অংশের সঙ্গে ঘষা না খান। শূন্যস্থানটা একেবারে ছোট নয়, স্বাভাবিক আকৃতির একজন মানুষ অনায়াসে পার হতে পারে। কিন্তু স্থূলদেহী ড. সিদ্দিকী আটকে গেলেন। পিছন থেকে তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে প্রমাদ গুনল রানা। শত্রুপক্ষ এই দৃশ্য দেখলেই চিনে ফেলবে ওদের।

আশঙ্কাটাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই যেন গর্জে উঠল একটা অটোমেটিক রাইফেল। বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ শুনল রানা, একই সঙ্গে পিছনে ভাঙা কংক্রিট উড়ল।

'আল্লাহ্‌র দোহাই! তাড়াতাড়ি করুন, ডক্টর!'

দ্বিতীয়বার গুলি হলো... এটাও ব্যর্থ হয়েছে। তুমুল বৃষ্টির কারণে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না শুটার, তা ছাড়া বুলেটের গতিপথেও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে দিচ্ছে পানির ধারা। তবে এভাবে বেশিক্ষণ চলবে না; যত প্রতিকূলতাই আসুক, দক্ষ একজন শুটার সেগুলোর কারেকশন দিতে বেশি সময় নেয় না।

ড. সিদ্দিকীর দিকে তাকাল রানা—গোঁজের মত ফোকরে আটকে রয়েছেন যেন তিনি, এগোচ্ছেন শম্বুক গতিতে। আর অপেক্ষা করা যায় না, পিছন থেকে নির্দয়ভাবে তাকে ধাক্কা দিল ও।

'মি. রানা! আমি ব্যথা পাচ্ছি!'

কথাটা কানেই তুলল না রানা, ঠেলে চলল প্রবল শক্তিতে।

ফড়ফড় করে কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হলো, তবে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই ওপাশের কংক্রিটে মুখ থুবড়ে পড়লেন বিজ্ঞানী—ওভারকোটের পিছনদিকটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

তৃতীয়বার গুলি হতেই বিদ্যুৎবেগে নড়ল রানা, নিচু হয়ে প্রায় ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে পার হলো বেড়ার ফোকরটা, এসে পড়ল এপাশে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, ড. সিদ্দিকীর হাত ধরে টানতে শুরু করল—বন্ধ কারখানার দিকে দৌড়াচ্ছে। পিছনে আরও কয়েকবার গুলি হলো, তবে এখন আর লক্ষ্যভেদের প্রশ্নই ওঠে না—দূরত্ব বেড়ে গেছে, তা ছাড়া ওরা এখন মুভিং টার্গেট।

একটু পরেই কারখানার একটা কোণ অতিক্রম করল ওরা, শত্রুপক্ষের দৃষ্টিসীমার আড়ালে পৌঁছে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনেই—হাঁপাচ্ছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ড. সিদ্দিকী তার ভিতরই খুশি খুশি গলায় বললেন, 'বেঁচে গেছি... বেঁচে গেছি আমরা!'

'এখনও না,' বলল রানা, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। 'চলার উপর থাকতে হবে আমাদের। ওরা ধাওয়া করবার আগেই যতটুকু সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। আসুন।'

'ক্... কিন্তু একটু বিশ্রাম ছাড়া যে চলছে না আমার!'

'কোনও বিশ্রাম নয়!' কড়া গলায় বলল রানা। 'ধরা পড়তে চান নাকি? চলে আসুন!'

হিড়হিড় করে বিজ্ঞানীকে টেনে নিয়ে চলল ও, অনুরোধ-উপরোধ কানেই তুলল না। দৌড়াচ্ছে ছোট ছোট কদমে, সঙ্গীকে বাধ্য করছে তাল মেলাতে। কারখানার সীমানা পেরিয়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই, সামনে ছোটবড় আরও

পরিত্যক্ত বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে সেগুলোর মাঝখানকার গলিগুলো বেছে নিল রানা, দ্রুত সরে যাচ্ছে আক্রান্ত ওয়্যারহাউস থেকে দূরে।

বৃষ্টিতে কাকভেজা হতে হতে চিন্তায় ডুবে গেল ও। এলাকাটা থেকে ড. সিদ্দিকীকে নিয়ে বেরুনো সহজ হবে না—গাড়ি না থাকাতেই সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যত চেষ্টাই করুক, পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে তেমন একটা দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। হামলাকারীরা জানে সেটা, সে-কারণেই শুরুতে রানার গাড়িটা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন ওরা ছুটছে বটে, কিন্তু এগোতে পারছে না খুব বেশি—রানার টানাটানিতে শুধু সচল রয়েছেন ড. সিদ্দিকী, এগোনোর গতি খুব কম। শারীরিক পরিশ্রম কী জিনিস তা জানা নেই ভদ্রলোকের, দেহের আকার-আয়তন সে-কথাই বলে। তাঁকে খুব বেশি খাটানোর সাহস পাচ্ছে না রানা, যদি অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যান... বিরাট বিপদ হবে। এখনও যে অ্যাজমার টান উঠে যায়নি, তা-ই ঢের।

ব্যাপারটা শত্রুপক্ষও আঁচ করতে পারবে, খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না তাদের, ছোট্ট একটা এলাকা চিরুণী-তল্লাশি করেই ধরে ফেলতে পারবে ওদের। কিছুটা সময় কোথাও গা-ঢাকা দিতে পারলে কাজ হতো, সেলফোনে যোগাযোগ করে রানা এজেন্সি থেকে রি-এনফোর্সমেন্ট নিয়ে আসা যেত। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, তা হবার নয়। রি-এনফোর্সমেন্ট আসবার আগেই ওদের খুঁজে বের করে ফেলবে শত্রুরা।

গাড়ি দরকার! রানার মাথার ভিতরে এই একটা চিন্তাই চিৎকার করে উঠছে থেকে থেকে। তা হলেই পরিস্থিতি অনেকটা ওদের অনুকূলে চলে আসত। কিন্তু কোথায় পাবে

গাড়ি? পুরো এলাকাটা পরিত্যক্ত, আসবার পথে কোথাও কোনও মোটরযান চোখে পড়েনি ওর। তবে হ্যাঁ, শত্রুরা নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে এসেছে... ওগুলোর একটা হয়তো দখল করা যেতে পারত। কিন্তু গাড়িগুলো যে কোথায় লুকিয়েছে ওরা, কে জানে। খোঁজাখুঁজি করতে গেলে নিজেরাই বরং চোখে পড়ে যাবে। তা ছাড়া গাড়ির সঙ্গে নিশ্চয়ই এক-দু'জন লোক থাকবে, দুর্বল হয়ে পড়া বিজ্ঞানীকে নিয়ে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হবে না।

আইডিয়াটা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা। হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেছে—আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না। ড. সিদ্দিকীও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছেন, পা ফেলছেন এলোমেলোভাবে, যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। ঘাড়ের উপর ভদ্রলোককে একটা হাত রাখতে দিল রানা, তাঁর ওজনের খানিকটা নিজের কাঁধে নিল, হাঁটতে সাহায্য করছে। বৃষ্টির তেজ বেড়েছে, কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ বিকেলটাকে ঢেকে দিয়েছে ছায়া আর অন্ধকারে। এই বৃষ্টি আর আলো-ছায়া পরিবেশটাই একমাত্র ভরসা—খুব কাছে না এলে ওদের ঠিকমত দেখতে পাবে না কেউ।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে ভেসে আসা হর্নের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল রানা—একটা বার্জ যাচ্ছে। তাই তো! কথাটা আগে মনে পড়েনি কেন? রওনা দেবার আগে এখানকার ম্যাপ স্টাডি করে এসেছে ও—ছোট্ট একটা জেটি থাকবার কথা নদীর পারে... মনে মনে হিসেব করল রানা... ওদের বর্তমান অবস্থান থেকে মোটামুটি একশো গজ দূরে। শিল্প-এলাকার সমস্ত মিল-কারখানা আর ওয়্যারহাউস পরিত্যক্ত হলেও জেটিটা এখনও ব্যবহার হয়। বোট পাওয়া যেতে পারে ওখানে!

নতুন উদ্যম ভর করল রানার উপর, দিক পাল্টে ড. সিদ্দিকীকে নিয়ে জেটির উদ্দেশে রওনা হলো ও। পনেরো মিনিট পরেই পৌঁছে গেল গন্তব্যে।

বিজ্ঞানীকে মাটিতে বসিয়ে ভাঙা একটা বিল্ডিঙের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। জেটিটা আসলেই ছোট, কোনোমতে একটা ট্রলার হয়তো ভিড়ানো যায়। এ-মুহূর্তে ওটা খালি... না, বলা উচিত—খালি হলো। ওদিকে তাকিয়ে নিজেকে বেকুবের মত লাগল রানার—পরিষ্কার দেখল, একটা মাছ ধরা বোট পিয়ার ছেড়ে চলে যাচ্ছে মাঝনদীতে, আর কোনও জলযান নেই আশপাশে। এইমাত্র ছেড়েছে বোটটা, আর কয়েকটা মিনিট আগে পৌঁছুলে ওটাতেই চড়তে পারত ওরা—ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর কাকে বলে!

কপালকে শাপশাপান্ত করতে গিয়ে আচমকা থমকে গেল রানা, চোখ রগড়ে তাকাল ভাল করে। একটা গাড়ি! জেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে! রং-চটা, এখানে-ওখানে মরচে-পড়া, প্রাচীন মডেলের একটা সেডান—অন্তত বিশ বছরের পুরনো। তা-ও গাড়ি তো! ওটার আরোহী সম্ভবত কোনও কাজে এসেছিল ফিশিং বোটটাতে, এখন ফিরে যাচ্ছে। নাহ্, ভাগ্যদেবী এখনও মুখ ফিরিয়ে নেননি তা হলে।

ড. সিদ্দিকীকে টান দিয়ে দাঁড় করাল রানা, অনুসরণ করতে বলে এক ছুটে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে, সেডানটার পথরোধ করে দাঁড়াল। ড্রাইভার লোকটা বয়স্ক, মুখে চাপদাড়ি। বিরক্ত গলায় বলল, 'ব্যাপার কী?'

লিফট চাইল না রানা, শুধু শুধু নিরীহ একজন মানুষকে বিপদের মাঝখানে টেনে আনার মানে হয় না। তাই বলল, 'দিস ইয অ্যান ইমার্জেন্সি। আপনার গাড়িটা আমাদের

প্রয়োজন।'

'কী বলছেন যা-তা!' আপাদমস্তক দেখল লোকটা ছেঁড়া-ফাটা কোট পরা রানাকে।

পিস্তল বের করে ড্রাইভারের দিকে তাক করল রানা, লোকটাকে বোঝানোর সময় নেই। 'প্লিজ, চাবিটা ইগনিশনে রেখে বেরিয়ে আসুন।'

আতঙ্ক ফুটল বয়স্ক মানুষটার চোখে। ত্রস্ত ভঙ্গিতে নামল গাড়ি থেকে।

'ডক্টর, উঠে পড়ুন।' বলে রানা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। স্টার্ট দিয়ে তাকাল ড্রাইভারের দিকে। 'এটা আপনার গাড়ি?'

'কী?'

'গাড়িটার মালিক কি আপনি? রেজিস্ট্রেশন ট্র্যাক করে পাওয়া যাবে আপনাকে?'

'অ্যাঁ... হ্যাঁ।'

'গুড, তা হলে গাড়ির দাম আর সঙ্গে কিছু ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন আগামীকালকের মধ্যে।'

'কিন্তু আমি এখান থেকে ফিরব কী করে?' জানতে চাইল বয়স্ক লোকটা।

'হাঁটা শুরু করে দিন, একটা না একটা কিছু নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।'

ড. সিদ্দিকী উঠে পড়েছেন, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করল রানা, গিয়ার দিয়ে সবেগে আগে বাড়াল সেডানটাকে। গাড়ির কিংকর্তব্যবিমূঢ় মালিক পড়ে রইল পিছনে।

নদীর ধার থেকে মুখ ঘুরিয়ে একটা ফাঁকা কম্পাউণ্ডের ভিতর দিয়ে সেডানটাকে ছোটাল রানা—শর্টকাটে মূল রাস্তায় পৌঁছুতে চাইছে। গাড়িটার বাহ্যিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন,

ইঞ্জিনের অবস্থা চমৎকার, যত্নে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি মালিক—শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। মনে মনে আশাবাদী হয়ে উঠল রানা, সত্যিই হয়তো আর কোনও সংঘাত ছাড়া চলে যেতে পারবে ওরা।

কিন্তু সেই কপাল নিয়ে জন্মায়নি মাসুদ রানা! কম্পাউণ্ডের শেষ প্রান্তে পৌঁছুতেই হঠাৎ দু'জন অস্ত্রধারীকে দেখতে পেল ও—সীমানার ভিতরের একটা খালি বিল্ডিং চেক করে বেরিয়ে এসেছে। ধাবমান গাড়িটাকে দেখেই সন্দেহ ঘনাল তাদের চোখে, গুলি করার ভঙ্গিতে তুলতে শুরু করল অস্ত্রদুটো।

'মাথা নামান!' সঙ্গীর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল রানা, এক হাতে পিস্তলটা বের করে ফেলেছে হোলস্টার থেকে।

গুলি করল অস্ত্রধারীরা, সজোরে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে এল রানা। ড. সিদ্দিকী প্রায় শুয়ে পড়েছেন, তাঁর শরীরের উপর দিয়ে হাত প্রসারিত করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল ও—ম্যাগাজিন খালি করে ফেলছে প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালা দিয়ে।

আত্মরক্ষার সুযোগ পেল না দুই খুনি, যান্ত্রিক দ্রুততায় ছোঁড়া রানার বুলেটগুলো এসে শরীরের যত্রতত্র আঘাত করল তাদের। নাইন মিলিমিটারের প্রচণ্ড ধাক্কায় আছড়ে পড়ল তারা মাটিতে।

চোখের পলকে আরও কয়েকজন উদয় হলো কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে, রাস্তা আর গলি চেক করছিল এরা। সঙ্গীদের পটল তুলতে দেখে পিলারের আড়ালে থমকে দাঁড়িয়েছে, একেবারে নিরাপদ আশ্রয়... গুলি করে ওখান থেকে সেডানটাকে অনায়াসে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে। গেট দিয়ে আর বেরুনো সম্ভব নয়, বন্‌বন্‌ করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা,

ভেজা কংক্রিটের উপরে পিছলাতে শুরু করল গাড়ির চাকা... অস্বাভাবিক দ্রুততায় লাটিমের মত ঘুরে যাচ্ছে। তবে নিয়ন্ত্রণ হারাল না ও, উল্টোদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে স্থির করল গাড়িটাকে—নব্বুই ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ওটা এখন বাম দিকে মুখ করে ফেলেছে।

অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, সবেগে কম্পাউণ্ডের পেরিমিটার ফেন্সের দিকে ছোটাল সেডান। পিছন থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল হামলাকারীরা—তুমুল বর্ষণকেও যেন হার মানাবে তাদের অঝোর ধারার বুলেট-বৃষ্টি। সেডানের রিয়ার-এণ্ডে ঠক্ ঠক্ করে বিঁধতে শুরু করল একটার পর একটা গুলি, রিয়ার উইণ্ডো আর টেইল-লাইট চুরমার হয়ে গেল, একটা বুলেট রানার মাথার উপর দিয়ে ছাদ ভেদ করে চলে গেল। কিন্তু ও নির্বিকার, গুলি শুধু ফিউয়েল-ট্যাঙ্কে না লাগলেই হলো। লাগলেও নেমে যাবার মত সময় পাওয়া যাবে। তাই দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে মন নিবিষ্ট রেখেছে ও ড্রাইভিঙে।

আরেকটা গুলি ঢুকে পড়ল গাড়ির ভিতরে, সামনের দু'সিটের মাঝখান দিয়ে গেল ওটা, বেরুল ফ্রন্ট-উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে। সিটের উপর একটু নিচু হয়ে গেল রানা, শত্রুদের কাছ থেকে টার্গেট-মাস্ ছোট করে আনতে চায়। অবশ্য এই পজিশনও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। মেশিনগানের গুলি ট্রাঙ্ক আর পিছনের সিট ভেদ করে চলে আসতে পারে ওর পিঠ পর্যন্ত। তবে স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে, মূলত সেডানের টায়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে লোকগুলো—থামাতে চাইছে ওদের। এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, ব্যাটারা সম্ভবত জানে না—টায়ার ফাটলেও চাকার মেটাল রিমের উপর ভর করে গাড়ি চালাতে জানে ও। ওভাবে পাঁচ-সাত মাইল অনায়াসে চলে যেতে

পারবে—দূরত্বটা একেবারে কম নয়, ওর মত একজন এসপিয়োনাজ এজেন্টের পালিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। এ-কারণে দুই পলাতককে লক্ষ্য করে গুলি চালালেই বরং ভাল করত লোকগুলো।

এসে গেছে ফেন্স, প্রবল বেগে ওটার উপর আছড়ে পড়ল সেডান, ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে গেল কম্পাউণ্ডের পাশের সাইড-স্ট্রিটে। এক মুহূর্তের জন্য অ্যাকসেলারেটরে চাপ কমাল রানা, গাড়িটাকে সিধে করবার জন্য, তারপরই আবার সজোরে দাবাল। ফাঁকা রাস্তা ধরে উড়ে চলল সেডান।

বিপদ এখনও কাটেনি। কিছুদূর যাবার পরই পাশের একটা রাস্তা থেকে লম্বা একটা কালো রঙের কারকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা—আড়াআড়িভাবে ব্লক করে ফেলেছে সামনের সরু ইন্টারসেকশনটাকে। লাফ দিয়ে ওটা থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক, কারের পিছনে গিয়ে হাতের পিস্তল তাক করল অগ্রসরমান সেডানের দিকে। গুলি করতে গিয়ে থমকে গেল তারা—নিজেদের ভুলটা ধরতে পেরেছে। সেডানকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে উল্টো নিজেরাই ফাঁদে পড়েছে ওরা, স্পিড কমাচ্ছে না রানা, সোজা এসে আঘাত করে কারটাকে ওদের গায়ের উপর ফেলবে। চোখে আতঙ্ক ফুটল ওদের, পাগলের মত লাফঝাঁপ দিয়ে সরে যাচ্ছে এবার।

'ড. সিদ্দিকী, ধরুন কিছু একটা!' চেঁচাল রানা। 'খুব জোরে একটা ঝাঁকি খাবেন।'

মাথা গরম করছে না ও, স্টিয়ারিং সামান্য ঘুরিয়ে সংঘর্ষের কেন্দ্র বদলাল। মাঝামাঝি ধাক্কা দিলে নিজেদের গাড়ি থেমে যাবে, ওরাও আহত হতে পারে, তাই সেডানকে তাক করল কারের রিয়ার-এণ্ডের দিকে।

সরাসরি গিয়ে শত্রুদের গাড়ির পিছনদিকে গুঁতো দিল ও। চরকির মত ঘুরে গেল কালো কার, রাস্তার একপাশে শূন্যস্থান সৃষ্টি করে দিচ্ছে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল রানার দেহ, ঘাড়টা যেন মটকে যাবে মট্ করে। হেডলাইট ভেঙে গেল সেডানের, একটা পাশ ঘষা খেল রাস্তার পাশের বিল্ডিঙের দেয়ালে... তবে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে পারল।

পিছন থেকে আবার গুলি ছোঁড়া হলো, তবে মিছেই বুলেট নষ্ট করছে হামলাকারীরা। প্রতি মুহূর্তে ওদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে টার্গেট।

সিটের উপর সোজা হয়ে মাথা ঝাড়া দিল রানা, ব্যথাটা সয়ে নিচ্ছে। তারপর তাকাল সঙ্গীর দিকে—ড. সিদ্দিকী প্রায় মেঝের সঙ্গে মিশে রয়েছেন।

'ডক্টর! আপনি ঠিক আছেন?'

জবাব দিলেন না বিজ্ঞানী। নিথর হয়ে আছেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। 'ড. সিদ্দিকী! কী হয়েছে আপনার?'

এবার নড়লেন বিজ্ঞানী। গোঙানির মত শব্দ করে বললেন, 'আমি অসুস্থ বোধ করছি।'

'অ্যাজমা?'

'না। আমার চোখের সামনে গোটা জীবন ছবির মত ভেসে উঠছে—শুনেছি মরার আগে এমন হয়।'

হেসে ফেলল রানা। 'মাঝে মাঝে জীবনটাকে দেখার সুযোগ হলে দেখে নেওয়াই ভাল। পুরনো স্মৃতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে এতে। আপনার গুলি-টুলি লাগেনি তো?'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী।

'গুড। তা হলে উঠে বসুন। কাজ আছে।'

'আপনি একাই তো কাফি,' সোজা হতে হতে বললেন বিজ্ঞানী। 'আমাকে আবার কী প্রয়োজন?'

'কী করব, আল্লাহ দুটোই হাত দিয়েছেন, চারটে নয়,' হালকা সুরে বলল রানা। 'আমার জ্যাকেটের পকেটে সেলফোন আছে, বের করুন ওটা। একটা নাম্বার বলব, ওটাতে ডায়াল করে আমার কানে দিন। দেখি, ব্যাকআপ আনা যায় কি না।'

'হ্যাঁ, ব্যাকআপই প্রয়োজন আমাদের,' স্বীকার করলেন সিদ্দিকী।

'কাজ ওটুকুই নয়,' রানা বলল। 'ফোন শেষে আপনি ঝেড়ে কাশবেন। আমাকে খুলে বলবেন, এই উন্মাদরা কারা। কেন আপনাকে খুন করার জন্য এভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে?'

আট

'ভুল বুঝেছেন আপনি,' শান্ত গলায় বললেন ড. আন্দালিব সিদ্দিকী। 'ওরা আমাকে খুন করতে আসেনি।'

'কী!'

'ওরা আমাকে জ্যান্ত চায়, মি. রানা।'

চমকে গেল রানা, পুরো আক্রমণটাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে শুরু করল। হঠাৎই বুঝতে পারল, ভদ্রলোক ঠিক

বলছেন। এতক্ষণে যত গুলি করা হয়েছে, তার একটাও ওদের গায়ে লাগেনি—এটা স্রেফ সৌভাগ্য নয়, হতে পারে না। এক ডজনের বেশি ট্রেইনড্ প্রফেশনাল শত শত রাউণ্ড গুলি খরচ করবে, অথচ দু'জন টার্গেটের গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারবে না... এটা অসম্ভব। ইচ্ছেকৃতভাবেই হিসেবি শট নিয়েছে ওরা—ড. সিদ্দিকীকে ভয় দেখিয়ে থামাতে চেয়েছে। শরীরের একেবারে কাছ ঘেঁষে দু'একটা যা শট এসেছে, সেগুলো ছোঁড়া হয়েছিল ওকে খুন করার জন্য, ড. সিদ্দিকীকে নয়। গাড়িতেও ড্রাইভারের দিকটাতেই বেশি গুলি করা হয়েছে, যাতে বিজ্ঞানী আহত না হন।

হামলাটায় একমাত্র অসঙ্গতি হচ্ছে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেটটা। গভীরভাবে ভাবল রানা—সত্যিই কি তাই? ওই রকেট কি বিজ্ঞানীকে খুন করার জন্য ছোঁড়া হয়েছিল? একটু ভাবতেই পরিষ্কার হয়ে গেল—না, ব্যাপারটা অন্যরকম। রকেট ছুঁড়লেই যে রুমের ভিতরের মানুষ নিশ্চিতভাবে মারা পড়বে, তা নয়। বরং ওটা যদি রুমের দেয়াল ভেদ করে ছাদে হিট করার জন্য ছোঁড়া হয়, তা হলে কংক্রিট ধসানো যাবে। সেক্ষেত্রে মারা না গিয়ে আহত হয়ে ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়তেন ড. সিদ্দিকী।

প্রস্তুতির কোনও অভাব ছিল না, নিঃসন্দেহে সফল হতো লোকগুলো... যদি না অসময়ে রানা হাজির হয়ে ওদের কাজে বাগড়া না দিত। ওর কারণেই ওদের প্ল্যানের দফা-রফা হয়ে যায়, অপারেশনটা চালিয়ে যাবার জন্য তাৎক্ষণিক কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আনে ওরা—মাসুদ রানাকে ঠেকানোর জন্য সেটুকু যথেষ্ট ছিল না।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে সেডান, হাইওয়েতে উঠে এল কিছুক্ষণের মধ্যে। ড. সিদ্দিকী এর মধ্যে

বের করে নিয়েছেন সেলফোনটা। রানা বলল, 'ডায়াল করুন...'

নাম্বারটা বলল ও।

একটার পর একটা ডিজিট চাপলেন সিদ্দিকী, তারপর ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বললেন, 'রিং হচ্ছে।'

সেটটা হাতে নিতে নিতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশে যেতে চান?'

'না, না,' সভয়ে মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী। 'আপনি কি থানায় ফোন করলেন নাকি?'

'উঁহুঁ।'

'প্লিজ, কোনও পুলিশ নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ওপাশে রিসিভ করা হয়েছে কলটা। রিনরিনে কণ্ঠ ভেসে এল, 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।' সোহানার গলা।

'রানা বলছি। আমরা কণ্ডিশন রেড-এ পড়েছি।'

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যা-ই অনুভব করুক, সে-সব গলায় ফুটতে দিল না সোহানা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'সমস্যা যে হয়েছে, তা আমরা আগেই আঁচ করেছি... ফোর্ডের ট্রান্সমিটারটা যখন বন্ধ হয়ে গেল। কী হয়েছে ওটার?'

'গাড়িটা এখন ইতিহাস। পরে খুলে বলব সব। আমরা এখন একটা চোরাই গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছি।'

'লোকেশনটা বলো।'

'দাঁড়াও, ভয়েস-এনক্রিপশন চালু করে নিই।' সেলফোনের নীচের দিকের একটা বোতাম চাপল রানা, লাইনটা এখন স্ক্র্যাম্বলড্ হয়ে গেছে। সেটটা কানে ঠেকাল আবার ও। 'এখনও নিউয়ার্কে আমরা, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াটা থেকে বেরিয়ে এসেছি,

হাইওয়ে ধরে উত্তরে যাচ্ছি। রুট টোয়েন্টি ওয়ানের সাইনবোর্ড দেখেছি একটু আগে।'

'ক'জন হামলা করেছিল?'

'ডজনখানেকের মত। তবে অসুবিধে হয়নি, বেরিয়ে আসতে পেরেছি।'

'পিছু নেয়নি তো?'

স্টিয়ারিং হুইলে বাঁ হাত স্থির রেখে পিছন ফিরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে মুখ কালো হয়ে গেল ওর। দুটো গাড়ি ছুটে আসছে দূর থেকে, পাগলের মত ছোটানো হয়েছে ওগুলো—দূরত্ব কমিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

তিক্ত কণ্ঠে ও বলল, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এতক্ষণ ছিল না, কিন্তু তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়েছে ওরা!'

'ব্যাকআপ চাও?'

'যে-অবস্থা দেখছি, তাতে ব্যাকআপ আমাদের কাছে পৌঁছুনোর আগে আমরাই ব্যাকআপের কাছে পৌঁছে যাব। একটা রঁদেভু পয়েন্ট দাও।'

'ধরো একটু,' বলে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ম্যাপ দেখল সোহানা। তারপর বলল, 'শোনো, রুট টোয়েন্টি-ওয়ান থেকে বেরিয়ে এসো। সামনে রুট-থ্রি'র ইন্টারসেকশন পাবে, ওটা ধরে রুট-সেভেনটিনে ওঠো। উত্তরে... টেটারবোরোতে পৌঁছুতে হবে তোমাকে।'

টেটারবোরো এয়ারপোর্টের কথা বলছে ও। গ্রেটার নিউ ইয়র্কের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর ওটা: কেনেডি, লা-গুয়ার্ডিয়া আর নিউয়ার্ক ইন্টারন্যাশনালের পরে। রুট-সেভেনটিন আর ফরটি-সিক্সের মাঝামাঝি, ইন্টারস্টেট-এইটির

পাশে পড়বে ওটা। মিডটাউন ম্যানহ্যাটন থেকে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ ধরে মাত্র বারো মাইল দূরত্ব। শুধুমাত্র কর্পোরেট, চার্টার ও প্রাইভেট এয়ারক্র্যাফট হ্যাণ্ডেল করে এয়ারপোর্টটা, বড় বিমানবন্দরগুলোর উপর থেকে নন-কমার্শিয়াল এয়ার-ট্রাফিকের চাপ কমায়। এ-ধরনের এয়ারপোর্টকে *রিলিভার* বলে।

'জাকিরকে আমি পাঠাচ্ছি ওখানে... হেলিকপ্টারসহ,' সোহানা বলল। 'বাকি স্পেসিফিকস্ দশ মিনিট পরে ফোন করে জেনে নিয়ো।'

'ঠিক আছে,' রানা বলল।

'সাবধানে থেকো।'

'না থেকে উপায় আছে? ছুটিটা কাজে লাগাতে হবে না!' হাসল রানা, তারপর কেটে দিল লাইনটা। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা—অনুসরণকারীরা ভালই এগোচ্ছে। হাইওয়েতে আরও গাড়ি চলছে, সেগুলোকে ওভারটেক করছে ঘন ঘন, এগোনোর সুবিধার্থে রং-সাইডে যেতে দ্বিধা করছে না। ড্রাইভারেরা দক্ষ, সেই সঙ্গে অনেকটা বেপরোয়া-ও বোধহয়, একের পর এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নিচ্ছে। সেডানের ফিউয়েল গজের দিকে তাকিয়েই শঙ্কিত বোধ করল রানা—গাড়িতে ওঠার সময় ডায়ালের *এফ*-এর কাছাকাছি ছিল কাঁটাটা, অথচ এখন নেমে এসেছে অর্ধেকে। এত অল্প সময়ে এ-পরিমাণ ফিউয়েল খরচ হবার কথা নয়। মানেটা পরিষ্কার—গোলাগুলিতে ফুটো হয়ে গেছে ওদের ট্যাঙ্ক। অবশিষ্ট জ্বালানি নিয়ে টেটারবোরো পৌঁছুনো প্রায় অসম্ভব। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল ওর। সেডানের গতি বাড়াতে বাড়াতে তাকাল ড. সিদ্দিকীর দিকে।

‘লোকগুলোর পরিচয় এখনও কিন্তু বলেননি আপনি, ডক্টর,’ একটু রাগী সুরে বলল রানা।

‘এরা সবাই কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড মিগুয়েল সাণ্টানার লোক,’ শান্ত স্বরে বললেন সিদ্দিকী।

‘কী!’ অবাক হলো রানা। ‘একজন ড্রাগলর্ড আপনার পিছনে লাগবে কেন?’

‘বলছি। আমি যে মার্কিন সরকারের হয়ে গবেষণা করি, তা জানেন নিশ্চয়ই? ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হয়ে কাজ করছিলাম। এক বছরের প্রজেক্ট... ড্রাগ অ্যাডিকশনের একটা প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। *এলিক্সিয়ার বায়ো-ল্যাব*-এর নাম শুনেছেন? ওখানেই শুরু হয় কাজ...’

‘এক মিনিট,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘ড্রাগ অ্যাডিকশনের প্রতিষেধকের ব্যাপারটা বুঝলাম না।’

‘সহজ করে বলি—মাদকাসক্তির পুরো প্রক্রিয়াটাই ভীষণ গোলমেলে। শারীরিক, নাকি মানসিক, কীসের কারণে মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে, সেটাই আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি আমরা। তাছাড়া অ্যাডিক্টদের ভিতরও রকমফের আছে। প্যাসিভ-রা ডিপ্রেসেণ্ট ব্যবহার করে, অ্যাকটিভ-রা চায় স্টিমিউলেণ্ট। আবার উল্টোটাও ঘটে! আমার কাজ ছিল সমস্ত অ্যাডিক্টদের ভিতর একটা কমন ট্রিগার খুঁজে বের করা—যাতে ওটার মাধ্যমে অ্যাডিকশনে পড়া-না-পড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।’

‘কী ধরনের ট্রিগারের কথা বলছেন?’

‘ব্রেনের একটা নার্ভ সেণ্টার—যেটা মাদকাসক্তির মূল কারণ। ভেবে দেখুন—যদি তেমন একটা নার্ভ সেণ্টার খুঁজে বের করা যায়, আর সেটাকে আপনি ইলেকট্রিক সুইচের মত

অন-অফ করতে পারেন... দারুণ একটা ব্যাপার হবে না?'

'এ তো মাইণ্ড-কন্ট্রোলের কথা বলছেন আপনি!'

'এত সিরিয়াসভাবে নিচ্ছেন কেন? আমি তো মানুষকে হাতের পুতুল বানাবার কথা বলছি না, শুধু একটা ওষুধ দিয়ে নার্ভটাকে অচল করে রাখতে চাইছি... যাতে কেউ কোনোদিন আর মাদকাসক্ত না হয়।'

'বুঝলাম, কিন্তু তারপরেও... মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে কোনও ধরনের এক্সপেরিমেন্ট সমর্থন করি না আমি।' আড়চোখে রিয়ারভিউ মিরর দেখল রানা, ধাওয়াকারীরা ওদের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব কমছে আরও। ওদের পুরনো সেডানের গতি অনেক কম, শত্রুদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

'বুঝেছি, আপনি একজন আদর্শবাদী!' গোমড়া মুখে বললেন ড. সিদ্দিকী।

'আমার কথা বাদ দিন,' রানা বলল। 'আপনার কথা শেষ করুন। গবেষণাটা সফল হয়েছিল?'

'না,' মাথা নাড়লেন ড. সিদ্দিকী। 'ব্যর্থ হয়েছিল তা-ও বলা যায় না। ব্যাকফায়ার করেছিল বললেই বরং ঠিক হবে।'

'ব্যাকফায়ার মানে?'

'একটা কেমিক্যাল আবিষ্কার করে বসি আমি—ওটা যে-কোনও মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে আসক্ত করে তুলতে পারে। একটা নতুন ড্রাগ! জিনিসটা অল্প খরচে তৈরি করা যায়, আবার তেমন কোনও ইকুইপমেন্টও প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য ড্রাগের মত ম্যানুফ্যাকচারিঙের সময় বিষক্রিয়া ঘটে না, বিস্ফোরণেরও ঝুঁকি নেই। এই ড্রাগ যে-কোনও মাদক-ব্যবসায়ীর জন্য ড্রিম-প্রোডাক্ট।'

আবার রিয়ারভিউ মিরর দেখল রানা—ধাওয়াকারীরা এখন পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

'ব্যাপারটা রিপোর্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে ডিইএ আমার পুরো প্রজেক্ট বন্ধ করে দিল,' বলে যাচ্ছেন সিদ্দিকী। 'গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র সিজ করে পুড়িয়ে ফেলল। কিন্তু ওদের মধ্যে কলাম্বিয়ানদের চর আছে, সে-ই আবিষ্কারের ঘটনাটা ফাঁস করে দিয়েছে ড্রাগলর্ড সান্টানার কাছে। গবেষণার কাগজপত্র না থাকায় লোকটা এখন আমাকে হাতে পেতে চায়... নতুন ড্রাগটার ফর্মুলার জন্য।'

'তা হলে ডিইএ আপনাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে না কেন?'

'দিয়েছিল। কিন্তু বললাম না, চর আছে ওদের মধ্যে? এক রাতে ডিইএ-র সেফহাউসে হামলা করে কলাম্বিয়ানরা—আমাকে কিডন্যাপ করার জন্য। আমার দেহরক্ষীরা সবাই মারা পড়ে, আমি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাই। ভাগ্যিস, অনেকদিন আগে ইমার্জেন্সির জন্য ওয়্যারহাউসের হাইডআউটটা তৈরি করে রেখেছিলাম... নইলে যাবার কোনও জায়গা ছিল না আমার।'

'হুম,' আনমনে মাথা দোলাল রানা, মনোযোগ পুরোপুরি ড্রাইভিঙের দিকে। শত্রুরা বিশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

'কিন্তু ওখানে অনির্দিষ্টকাল থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে—আমার খোঁজ বের করে ফেলত ওরা... ফেলেছেও, নিজের চোখেই তো দেখেছেন!' বলে চললেন সিদ্দিকী। 'আমেরিকান কোনও সংস্থার কাছে যাবার সাহস পাইনি—কলাম্বিয়ানরা কোথায় কোথায় টাকা খাইয়ে রেখেছে কে জানে! অনেক ভেবে-চিন্তে মনে পড়ল রানা এজেন্সি আর বিসিআই-এর কথা। আমি জানি, আপনারা আর যা-ই করুন,

অন্তত ড্রাগ-ডিলারদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না। তারপরও কিছুটা অনিশ্চয়তায় ছিলাম, তাই ভাবলাম—সাহায্য চাইতে হলে সরাসরি মাসুদ রানার কাছে চাইব, আর কারও কাছে নয়।'

'ভাল করেছেন,' বলল রানা, ডান হাতে আবার বের করে আনল সিগ-সাওয়ারটা। 'এটা লোড করতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী—পারবেন।

একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিনসহ অস্ত্রটা তাঁর হাতে দিল রানা, নিজে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে। রিয়ারভিউ ছেড়ে এখন সাইডভিউ মিররে উদয় হয়েছে ধাওয়াকারী গাড়িদুটো, একেবারে গায়ের উপর উঠে আসতে চায়। কাছ থেকে দেখে রানা চিনতে পারল, দুটোই পন্টিয়াক... কালো রঙের। একটা চলে গেল পিছনে, অন্যটা পাশাপাশি পজিশন নেবার চেষ্টা করছে। ব্যাটাদের মতলব বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার—বক্স করে সেডানকে রাস্তার পাশে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। সেডানে ড. সিদ্দিকী আছেন বলে গুলি করবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

'কুইক, ডক্টর!' হাত বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাল রানা। 'পিস্তলটা দিন।' পরমুহূর্তেই তালুতে সিগ-সাওয়ারের শীতল স্পর্শ পেল ও। গ্রিপটা আঁকড়ে ধরে বলল, 'সিটবেল্ট বাঁধুন।'

ত্রস্ত হাতে বেল্টের ক্লিপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সিদ্দিকী। তার ঠিক দু'সেকেণ্ড পর বামদিকে সমান্তরাল পজিশনে চলে এল ধাওয়াকারীদের প্রথম পন্টিয়াক, পাশ থেকে ধাক্কা দিল সেডানকে। রানাও ওদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছে—পাল্টা ধাক্কা দিচ্ছে। ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণের বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল। বিপরীতমুখী গাড়িগুলোর জানালায় বিস্মিত মুখ দেখতে পেল রানা, অবাক হয়ে কাণ্ডটা দেখছে... পুলিশ-টুলিশে খবর

দেবে নিশ্চয়ই।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত স্থির রইল দুটো গাড়িই, কেউ কাউকে রাস্তা থেকে ঠেলে সরাতে পারছে না। তবে একটু পরেই হার মানতে শুরু করল সেডান, পণ্টিয়াকটা আকারে বড়, শক্তিও বেশি। রানা বুঝতে পারল, এক্ষুণি কিছু একটা করা দরকার, নইলে ওরা রাস্তা থেকে ছিটকে যাবে। গুলি ছুঁড়তে গিয়ে থমকে গেল, শত্রুপক্ষের ড্রাইভার যদি আহত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়, তা হলে হাইওয়েতে চলাচলকারী অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে... নিরীহ মানুষ হতাহত হবে তাতে। কী করা যায়!

হঠাৎ স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশের গাড়ির উপর থেকে চাপ কমিয়ে আনল রানা, একই সঙ্গে ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে ঠেসে ধরল অ্যাকসেলারেটর। জ্যা-মুক্ত তীরের মত আগে বাড়ল সেডান, চোখের পলকে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট—শত্রুদের গাড়ির বনেট এখন রানার জানালা বরাবর। হাত বের করে গুলি ছুঁড়ল রানা—ইঞ্জিন লক্ষ্য করে! অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ট্রিগার চাপল ও, চোখের পলকে খালি করে ফেলল পুরো ম্যাগাজিন।

হুড ভেদ করে মাখন কাটা ছুরির মত ঢুকে গেল সিগ-সাওয়ারের শক্তিশালী বুলেট। ফ্যান গুঁড়িয়ে দিল, রেডিয়েটরে গরম পানির বিস্ফোরণ ঘটাল—বনেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ কালো ধোঁয়া। বেশ ক্ষতি হয়েছে ইঞ্জিনের, প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই গতি হারাল পণ্টিয়াক, পিছিয়ে পড়ল।

গুলি ছুঁড়েই ঝট্ করে হাতটা আবার ভিতরে নিয়ে এসেছে রানা, ভেবেছিল পাল্টা গুলি হবে, কিন্তু দেখা গেল—প্রতিপক্ষ পাক্কা প্রফেশনাল। নিজেদের ক্ষতি হবার পরও মাথা গরম

করেনি, ড. সিদ্দিকীর যাতে কোনও ক্ষতি না হয়—সে-ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন, একটা গুলিও ছুঁড়ল না।

ঘটনার আকস্মিকতা, সেই সঙ্গে আচমকা সেডানের গতি বেড়ে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় গাড়িটা। তবে খুব শীঘ্রি চমকটা সামলে নিল ওটার আরোহীরা, স্পিড বাড়িয়ে চলে এল রানাদের পিছে।

রিয়ার-এণ্ডে গুঁতো খেয়ে কেঁপে উঠল গোটা সেডানের চেসিস—পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পুরনো কারটাকে টালমাটাল করে দিতে চাইছে হামলাকারীরা। ডানে-বামে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আর ব্রেক ব্যবহার করে স্থির রইল রানা। আবার ধাক্কা দেয়া হলো পিছন থেকে, ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্দিকী।

'শান্ত থাকুন,' রানা বলল। 'ওভাবে কিছুই করতে পারবে না ওরা।'

দ্বিতীয় গাড়ির লোকেরা কার-ফাইটিঙে আনাড়ি—বুঝতে পারছে ও। নইলে পিছন থেকে গুঁতো মারত না। এই আক্রমণে সামনের গাড়ির তেমন কোনও ক্ষতি হয় না, দক্ষ ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণও হারায় না সহজে। ওদের উচিত ছিল পাশে এসে আঘাত করা, তবে প্রথম গাড়িটার পরিণতি দেখে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়। লোকগুলোর এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে।

কার-ফাইটে সবচেয়ে কার্যকর অ্যাটাকিং-মুভমেণ্ট মাত্র একটা—ওটাই প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল রানা, তবে সেজন্যে সুবিধেজনক পজিশনে পৌঁছুতে হবে প্রথমে। পিছন থেকে আবার ধাক্কা খাবার আগেই স্পিড বাড়াল ও, তারপর আচমকা ডানে কেটে চেপে ধরল ব্রেক। ভেজা রাস্তায় টায়ার পিছলানোর শব্দ হলো, অকস্মাৎ থেমে যাচ্ছে সেডানটা। ব্যাপারটা আগে আঁচ করতে পারেনি ধাওয়াকারীরা, প্রতিক্রিয়ার সময় পেল

গা... সেডানকে পিছনে ফেলে পাশ দিয়ে ছুটে সামনে চলে গেল। এবার আবার অ্যাকসেলারেটর চাপল রানা, পন্টিয়াকের রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায় নিয়ে এল সেডানকে। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে দুই গাড়ির জায়গা বদলে গেছে।

মুখে হাসি ফুটল রানার, কায়দামত পাওয়া গেছে ব্যাটাদের! এবার কৌশলটা খাটাবে ও। বইয়ের ভাষায় প্রেসিশান ইমোবিলাইযেশন টেকনিক বা পিআইটি বলে একে। বলতে গেলে তেমন কোনও শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না, স্রেফ একটা টোকা, বাকি কাজ সারে পদার্থবিদ্যার স্বাভাবিক নিয়ম।

স্পিড বাড়িয়ে এগোল রানা, ফ্রন্ট বাম্পারের বাম প্রান্ত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল পন্টিয়াকের রিয়ার-এণ্ডের ডান কোনায়। হিসেব করা আঘাত—ব্যালান্স পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল গাড়িটার, লাটিমের মত ঘুরতে শুরু করল। একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরতেই টেকো ড্রাইভার আর অপর তিন আরোহীর হতবিহ্বল চেহারা চোখে পড়ল রানার। হাত নেড়ে টা-টা করল ও, বিদায় সম্ভাষণটা ওরা দেখল কি না কে জানে; গাড়িটা তখনও ঘুরছে... একই সঙ্গে পিছলে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রানা, পিছনে পন্টিয়াকটা গিয়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার পাশের ব্যারিয়ারে—থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'নাইস জব!' প্রশংসার সুরে বললেন ড. সিদ্দিকী। 'দেখালেন বটে!'

'এখনও খুশি হবার সময় আসেনি,' নীরস গলায় বলল রানা। 'ওরা ফিরে আসবে।'

'কী!' চমকে গেলেন সিদ্দিকী।

'হ্যাঁ, ওই আঘাতে গাড়ি কেবল থামিয়ে দেয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য, অন্য কোনও ক্ষতি হয় না। লাভের মধ্যে

আমরা একটু সময় পেয়েছি, এ-ই আর কী!' ফিউয়েল গজের দিকে তাকাল রানা—কাঁটা এখন এক-চতুর্থাংশ রিডিং দেখাচ্ছে। 'তেলও শেষ আমাদের, এই গাড়ি নিয়ে রঁদেভু-তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।'

'তা হলে?'

'আর কিছু করতে হবে।'

সামনে একটা একজিট র‍্যাম্প দেখতে পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা। দেখা যাক, অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেয়া যায় কি না। নতুন গাড়িও ম্যানেজ করতে হবে। র‍্যাম্প ধরে সবেগে হাইওয়ে থেকে নেমে এল ওরা।

নীচের রাস্তা ধরে একশো গজ যেতেই একটা শপিং মল চোখে পড়ল, পাশে বিশাল পার্কিং লট—সেখানে গাড়ি আর গাড়ি। ঝড়ের বেগে সেডানটাকে লটে ঢোকাল ও, দৃষ্টিসীমার আড়ালে পার্ক করবার মত একটা জায়গা খুঁজছে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, একটাও ফাঁকা স্পট চোখে পড়ল না। ছুটির দিন আজ, রোববার, তারওপর বৃষ্টি পড়ছে। ঝড়বাদলের মধ্যে বেড়ানো তো সম্ভব নয়, তাই মানুষজন চলে এসেছে শপিং করতে—অগণিত ক্রেতাদের গাড়ির ভিড়ে টইটম্বুর হয়ে গেছে পুরো লট... একটুও জায়গা নেই। সারি সারি যানবাহনের মাঝখানে ঘুরে বেড়ানোটাই সার হলো রানাদের জন্য। সেডানটাকে যেখান-সেখানে ফেলে রাখারও উপায় নেই, শপিং মলের সিকিউরিটি পার্সোনেল বাধা দেবে।

লটের এণ্ট্র্যান্সের দিকে ফিরে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ ঢুকতে দেখল দ্বিতীয় পণ্টিয়াকটাকে—আঘাত সামলে নিয়ে ফিরে এসেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শিকারকে খুঁজে নিল ওরা, নাক ঘুরিয়ে সোজা ছুটে এল সেডানের দিকে। উইণ্ডশিল্ডের

ওধারে টেকো ড্রাইভার আর তার সঙ্গীদের হিংস্র চেহারা দেখা গেল, দৃষ্টি দিয়েই যেন খুন করবে রানাকে।

ঘোরার জায়গা নেই, ব্রেক কষল রানা, গিয়ার পাল্টে রিভার্সে দিল, তারপর চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। শরীর বাঁকিয়ে পিছনের উইণ্ডশিল্ড দিয়ে তাকাচ্ছে ও, উল্টোদিকে ড্রাইভ করছে।

হঠাৎ শত্রুদের একজন জানালা দিয়ে হাত বের করল, হাতে একটা সাইলেন্সার-লাগানো .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল। গুলির শব্দ শোনা গেল না, শুধু দু'বার গুঙিয়ে উঠল সেডানের পুরনো ইঞ্জিন। সামনের দিকে তাকাতে হলো না রানার, পরিষ্কার বুঝতে পারছে কী ঘটেছে—ওর-ই ওষুধ দিয়ে শায়েস্তা করা হচ্ছে ওকে। ওদের প্রথম গাড়িটাকে ও যেভাবে অচল করেছিল, ঠিক সেইভাবেই অচল করা হচ্ছে সেডানকে—রেডিয়েটর আর ইঞ্জিনে গুলি করে। হিস হিস শব্দ উঠল—রেডিয়েটর লিক হয়ে বাষ্প বেরুতে শুরু করেছে।

'মি. রানা!' আতঙ্কিত গলায় চেঁচালেন ড. সিদ্দিকী।

কিছু বলল না রানা, এখুনি অস্থির হবার প্রয়োজন নেই। নাইন মিলিমিটারের চেয়ে ফরটি-ফাইভের শক্তি কম, ইঞ্জিনটা এখনই বন্ধ হবে না। অ্যাকসেলারেটর চেপে দ্রুত পিছিয়ে যাওয়া নিয়েই ব্যস্ত রইল ও।

সারি সারি গাড়ির মাঝখানের একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছে গেছে সেডান—মোটামুটি প্রশস্ত ওখানটা। হ্যাণ্ডব্রেক টেনে সজোরে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, স্কিড করে একশো আশি ডিগ্রি টার্ন করবে—মুখ ঘোরাবে গাড়ির। কৌশলটা নিখুঁতভাবে কার্যকর করা গেল না—ভেজা কংক্রিটে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পিছলাল চাকা, সেডানের পিছনটা গিয়ে বাড়ি খেল পার্ক করা

একটা জিপের সামনে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল ওরা, পিছনে জিপের অ্যালার্ম বাজছে তারস্বরে।

রানা মাথা ঘামাল না ও-নিয়ে, কোনোদিকে না তাকিয়ে গিয়ার বদলাল, তারপর মুখ সোজা করে সবেগে ছোটাল গাড়ি। ধাওয়াকারীরা এখন ওদের পিছনে।

হঠাৎ চমকে উঠল ও। ছাতা হাতে কয়েকটা গাড়ির মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যমনস্ক এক তরুণী... ঠিক ওদের সামনে! ধাবমান সেডানটাকে দেখতে অনেক দেরি করে ফেলল সে, তখন সরবার সময় নেই। আতঙ্কে প্যারালাইসিস-আক্রান্ত রোগীর মত স্থির হয়ে গেল মেয়েটি। হাত থেকে পড়ে গেল ছাতা।

'ওহ্ গড!' চেঁচিয়ে উঠলেন ড. সিদ্দিকী।

নয়

'নোড়ো না!' বিড়বিড় করে উঠল রানা—শুনে মনে হতে পারে, সামনের মেয়েটির উদ্দেশে বলছে ও কথাটা; আসলে ওটা প্রার্থনা... ওপরঅলার কাছে করছে, যাতে স্থির থাকে মেয়েটা। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য দু'পাশের ফাঁকা জায়গার হিসেব সেরে ফেলেছে ও, কিন্তু নড়াচড়া করলেই সব গুবলেট হয়ে যাবে।

বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, পার্কিং লটের আইলের

একপাশে সরিয়ে আনল সেডান। পার্ক করা একসারি গাড়ির সঙ্গে ঘষা খেতে থাকল বামপাশ—একের পর এক হেডলাইট আর ফ্রন্ট বাম্পার ধ্বংস করছে, তবে মেয়েটার শরীরের ছ'ইঞ্চি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল।

রিয়ারভিউ মিররে মেয়েটাকে থরথর করে কাঁপতে দেখল রানা—বেচারি নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ড. সিদ্দিকীর চোখেও অবিশ্বাস—নিশ্চিত একটা অ্যাকসিডেন্ট কীভাবে ফাঁকি দিল এই লোকটা? পরমুহূর্তে পিছনে টায়ারের কর্কশ শব্দ আর হর্ন শোনা গেল—পণ্টিয়াক থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। রানার মত মেয়েটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। মুচকি হাসল রানা। যাক, মেয়েটা অন্তত একটা কাজের কাজ করেছে। শত্রুদের থামিয়ে দিয়ে পালাবার একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে—এটা কাজে লাগাতে হবে।

পার্কিং লটে আর ঘোরাফেরা করে কাজ নেই, দিক পাল্টে মলের এণ্ট্র্যান্সের দিকে সেডান ছোটাল রানা। বড় বড় কাঁচের দরজাগুলোর সামনে এসে ব্রেক কষে থামল ও। 'ড. সিদ্দিকী, বেরিয়ে পড়ুন।'

গাড়ি ছেড়ে দেয়ার কথা শুনে চোখ বড় হয়ে গেল বিজ্ঞানীর, বাহনটার ভিতরেই নিরাপদ বোধ করছিলেন তিনি। প্রতিবাদের সুরে বলতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু...'

'কোনও কথা নয়, বেরোন!'

সেডান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা আর ড. সিদ্দিকী। দৌড়ুতে শুরু করল এণ্ট্রান্সের দিকে। দরজা পেরিয়ে যখন ঢুকে যাচ্ছে, তখন পিছনে ব্রেক কষার শব্দ হলো। এক পলকের জন্য মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানা—ধাওয়াকারীরা এসে পড়েছে, কালো পণ্টিয়াকটা থামানো হয়েছে ঠিক সেডানের পিছনে।

অ্যাসল্ট অপারেশনের নিয়মকানুন দাঁড়ি-কমা মেনে অনুসরণ করছে এরা। রানা বুঝতে পারল, ড্রাইভার গাড়িসহ সেডানের কাছে থাকবে, বাকি তিন আরোহী এসে ঢুকবে ওদের খোঁজে। এটাই নিয়ম—টার্গেটের এস্কেপ ভেহিকল চোখে চোখে রাখতে হয়। তা ছাড়া ওয়্যারলেসে যোগাযোগও থাকবে ওদের মধ্যে। সেডান ফেলে রানারা যদি অন্য কোনও রাস্তায় পালাবার চেষ্টা করে, ড্রাইভার চোখের পলকে সেখানে হাজির হয়ে যেতে পারবে। লোকগুলোর এই নিয়মানুবর্তিতাকেই কীভাবে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার করা যায়, ভাবতে শুরু করল রানা।

মলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। বিল্ডিংটা দোতলা, সুপ্রশস্ত অভ্যন্তর—ডেকোরেশনও করা হয়েছে চমৎকারভাবে। ভিতরটা লোকে লোকারণ্য—হারিয়ে যেতে কষ্ট হবে না। আশপাশের দোকানগুলোর উপর চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রানা—বামে একটা ইলেকট্রনিক্স স্টোর নজর কাড়ল ওর। ড. সিদ্দিকীর আস্তিনে টান দিয়ে বলল, 'এদিকে আসুন।'

লোকজনের ভিড় ঠেলে দোকানটার দিকে এগোল রানা, সিগ-সাওয়ারটা ধরে রেখেছে হাতে, জ্যাকেটের আড়ালে লুকিয়ে ম্যাগাজিন বদলে নিল। নতুন একটা ভরেছে, চেম্বারেও ঢোকাল একটা সিঙ্গেল বুলেট—অস্ত্রটা এখন পুরোপুরি লোডেড।

ভেজা পোশাক পরা দুজন মানুষকে স্টোরে ঢুকতে দেখে একটু বিস্ময় ফুটল অল্পবয়েসী ক্লার্কের চেহারায়। ভুরু কুঁচকে রানা আর ড. সিদ্দিকীকে দেখল সে, বোঝার চেষ্টা করছে—আসলেই কিছু কেনার মত সামর্থ্য আছে কি না নবাগত দুই কাস্টোমারের। সেডান দখল করবার সময়ই উদ্বাস্তুদের ওভারকোটদুটো ফেলে দিয়েছিল বলে তা-ও কিছুটা রক্ষা,

নইলে অমন পোশাক দেখে লোকটা দূর-দূর করে খেদাত ওদের।

'কী হলো?' একটু বিরক্তি ফুটিয়ে বলল ও। 'আমাদের পছন্দ হচ্ছে না?'

ঝট্ করে সোজা হলো ক্লার্ক, কথা বলার দৃঢ়তা আর চেহারার আভিজাত্য দেখে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হাউ মে আই হেল্প ইউ, সার?'

পিস্তলটা ইতিমধ্যে হোলস্টারে রেখে দিয়েছে রানা, চোখ বোলাল ভিতরে সাজিয়ে রাখা হরেক রকম টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ারের দিকে। 'আমরা যা খুঁজছি, তা স্টোরের পিছনদিকে আছে,' বলল ও।

'প্লিজ, আসুন,' হাঁটতে হাঁটতে বলল ক্লার্ক। 'দেখান কী প্রয়োজন আপনাদের।'

অল্প কিছু কাস্টোমার রয়েছে স্টোরের ভিতরে, তাদের পাশ কাটিয়ে পিছনের কাউন্টারের দিকে এগোল রানা, ড. সিদ্দিকী অনুসরণ করলেন ওকে।

'যা চান, তা-ই পাবেন এখানে, সার,' ক্যানভাসারের ভঙ্গিতে বলল ক্লার্ক। 'চমৎকার সময়ে এসেছেন, এই হপ্তায় আমরা সব বিক্রির ওপর বিশেষ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি...'

লোকটার কথায় কান দিল না রানা। কাউন্টারটার একপাশে একটা দরজা চোখে পড়েছে ওর, দোকানের স্টোররুমে যাওয়া যায়। বিজ্ঞানীকে নিয়ে সেদিকে গেল ও, নব মুচড়ে খুলে ফেলল পাল্লা।

'করছেন কী, সার?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ক্লার্ক। 'কাস্টোমারদের স্টোররুমে যাবার নিয়ম নেই!'

'কিন্তু স্টোররুমটাই তো খুঁজছি আমরা!' বলে টান দিয়ে

ড. সিদ্দিকীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, ক্লার্ক কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

কিল পড়ল দরজায়। চাপা আওয়াজ ভেসে এল, 'সার! দরজা খুলুন।'

অনুরোধটা গ্রাহ্য করল না রানা। হাঁটতে শুরু করল স্টোররুমের বিপরীত দিকটা লক্ষ্য করে।

'এখানে ঢুকলেন কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন সিদ্দিকী।

জবাব না দিয়ে আঙুল তুলে দ্বিতীয় একটা দরজা দেখাল রানা—সার্ভিস ডোর। ওখান দিয়ে বাইরে থেকে দোকানের সমস্ত মালামাল এনে ঢোকানো হয় স্টোররুমে। আমেরিকার সমস্ত শপিং মলের নিয়ম এটা—স্টোররুম থাকলেই সেটার আলাদা সার্ভিস ডোর থাকতে হবে। এই ব্যবস্থায় আড়াল থেকে সব ধরনের ডেলিভারি ও সাপ্লাই সম্পাদন করা যায়, সামনে থাকা কাস্টোমারদের অসুবিধে হয় না মালামাল আনা-নেয়ার ফলে।

নানা ধরনের কার্টনে ভরা অনেকগুলো র‍্যাক রয়েছে স্টোররুমের ভিতরে, সেগুলোর মাঝ দিয়ে এগোল রানা আর ড. সিদ্দিকী। দরজার সামনে পৌঁছুল। তালা দেয়া আছে পাল্লায়, তবে সেটা রানার জন্য কোনও বড় সমস্যা নয়, এক গুলিতে নবটা উড়িয়ে দিল ও, তারপর সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে এল মলের বাইরে... বৃষ্টির মধ্যে।

অ্যাসল্ট টিমের সদস্যরা তখন মলের ভিতরে ওদের খুঁজে মরছে, খুব শীঘ্রি তাদের বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা নেই। বিল্ডিং থেকে বেরুনোর মূল পথ আর ফায়ার একজিটগুলোর দিকে নজর রাখবে ওরা, কিন্তু সার্ভিস ডোরের দিকে খেয়াল করবে

বলে মনে হয় না... সম্ভবও নয়।

একটু ঘুরপথে এণ্ট্র্যান্সের দিকে এগোল রানা, মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলছে। যা ভেবেছিল, তা-ই। সেডানের পাছায় প্রায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো গাড়িটা। প্রয়োজনে দ্রুত ছোটার সুবিধার্থে ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি। টাকমাথা ড্রাইভার ড্রাইভিং সিটে বসে সতর্ক চোখে তাকিয়ে রয়েছে মলের দরজার দিকে, অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই।

পিছন থেকে অগ্রসর হলো রানা, পন্টিয়াকের রিয়ারভিউ আর সাইডভিউ মিরর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। হাতে বেরিয়ে এসেছে সিগ-সাওয়ারটা। নিচু হয়ে ড্রাইভারের দরজার পাশে চলে গেল ও, তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে সচকিত হলো ড্রাইভার, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অনাহূত আগন্তুকের দিকে, তবে দেরি করে ফেলেছে সে। পিস্তলের বাট দিয়ে জানালার কাঁচে সজোরে আঘাত হানল রানা, ভাঙা কাঁচের আঘাত থেকে বাঁচতে মাথা নামিয়ে ফেলল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল পাশের সিটের দিকে—ওখানে তার পিস্তল, সেলফোন, সিগারেট আর লাইটার রাখা।

'খবরদার!' বুক কাঁপানো স্বরে ধমকে উঠল রানা। 'নড়বে না!'

থমকে গেল ড্রাইভার। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে রানার দিকে।

'নামো!'

চকিতে নিজের পিস্তলের দিকে তাকাল টাকমাথা, হিসেব কষছে—ওটা নিতে পারবে কি না।

'বোকামি কোরো না,' বলল রানা। 'লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে এসো গাড়ি থেকে।'

আবার পাশে তাকাল ড্রাইভার, হার মানতে চাইছে না।

গুলি করল রানা, লোকটার দু'পায়ের মাঝখানে, সিটের গদিতে। 'পরেরটা কিন্তু বিচি গালিয়ে দেবে,' হুমকি দিল ও।

সাহস হারিয়ে ফেলেছে টাকমাথা, হ্যাণ্ডস্ আপের ভঙ্গিতে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। 'প্লিজ, মারবেন না আমাকে,' বলল সে।

'তা হলে ভাগো।' রাস্তার দিকটা দেখিয়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে পালাল ড্রাইভার। কয়েক সেকেণ্ড তার পিঠের দিকে পিস্তল তাক করে রাখল রানা, তারপর উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। গুলির শব্দে আশপাশের লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না ও। ড. সিদ্দিকীকে বলল, 'উঠে পড়ুন, কুইক!'

ইতিমধ্যে প্যাসেঞ্জার সিটটা খালি করে দিয়েছে রানা, ফোন-সিগারেটের প্যাকেট-লাইটার-পিস্তল সব উঠিয়ে রেখেছে ড্যাশবোর্ডের উপর; বিজ্ঞানী চড়ে বসতেই হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে আগে বাড়ল ও, সেডানের পাশে গিয়ে থামল একটু। টাকমাথা ড্রাইভারের যিপো লাইটারটা জ্বেলে ছুঁড়ে দিল সেডানের তলায়। গাড়ির নীচে বৃষ্টি পৌঁছুচ্ছে না, ফুটো হয়ে যাওয়া ফিউয়েল ট্যাঙ্ক থেকে তেল পড়ে ভিজে রয়েছে। চোখের পলকে দাউ-দাউ আগুন ধরে গেল, তারপর পোড়াতে শুরু করল পুরো চেসিসটাকে।

অ্যাকসেলারেটর চেপে পণ্টিয়াকটাকে সবেগে ছোটাল রানা, শপিং মলের সীমানায় পৌঁছুতেই পিছনে শুনল বিস্ফোরণের গুম গুম শব্দ—সেডানটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রিয়ারভিউ মিররে তিন অস্ত্রধারীকে দৌড়ে মল থেকে বেরুতে দেখল ও—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটু

পরেই বাঁক ঘুরল পন্টিয়াক, লোকগুলো হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

র‍্যাম্প ধরে আবার হাইওয়েতে উঠে এল রানা, উত্তর দিকে ছুটছে। পিছনদিকে খেয়াল রাখল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু নতুন কোনও গাড়ি নিয়ে তাড়া করে এল না কেউ। মনে হচ্ছে অবশেষে খসানো গেছে হামলাকারীদের।

জোরে জোরে দম ফেলছেন ড. সিদ্দিকী, এক হাতে খামচে ধরে রেখেছেন বুকটা। রানা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আপনার? হার্ট অ্যাটাক নয় তো?'

'না,' মাথা নাড়লেন বিজ্ঞানী। 'দম ফুরিয়ে গেছে... বুক ব্যথা করছে তাই।'

'এটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলেন? শরীরের একটু যত্ন নেন না কেন?'

'কখনও ছাই ভেবেছি নাকি যে এভাবে প্রাণ নিয়ে ছোটাছুটি করতে হবে?'

'এখন থেকে ভাবুন। পরিচয় যদি সত্যি পাল্টাতে চান, তা হলে শুকাতে হবে আপনাকে। মোটা মানুষের দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।'

'শুকাব—কথা দিচ্ছি।'

'গুড,' বলে হাসল রানা। আড়চোখে লক্ষ করল, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বিজ্ঞানীর, তবে ভেজা কাপড়ের কারণে ঠাণ্ডায় কাঁপছেন। ওর নিজেরও শীত করছে। তাই বলল, 'হিটারটা বাড়ান... যতটা সম্ভব। শরীর গরম করা দরকার, নইলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।'

কাঁপা কাঁপা হাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ড. সিদ্দিকী। একটু পরেই আরামদায়ক উত্তাপ বেরুতে শুরু করল ব্লোয়ার থেকে।

আগুন পোহানোর ভঙ্গিতে হাত মেলে ধরলেন তিনি। রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেডানটা পুড়িয়ে দিলেন কেন, জানতে পারি?'

'যাতে ওটার সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতার কথা পুলিশ বা অন্য কেউ জানতে না পারে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে দিলেই হতো, তবে তার সময় পাইনি বলে আগুনটাই একমাত্র বিকল্প ছিল। তা ছাড়া আগুনটা লোকজনের নজর ফেরাতেও কাজে লেগেছে।'

'আপনার দেখছি সবদিকেই সতর্ক দৃষ্টি!' প্রশংসার সুরে বললেন ড. সিদ্দিকী।

'পেশাগত ট্রেইনিং,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'তারপরও... যেভাবে একটার পর একটা কাণ্ড ঘটালেন... সাধারণ কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। আপনি খুব দুঃসাহসী মানুষ।'

বিব্রত বোধ করল রানা। 'লজ্জা দেবেন না, আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি...'

কথা শেষ হলো না ওর, বেরসিকের মত বেজে উঠল ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা টেকো ড্রাইভারের সেলফোনটা। বিরক্তিকর রিংটোন—নাকী সুরে গান গাইছে হাল-সময়ের এক টিনেজ গায়িকা। ভুরু কুঁচকে ফোনটার দিকে তাকাল গাড়ির দুই আরোহী। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ওরা, তারপর রানা হাত বাড়িয়ে তুলে নিল সেটটা।

'ধরার কোনও দরকার আছে?' অস্বস্তি নিয়ে বললেন সিদ্দিকী। 'ফোনটা তো আমাদের নয়।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কলটা আমাদেরই জন্যে,' বলল রানা। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য হাসল একটু। 'তা

ছাড়া এই বিশ্রী গানটা থামানোর জন্যে হলেও কলটা রিসিভ করা দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী।

অ্যান্সার বাটন টিপে সেলফোনটা কানে ঠেকাল রানা। 'ইয়েস? লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড ডিপার্টমেন্ট।'

'কী!' ওপাশের লোকটা যেন একটু চমকে গেল।

'হারানো একটা কালো পন্টিয়াকের খোঁজ চান তো? লস্ট অ্যাণ্ড ফাউণ্ড ডিপার্টমেন্ট ছাড়া আর কোথায় ফোন করবেন?'

'হুঁ, দেখা যাচ্ছে আমি একজন বাক্যবাগীশের সঙ্গে কথা বলছি,' খসখসে ভারী কণ্ঠস্বর, 'যে একই সঙ্গে আস্ত নির্বোধ!'

'সেই নির্বোধের হাতেই ঘোল খেয়ে বেড়াচ্ছ?' বিদ্রূপ করল রানা। 'তা হলে তোমাদের কী বলব—উজবুক, নাকি গাড়ল?'

অপমানটা গায়ে মাখল না লোকটা। 'স্বীকার করছি, নিজেদের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে আমাদেরটা নিয়ে পালানো... কৌশল হিসেবে মন্দ ছিল না। তবে এটুকু সাফল্যেই খুশি হয়ে উঠেছ দেখে বুঝতে পারছি তুমি একটা নির্বোধ। আমরা কে, সে-ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণাই নেই। ভেবেছ এত অল্পে হার মানব আমরা? কক্ষনো না! কোথাও পালাবার উপায় নেই তোমার, মিস্টার। আমরা আসতেই থাকব।'

'আমিও অপেক্ষায় থাকব,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'তোমাদের চিনি না বলে ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু তোমরাই কি চিনেছ আমাকে?'

'হাহ্!' অবজ্ঞা প্রকাশ পেল ফোনে। 'নাম জানি না, তবে তুমি কে হতে পারো—সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের। পুলিশ-টুলিশ নও সেটা বোঝাই যাচ্ছে, হলে প্রাইভেট সিকিউরিটির-ই কেউ হবে, তা-ই না? সিদ্দিকী ভাড়া

করেছে তোমাকে... একজন বডিগার্ড, রাইট?'

'বাহ্, তোমার অনুমানশক্তি দেখে আমি মুগ্ধ!' টিটকিরি মারার সুরে বলল রানা। 'মগজটা এত উর্বর করেছ কী করে? নিয়মিত গোবর ঢালো মাথায়?'

'শোনো মি. বডিগার্ড,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লোকটা, বহু কষ্টে রাগ সামলাচ্ছে, 'বিরাট ভুল করছ তুমি। বুঝতে পারছি, ড. সিদ্দিকী তোমাকে আসল ঘটনা কিছুই বলেনি। কীসের মধ্যে নাক গলিয়ে বসেছ, সেটা বুঝতে পারছ না তাই। এখনও সময় আছে, সরে দাঁড়াও। বিজ্ঞানীর বাচ্চাটাকে তুলে দাও আমাদের হাতে।'

'বার বার বডিগার্ড-বডিগার্ড বলে আমাকে ছোট করছ তুমি,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'খুব অপমানিত বোধ করছি। ড. সিদ্দিকীকে চাইলে এখন আমার পা ধরতে হবে তোমাকে।'

'কী বললি!' আর সহ্য হলো না লোকটার, তুই-তোকারিতে নামিয়ে এনেছে সম্বোধন। 'শালা দু'টাকার বডিগার্ড, আমাকে বলে কি না পায়ে ধরতে! তোকে যদি আমি...' মুখ দিয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুটল তার।

'থামো!' বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল শত্রুপক্ষের লোকটা, পরমুহূর্তে বিস্মিত হয়ে ভাবল—ব্যাপার কী? সামনাসামনি নয়, টেলিফোনে ভেসে এসেছে কণ্ঠটা... তারপরও এভাবে তার বুক কেঁপে উঠল কেন? কে এই দেহরক্ষী?

'...আর যদি একটাও বাজে কথা বলো,' শীতল গলায় বলল রানা, 'তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি। ড. সিদ্দিকীর আশপাশেও যেন না দেখি তোমাদের। বুঝেছ?'

'ইউ আর আ ডেড ম্যান, স্ট্রেঞ্জার,' থমথমে গলায় বলল

ফোনের লোকটা। 'নিজের মৃত্যু-পরোয়ানা সই করেছ তুমি...'

'এসব সস্তা হুমকি অন্য কোথাও গিয়ে ঝাড়ো। ত্রিসীমানায় যদি দেখি তোমাদের, পরোয়ানাটা উল্টো তোমাদের নামেই জারি হবে। মাথায় রেখো কথাটা। গুড বাই!'

লাইন কেটে দিল রানা, তারপর ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে... পাশ দিয়ে যেতে থাকা একটা পিকআপ ট্রাকের পিছনে। ড. সিদ্দিকী অবাক হয়ে বললেন, 'ফেলে দিলেন কেন?'

'আপনার বন্ধুরা খোশগল্পের জন্য ফোন করেনি,' রানা বলল। 'নতুন এসব সেটের সঙ্গে বার্গলারি-প্রোটেকশনের জন্য ট্র্যাকার থাকে। অনুসরণ করবার আগে তাই শিয়োর হতে চাইছিল, জিনিসটা আমাদের সঙ্গে আছে কি না।'

হেসে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'কোনও কিছুই দেখি আপনার নজর এড়ায় না! শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, ড্রাইভারটাকে ছেড়ে দিলেন কেন?'

'অকারণে মানুষ খুন করি না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'গাড়িটা দখলের জন্য ওকে খুন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

বৃষ্টিটা কমে এসেছে। পকেট থেকে নিজের সেলফোন বের করে সোহানাকে রিং দিল রানা।

'কোথায় তুমি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন এল। 'দশ মিনিট পরেই ফোন করতে বলেছিলাম না?'

'সরি, ফেউ খসাতে দেরি হয়ে গেল,' রানা বলল। 'গাড়িও বদলেছি। আমরা এখন একটা কালো পণ্টিয়াকে।'

'টেটারবোরোর *হলিডে ইন*-এ পৌঁছুতে পারবে? এয়ারপোর্টের পাশেই হোটেলটা, জাকির অপেক্ষা করবে

ওখানে।'

'আশা করি পারব। ই.টি.এ. বিশ মিনিট—বলে দাও ওকে।'

'ঠিক আছে।'

দশ

টেটারবোরো এয়ারপোর্ট থেকে হলিডে ইনের দূরত্ব মাত্র আধ মাইল, রানওয়েতে উঠতে-নামতে থাকা বিমানের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। রুট সেভেনটিন ধরে কালো পণ্টিয়াকটা যখন ওখানে পৌঁছুল, তখন অবশ্য উৎপাতটা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে—বিরূপ আবহাওয়ায় প্লেনের ওঠানামা কম হবার কারণে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না। বৃষ্টি ইতিমধ্যেই ইলশেগুঁড়িতে পরিণত হয়েছে, বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম খুব শীঘ্রি শুরু হয়ে যাবে।

হোটেলের কারপোর্টে সটান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখাপ্রধানকে—হাঁটু-পর্যন্ত লম্বা একটা ওভারকোট পরেছে, হাতদুটো ঢুকিয়ে রেখেছে পকেটে। নিঃসন্দেহে পিস্তল ধরা আছে মুঠিতে, হাবভাবে সতর্ক ভাবটা লুকাতে পারছে না। উত্তেজনাও ফুটে রয়েছে চেহারায়।

ঠিক জাকিরের পাশে গিয়ে গাড়ি থামাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধূসর রঙের ভ্যান হাজির হলো কোত্থেকে যেন, পন্টিয়াকের রিয়ার-এণ্ডের ছ'ইঞ্চি তফাতে এসে দাঁড়াল। ব্যাপারটা লক্ষ করে আতঙ্ক ফুটল ড. সিদ্দিকীর চেহারায়।

'রিল্যাক্স,' বলল রানা। 'এরা আমাদেরই লোক।'

বিজ্ঞানীকে অভয় দিলেও আড়চোখে রিয়ারভিউ মিররে চোখ বোলাল ও, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে নিরাপত্তার ব্যাপারে। ভ্যানটা রানা এজেন্সির হলেও ভিতরে অন্য লোক থাকতে পারে।

উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু অবশ্য দেখতে পেল না রানা, ভ্যানের ভিতর পরিচিত তিনটে মুখই রয়েছে—অন্য কেউ না। তিনজন পুরুষ... সবাই রানা এজেন্সির বিশ্বস্ত অপারেটর। গাড়িটার উপস্থিতিও স্বাভাবিক, ইমার্জেন্সির জন্য টেটারবোরো এয়ারপোর্টের পাশে একটা রেন্টাল এজেন্সির তত্ত্বাবধানে সবসময় রাখা হয় ওটা। বলা বাহুল্য, রেন্টাল এজেন্সিটাও ওদেরই।

একটু অপেক্ষা করল রানা, আগে ভ্যানের আরোহীদের নামতে দিল; পন্টিয়াকের ইঞ্জিন চালু রেখেছে, কোথাও গোলমাল দেখলে যেন চট করে সটকে পড়তে পারে।

ভ্যান থেকে নেমে একটু দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিল তিন অপারেটর। জাকির বলল, 'অল ক্লিয়ার, মাসুদ ভাই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ড. সিদ্দিকীকে ইশারা করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

'ডক্টর, এ হচ্ছে জাকির হোসেন—আমার এজেন্সির নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চের ইনচার্জ।' পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

'কথা হয়েছে আমাদের,' বলে হাত মেলালেন বিজ্ঞানী।

‘কেমন আছেন আপনি?’ সৌজন্যসূচক হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল জাকির।

‘আধ ঘণ্টা আগের চেয়ে অনেক ভাল,’ নার্ভাস ভঙ্গিতে পাল্টা হাসলেন সিদ্দিকী।

বাকি তিনজনের সঙ্গেও পরিচয় করাল রানা। ‘আফতাব, শামস, আর জয়... এরাও এজেন্সির অপারেটর।’

একে একে সবাই করমর্দন করল বিজ্ঞানীর সঙ্গে। কুশল বিনিময় শেষ হতেই কাজের কথায় এল রানা। ‘মনসুর আর ওর টিম কোথায়?’

রানা এজেন্সির চার সদস্য বিশিষ্ট উইটনেস প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট টিমের প্রধান মনসুর আহমেদ, ওদের ব্যাপারেই জানতে চাইছে ও।

‘সেফ-সাইটে,’ জানাল জাকির। ‘ড. সিদ্দিকীর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে ওরা।’

‘ওখানে যাব কীভাবে আমরা?’

‘যে-হেলিকপ্টারটা নিয়ে এসেছি, ওটায়। এয়ারপোর্টে রাখা আছে কপ্টারটা, টেকঅফের জন্য তৈরি।’

‘গুড,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘তার আগে গাড়িটার ব্যবস্থা নিতে হবে। এটায় লোকেশন ট্রান্সমিটার থাকতে পারে।’

‘সরিয়ে ফেলছি এখুনি।’

‘তার আগে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলতে হবে,’ বলল রানা। ‘সামনের সিটে ছিলাম আমরা সারাক্ষণ, তারপরও ঝুঁকি নিয়ো না। ভিতরের পুরোটা ভাল করে পরিষ্কার কোরো।’

‘ঠিক আছে। আফতাব!’ ডাকল জাকির। ‘শামসকে নিয়ে ব্যবস্থা করো পণ্টিয়াকটার। জয় আমাদের সঙ্গে ভ্যানে যাবে।’

'ড্যাশবোর্ডের উপর একটা পিস্তল পাবে,' রানা বলে দিল। 'ওটার সিরিয়াল নম্বর ট্রেস করতে পারো কি না দেখো। আমাদের উপর যারা হামলা করেছিল, ওদের নাম-পরিচয় জানা দরকার।'

'জী, মাসুদ ভাই,' বলে পন্টিয়াকে চড়ে বসল আফতাব আর শামস, চলে গেল গাড়িটা নিয়ে।

'আসুন,' বলল জাকির, রানা ও ড. সিদ্দিকীকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল ভ্যানে। জয় ইতিমধ্যে ড্রাইভিং সিটে আসন নিয়েছে, যাত্রীরা চড়তেই স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে, রওনা হয়ে গেল এয়ারপোর্টের দিকে।

ভ্যানের পিছনদিকটা বেশ প্রশস্ত, সার্ভেইলান্সের জন্য নানা রকম ইকুইপমেন্টে সাজানো। তারপরও গদিমোড়া সিটগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে হাত-পা ছড়ানো যায়। আরাম করে বসল রানা ও ড. সিদ্দিকী। একটা কফিপট আছে পিছনে, সেখান থেকে স্টাইরোফোমের দুটো ডিসপোজেবল কাপে কফি ঢেলে দিল জাকির। আয়েশ করে চুমুক দিল ওরা।

কারে হিটার চলছিল, কিন্তু ড. সিদ্দিকীর শরীর পুরোপুরি গরম হয়নি। এখনও শীতে কাঁপছেন ভদ্রলোক। ব্যাপারটা লক্ষ করে জাকির বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, কপ্টারে ওঠার আগেই শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করব।'

রানাও একটু একটু কাঁপছে, তবে ঠাণ্ডার কারণে নয়, অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে। অনেকগুলো বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে ওকে বিকেল থেকে, নার্ভগুলোকে এ-কাজে শক্তি জুগিয়েছে অ্যাড্রেনালিন। ডেক্সেড্রিন নামে একটা ওষুধ দিয়ে শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক করে নেয়া যায়, জাকির দিতেও চাইল, কিন্তু রাজি হলো না ও। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, শরীর

তার নিজস্ব নিয়মেই শান্ত করুক নার্ভগুলোকে।

একটু পরেই টেটারবোরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ভ্যান। কর্পোরেট আরোহীদের জন্য নির্ধারিত গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল সরাসরি টারমাকে, টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে দুশো গজ দূরের একটা হ্যাঙ্গারের সামনে গিয়ে থামল। ওখানেই রয়েছে রানা এজেন্সির নিজস্ব বেল্ ২০৬-এল হেলিকপ্টারটা।

বেশি সময় নষ্ট করল না ওরা, করার প্রয়োজনও হলো না। প্রাইভেট ফ্লাইট অপারেট করা হয় বলে টেটারবোরোতে সিকিউরিটি চেকআপ তেমন কড়া নয়, ডমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য ফর্মালিটি আরও কম। বিশেষ করে হেলিকপ্টারের জন্য কাগুজে ক্লিয়ারেন্স ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। হ্যাঙ্গারে কয়েক মিনিট থাকল ওরা শুধু ভেজা কাপড় পাল্টে পাইলটদের শুকনো কভারঅল পরতে, তারপরই উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ওড়ার অনুমতি দেয়া হলো। জয় রয়ে গেল ভ্যানের সঙ্গে, কপ্টার চালনার দায়িত্ব নিল জাকির। রানা বসল পাশে, আর ড. সিদ্দিকী পিছনে। তিনজনকে নিয়ে টেকঅফ করল বেল ২০৬-এল, হাডসন নদী নীচে রেখে উত্তরদিকে উড়ে চলল।

বৃষ্টি থেমে গেছে পুরোপুরি, আকাশ ফকফকে পরিষ্কার। স্বচ্ছন্দে যাচ্ছে কপ্টারটা। মিনিট পনেরো পরেই বাঁয়ে উদয় হলো নিউ জার্সি প্যালিসেডস্—হাডসন রিভারের পশ্চিম তীরের বিখ্যাত ব্যাসল্ট পর্বতশ্রেণী। শেষ বিকেলের আলোয় রক্তিম হয়ে আছে বৃষ্টিস্নাত চূড়াগুলো... ঝলমল করছে। দৃশ্যটা অপূর্ব সুন্দর। তবে প্রকৃতির মোহময় রূপে মোটেই মুগ্ধ হচ্ছেন না ড. আন্দালিব সিদ্দিকী, এখনও সিঁটিয়ে রয়েছেন তিনি। কারণটা জানতে চাইল রানা।

'ভয় করছে,' সোজাসাপ্টা ভাষায় স্বীকার করলেন বিজ্ঞানী। 'কেউ যদি গুলি করে হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ করায়?'

'দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' পাইলটের সিট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল জাকির। 'আমাদের এই হেলিকপ্টার যে-সে জিনিস নয়। বডিটা আর্মার-প্লেটেড; জানালা আর উইণ্ডশিল্ডে যে-প্লেক্সিগ্লাস দেখছেন, ওগুলোও বুলেটপ্রুফ। না হলেও ক্ষতি ছিল না। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ একশ' সাতাশ মাইল স্পিডে ছুটতে পারে এটা, এই গতির একটা কপ্টারে গুলি লাগানো খুব কঠিন। রীতিমত অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফট গান লাগবে। ধাওয়া করেও সুবিধে করতে পারবে না। টানা তিন ঘণ্টা উড়তে পারি আমরা, ফিউয়েল শেষ হবার আগেই সাড়ে তিনশ' মাইল চলে যেতে পারব।'

'যদি রকেট ছোঁড়ে?' সন্দেহ দূর হচ্ছে না ড. সিদ্দিকীর।

'তেমন কোনও ঝুঁকি দেখলে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় চলে যেতে পারব,' হাসল জাকির। 'দেখতেই পাবে না, রকেট তাক করবে কীভাবে?'

'বুঝতেই পারছেন—ভয়টা অমূলক,' রানা যোগ করল। 'অত্যন্ত সফিসটিকেটেড কপ্টার এটা, স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার করে। আমরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, ওদের অনেক কাজ বিনে পয়সায় করে দিয়ে নিজেদের জন্যে একটা জোগাড় করেছি।'

'কী জানি!' সিটে হেলান দিলেন সিদ্দিকী। 'মনে সাহস পাচ্ছি না কিছুতেই।'

'দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে মনটা খালি করে ফেলুন। তা হলেই দেখবেন ভয় কেটে যাচ্ছে। অটোসাজেশন কীভাবে দিতে হয়, জানেন তো? এ-ধরনের পরিস্থিতিতে খুব কাজে লাগে ওটা।'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন সিদ্দিকী, তারপর চোখ মুদে ফেললেন।

খানিক নীরবতা বিরাজ করল ককপিটে। শেষে নিউয়ার্কে কী ঘটেছে, সেটা জানতে চাইল জাকির। ফিরে গিয়ে ওকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট পাঠাতে হবে ঢাকায়।

সব খুলে বলল রানা। নতুন ড্রাগের কথা, ড্রাগলর্ড মিগুয়েল সান্টানার কথা, ওদের উপর হামলার বিবরণ... সব। ওর কথা শেষ হলে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জাকির। বলল, 'হাইডআউটের খোঁজ ব্যাটারা পেল কী করে?'

'অনেকভাবেই পেতে পারে,' রানা আন্দাজ করল। 'ডক্টর সিদ্দিকীর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টে খুঁত ছিল হয়তো। দু'সপ্তাহ ছিলেন ওখানে, এর মধ্যে খাবার-দাবার কিনতে দু'একবার বাইরে গেছেন নিশ্চয়ই। তখনই হয়তো চোখে পড়ে গেছেন।'

'হুম, সেটাই হবে বোধহয়,' বলে উঠলেন ড. সিদ্দিকী। 'গত পরশু ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলাম আমি, ফার্মেসিতে কয়েকটা লোক কেমন দৃষ্টিতে যেন তাকাচ্ছিল আমার দিকে।'

'ছদ্মবেশ নিয়ে যাননি?'

'চেহারা কীভাবে পাল্টাতে হয়, তার কিছুই জানি না আমি।'

'কপাল ভাল আপনার,' জাকির বলল। 'এত বড় একটা ভুল করার পরও বেঁচে আছেন!'

'মি. রানার কল্যাণে,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন সিদ্দিকী। 'সত্যি, আপনি একেবারে ঠিক সময়মত হাজির ছিলেন আমার পাশে। কীভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব...'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না, আপনারই মত আমিও একজন বাঙালী,' রানা বলল। আগামীতে আর একটু সাবধান থাকবেন, তা হলেই হবে। ট্রেইনিঙের সময় কিছু নিয়ম শিখিয়ে দেব, ওগুলো মেনে চললে সহজে নজর এড়াতে পারবেন সবার।'

'ট্রেইনিং!'

'হ্যাঁ। রিলোকেশনের আগে সাবজেক্টদের একটা ছোটখাট কোর্স করতে হয়—নতুন পরিচয়ে অভ্যস্ত হতে, সেই সঙ্গে সতর্কতামূলক কিছু টেকনিক শেখার জন্যে। আপনাকেও করতে হবে ওটা।'

'কোথায় হবে এই ট্রেইনিং?'

'কোথায় আবার,' হাসল রানা, 'যেখানে আপনি যাচ্ছেন... সেই সেফ-সাইটে!'

হাডসন রিভার ধরে দুইশ' মাইল উত্তরে গেল হেলিকপ্টার, পেরিয়ে গেল একের পর এক নদীতীরবর্তী জনপদ আর ছোট ছোট শহর। কিংস্টন পেরুতেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো দিগন্তবিস্তৃত ক্যাটস্‌কিল পর্বতমালা আর পাদদেশের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। সন্ধে নেমে এসেছে ইতিমধ্যে, আকাশের গায়ে ঠায় দাঁড়ানো পাহাড়কে মনে হচ্ছে পৌরাণিক কোনও দৈত্য। নীচে জঙ্গল নয়, যেন মুঠো মুঠো অন্ধকার ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সাদাটে এক চিলতে শূন্যতা... আসলে ওগুলো পাহাড়ি উপত্যকা। উপর থেকে পরিবেশটা ভৌতিক ঠেকছে।

খানিক পরেই ভুরু কুঁচকে গেল রানার। উত্তর দিকের একটা রিজের আড়াল থেকে পাক খেয়ে উঠছে ধোঁয়া, লালচে আভাও দেখা যাচ্ছে। জাকিরের কাঁধে টোকা দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল ও।

'ড্রাই স্প্রিং ওটা,' বলল জাকির, 'বজ্রপাতে আগুন ধরেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কমিউনিকেশন শুনতে পাচ্ছি রেডিওতে। চিন্তার কিছু নেই, মাসুদ ভাই। আগুনটা ছোট, ওরা মোটামুটি

নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে। এদিকে প্রায়ই ঘটে এমনটা।'

আর পাঁচ মিনিট পরেই ও ঘোষণা করল, 'লোকেশনে পৌঁছে গেছি, মাসুদ ভাই।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের আশপাশে আর কোনও এয়ারক্র্যাফট আছে?'

অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে সজ্জিত হেলিকপ্টারে একটা শক্তিশালী রেইডার সিস্টেমও আছে। ওটার ডিসপ্লেতে চোখ বোলাল জাকির। বলল, 'জী না, মাসুদ ভাই।'

'গুড, তা হলে নামতে শুরু করো।'

জানালা দিয়ে নীচে উঁকি দিলেন ড. সিদ্দিকী—ছোট্ট একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে, ফার গাছে ভর্তি। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। বিস্মিত গলায় তিনি বললেন, 'নামছেন কোথায়? ওখানে তো জায়গাই নেই!'

জবাব দিল না জাকির, কপ্টারটাকে ল্যাণ্ড করাতে ব্যস্ত ও। আনুভূমিকভাবে নীচে নামতে শুরু করেছে যান্ত্রিক ফড়িংটা।

'করছেন কী!' শঙ্কিত গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'গাছের সঙ্গে বাড়ি খাবেন তো!'

'তা-ই?' হেসে উঠল জাকির। কনসোলের একটা বোতাম টিপে বলল, 'এবার নীচে তাকান তো।'

হঠাৎ নড়ে উঠতে দেখা গেল গাছপালার একটা অংশকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ড. সিদ্দিকী দেখলেন, প্রায় ত্রিশ বর্গগজ জায়গা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে... সেখানটায় উঁকি দিচ্ছে ধূসর রঙের কংক্রিট। কিছু বুঝতে না পেরে মুখ তুললেন তিনি, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে।

'অত্যন্ত সফিসটিকেটেড একটা ক্যামোফ্লাজ নেট ওটা,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'উপর থেকে দেখতে গাছপালার মত মনে

হয়। একেবারে কাছে না গেলে টেরই পাবেন না কিছু।'

'ইম্প্রেসিভ!' স্বীকার করলেন বিজ্ঞানী।

কংক্রিটের ল্যাণ্ডিং প্যাডে এসে নামল কপ্টার, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জাকির। সিটবেল্ট খুলে নেমে এল ওরা তিনজন। বামদিকের কয়েকটা গাছের আড়ালে একটা কন্ট্রোল প্যানেল আছে, ওটার দিকে এগিয়ে গেল জাকির। সুইচ টেপার আগে একটু অপেক্ষা করল—ইঞ্জিন বন্ধ হলেও এখনও কপ্টারের পাখাগুলোর ঘূর্ণন থামেনি। ওগুলো পুরোপুরি স্থির হবার আগে ল্যাণ্ডিং প্যাড ঢাকবার চেষ্টা করলে ডাউনড্রাফট ক্যামোফ্লাজ নেটটাকে ব্লেডের উপর টেনে এনে ফালি ফালি করে দিতে পারে।

একটু পরেই সুইচ টিপল জাকির। মোটরের মৃদু গুঞ্জন উঠল, ল্যাণ্ডিং প্যাড আর হেলিকপ্টারটা ঢাকা পড়ে যেতে শুরু করেছে। মোটরাইজড্ পোলের ডগায় আটকানো আচ্ছাদনটা ফিরে আসছে খোলা জায়গায়, মাথার উপর থেকে আড়াল করে দিচ্ছে আকাশকে।

'রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমেও অপারেট করা যায় নেটটা,' ফিরে এসে ড. সিদ্দিকীকে বলল জাকির। 'কপ্টারের ভিতরে সুইচ আছে, ওটা দিয়েই খুলেছিলাম তখন। রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমটার সঙ্গে আবার একটা অটোমেটিক সেন্সর আছে। ওটার সাহায্যে শীতকালে মাঝে মাঝে আপনাআপনিই খোলে আর বন্ধ হয় এই নেট—তুষারের ভারে যাতে ছিঁড়ে না পড়ে, সেজন্যে। ল্যাণ্ডিং প্যাডের কংক্রিটে হিটিং কয়েল আছে, তুষার গলিয়ে ফেলে। তাই হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করাতে অসুবিধে হয় না।'

'এতসব আয়োজন কীসের জন্য?' জিজ্ঞেস করলেন

সিদ্দিকী।

'আপনার মত কেস হ্যাণ্ডেল করবার জন্যে,' হেসে বলল রানা। 'এটা আমাদের সেফ-সাইট। কাউকে লুকানোর জন্য এরচেয়ে ভাল জায়গা আর দ্বিতীয়টি নেই।'

'এখানেই থাকতে হবে আমাকে বাকি জীবন?' ভুরু কোঁচকালেন বিজ্ঞানী।

'না, না। এখানে থাকবেন কেন? এটা আপনার সাময়িক আশ্রয়।'

দু'বছর আগে, এফবিআই যখন রানা এজেন্সিকে *উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রাম*-এ অন্তর্ভুক্ত করল, তখনই দেখা দিয়েছিল প্রয়োজনটা। রিলোকেশনের আগে সাবজেক্টদের কিছুদিন এজেন্সির দায়িত্বে রাখতে হয়—নতুন কাগজপত্র তৈরি, সেই সঙ্গে সাবজেক্টদের নতুন চেহারা ও পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। ওদের পুরনো সেফ-হাউসগুলো এ-কাজের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত ছিল না। তাই নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য সভ্যতাবিবর্জিত, বিরান এলাকায় একটা নতুন সেফ-সাইট দরকার হয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্যাটস্‌কিল পর্বতমালার পাদদেশের এ-জায়গাটা লিজ নেয়া হয়েছে। এটার সঙ্গে রানা এজেন্সির কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাবে না কেউ, লিজটা নেয়া হয়েছে অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের নামে। লোকেশনটাও চমৎকার—প্রায় একই চেহারার আরও বেশ কয়েকটা উপত্যকা রয়েছে আশপাশে, সেফ-সাইটটার পিনপয়েন্ট লোকেশন বের করা সহজসাধ্য নয়। ক্যামোফ্লাজ নেটের কারণে সাইটটা অদৃশ্যও থাকে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়ার পথ রয়েছে, তবে নিতান্ত বাধ্য না-হলে ওটা ব্যবহার করা হয় না। চলাচলের চিহ্ন দেখে যাতে সাইটের

খোঁজ পাওয়া না যায়, তাই এ সতর্কতা। সাধারণত হেলিকপ্টারই ব্যবহার করা হয় যাতায়াতের জন্য, সেটাও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। অত্যাধুনিক রেইডারের মাধ্যমে আগে নিশ্চিত করা হয়—আশপাশে অন্য কোনও এয়ারক্র্যাফট আছে কি না। কেবলমাত্র ক্যামোফ্লাজ নেটের অস্তিত্ব ফাঁস হবার আশঙ্কা না থাকলেই ল্যাণ্ড করে হেলিকপ্টার।

ল্যাণ্ডিং প্যাডের এক পাশ থেকে চারজন মানুষকে উদয় হতে দেখা গেল হঠাৎ। তিন হেলিকপ্টার আরোহীর সামনে এসে থামল তারা, অভিবাদন জানাল।

'কেমন আছ তোমরা, মনসুর?' হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল, মাসুদ ভাই,' প্রত্যুত্তর দিল মনসুর আহমেদ। ও উইটনেস প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট টিমের লিডার। রানার নিজের হাতে গড়া এজেন্ট ও। 'অনেক দিন পর দেখা হলো আপনার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ। এসো পরিচয় করিয়ে দিই।' বিজ্ঞানীকে দেখাল ও। 'ইনিই ড. আন্দালিব সিদ্দিকী—তোমাদের নতুন সাবজেক্ট। ডক্টর, এ হচ্ছে মনসুর আহমেদ—আমাদের স্পেশালিস্ট টিমের লিডার।' বাকিদের দেখাল এবার। 'মারুফ আজাদ, সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। রফিক নওশাদ আর শাহরিয়ার আলম—টিম মেম্বার।'

একে একে সবার সঙ্গে হাত মেলালেন ড. সিদ্দিকী। বললেন, 'চমৎকার সেটআপ আপনাদের। বিশেষ করে ক্যামোফ্লাজটার তো জবাব নেই।' উপরদিকটা দেখালেন তিনি।

'এগুলো সব আসলে মাসুদ ভাইয়ের আইডিয়া,' বলল মনসুর। 'এই সাইটের খুঁটিনাটি সব উনিই ঠিক করেছেন।'

'আগেই অনুমান করা উচিত ছিল আমার,' হাসলেন সিদ্দিকী। 'তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হেলিকপ্টারটা নাহয় খালি চোখে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু হিট সিগনেচার লুকানোর কী ব্যবস্থা করেছেন আপনারা?'

'আপনি হিট সিগনেচার সম্পর্কে জানেন?' একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল মনসুর।

'অবশ্যই। এ তো পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্র—সব বস্তুই তাপ বিকিরণ করে। ইনফ্রা-রেড সেন্সরে ধরা পড়ে সেটা। সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট নিয়ে যদি একটা এয়ারক্র্যাফট কাছাকাছি চলে আসে, তা হলে তো আপনাদের হেলিকপ্টারটাকে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবে। ক্যামোফ্লাজ নেট কোনও কাজে আসবে না।'

'আপনি হাইটেক মিলিটারি ইকুইপমেন্টের কথা বলছেন, ডক্টর,' রানা বলল। 'আপনার শত্রু... মানে, কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ডের কাছে ওই জিনিস থাকার কথা নয়।'

'তারপরেও... একটা ডিফেন্সিভ সিস্টেম থাকা ভাল না?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আপনি কি মিলিটারি অ্যাসল্টের আশঙ্কা করছেন? সেক্ষেত্রে এই সাইট পাল্টে অন্য কোথাও যেতে হবে আমাদের।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বললেন সিদ্দিকী। 'আমি স্রেফ সিকিউরিটির খুঁত আছে কি না, সেটা জানার চেষ্টা করছি।'

'আমাদের সিকিউরিটি নিখুঁত—এ দাবি করব না। আসলে টোটাল সিকিওর্ড লোকেশন বলে কিছু নেই, ডক্টর,' বলল রানা। 'এমনকী শাইয়েন মাউন্টেনে আমেরিকানদের মিলিটারি কমাণ্ড সেন্টারও পুরোপুরি নিরাপদ নয়। জায়গামত একটা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটালে পুরো পাহাড়টাই উড়ে যাবে।'

ঢোঁক গিললেন সিদ্দিকী। 'কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়? আপনি কি ভয় দেখাতে চাইছেন আমাকে?'

'মোটেই না,' রানা বলল। 'একটা উদাহরণ দেয়া হলো মাত্র। ওই নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটানো সহজ কাজ নয়, এ-কারণেই শাইয়েন মাউন্টেনকে নিরাপদ ধরা হয়। আমাদের এই সাইট-ও ওই অর্থে নিরাপদ, কারণ মিগুয়েল সান্টানার পক্ষে হাইটেক মিলিটারি ইকুইপমেন্ট জোগাড় করে হামলা চালানো সম্ভব নয়।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী। মনে হলো, পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হতে পারেননি তিনি।

'বাকি কথা ভিতরে গিয়ে বললে কেমন হয়?' মনসুর বলল। 'এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ, চলো।'

'ভিতরটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

উপত্যকার পশ্চিম ধারে গাছে ছাওয়া পাহাড়ি ঢাল দেখাল মনসুর। 'ওখানে... পাহাড়ের ভিতরে আমাদের বাঙ্কার হাউস। সামরিক হামলা হলেও চিন্তার কিছু নেই, সার। ছোটখাট বোমাবর্ষণ ঠেকাতে পারে ওটা।' হাসল ও।

'অ্যাঁ!' ড. সিদ্দিকীর চোখে বিস্ময় ফুটল। 'এতক্ষণ তা হলে আপনারা ভয় দেখালেন কেন আমাকে?'

'ভয় কোথায় দেখালাম?' রানা হাসছে। 'আপনি নিজেই তো ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন।'

মুখ গোমড়া করে ফেললেন সিদ্দিকী।

'আপনারা যান,' জাকির বলল। 'আমি হেলিকপ্টারটার রি-ফিউয়েলিং সেরে আসছি। মারুফ, সাহায্য করবে আমাকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল প্রোটেকশন টিমের সেকেণ্ড ইন

কমাণ্ড। বিজ্ঞানীকে নিয়ে মনসুরকে অনুসরণ করল রানা। অন্যেরা রইল পিছনে।

'এখানে ফিউয়েল পাচ্ছেন কোত্থেকে?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

'একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড-ট্যাঙ্ক আছে,' পিছন থেকে জবাব দিল রফিক। 'ছ'মাস পর পর রিফিল করা হয়। হেলিকপ্টারই যেহেতু এখানে যাতায়াতের মূল বাহন, ফিউয়েল না রাখলে চলে না।'

নীরব হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ত্রিশ ফুটের মত উঠল ওরা, ওখানে ঝোপঝাড় আর বোল্ডারের আড়ালে একটা কংক্রিটের তৈরি প্যাসেজওয়ে রয়েছে। সঙ্গীদের নিয়ে প্যাসেজের শেষপ্রান্তে একটা ধাতব দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মনসুর। পাশেই দেয়ালে একটা ইলেকট্রনিক নাম্বার প্যাড রয়েছে, ওটায় দ্রুত কয়েকটা সংখ্যা চাপল ও।

মৃদু শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। ওপাশে আরেকটা প্যাসেজ... আধো-অন্ধকারে ঢাকা। ভিতরে পা রাখতেই হালকা সুরে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করল। বিভ্রান্ত দেখাল ড. সিদ্দিকীকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যালার্ম কেন?'

'যাতে কেউ চুপি চুপি এখানে ঢুকে পড়তে না পারে,' হেসে জানাল মনসুর। 'ডোরওয়েতে মোশন সেন্সর আছে, কেউ ঢুকলেই অ্যালার্ম বাজিয়ে ভিতরের লোকজনকে সতর্ক করে দেয়। পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে অ্যালার্মটা নিষ্ক্রিয় করা না হলে অনুপ্রবেশকারীকে ঠেকানোর জন্য পুরো প্যাসেজটা নকআউট গ্যাসে ভরে যাবে।'

ভিতরদিককার দেয়ালে বসানো দ্বিতীয় একটা নাম্বার-প্যাডে

কোড চাপল ও। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল অ্যালার্মের উৎপাত। একই সঙ্গে জ্বলে উঠল একটার পর একটা বাতি।

মুগ্ধতা ফুটল ড. সিদ্দিকীর চোখে। বললেন, 'সত্যি, আপনারা কাজ জানেন বটে!'

এগারো

প্যাসেজ ধরে ধীরে ধীরে এগোল পাঁচজনে—সবার সামনে মনসুর, ওকে অনুসরণ করল রানা, ড. সিদ্দিকী, রফিক আর শাহরিয়ার। ডানদিকে বাঁক নিয়ে বড়-সড় একটা লিভিং এরিয়ায় পৌঁছুল ওরা। জায়গাটা সুন্দর; ফ্লোরটা পালিশ-করা ওক কাঠের, সুসজ্জিত ফার্নিচারগুলো দামি চামড়া-মোড়া। চারপাশের অফ-হোয়াইট দেয়াল জায়গায় জায়গায় ঢাকা পড়েছে বুকশেলফ, ইম্প্রেশনিস্ট পেইন্টিং, আর নানা ধরনের ফটোগ্রাফে। একপাশে বড় একটা ফায়ারপ্লেসও আছে।

'দারুণ জায়গা!' প্রশংসার সুরে বললেন ড. সিদ্দিকী। 'বাঙ্কারের কথা শুনে যা ভেবেছিলাম, তার সঙ্গে একটুও মিলছে না।'

'শুধু সৌন্দর্যই দেখলেন?' হাসল রানা। 'আর দশটা সাধারণ বাঙ্কারের চেয়ে কয়েকগুণ উন্নত এটা। মনসুর, শোনাও ওঁকে।'

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীর দিকে ফিরল প্রোটেকশন টিম-লিডার। 'বাঙ্কারটা রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিটের তৈরি,' লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ও। 'বানানো হয়েছে পাহাড়ের চল্লিশ ফুট ভিতরে। স্ট্রাকচারটা ইন্সুলেটেড, এর ফলে শীত-গ্রীষ্ম সবসময়েই ভিতরটায় বাহাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা বিরাজ করে। সোলার প্যানেল আর ব্যাটারির মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাই আমরা, ইমার্জেন্সির জন্য ব্যাকআপ জেনারেটরও রয়েছে। বাঙ্কারের নীচে একটা কুয়ো রয়েছে, ওখান থেকে আসে বিশুদ্ধ পানি—বাইরে থেকে কেউ বিষ মিশিয়ে দিতে পারবে না। উপরদিকে একটা ভেন্টিলেশন শাফট আছে, ওটার সাহায্যে বাতাস আর সূর্যের আলো আসে। সূর্যের আলোটা আমরা আয়নার সাহায্যে ভিতরেও ব্যবহার করতে পারি।'

'হুম, অত্যন্ত এনার্জি-এফিশিয়েন্ট ব্যবস্থা দেখছি!' মন্তব্য করলেন ড. সিদ্দিকী। 'কিন্তু কোনও কারণে যদি শাফটটা বন্ধ হয়ে যায়, বাতাস পাবেন কীভাবে?'

'কার্বন-ডাই-অক্সাইড রি-সাইক্লিঙের একটা ছোট প্ল্যান্ট রয়েছে ভিতরে... ইমার্জেন্সির জন্য।'

'সেটা নিশ্চয়ই বিদ্যুতে চলে? আপনাদের এন্ট্র্যান্সও তো ইলেকট্রনিক। যদি সোলার পাওয়ার আর ব্যাকআপ জেনারেটর... দুটোই ফেল করে, তা হলে ফাঁদে পড়ে যাবেন না?'

এবার মুখ খুলল রানা। 'তাতেও সমস্যা নেই। ঢোকার দরজাটা ম্যানুয়ালি অপারেট করা যায়। এ ছাড়া একটা ইমার্জেন্সি একজিটও রয়েছে।'

'কোথায়?'

আঙুল তুলে লিভিং এরিয়ার অপরপ্রান্তে দ্বিতীয় একটা

দরজা দেখাল ও। বলল, 'সিকিওর্ড একজিট বলতে যা বোঝায়, দরজাটা তা-ই। ওটা ব্যবহার করে ঢুকতে পারবে না কেউ, কারণ বাইরে থেকে খোলার কোনও উপায় নেই ওটা, ওপাশে হাতল-টাতল কিচ্ছু নেই। খোলা-বন্ধ... সব ভিতর থেকে করতে হয়।'

'আরিব্বাপ! অ্যারেঞ্জমেন্ট তো দেখছি খুবই চমৎকার,' মন্তব্য করলেন ড. সিদ্দিকী। 'একটু স্বস্তি পাচ্ছি আমি এখন।'

'এখনও উত্তেজিত হয়ে আছেন তো!' বলল রানা। 'খাওয়াদাওয়া করে একটা ঘুম দিন, জেগে ওঠার পর দেখবেন শুধু স্বস্তি আর স্বস্তি।'

হেসে ফেললেন বিজ্ঞানী। 'কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমার খিদেও পেয়েছে।'

পিছনদিকে ফিরল রানা। 'শাহরিয়ার, রান্নাবান্না কি এখনও তুমিই করছ?'

'না করে উপায় আছে?' কপট রাগের সুরে বলল শাহরিয়ার আলম। 'আপনি তো একজন রাঁধুনি রাখবার পারমিশন দিচ্ছেন না! কোন্ দুঃখে যে মায়ের কাছ থেকে রান্নাবান্নায় হাতেখড়ি নিয়েছিলাম...'

'ওকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, মাসুদ ভাই,' পাশ থেকে বলে উঠল রফিক। 'রান্নাবান্নার অভ্যেস থাকাটা ভাল। বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেলেও না-খেয়ে মরতে হবে না।'

'এই অভ্যেসটা তোদের থাকার দরকার নেই?' কোমরে হাত রেখে বলল শাহরিয়ার। 'নাকি ভাবছিস, তোদের বউ কখনও বাপের বাড়ি যাবে না?'

'গেলে যাবে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রফিক। 'তখন তুই

আমাদের রেঁধে খাওয়াবি!'

'কী-ই-ই!'

সমস্বরে হেসে উঠল সবাই।

রানা বলল, 'এই সমস্যার সমাধান এখুনি করে দিচ্ছি। রফিক, আগামী কয়েকদিন তুমি শাহরিয়ারের সঙ্গে অ্যাসিসটেণ্ট শেফ হিসেবে থাকবে। ঠিক আছে?'

'ইয়াল্লা, রিফিউয়েলিঙের জন্য জাকির ভাই আমাকে ডাকলেন না কেন?' কপাল চাপড়াল রফিক।

আবার হাসল সবাই। মনসুর বলল, 'সমাধান তো হয়েই গেল। শাহরিয়ার, জলদি ডিনারের ব্যবস্থা করো।'

ড. সিদ্দিকীর দিকে তাকিয়ে শাহরিয়ার জানতে চাইল, 'সার, আপনার খাওয়াদাওয়ায় কোনও বাছবিচার আছে? মানে... কোনও কিছুতে অ্যালার্জি, বা শুধু ভেজিটেরিয়ান...'

'চিন্তার কিছু নেই,' স্মিত হেসে বললেন সিদ্দিকী। 'আমি সবই খাই।'

'ঠিক আছে, তা হলে আধ ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। আজ আপনাকে ভুনা-খিচুড়ি খাওয়াব।' রফিকের দিকে ফিরল শাহরিয়ার। 'এই যে অ্যাসিসটেণ্ট, দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে।'

'আপনি এগোন, জাঁহাপনা!' সকৌতুকে বলল রফিক।

হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চলে গেল ওরা। ড. সিদ্দিকীকে লিভিং এরিয়ার পাশের একটা করিডর দেখাল মনসুর। বলল, 'হাতের বাঁয়ে দু'নম্বর দরজাটা আপনার কামরার। যান, গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি আর মাসুদ ভাই আপনার দু'পাশের কামরায় থাকব। কোনও সমস্যা হলেই ডাকবেন।'

নিজের কভারঅল দেখালেন বিজ্ঞানী, আঁটসাঁট হয়েছে

ওটা। 'এটা পরে ঠিক আরাম পাচ্ছি না, অন্য কোনও পোশাক পেলে ভাল হত।'

'ক্লজিটে বিভিন্ন সাইজের কাপড় রাখা আছে,' বলল মনসুর। 'একটা না একটা ঠিকই লেগে যাবে। কষ্ট করে আজকের রাতটা ওই কাপড়ে কাটিয়ে দিন। কাল আপনার জন্যে নতুন পোশাক-আশাক আনিয়ে নেব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ড. সিদ্দিকী। তাঁর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা। ভদ্রলোক রুমের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতেই মনসুরকে বলল, 'কমিউনিকেশন রুমে যাচ্ছি আমি। ঢাকায় কথা বলতে হবে।'

'ওঁর ব্যাপারে ব্রিফ করবেন না আমাদের?' জিজ্ঞেস করল মনসুর। 'কী ধরনের ট্রেইনিং দিতে হবে, নতুন পরিচয় কী ধরনের হবে... এসব না জানলে অন্তরাকে কাগজপত্র তৈরি করতে বলব কীভাবে?'

রানা এজেন্সির উইটনেস প্রোটেকশন টিমের পঞ্চম সদস্য অন্তরা আশরাফ—ফর্জারি বিশেষজ্ঞ। তবে ওর এই পরিচয় অল্প কিছু লোক ছাড়া আর কেউ জানে না। অলব্যানিতে থাকে ও, সাধারণ একজন আর্টিস্টের কাভার নিয়ে। আসলেই একজন প্রতিভাবান শিল্পী ও, বয়েস মাত্র বাইশ। বাবা-মা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, সড়ক-দুর্ঘটনায় একটা পা হারানোর পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। অভাব-অনটন সইতে না পেরে অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে পড়েছিল মেয়েটি—বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের পেইন্টিং নকল করে বিক্রি করতে শুরু করেছিল। আড়াই বছর আগে এ-ধরনের একটি নকল তৈলচিত্রের কেস তদন্ত করতে গিয়ে ওর খোঁজ পায় রানা। ধরা পড়ে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা ওকে জানায় অন্তরা, আয়-রোজগারের

অন্য কোনও পথ না থাকায় এ-পথে নেমেছে সে। সব শোনার পর রানা বুঝতে পারে, আসলে মেয়েটি জাত-ক্রিমিনাল নয়, পরিস্থিতির শিকার। পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে তাই ওকে পাল্টা প্রস্তাব দেয় রানা—ইচ্ছে করলে ওর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে যোগ দিতে পারে ও। রাজি হয়ে যায় অন্তরা। প্রাথমিকভাবে পেইণ্টিং-ফর্জারি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ শুরু করে ও, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সব ধরনের জালিয়াতির বিষয়ে ওর একটা সহজাত দক্ষতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। জাতশিল্পী ও, সহজেই যে-কোনও জিনিস নকল করতে পারে, যে-কারও জালিয়াতি ধরতেও পারে। দু'বছর আগে উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রামে রানা এজেন্সি অন্তর্ভুক্ত হবার পর রানা ওকে স্পেশালিস্ট-টিমের মেম্বার করে দিয়েছে, এখন ও সাবজেক্টদের নতুন কাগজপত্র তৈরি করে। কাজটা এত নিখুঁত হয় যে, বড় বড় বিশেষজ্ঞও ওর জালিয়াতি ধরতে পারে না। ইচ্ছে করেই ওকে আড়ালে রেখেছে রানা, কোথাও ওর সত্যিকার পেশা প্রকাশ হতে দেয়নি। রিলোকেটেড সাবজেক্টদের নতুন নাম-পরিচয় খুঁজে বের করার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে, ফর্জারকে কবজা করা। শত্রুরা যাতে তা না করতে পারে, তাই এ সতর্কতা।

অন্তরার নাম শুনে চকিতে সব মনে পড়ে গেল রানার। মনসুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসব ডিটেইলস্ অন্তরাকে পরে দিলেও চলবে। আসলে ড. সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত বিষয়ে আসলে আমি নিজেও তেমন কিছু জানি না। আজ বিশ্রাম নিক, কাল ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিকঠাক করে নেয়া যাবে।'

'আপনি যা বলেন,' শ্রাগ করল মনসুর।

ওঁকে লিভিং এরিয়ায় রেখে কমিউনিকেশন রুমে চলে এল

রানা। অ্যাকোমোডেশন এরিয়ার উল্টোদিকের একটা করিডর ধরে যেতে হয় ওখানে। রুমটা বেশি বড় নয়, তবে গোপনীয়তা বজায় রেখে যোগাযোগের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ভিতরে। দুটো ভিএইচএফ রেডিও সেট রয়েছে, স্ক্র্যাম্বলড্ টেলিফোন লাইন রয়েছে তিনটে, ইন্টারনেট কমিউনিকেশনের জন্য একটা কম্পিউটারও রয়েছে। কম্পিউটারটায় রিলোকেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যও রাখা হয়।

একটা টেলিফোন সেটের রিসিভার তুলে নিল রানা, ডায়াল করল সরাসরি বিসিআই চিফের প্রাইভেট নাম্বারে। কয়েকবার রিং হলো, জবাব আসছে না। বাংলাদেশে এখন ভোর, চিফ ঘুমাচ্ছেন কি না সন্দেহ হলো ওর। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পরে ট্রাই করবে ভাবতেই রিসিভ করা হলো কলটা।

'ইয়েস?' যথারীতি ভরাট, গুরুগম্ভীর কণ্ঠ। ঘুমজড়িত জড়তার লেশমাত্র নেই মেজর জেনারেল রাহাত খানের মধ্যে, সম্পূর্ণ সজাগ তিনি।

'রানা, সার।'

'হ্যাঁ, বলো। কী খবর?'

কোনোরকম ভূমিকায় গেল না, সংক্ষেপে ড. সিদ্দিকীকে উদ্ধার করে আনার পুরো ঘটনা বর্ণনা করল রানা। শুনে একটু চুপ রইলেন চিফ। তারপর বললেন, 'কী বুঝলে তুমি পুরো ব্যাপারটা থেকে?'

'কোথাও কিছু গলদ আছে, সার,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছি না আমি। এতসব সংস্থা থাকতে ওঁকে ডি.ই.এ-তে কেন নিয়োগ দেয়া হবে? তাও কি না মানব-কল্যাণমূলক একটা গবেষণায়? ড্রাগ-অ্যাডিকশনের চিরস্থায়ী প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে! এ বিশ্বাস হয় না,

সার। আমেরিকানদের খুব ভাল করে চিনি আমরা। ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর মত প্রতিভাকে জঘন্য কোনও গবেষণায় ব্যবহার করার কথা ওদের। তাঁকে দিয়ে এমন কোনও জিনিস আবিষ্কার করানোর কথা, যা দিয়ে বাকি দুনিয়ার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারে ওরা।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও বলছে, তিনি মিলিটারির হয়ে কাজ করতেন গত বছর পর্যন্ত।'

'আরও অসঙ্গতি আছে, সার,' রানা বলল। 'যদি ওঁর কথা সত্যি বলে মেনেও নিই, তারপরও মিলছে না অনেক কিছু। ডি.ই.এ-তে কলাম্বিয়ানদের চর থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্যেরা তাঁকে জানপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে না। গত দশ বছরে কয়েকবার প্রমাণ পেয়েছি আমরা, আমেরিকানরা যে-কোন মূল্যে ড. সিদ্দিকীকে হাতে রাখতে চায়। এর জন্যে প্রয়োজনে কলাম্বিয়ানদের আট-দশজন চরকে খতম করে দেবে ওরা। অথচ তিনি কি না ওদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না! কলাম্বিয়ানদের ব্যাপারটাও গোলমেলে। হামলাকারীদের জনা কয়েকের চেহারা দেখেছি আমি, একজন ফোনে কথাও বলেছে আমার সঙ্গে—কাউকেই কলাম্বিয়ান বলে মনে হয়নি আমার।'

'ওটা তেমন বড় কোনও ব্যাপার নয়,' রাহাত খান বললেন। 'ওরা ভাড়াটে হতে পারে। তবে হ্যাঁ... গোলমাল যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। ড. সিদ্দিকী এখন কোথায়?'

'আমাদের সেফ-সাইটে। ওঁকে রিলোকেট করার কাজটা শুরু করব কি না, এ-ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, সার। ভদ্রলোকের যুক্তি-তর্ক একদম বিশ্বাস হয়নি আমার। উনি

আমেরিকায় বসে... তার ওপর আবার গা-ঢাকা দিয়ে বাংলাদেশের উপকারে কাজ করে যাবেন, এটা অবাস্তব। পরে যদি পিঠ ফিরিয়ে নেন, আমাদের কিছুই করার থাকবে না।'

একটু ভাবলেন চিফ। তারপর বললেন, 'লোকটা আসলেই সিদ্দিকী কি না, সেটাও শিয়োর হওয়া প্রয়োজন...'

'ব্যাপারটা আমার মাথায় আছে, সার। আজ রাতের ভিতরেই ফিঙ্গারপ্রিণ্ট জোগাড় করে আমাদের ফাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।'

'গুড। এমনিতে কেমন দেখলে লোকটাকে?'

'স্মার্ট। বিপদে পড়ে ভয় পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ঘাবড়ে যাননি। আমার কথামত প্রতিটা কাজ করেছেন। তা ছাড়া চিন্তা-ভাবনা খুব পরিষ্কার; প্রশ্ন করেন প্রচুর... শেখার আগ্রহ আছে, খুঁটিনাটি সবকিছুতেই কড়া নজর।'

'একজন জিনিয়াসের ক্ষেত্রে এসব অস্বাভাবিক নয়,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান।

'সত্যিই যদি ইনি আন্দালিব সিদ্দিকী হন, তা হলে কী করব, সার?'

'এখুনি ওকে হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আপাতত যা চায়, তা-ই করতে থাকো,' বললেন বিসিআই চিফ। 'ট্রেইনিং দাও ওকে, রিলোকেশনের প্রস্তুতি নাও। সঙ্গে চোখকান খোলা রাখো। বোঝার চেষ্টা করো, আসলে কী ঘটছে।'

'ইয়েস, সার!' অনুগত সৈনিকের মত বলল রানা।

'সিদ্দিকী যা যা বলেছে, সেগুলোও ভেরিফাই করে দেখো,' বললেন রাহাত খান। 'ওর ব্যাপারে ফাইনালি কিছু করবার আগে আবার যোগাযোগ কোরো।'

'ঠিক আছে, সার।'

'আর হ্যাঁ, সাবধানে থেকো।'

'থাকব, সার।'

লাইন কেটে দিলেন রাহাত খান।

দরজায় শব্দ হলো—জাকির উঁকি দিচ্ছে। 'আসব, মাসুদ ভাই?'

'এসো।'

'আমার ফিরে যাওয়া দরকার,' ভিতরে ঢুকে বলল জাকির। 'নিউ ইয়র্কে মেলা কাজ। এদিকটা মনসুর সামলাতে পারবে, আর আপনি তো আছেনই। তারপরও যদি চান...'

'না, না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাকে ওখানেই বেশি দরকার। চলে যাও। মারুফকে বলো হেলিকপ্টারে তোমাকে ড্রপ করে দিয়ে আসতে। আর হ্যাঁ, ডি.ই.এ-তে তোমার কোনও কণ্ট্যাক্ট থাকলে ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে একটু খোঁজ নিয়ো—সত্যিই তিনি ওদের হয়ে কোনও কাজ করছিলেন কি না।'

'খবর পাওয়া সহজ হবে না,' জাকির বলল। 'ভদ্রলোক তো গোপনে গবেষণা করছিলেন।'

'আসলেই করছিলেন কি না—সেটাই প্রশ্ন।'

ভুরু কোঁচকাল জাকির। 'আপনার সন্দেহ আছে?'

'আমার সন্দেহের কথা শুনে কাজ নেই। তুমি খবর নাও। ব্যাপারটা সত্যি হলে অন্তত কানাঘুষোর আকারে হলেও জানবে ওখানকার লোকজন।'

'ঠিক আছে। আর কিছু?'

'আর?' একটু ভাবল রানা। 'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম... ওয়্যারহাউসের ওখানে কিছু উদ্বাস্তু লোক সাহায্য করেছিল আমাদেরকে। ওদেরকে কথা দিয়েছি, আগামীকালের ভিতরেই

এক ট্রাকভর্তি খাবার আর গরম কাপড়চোপড় পাঠাব...'

'আর বলতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল জাকির। 'আমি গিয়েই ব্যবস্থা নেব।'

'আর পুরনো ওই সেডানটার বদলে নতুন একটা পাওয়া উচিত ওই ড্রাইভারের। ও নিজেই মালিক ছিল ওটার।'

'বুঝতে পেরেছি, মাসুদ ভাই।'

'থ্যাঙ্কস্,' হাসল রানা। 'যাও তা হলে। যোগাযোগ রেখো।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল জাকির।

বারো

পরদিন। ভোর ছ'টা।

লিভিং এরিয়ার সোফায় একাকী বসে আছে রানা, সামনের টেবিলের উপর রেখে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ওর সিগ-সাওয়ারটাকে, পরিষ্কার করছে ন্যাকড়া আর তেল দিয়ে। চোখের কোণায় নড়াচড়ার আভাস পেয়েই মুখ তুলে তাকাল ও, ড. সিদ্দিকী এসে ঢুকেছেন কামরায়, ফ্রি-সাইজের একটা গাউন পরে আছেন।

'কাউকে দেখছি না... সবাই কোথায়?' রানাকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।

'মনসুর কিছু জরুরি পেপারওয়ার্ক করছে,' রানা বলল। 'মারুফ কন্ট্রোল রুমে...'

'কন্ট্রোল রুম!'

'আপনার হাইডআউটের মত এখানেও বেশ কিছু সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে। তা ছাড়া আছে একটা রেইডার—অচেনা কোনও এয়ারক্র্যাফট আসে কি না, দেখার জন্যে। কন্ট্রোল রুম থেকে ওগুলো সব মনিটর করতে হয়।'

'ও, আচ্ছা! বাকি দু'জন?'

'রফিক গেছে হেলিকপ্টারের মেইনটেন্যান্স করতে, আর শাহরিয়ার ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে।'

খাবার রান্না হবার একটা লোভনীয় গন্ধ ভাসছে পুরো বাঙ্কারে, নাক উঁচু করে সেটা শুঁকলেন সিদ্দিকী। 'আমার আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। ভদ্রলোকের রান্নার হাত কিন্তু অসাধারণ, কালকের ভুনা-খিচুড়ির কথা জীবনেও ভুলতে পারব না...' বলতে বলতে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করে হাই তুললেন বিজ্ঞানী।

'ঘুম কেমন হয়েছে?' মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা।

ওর মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসলেন সিদ্দিকী। 'অবাক হবেন কি না জানি না... চমৎকার! যা একটা দিন গেছে গতকাল, আমি তো ভেবেছিলাম ঘুমই আসবে না। কিন্তু বিছানায় পিঠ ঠেকাবার পর কীভাবে যে সকাল হয়ে গেল, টেরই পাইনি।'

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়,' রানা বলল। 'নার্ভের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে আপনার। আর চাপ সহ্য করতে পারছিল না ওগুলো, এখানকার নিরাপদ পরিবেশ পেয়ে ঘুমের মাধ্যমে নিজেদের শান্ত করে নিয়েছে।'

'আপনি ঘুমিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিকী।

'হ্যাঁ, তবে আপনার মত অত লম্বা ঘুম দিতে পারিনি। অনেক কাজ ছিল।'

'এই অস্ত্র-পরিষ্কারের মত?' টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন সিদ্দিকী।

হাসল রানা। 'ব্যবহারের পর যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলতে হয় আগ্নেয়াস্ত্র, নইলে ইমার্জেন্সির সময় জ্যাম হয়ে যেতে পারে। আমি তো বেশ দেরিই করেছি। কাল রাতেই পরিষ্কার করা উচিত ছিল এটা। অন্য কাজ ছিল বলে সময় পাইনি।'

কাজগুলো কী, তা আর জানতে চাইলেন না সিদ্দিকী। শুধু বললেন, 'এত ব্যস্ত থাকছেন... আপনার নার্ভগুলোর কি শান্ত হবার প্রয়োজন হয় না?'

'হয়, তবে সময় লাগে অনেক কম,' বলল রানা। পিস্তল পরিষ্কার শেষ হয়েছে ওর, ন্যাকড়া দিয়ে বিভিন্ন টুকরোর গায়ে লেগে থাকা বাড়তি গান-অয়েল মুছে ফেলল, তারপর শুরু করল জোড়া দিতে। 'গতকালকের মত পরিস্থিতি প্রায়ই সামলাতে হয় আমাকে। এসবের সঙ্গে আমি পরিচিত। ওই যে... ইংরেজিতে যাকে বলে—*কণ্ডিশনড্।*'

'কণ্ডিশনড্?' ভুরু কোঁচকালেন বিজ্ঞানী।

জবাব দেয়ার আগে সিগ-সাওয়ারের স্লাইডে ব্যারেল বসাল রানা, সাবধানে ওটার ভিতরে ঢোকাল রিকয়েল-স্প্রিং আর গাইড রডটাকে। তারপর বলল, 'কাল আমি যা করেছি, সেটা শুধু দুঃসাহসের বশে নয়। সাহসের ভূমিকা কিছুটা ছিল হয়তো, কিন্তু মূল চালিকাশক্তি ছিল আমার ট্রেইনিং।'

'ভেঙে পড়তে থাকা একটা ক্যাটওয়াকের উপরে দাঁড়িয়ে

কীভাবে লড়াই করতে হবে—এটাও বুঝি শেখানো হয়েছে আপনাকে?' সিদ্দিকীর কণ্ঠে অবিশ্বাস।

হেসে ফেলল রানা। 'তা-ই কি শেখানো সম্ভব? আমাকে স্রেফ মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদ মোকাবেলার ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে। কোন্ পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটা ঠিক করি অভিজ্ঞতা আর উপস্থিতবুদ্ধির মাধ্যমে। ইন্সটিঙ্কট-ও কিছুটা ভূমিকা রাখে তাতে।'

সোফায় হেলান দিলেন সিদ্দিকী। 'তারপরেও... আপনি আমারই মত একজন রক্তমাংসের মানুষ। ওরকম পরিস্থিতিতে শরীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য। তবুও এতকিছু কীভাবে করলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'না-বোঝার মত কিছু বলেছি কি?' বলল রানা। 'আপনার খটকা লাগছে কেন?'

'আমি একজন বায়ো-কেমিস্ট, মানবদেহের বিভিন্ন হরমোন এবং ওগুলোর প্রভাবের উপর আমাকে একজন বিশেষজ্ঞও বলতে পারেন। এপিনেফ্রিন... মানে সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা অ্যাড্রেনালিন বলি আর কী... ভয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভিতরে নিঃসৃত হতে শুরু করে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়, পাকস্থলি খামচে ধরে, পেশিতে কাঁপুনি এনে দেয়। শরীর কথা শোনে না। ওটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, আপনারও হয়েছে নিশ্চয়ই। এসব প্রতিক্রিয়া কাটালেন কীভাবে, সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'কাটিয়েছি কে বলল?'

'কাটাননি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওসব প্রতিক্রিয়ার ফলে সত্যিকার অর্থে কী ঘটে, তা জানেন তো? বাড়তি হার্টবিটের ফলে পেশিতে

দ্রুত রক্তসঞ্চালন হয়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে অক্সিজেনের সাপ্লাই বৃদ্ধি পায়—এতে পেশিতে রিফ্লেক্স বাড়ে, মস্তিষ্কের আদেশ আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি পালন করতে পারে। এ-ছাড়াও এপিনেফ্রিনের কারণে লিভার গ্লুকোজ তৈরি করতে থাকে, রক্তে শুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়। শরীরে ফ্যাটি অ্যাসিডের সঞ্চালনও অনেক বেশি পরিমাণে হয়। এই ফ্যাটি অ্যাসিড আর শুগার হচ্ছে শরীরের জ্বালানি... আর বাড়তি জ্বালানির মানে হচ্ছে বাড়তি শক্তি ও স্ট্যামিনা। ভয়টাকে বাদ দিয়ে আমাকে সেই শক্তি আর স্ট্যামিনা কাজে লাগানোর শিক্ষা দেয়া হয়েছে।'

'এসব আমি জানি, কিন্তু ভয়টাই তো আসল। সেটাকে কীভাবে বাদ দিচ্ছেন?'

ব্যাখ্যা করতে শুরু করল রানা। 'প্যারাসুট পরিয়ে একটা লোককে বিশ হাজার ফুট অলটিচিউডের প্লেন থেকে লাফ দিতে বলুন, ভয় পেয়ে যাবে সে। কারণ কাজটা জীবন-সংশয়ী... ওর জন্যে একেবারে অচেনা। কিন্তু সামান্য ট্রেইনিং দিন ওকে—প্রথমে উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে সুইমিং পুলে লাফ দেয়ান, এতে লাফিয়ে পড়ার ভয় কাটবে। তারপর আরও উঁচু জায়গা থেকে বানজি-জাম্পের হারনেস পরিয়ে লাফ দিতে দিন—প্যারাসুটের ঝাঁকি কেমন হয়, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে সে। এরপর ছোট প্লেনে নিয়ে কম অলটিচিউডে জাম্প করান... আস্তে আস্তে উচ্চতা বাড়াতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত বিশ হাজার ফুট থেকে সে যখন জাম্প করবে, তখন কিন্তু আর ভয় পাবে না। এফিনেফ্রিন বা অ্যাড্রেনালিন যা-ই বলুন... তখন কি নিঃসৃত হবে না? হবে। হার্টবিট বেড়ে যাবে, পাকস্থলিতে মোচড় দেবে, পেশি কাঁপবে... কিন্তু এতে তার কোনও

অসুবিধে হবে না। কারণ প্যারা-জাম্পে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, শরীরের ওসব প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক কাজ করতে পারছে... ভয় পাবার কিছু নেই। তাই না? ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি আপনাকে?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. সিদ্দিকী। প্রশংসার সুরে বললেন, 'আপনার আসলে টিচার হওয়া উচিত ছিল।'

'ওই পেশায় শাইন করতে পারতাম না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'ছাত্র হই বা শিক্ষক... ক্লাসরুমের চার দেয়াল খুব অপছন্দ আমার।'

'সেটা বুঝতেই পারছি,' বললেন ড. সিদ্দিকী। 'আপনার মত দুঃসাহসী মানুষকে ফিল্ডেই মানায়।'

'আবার লজ্জা দিচ্ছেন। গতকাল কিন্তু সত্যিকার সাহস দেখিয়েছেন আপনি!'

'সাহস! আমি!' চোখ কপালে তুললেন সিদ্দিকী। 'আমাকে সাহসী বলছেন আপনি? গত দু'টো সপ্তাহ কীভাবে ভয়ে কুঁকড়ে ছিলাম, সেটা জানলে আর এ-কথা বলতেন না।'

'ভয়ই যদি না পান, তা হলে সাহস দেখাবেন কীভাবে? ওটাকে নেতিবাচকভাবে নেয়ার কিছু নেই। গতকাল আমরা যে-ধরনের হামলার মুখে পড়লাম, তাতে অনেক অভিজ্ঞ লোকও ঘাবড়ে যেতে পারত। আমি ওতে অভ্যস্ত, কিন্তু আপনি নন। তারপরেও আপনি যথেষ্ট শক্ত ছিলেন, পাগলামি করেননি, আমার কথামত কাজ করেছেন... এসব যদি সাহসিকতা না হয়, তা হলে কী?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'গতকালকের সবকিছুই কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কী করেছি না করেছি কিছুই ঠিকমত বলতে পারব না। হয়তো আপনি পাশে

ছিলেন বলেই ঘাবড়াইনি।'

'অন্য কেউ থাকলেও একই আচরণ করতেন,' রানা বলল। 'বিপদের সময় মানুষের আসল প্রতিক্রিয়া বেরিয়ে আসে। নইলে বেশিরভাগ সময়েই সবাই অভিনয় করে।'

'সেটা নিশ্চয়ই আপনার বেলায় ঘটে না? আপনি তো বিপদে ভয় পান না।'

'ভয় আমিও পাই,' রানা বলল। 'তবে সেটাকে সামলে স্বাভাবিক কাজ করতে পারি। এতক্ষণ কী বললাম আপনাকে?'

'কিন্তু এভাবে পরের জন্য ঝুঁকি নেন কেন? লাভ কী এতে?'

'লাভ-ক্ষতি নিয়ে তো ভাবিনি কখনও!' রানা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'যা করি, সব দেশের জন্য... মানুষের উপকারের জন্য করবার চেষ্টা করি। এক ধরনের দায়িত্ব অনুভব করি বলতে পারেন...'

'আমি বলব, এ-ও এক ধরনের অ্যাডিকশন,' সিদ্দিকী বললেন। 'মেডিক্যাল একটা টার্ম-ও আছে বোধহয় একটা—*রিস্ক অ্যাডিকশন।* বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার নেশা... ঝুঁকি নেয়ার নেশা... শান্ত-নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপনের প্রতি অনীহা... এসব ভাল লক্ষণ নয়।'

হাসল রানা। 'আমাকে অসুস্থ বলতে চাইছেন?'

'ও-ধরনের মন্তব্য করা ঠিক হবে না, কারণ আমি ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্ট নই। তবে এটুকু বুঝি, যে-কোনও নেশাই খারাপ। কারণ একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।'

'আমি ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করি।'

'শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সবকিছু জয় করা যায় না,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন ড. সিদ্দিকী। 'বিলিভ মি, মিস্টার রানা... আমি যে-জিনিস আবিষ্কার করেছি, ওটাকে মনের জোর বা ইচ্ছাশক্তি

দিয়ে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।'

ড্রাগটা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছে হলো রানার, কিন্তু সুযোগ পেল না। অ্যাপ্রন পরে হাজির হয়েছে শাহরিয়ার, রান্না শেষ ওর—ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করতে ডাকছে সবাইকে।

দিনের বেলাটা চুপচাপ কেটে গেল। ড. সিদ্দিকীকে আরেক দফা বিশ্রাম নিতে বলে বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকল রানা এজেন্সির অপারেটররা। আসলে ভদ্রলোকের পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে ট্রেইনিং শুরু করতে চাইছে না। ব্রেকফাস্টের পর পরই গোপনে তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে, সেটা ই-মেইল করে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়... বিসিআই হেডকোয়ার্টারে রক্ষিত ডোশিয়ে-র সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য।

দুপুর নাগাদ ফলাফল চলে এল। রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা—ছদ্মবেশী কোনও শত্রুকে ওদের গোপন সেফ-সাইটে নিয়ে আসেনি ও। উদ্ধার করা ভদ্রলোক সত্যিই ড. আন্দালিব সিদ্দিকী, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে গেছে। মনসুরকে ডেকে পরামর্শ করল ও, ঠিক হলো—দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করবে ওরা। আজ শুধু ব্রিফিং হবে, কাল থেকে প্র্যাকটিক্যাল।

লাঞ্চটা বেশ জম্পেশ হলো। সকালের ব্রেকফাস্ট সাদামাঠা ছিল বলেই বোধহয় পোলাও, বোনলেস চিকেন, টিনজাত সবজির কাবাব আর পায়েশ সহযোগে মুখরোচক ভারী খাবারের আয়োজন করেছে শাহরিয়ার। ড. সিদ্দিকী আমেরিকায় বড় হলেও বাংলাদেশি এসব খাবারদাবারে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। খাদ্যরসিক মানুষ তিনি, সবকিছুই খেতে পারেন... মজাও পান। রান্নাটাও হয়েছে বেশ ভাল। রফিক অবশ্য কিছুক্ষণ পর

পরই শাহরিয়ারকে খেপানোর জন্য এটা-ওটা খুঁত ধরছে—দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ খুনসুটি লেগেই রয়েছে।

‘বোনলেস চিকেনের জন্য কোনও সমালোচনা করলে আমি কিন্তু মানব না,’ কপট রাগ দেখিয়ে বলল শাহরিয়ার। ‘দোষটা মুরগির, আমার নয়। খুঁজে-পেতে ডিপ ফ্রিজের তলায় দশদিনের পুরনো দুটো পেয়েছিলাম, তা-ই দিয়ে রান্না করতে হয়েছে। তাজা মাংস নেই তো আমি কী করব? বাজার করাটা কি আমার কাজ?’

হেসে উঠলেন ড. সিদ্দিকী। ‘ওঁর কথায় কান দেবেন না। রফিক সাহেব আপনাকে রাগানোর জন্যে ওসব বলছেন। চিকেনটাই তো সবচেয়ে মজা হয়েছে। স্পেশাল কিছু একটা দিয়েছেন এতে। অয়েস্টার সস নাকি?’

‘দু’চামচ,’ বলল শাহরিয়ার, চেহারায় বিস্ময়। ‘আপনি দেখি ধরে ফেলেছেন!’

‘ওটা আমার বিশেষ ক্ষমতা,’ হাসিমুখে বললেন সিদ্দিকী। ‘জিভ সবকিছুর স্বাদ বুঝতে পারে। অবশ্য সুপার-পাওয়ার আপনারও আছে—হাতের জাদু! কামাল করে দিয়েছেন একেবারে।’

হাসি ফুটল শাহরিয়ারের মুখে। ‘রান্না যেমনই হোক, এমন কথা শুনলে কার না ভাল লাগে! অথচ কপালটা দেখুন—কষ্টও করি, আবার সমালোচনাও শুনতে হয়।’ রফিককে দেখাল ও। ‘এই নিমকহারামটাকে খাইয়ে কোনও লাভ নেই। কাল থেকে ওকে শুধু শুকনো রুটি আর বাসি ডাল দেব আমি।’

‘তা-ও বোধহয় এরচেয়ে ভাল হবে,’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রফিক।

হেসে উঠল সবাই।

খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে সবার। ড. সিদ্দিকী জিজ্ঞেস করলেন, 'ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা আছে এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল শাহরিয়ার। 'হ্যাঁ। করতে চান?'

'পেলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। কনফারেন্স রুমে যান, আমি নিয়ে আসছি।'

'কনফারেন্স রুম!'

'ট্রেইনিঙের কথা ভুলে গেছেন?' হাসল রানা। 'আজ আপনার ব্রিফিং হবে। কাল থেকে হাতে-কলমে শেখানো হবে সব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়লেন ড. সিদ্দিকী। সবার সঙ্গে গিয়ে ঢুকলেন কনফারেন্স রুমে। ওখানকার গোলটেবিল ঘিরে বসল সবাই। একটু পরেই এসে গেল শাহরিয়ার—একটা ট্রে-তে করে নিয়ে এসেছে একটা ওয়াইনের বোতল, সেই সঙ্গে গ্লাস আর বরফের কুচি। গ্লাসের সংখ্যা মাত্র একটা লক্ষ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন বিজ্ঞানী।

'একাই খেতে হবে আপনাকে,' রানা বলল। 'আমরা সবাই ডিউটিতে আছি। এ-অবস্থায় ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সিদ্দিকী। গ্লাস নিতে নিতে শাহরিয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এনেছেন?'

'*স্ট্রগানফ*... রাশান ওয়াইন,' বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল শাহরিয়ার।

গ্লাসে সামান্য একটু ঢেলে চুমুক দিলেন সিদ্দিকী। 'হুঁ... ভাল জিনিস তো! আগে কখনও খাইনি। রাশান মদ এত ভাল হয়, জানা ছিল না।'

'নামটাই রাশান, রেসিপিটা নয়,' চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল শাহরিয়ার। 'উনবিংশ শতকের এক ফ্রেঞ্চ শেফ

বানিয়েছিল এটা, রাশান এক অ্যারিস্টোক্র্যাটের ব্যক্তিগত বাবুর্চি ছিল সে। অ্যারিস্টোক্র্যাট লোকটার নাম কাউন্ট পল স্ট্রগানফ। সচরাচর যা হয়... পয়সাঅলা মানুষটার নামে নাম হয়েছে ওয়াইনটার, আবিষ্কর্তার নামে নয়।'

'খাবারদাবার আর পানীয়ের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি,' প্রশংসার সুরে বললেন সিদ্দিকী। 'রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় নামা উচিত আপনার।'

মুচকি হাসল শাহরিয়ার। 'ওতে এখানকার মত আনন্দ আর উত্তেজনা কোথায়?'

মারুফের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা, ওকেই দেয়া হয়েছে ব্রিফিঙের দায়িত্ব। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল স্পেশালিস্ট টিমের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'ড. সিদ্দিকী, অনুমতি দিলে ব্রিফিং শুরু করতে পারি।'

'প্লিজ!' স্ট্রগানফে চুমুক দিয়ে বললেন বিজ্ঞানী। 'গো অ্যাহেড।'

'শুরুতেই জানাই, উধাও হয়ে যেতে হলে, মানে নাম-পরিচয় পাল্টে গা-ঢাকা দিতে হলে... অর্থাৎ, রিলোকেশনের জন্যে মোট চারটে ধাপ অতিক্রম করতে হবে আপনাকে,' লেকচার শুরু করল মারুফ। 'প্রথমটা হচ্ছে নতুন পরিচয় সংগ্রহ। এই দেশের ক্ষেত্রে সেটার জন্যে অথেনটিক একটি বার্থ-সার্টিফিকেট এবং সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার প্রয়োজন হবে আপনার...'

'অথেনটিক?' ভুরু কোঁচকালেন ড. সিদ্দিকী। 'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'একটা উপায় হচ্ছে, মৃত কোনও ব্যক্তির বার্থ-সার্টিফিকেট আর সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার সংগ্রহ করা। তবে এ ক্ষেত্রে

সতর্ক থাকতে হয়—যার পরিচয় গ্রহণ করছেন আপনি, তার যেন কোনও নিকটাত্মীয় বা পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবিত না থাকে। কেউ যেন বলতে না পারে, এই লোক বহু আগেই মারা গেছে। এর জন্যে পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে হয়, এমন একটা পরিবার খুঁজে বের করতে হয়, যার সব সদস্য একই সঙ্গে দুর্ঘটনা বা অন্য কোনোভাবে মারা গেছে। ওই পরিবারের একটা বাচ্চা থাকতে হয়, বেঁচে থাকলে যার বয়স আপনারই মত হতো। নবজাত বাচ্চার জন্য অনেক বাবা-মা-ই সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার সংগ্রহ করে, হসপিটাল রেকর্ডে উল্লেখ থাকে সেটা। তা ছাড়া কিছু কিছু স্টেটে ডেথ-সার্টিফিকেটেও নাম্বারটা লেখা হয়। দুটোই সহজে সংগ্রহ করা যায়।'

'প্রচুর পেপারওয়ার্ক করতে হবে দেখছি,' মন্তব্য করলেন সিদ্দিকী। 'খুব খাটুনি যাবে আপনাদের।'

'যদি এ-পদ্ধতিটা ফলো করি আর কী!' হাসল মনসুর।

'এভাবে নয়? কেন?' অবাক হলেন সিদ্দিকী।

'এই পদ্ধতিটা মডারেট থ্রেট লেভেল, সেই সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্যে কার্যকর,' রানা বলল। 'আপনার জন্যে নয়। মার্কিন সরকার মাঝে মাঝেই সমস্ত সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার রিভিউ করে। বহুদিন ধরে ইনঅ্যাকটিভ একটা নাম্বার থেকে হঠাৎ করে ট্যাক্স রিটার্ন পেতে শুরু করলে ওরা স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে শুধু কলাম্বিয়ানদের নয়, মার্কিন সরকারের ওয়ান্টেড লিস্টেও আপনার নাম উঠে আসবে—একজন ক্রিমিনাল হিসেবে!'

'তা হলে?'

'সম্পূর্ণ নতুন একটা সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার অ্যাসাইন করা হবে আপনাকে।'

'কিন্তু নতুন নাম্বার তো অল্পবয়েসীরা পায়। আমার মত বয়স্ক একজন মানুষের জন্যে সেটা বেমানান হবে না?'

'মোটেই না,' মারুফ মুখ খুলল। 'আপনি ইমিগ্র্যান্টদের কথা ভুলে গেছেন। ওরা নাগরিকত্ব পাবার পর নতুন নাম্বার পায়। আমাদের একজন ফর্জারি-স্পেশালিস্ট আছে, সে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে দেবে... আপনি একজন অভিবাসী, সেই সঙ্গে সদ্য-নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষ হিসেবে নতুন নাম্বারের জন্য আবেদন করবেন। পেয়েও যাবেন, আমরা ব্যাপারটা নিশ্চিত করব। কাজেই আপনার নাম্বারটা হবে একেবারে অথেনটিক... ব্র্যাণ্ড-নিউ... কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারবে না।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' স্বীকার করলেন ড. সিদ্দিকী। 'কে এই স্পেশালিস্ট?'

'তার পরিচয় আপনার না জানলেও চলবে,' রানা বলল। 'দেখা করারও প্রয়োজন নেই। আমরা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলে বাকি কাজ ও নিজেই করে নেবে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। 'কী ধরনের কাগজপত্র তৈরি করবেন উনি?' কৌতূহল মিটছে না তাঁর।

'ডিটেইলড্ ব্যাকগ্রাউণ্ড,' মারুফ বলল। 'কোথায় আপনার জন্ম হয়েছে, কোথায় বড় হয়েছেন, কোন্ স্কুলে পড়েছেন, কোথায়-কোথায় থেকেছেন... সোজা কথায় নকল পরিচয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি। এসব সাপোর্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আই.ডি., ড্রাইভারস্ লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, পাসপোর্ট... এমনকী আপনার পুরনো স্কুলের লাইব্রেরি কার্ডও তৈরি করে দেবে ও।'

বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেছে ড. সিদ্দিকীর।

'অবাক হবার কিছু নেই,' মারুফ বলল। 'আমরা শুধু কাগজপত্রই তৈরি করে দেব, কিন্তু ওগুলো ঠিকমত কাজে লাগানোর দায়িত্ব আপনার। পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে আপনাকে, কেউ জিজ্ঞেস করলেই যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া গড়গড় করে বলে যেতে পারেন... মিলিয়ে দেখলে কেউ যেন একচুল এদিক-ওদিক দেখতে না পায়। মনে রাখবেন, রিলোকেশনের আসল সাফল্য কিন্তু সাবজেক্টের ওপর নির্ভর করে, যারা অ্যারেঞ্জ করে দেয় তাদের উপর নয়।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ড. সিদ্দিকী। 'বুঝলাম। সব মুখস্থ করতে আমাকে, তেমন কঠিন কিছু তো নয়।'

'এখুনি মন্তব্য করবেন না,' বলে উঠল মনসুর। 'আরও তিনটে স্টেজ বাকি আছে কিন্তু!'

থমকে গেলেন সিদ্দিকী, কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন বোধহয়।

'এনিওয়ে, এবার আসি দ্বিতীয় পর্যায়টার ব্যাপারে,' খেই ধরল মারুফ। 'সেটা হলো, চেহারা বদলানো। নতুন পরিচয়ের সঙ্গে আপনার নতুন একটা চেহারা নিতে হবে। অল্প চেষ্টায় কিছু কিছু পরিবর্তন সহজেই আনা সম্ভব, যেমন চুলের রং-পাল্টানো, মুখে দাড়ি-গোঁফ রাখা, চোখে চশমা পরা... এসব। মডারেট রিস্ক লেভেলে এটুকুই যথেষ্ট হয়ে থাকে। তবে আপনার কেসটা যেহেতু এরচেয়ে গুরুতর, তাই সার্জিক্যাল প্রসিডিওর ফলো করাটাই উচিত হবে...'

'সার্জিক্যাল মানে?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন সিদ্দিকী।

'প্লাস্টিক সার্জারি, ডক্টর,' বুঝিয়ে বলল রানা। 'অপারেশনের মাধ্যমে আপনার চেহারা এমনভাবে পাল্টে দেয়া হবে, যাতে আপনার মা-ও ছেলেকে চিনতে না পারেন।'

'আমার মা মারা গেছেন বহুদিন আগে, বাবা-ও,' থমথমে গলায় বললেন সিদ্দিকী।

'দুঃখিত,' বিব্রত কণ্ঠে বলল রানা। 'কিছু মিন করে বলিনি ওটা। কথার কথা বলেছি।'

'অপারেশন করার কি সত্যিই দরকার আছে?'

'আইডেণ্টিটি চেঞ্জটা যদি নিখুঁত করতে চান... হ্যাঁ।' রানা বলল। 'আপনার শারীরিক গঠনও পাল্টাতে হবে। কাল গাড়িতে আপনাকে তো বলেছি সেটা। মোটা মানুষের প্রতি সহজে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শুকাতে হবে আপনাকে। সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বটে, হয়তো রিলোকেশনের আগে পেরে উঠবেন না, তবে শুকাতে আপনাকে হবেই... আগে বা পরে।'

'আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করব না,' কথা দিলেন সিদ্দিকী।

'চেষ্টায় হবে না, যে-সব ইন্সট্রাকশন দিচ্ছি, তার সবক'টা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। তা ছাড়া শুধু চেহারা পাল্টালে বা ভুয়া ব্যাকগ্রাউণ্ড মুখস্থ করলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আপনাকে আসল যে-কাজটা করতে হবে, তা আরও কয়েক গুণ কঠিন।'

'কী সেটা?'

'ওটা আমাদের চার নম্বর স্টেপ, যথাসময়ে জানতে পারবেন,' মারুফ বলল। 'আগে তৃতীয় ধাপটার কথা বলে নিই। এটা অর্থনৈতিক... মানে নতুন জীবনে আপনার টাকা-পয়সা সংক্রান্ত। নতুন একটা পরিচয় নেবেন আপনি, তার মানে এই নয় যে, আয়-রোজগার নতুন করে শুরু করবেন... কোনও রকম ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ছাড়া। স্বাভাবিকভাবেই আগের জীবনের জমানো টাকাগুলো সঙ্গে নিতে চাইবেন

আপনি, সেজন্যে কৌশল খাটাতে হবে আমাদের। যাতে এই টাকা ট্রেস করে আপনাকে খুঁজে বের করতে না পারে কেউ।'

'কৌশলটা কী?'

'বাহামায় অথবা সুইস ব্যাঙ্কে একটা নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপনি, বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা ওটায় ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সফার করে ফেলবেন। পদ্ধতিটা মোটামুটি নিরাপদ, কারণ নাম্বারড্ অ্যাকাউন্টে নাম-পরিচয় বা ঠিকানা দিতে হয় না। এ-কারণে আপনার নতুন আইডেণ্টিটি জানতে পারবে না কেউ। তারপর আরও নিরাপদ থাকবার জন্য রিলোকেটেড হবার পর আপনি আপনার বাসস্থানের আশপাশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ভিন্ন ভিন্ন নামে কয়েকটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন, নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট থেকে ওগুলোয় প্রয়োজনমাফিক অনিয়মিতভাবে টাকা আনিয়ে নেবেন। খরচ করবেন একেক সময় একেকটা থেকে। তবে খেয়াল রাখবেন, কখনও যেন দশ হাজার ডলারের বেশি ট্রান্সফার না করেন, কারণ বড় ধরনের প্রতিটা ট্রানজ্যাকশনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পৌঁছে যায়। তারমানে এ-ই নয় যে, নয় হাজার নয়শ' নিরানব্বুই ডলারের ট্রান্সফার করতে পারবেন। দশ হাজার ডলারের কাছাকাছি নিয়মিত ট্রানজ্যাকশন হলেই প্যাটার্নের খোঁজে নজর রাখতে শুরু করে এফবিআই আর ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্ট।'

'তা হলে কোন্ অ্যামাউণ্টে ট্রান্সফার করব?'

'নির্দিষ্ট কিছু থাকবে না, ছোট-বড় সব ধরনেরই করতে থাকবেন... যাতে আপনার এই মানি-ট্রান্সফার কখনও কোনও ছকের মধ্যে না পড়ে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে আপনার কাছে?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে সায় দিলেন ড. সিদ্দিকী।

'আপনার আয় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের লোকজনের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে,' যোগ করল মনসুর। 'যে-কোনও সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়েই ওরা সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য। তাই আগেভাগেই ওদের সন্দেহ দূর করে দিতে হবে। গল্পটা এমন হতে পারে যে, বিদেশি একটা ট্রাস্ট ফাণ্ডের কাছে আপনি আপনার ব্যবসা বিক্রি করে দিয়েছেন, ওরা ছোট ছোট কিস্তিতে টাকাটা শোধ করছে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বললেন সিদ্দিকী।

'বেশ,' রানা বলল। 'প্রথম তিনটে ধাপ যদি পরিষ্কার হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে শেষটা শুনুন—এটাই সবচেয়ে কঠিন। মারুফ...'

'ওটা আপনিই বুঝিয়ে দিন, মাসুদ ভাই,' বলল মারুফ। অন্যেরাও সায় দিল প্রস্তাবটাতে।

মাথা ঘুরিয়ে বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল রানা। 'শুনুন তা হলে। মারুফ আগেই বলেছে, গায়েব হয়ে যাওয়ার আসল সাফল্য নির্ভর করে সাবজেক্টের উপরে... মানে আপনার উপরে। নতুন জীবন... এক অর্থে পুনর্জন্মও বলতে পারেন একে... শুরুতে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। শত্রুদের কাছ থেকে মুক্তি... নতুন একটা সূচনা... পুরনো ভুলগুলো শুধরে নেয়ার সুযোগ... এসব ক'জনই বা পায়? কিন্তু অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যে ছিন্ন করতে হবে, সেটা ভাবে না কেউ। ব্যাপারটা সহজ নয়, আগের জীবনের কিচ্ছু আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না... সিম্পলি নাথিং। আপনার কোনও পরিবার আছে?'

'না,' মাথা নাড়লেন সিদ্দিকী। 'আপনার তো সেটা জানবার কথা।'

'আমাদের ফাইলে আপনার সম্পর্কে সব তথ্য নেই, তাই শিয়োর হয়ে নিচ্ছি। কখনও বিয়ে করেছেন? বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'না, নেই। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি সারাক্ষণ, সংসার করার সুযোগ কোথায়?'

'প্রেমিকা বা বান্ধবী?'

'উঁহুঁ।'

'ঘনিষ্ঠ, বা খুব কাছের কোনও মানুষ...'

'সামাজিকতা করতে পারি না আমি,' সরল গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'তাই বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ নেই। যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছি এতদিন, সবাই আমার প্রফেশনাল কোলিগ, বা পরিচিত মানুষ।'

'তার মানে আপনি হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলে শুধু শত্রু ছাড়া আর কেউ তা-নিয়ে উতলা হয়ে পড়বে না? আপনিও কাউকে মিস করবেন না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'গুড, তা হলে ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন বা পরিবার থাকলেই যত সমস্যা। প্রথম প্রথম সাবজেক্টরা নতুন জীবন এনজয় করে ঠিকই, কিন্তু একটা সময়ে ঠিকই পরিবার-পরিজন আর বন্ধুবান্ধবকে মিস করতে শুরু করে। একটা সময়ে চুপিসারে যোগাযোগও করে বসে। শত্রুরা এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগায়। গা-ঢাকা দেয়া লোকটার আত্মীয় আর বন্ধুদের উপর নজর রাখে—তাদের চিঠিপত্র চেক করে, ফোন ট্যাপ করে, ফেউ লাগায়... ফলে যোগাযোগ করামাত্র সাবজেক্টের লোকেশন আর নতুন পরিচয় ফাঁস হয়ে পড়ে।'

'আমার ক্ষেত্রে এ-ধরনের কোনও সমস্যা হবে না,' জোর গলায় বললেন সিদ্দিকী।

'আগে পুরোটা শুনুন। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে শুধু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া নয়। আপনার শখ, অভ্যাস, আচার-আচরণ, এমনকী হাঁটাচলার ভঙ্গি পর্যন্ত পাল্টে ফেলতে হবে।'

'বলেন কী!' আঁতকে উঠলেন সিদ্দিকী।

'হ্যাঁ, একটা উদাহরণ দিই। আপনি কি কোনও সায়েণ্টিফিক জার্নালের নিয়মিত গ্রাহক?'

'বেশ কয়েকটার। কেন?'

'সবগুলোর মায়া কাটাতে হবে আপনাকে। কারণ আপনি গা-ঢাকা দেবার পরই শত্রুরা ওসব জার্নালের ওপর নজর রাখতে শুরু করবে। যারা নতুন গ্রাহক হবে, তাদের প্রত্যেককে চেক করতে শুরু করবে...'

'আর বলতে হবে না,' হাত তুলে রানাকে থামালেন সিদ্দিকী। 'আমাকে খাওয়াদাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ সব বদলে ফেলতে হবে—এই তো?'

'একজ্যাক্টলি।'

'এ-তো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। আমি পারব?'

'আপনাকে তৈরি করবার দায়িত্ব আমাদের,' রানা বলল। 'আগামী কয়েকদিনে কয়েকবার আপনার ইণ্টারভিউ নেব আমরা, খুঁটিনাটি সব জেনে নিয়ে লিস্ট তৈরি করব—কী কী পরিবর্তন করতে হবে জানাব আপনাকে। সেগুলোর উপর একই সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেইনিং চলতে থাকবে। আচার-আচরণ, কথা বলার ঢং, হাঁটাচলা... সবই বদলে দেব আমরা। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি এতসব

পরিবর্তনে রাজি আছেন কি না।'

একটু নীরব রইলেন ড. সিদ্দিকী। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'রাজি না হয়ে আমার উপায় নেই, মি. রানা। বাঁচার এই একটাই মাত্র পথ খোলা রয়েছে আমার সামনে।'

'আপনাকে একটা বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি...'

'দুঃখিত,' চেহারায় করুণ ভাব ফোটালেন বিজ্ঞানী। 'ওটায় আমি রাজি হতে পারছি না। যত কষ্টই হোক, যা-ই করতে হোক, আমি এ-দেশেই থাকতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আগামীকাল ভোর ছ'টা থেকে আপনার ট্রেইনিং শুরু হবে। তৈরি থাকবেন।'

তেরো

নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল পরের দুটো দিন। ড. সিদ্দিকীর ট্রেইনিং নিয়ে ব্যস্ত রইল রানা আর স্পেশালিস্ট টিমের সদস্যরা। প্রতিদিন ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা করে খাটানো হচ্ছে তাঁকে—ইণ্টারভিউ, লেকচার... সেই সঙ্গে আচার-আচরণ পাল্টানোর বিভিন্ন কৌশল শেখানো হচ্ছে একের পর এক। শুধু ইণ্টারভিউয়ের মাধ্যমে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, তাই পুরো সময়টা অবজার্ভেশনেও রাখা হচ্ছে তাঁকে, দক্ষ চোখে ভদ্রলোকের সমস্ত ভাবভঙ্গি, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি চিনে নিচ্ছে

ওরা, কাগজে নোট করে নিয়ে পরে সেগুলো বদলানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

কাজটা সহজ নয়... প্রশিক্ষক বা শিক্ষার্থী কারও জন্যই। কিন্তু স্পেশালিস্ট টিম এ-কাজে অভিজ্ঞ, ড. সিদ্দিকীও চমৎকার পারফর্মেন্স দেখাচ্ছেন। অত্যন্ত মেধাবী মানুষ তিনি... সোজা কথায় জিনিয়াস। স্মরণশক্তি খুবই ভাল, কোনও বিষয় একবারের বেশি দু'বার বলতে হয় না তাঁকে। সবকিছু আয়ত্ত করে নিচ্ছেন অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে। স্পেশালিস্ট টিম ব্যাপারটা লক্ষ করে মুগ্ধ—এরকম সাবজেক্ট ওদের জন্য স্বপ্নের মত। এর আগে যাদের রিলোকেটেড করেছে ওরা, তাদেরকে নতুন পরিচয়ে অভ্যস্ত করতে জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল ওদের—এসপিয়োনাজ এজেন্টদেরই এসব শিখতে যথেষ্ট সময় লাগে, সাধারণ মানুষকে অল্প সময়ে শেখানো তো আরও কঠিন।

মুগ্ধ অবশ্য রানাও হচ্ছে, তবে একই সঙ্গে কিছুটা দুশ্চিন্তা অনুভব করছে ও। ড. সিদ্দিকী যেভাবে এগোচ্ছেন, তাতে ট্রেইনিং শেষ হতে মোটেই সময় লাগবে না। প্লাস্টিক সার্জারিটা হচ্ছে শেষ কাজ, ওটা করেই তাঁকে খুব শীঘ্রি নতুন পরিচয় দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গোটা রহস্যটার ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। সারাক্ষণ বিজ্ঞানীকে চোখে চোখে রাখছে ওরা, লাভ হয়নি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ সিদ্দিকী, এখন পর্যন্ত একটাও বেফাঁস কথা বলেননি তিনি, উল্টোপাল্টা কোনও কাজও করেননি। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ওঁকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হতে হবে ওদের, আসল ঘটনা আর জানা হবে না। কীভাবে কী করা যায় ভেবে অস্থির হলো রানা, সমাধান আর পেল না।

সেফ-সাইটের পঞ্চম দিন। খুব ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার। হাতঘড়ি চোখের সামনে তুলে লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল—পাঁচটা বাজে। অ্যালার্ম বাজার কথা সাড়ে পাঁচটায়, আধঘণ্টা আগেই ঘুম ভাঙল কেন? ভুরু কুঁচকে গেল ওর। পরমুহূর্তেই দরজায় মৃদু টোকা শুনতে পেল... আগেও পড়েছে নিশ্চয়ই, সেজন্যেই ঘুম ভেঙেছে।

ঝটপট বিছানা থেকে নামল রানা। গায়ে একটা রোব জড়িয়ে উঁকি দিল দরজার ফাঁক করে। মারুফ দাঁড়িয়ে আছে করিডরে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটু আসবেন, মাসুদ ভাই?' মারুফের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'একটা ব্যাপার দেখানো দরকার আপনাকে।'

'এক মিনিট সময় দাও আমাকে।'

রোব খুলে দ্রুত প্যান্ট-শার্ট পরল রানা, তারপর বেরিয়ে এল রুম থেকে।

'আসুন,' বলে পা চালাল মারুফ। 'কমিউনিকেশন রুমে যেতে হবে আমাদের।'

লিভিং এরিয়া পেরিয়ে অন্যপাশের করিডরটায় পৌঁছুল দুজনে... তারপর দরজা খুলে ঢুকল কমিউনিকেশন রুমে। দেয়াল হাতড়ে লাইট জ্বালল মারুফ, রানাকে নিয়ে গেল ভিএইচএফ রেডিও সেটটার সামনে। বলল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

তীক্ষ্ণ চোখে যন্ত্রটাকে দেখল রানা—নীরব হয়ে আছে ওটা। সেটাই স্বাভাবিক, প্রয়োজন না হলে অন্ করা হয় না সেটটা। হেডসেট, মাইক্রোফোন সব জায়গামত গোছানো রয়েছে—ভাল করে দেখেও কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। সোজা

হয়ে মারুফের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ও।

'মাস্টার সুইচটা দেখুন,' শান্তস্বরে বলল মারুফ।

তাকাল রানা—নীচের দিকে নামানো রয়েছে সুইচটা, অন্ পজিশনে। তবে কোনও ধরনের ট্রান্সমিশন বা রিসেপশন হচ্ছে না, কারণ মেইন পাওয়ার সুইচটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করার আগে মাস্টার সুইচ অফ্ করে নেয়া নিয়ম, তবে ভুলে করা হয়নি বোধহয়। ছোট্ট ভুল... ব্যাপারটা তেমন অস্বাভাবিক বলা চলে না।

ওর চিন্তাধারা বোধহয় ধরতে পেরেছে মারুফ, বলল, 'ওটা গতকাল এভাবে ছিল না, মাসুদ ভাই। এর মধ্যে আমরা ব্যবহারও করিনি সেটটা। করলে মাস্টার-সুইচ অফ্ করার কথা ভুলতাম না।'

'কীভাবে শিয়োর হচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গতকাল রাত দশটায় কন্ট্রোল রুমের ডিউটিতে ক্লোজ-আপ হবার আগে একবার রাউণ্ড নিয়েছি আমি—তখন সব ঠিকঠাক ছিল। বিশ মিনিট আগে শাহরিয়ার আমাকে রিলিভ করেছে, শুতে যাবার আগে আবার একটা চক্কর দিচ্ছিলাম... দেখি এই কাণ্ড!'

'ভাবছ আনঅথরাইযড্ ট্রান্সমিশন করেছে কেউ?'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল মারুফ। 'কারণ অসঙ্গতি শুধু এই একটা নয়, আরও আছে।'

'কোথায়?' চারপাশে নজর বোলাল রানা।

'কম্পিউটারে,' বলল মারুফ। 'আসুন দেখাচ্ছি।'

রুমের আরেকপাশে রাখা কম্পিউটারটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কী-বোর্ডে কয়েকটা বাটন টিপে একটা ফাইল খুলল। বলল, 'দেখুন, লগ বলছে—দু'ঘণ্টা আগে বেশ কিছু

ফাইল অ্যাকসেস করা হয়েছে।'

'কে করেছে?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল রানা। 'তোমাদের সবার আলাদা পাসওয়ার্ড আছে না? কারটা ব্যবহার করা হয়েছে?'

'কারোটা না,' তিক্ত গলায় বলল মারুফ। 'হ্যাকিং করা হয়েছে... অত্যন্ত দক্ষভাবে।'

'কোন্ কোন্ ফাইল ঘাঁটা হয়েছে, তা বলতে পারবে? পুরনো কোনও সাবজেক্টের ব্যাপারে তথ্য চুরি করা হয়নি তো?'

'ওসব আমরা এই কম্পিউটারে রাখি না, তাই সে-ভয় নেই। তবে অনেকগুলো ফাইল খোলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করা হয়েছে আমাদের টিম-মেম্বারদের পার্সোনাল ডেটাগুলোর পিছনে।'

চেহারা থমথমে হয়ে গেল রানার।

দরজায় শব্দ হলো, মনসুর এসে ঢুকেছে কমিউনিকেশন রুমে। রানার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝল, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?'

খুলে বলল মারুফ।

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল স্পেশালিস্ট টিম লিডার। 'মাসুদ ভাই, একজনই আছে এখানে... যার কম্পিউটারে ঢোকার পাসওয়ার্ড নেই। একজনই আছে... যাঁর আনঅথরাইযড্ ট্রান্সমিশন করবার দরকার হতে পারে। ড. সিদ্দিকী!'

'তা আমি জানি না ভেবেছ?' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু এর পিছনে কারণটা কী, সেটা বুঝতে পারছি না। কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ভদ্রলোক... কেন? কম্পিউটারই বা ঘেঁটেছেন কেন?'

'গিয়ে জিজ্ঞেস করব?'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'ওভাবে পেট থেকে কথা বের করা যাবে না। স্বীকারই করবেন না হয়তো। বাঙ্কারের ভিতরে কোনও ক্যামেরা রাখিনি আমরা, কাজেই ছবি দেখিয়েও প্রমাণ করে দিতে পারব না যে, কাজটা ওঁর।'

'তাই বলে চুপ করে থাকব?' মারুফ প্রতিবাদ করল।

'উঁহুঁ, অন্যভাবে প্রেশার দেব ওঁকে,' রানা বলল। 'ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা জানার এটাই সুযোগ। সাবধানে এগোতে হবে আমাদের...'

কথা শেষ হলো না ওর, আবার দরজায় শব্দ হওয়ায় থেমে গেল। শাহরিয়ার এসেছে, হাসিখুশি চেহারায় শঙ্কা ফুটে রয়েছে। বলল, 'আপনারা সবাই এখানে? আমি তো খুঁজে মরছি...'

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল মনসুর।

'তিনটে হেলিকপ্টার ডিটেক্ট করেছি আমি... এদিকেই আসছে!'

'হেলিকপ্টার!'

'হ্যাঁ, কন্ট্রোল রুমে আসুন। দেখাচ্ছি।'

দ্রুত পায়ে শাহরিয়ারকে অনুসরণ করল বাকিরা, প্রায় ছুটতে ছুটতেই কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকল।

ভিতরটা নানা ধরনের টিভি স্ক্রিনে ভরা—বাঙ্কারের বাইরে বসানো অনেকগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিড দেখাচ্ছে। তবে সেসবের দিকে তাকাল না শাহরিয়ার, সঙ্গীদের নিয়ে গেল একপাশে বসানো একটা রেইডার কনসোলের দিকে। ওটার গোলাকার ডিসপ্লে-তে সবুজ রঙে ফুটে উঠেছে আশপাশের বিশাল একটা এলাকার প্রতিকৃতি। আঙুল তুলে তিনটে সচল

বিন্দু দেখাল ও—দ্রুত নড়ছে।

কয়েক সেকেণ্ড ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, স্পিড আর ফরমেশন দেখে হেলিকপ্টারই মনে হচ্ছে।'

'দশ মিনিট আগে উদয় হয়েছে কপ্টারগুলো,' বলল শাহরিয়ার। 'হাডসন নদী ধরে এদিকে এসেছে। আমরা যে-ফ্লাইট প্ল্যান ফলো করি, অনেকটা সেটা ধরেই।'

'কো-ইনসিডেন্স?' প্রশ্ন করল মারুফ।

'হতে পারে,' মনসুর বলল। 'হাডসনের এদিকটায় বেশ কিছু ছোট ছোট এয়ারপোর্ট আছে, অলব্যানি-তেও আছে একটা। করপোরেট রিট্রিটে যাচ্ছে হয়তো বড় কোনও ব্যবসায়ী, ওগুলোর কোনও একটা এয়ারপোর্টে নামবে। অনেক সময় ওয়াশিংটনে যাবার জন্যে পলিটিশিয়ানরাও এই রুট ব্যবহার করে।'

'ওদের কেউ ভোর পাঁচটায় বিছানা ছাড়ে বলে মনে হয় না আমার,' শাহরিয়ার বলল।

পিছনে পায়ের শব্দ হলো—রফিক-সহ ড. সিদ্দিকী এসে ঢুকেছেন কণ্ট্রোল রুমে। সবাইকে এক জায়গায় দেখে বিস্মিত গলায় জানতে চাইলেন, 'কী হচ্ছে এখানে?'

'তিনটে হেলিকপ্টার আসছে এদিকে, ডক্টর,' বলল মারুফ। 'সন্দেহজনকভাবে!'

'কী!' আঁতকে উঠলেন বিজ্ঞানী। 'আমার খোঁজে নয়তো?'

'এখুনি অস্থির হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'ওদের উদ্দেশ্য জানি না আমরা, ব্যাপারটা কাকতাল-ও হতে পারে। যদি না-ও হয়, তারপরেও চিন্তা নেই। আমাদের এই সেফ-সাইট খুঁজে বের করা সহজ নয়। এদিকে বহু পাহাড় আর

উপত্যকা আছে, দিনের পর দিন লেগে যাবে মাত্র তিনটে কপ্টার দিয়ে সার্চ করে আমাদের লোকেশন বের করতে।'

'মাসুদ ভাই!' বলে ডিসপ্লে দেখাল শাহরিয়ার। বিন্দু তিনটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ছে হেলিকপ্টারগুলো।

'পাহাড়ী এলাকায় ঢুকছে,' বলল মনসুর। 'সময় বাঁচানোর জন্য ছড়িয়ে পড়ছে, অল্প সময়ে যাতে বেশি জায়গা কাভার করতে পারে।'

রফিকও এগিয়ে এসে উঁকি দিচ্ছে। বলল, 'পণ্ডশ্রম করতে যাচ্ছে ব্যাটারা। উপর থেকে কিচ্ছু দেখতে পাবে না। অন্ধের মত বেশিক্ষণ হাতড়াতেও পারবে না, ফিউয়েল ফুরিয়ে গেলে কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যেতে বাধ্য হবে।'

রানা কথা বলল না, নীরবে কপ্টারগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে ও। ওগুলো কারা চালাচ্ছে, জানা নেই, তবে লোকগুলোর কাজের ধারা ওকে ভাবিয়ে তুলল। নিখুঁত নিয়মে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা, প্রত্যেকটি কপ্টার আলাদা সার্চ গ্রিড বেছে নিয়েছে—সেটার উপর দিয়ে দ্রুত ছুটছে এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত। উঁচুমানের ট্রেইনিং পাওয়া সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ পার্সোনেল... সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট ছাড়া এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

মনসুরও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। বলল, 'ব্যাটারা দেখি সিস্টেম্যাটিক্যালি সার্চ করছে!'

'কিন্তু করছে খুব দ্রুত,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'এখনও ঠিকমত আলো ফোটেনি বাইরে, ঠিকমত কিছু দেখতেই তো পাবার কথা নয়। নাইট-ভিশন গগলস্ থাকলেও আরও আস্তে মুভ করা উচিত, নইলে অনেক কিছু চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।

হাইলি-ট্রেইনড্ কারও তো এ-ধরনের ভুল করবার কথা নয়।'

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই যার যার তল্লাশি শেষ করে ফেলল হেলিকপ্টারগুলো, উড়ে চলে গেল আরেকদিকে... নতুন তিনটে সার্চ গ্রিড বেছে নিয়েছে। এবার আগের চেয়েও দ্রুত কাজ করছে ওগুলো।

'এ-কীভাবে সম্ভব?' বোকা বোকা গলায় বলল শাহরিয়ার। 'কোনও মানুষের পক্ষে এত দ্রুত একটা এলাকা ভিজুয়্যালি চেক করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব, যদি চেকিংটা ভিজুয়্যালি করা না হয়,' বলল রানা।

'মানে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন ড. সিদ্দিকী।

'আপনার আশঙ্কাটাই সত্যি হয়েছে,' শীতল গলায় বলল রানা। 'ওদের কাছে ইনফ্রারেড ইকুইপমেণ্ট... থারমাল সেন্সর আছে। ওরা আমাদের হেলিকপ্টারের হিট সিগনেচার খুঁজছে।'

'পাবে না নিশ্চয়ই?' বললেন সিদ্দিকী। 'ওটা তো গত দু'দিন থেকে চালানো হয়নি। ইঞ্জিন-বডি... সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে।'

'তাতে লাভ নেই,' বলল মনসুর, গলায় উদ্বেগ। 'ইনফ্রারেড স্ক্যানারে হেলিকপ্টারের আকৃতিটা বোঝা যাবে—ঠাণ্ডা-গরমে কিছু যাবে-আসবে না। তা ছাড়া ল্যাণ্ডিং প্যাডের হিট-প্যাটার্নও আশপাশের মাটির চেয়ে অন্যরকম দেখাবে।'

'গুড গড!' আতঙ্কিত গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'আমরা ধরা পড়ে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। 'এবং খুব শীঘ্রি। যেভাবে এগোচ্ছে ওরা, তাতে দশ মিনিটের ভিতরেই আমাদের মাথার উপর চলে আসবে।'

'এ হতে পারে না... এ হতে পারে না...' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের

মত বিড়বিড় করতে শুরু করলেন ড. সিদ্দিকী।

'ডক্টর!' কড়া গলায় ডাকল রানা। 'আমার দিকে তাকান!'

তাকালেন বিজ্ঞানী—চোখের তারায় আতঙ্ক ফুটে রয়েছে, গত কয়েকদিনে গড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যেন।

রেইডার ডিসপ্লের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'কারা এরা?'

'জিজ্ঞেস করছেন কেন?' কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন সিদ্দিকী। 'মিগুয়েল সান্টানার কথা বলেছি না আপনাকে?'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল রানা। 'যত টাকাই খরচ করুন, এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট জোগাড় করা সম্ভব নয়। ইনফ্রারেড স্ক্যানার, থারমাল সেন্সর-মাউন্টেড এয়ারক্র্যাফট—এসব স্পেশাল মিলিটারি ইকুইপমেন্ট। সত্যি করে বলুন, কে আপনার পিছনে লেগেছে।'

'আমি জানি না,' ঢোঁক গিলে বললেন সিদ্দিকী। 'সত্যি জানি না। শুধু সান্টানার কথা জানি আমি...'

লোকটার কলার চেপে ধরতে ইচ্ছে হলো রানার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—কিছু একটা লুকাচ্ছেন ড. সিদ্দিকী। সেই শুরু থেকেই এই লুকোচুরি খেলা খেলে যাচ্ছেন তিনি। আর এ-কারণে নিজের পাশাপাশি অন্যদের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন—নিউয়ার্কে রানা পড়েছিল ভাড়াটে খুনিদের সামনে... এখন গোটা স্পেশালিস্ট টিমই একটা মিলিটারি অ্যাসল্টের মুখে পড়তে যাচ্ছে। কেন? গায়ের জোরে রহস্যটা তাঁর পেট থেকে বের করে আনতে ইচ্ছে হলো ওর।

কিন্তু এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। দশ মিনিটও সময় নেই হাতে, সঙ্গীরা সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রোধটাকে গলা টিপে মারল রানা, মারুফের দিকে তাকিয়ে

বলল, 'রেইডারে চোখ রাখো। ওরা কাছে চলে এলেই বলবে আমাকে।' এবার মনসুরের দিকে ফিরল ও। 'একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।'

'আপনিই বলে দিন কী করব, মাসুদ ভাই,' সোজাসুজি বলল স্পেশালিস্ট টিম-লিডার। 'আমি কিছু বলতে চাই না।'

'একা সিদ্ধান্ত নেব না, তোমাদের মতামত জানা দরকার। কে কে এখানেই থাকতে চাও?'

'থাকার প্রশ্ন আসছে কেন?' বিস্মিত গলায় বললেন ড. সিদ্দিকী। 'আমাদের পালাতে হবে!'

'পালালেই সব সমস্যার সমাধান হয় না, ডক্টর,' রানা বোঝাল। 'ভাল একটা ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে লড়াই করেও হামলাকারীদের হারিয়ে দেয়া যায়। আর আমাদের এই বাঙ্কার যে চমৎকার একটা ডিফেন্সিভ পজিশন, সেটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না?'

'আমার একটা পয়েন্ট ছিল, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল রফিক। 'আপনার সন্দেহ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে হেলিকপ্টারের ওদের কাছে শুধু থারমাল সেন্সরই না, অত্যাধুনিক সব ধরনের অস্ত্রও থাকবে। বাঙ্কারটা উড়িয়ে দিতে পারবে ওরা।'

'আমার মনে হয় পিছু হটাই এ-মুহূর্তে সবচেয়ে লজিকাল অ্যাকশন হবে,' যোগ করল শাহরিয়ার।

'কিন্তু যাব কীভাবে?' প্রশ্ন ছুঁড়ল মারুফ। 'হেলিকপ্টারটাকে টেকঅফ করতে দেখলেই পাগলা কুকুরের মত ছুটে আসবে ওরা। রকেট ছুঁড়ে ধ্বংস করে দিতে পারবে।'

'তা করবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'ওরা ড. সিদ্দিকীকে জ্যান্ত চায়।' নিউয়ার্কের হামলাকারীদের সতর্কতার

কথা মনে পড়ছে ওর। 'তবে হ্যাঁ, কপ্টার নিয়ে যে পালানো যাবে না, এটা ঠিক।'

'তা হলে?'

'বাঙ্কারের আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে দুটো জিপ আছে আমাদের,' বলে উঠল মনসুর। 'ওগুলো নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'সমস্যা একটাই,' শাহরিয়ার বলল। 'থারমাল সেন্সরে জিপগুলোকেও দেখতে পাবে ওরা।'

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'সবগুলোই ব্যবহার করি না কেন? দুটো জিপ আর একটা হেলিকপ্টার—একেকটা একেক দিকে যাবে। কোন্‌টায় ড. সিদ্দিকী আছেন, বোঝার উপায় থাকবে না ওদের। তাই কোনোটাই উড়িয়ে দেয়ার সাহস পাবে না।'

'ডিকয় টেকনিক—চমৎকার!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মনসুর। 'বেশিদূর যেতেও হবে না আমাদের। বিশ মাইল পশ্চিমে নিউ ইয়র্ক স্টেট থ্রু-ওয়ে... ওটায় উঠতে পারলেই নিশ্চিন্ত, প্রচুর ট্রাফিক থাকে রাস্তাটায়। ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে অসুবিধে হবে না, চাইলে গাড়ি পাল্টেও নেয়া যাবে।'

'সিদ্ধান্তটায় কারও আপত্তি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

দেখা গেল নেই, ড. সিদ্দিকীও চুপ করে আছেন।

'গুড,' বলল রানা। 'লেটস্‌ গো।'

চোদ্দো

পরবর্তী কয়েক মিনিট যান্ত্রিক দক্ষতায় কাজ করল সবাই। কী করতে হবে না-হবে, তা নিয়ে আলোচনা করল না কেউ। রানা এজেন্সির অভিজ্ঞ অপারেটররা খুব ভাল করেই জানে নিজ নিজ দায়িত্ব। কণ্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে পাশের আরেকটা রুমে গিয়ে ঢুকল ওরা—ওটা বাঙ্কারের অস্ত্রাগার। র‍্যাকে সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, একপ্রান্তের একটা কেবিনেটে রয়েছে অ্যামিউনিশন।

প্রথমেই বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট পরল সবাই, ড. সিদ্দিকীর দিকেও একটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এটা পরে ফেলুন,' বলল ও। 'আপনাকে খুন করতে চায় না ওরা, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির ব্যাপারে কোনও গ্যারাণ্টি দেয়া যায় না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভেস্ট পরতে শুরু করলেন বিজ্ঞানী। ততক্ষণে রফিক আর্মস্ বিতরণ করতে শুরু করেছে। পিস্তল নিল সবাই, সেইসঙ্গে একটা করে এম-১৬ অ্যাসল্ট রাইফেল। নামেই রাইফেল, আসলে ওগুলো মেশিনগানের মত ব্রাশফায়ার করতে পারে—ওভাবেই মডিফাই করে নেয়া হয়েছে। অস্ত্রটা সাধারণ মেশিনগানের চেয়ে হালকা, সহজে বহন করা যায়।

ড. সিদ্দিকীও হাত বাড়ালেন। রানা মাথা নেড়ে বলল, 'না,

আপনার অস্ত্র নেয়ার প্রয়োজন নেই। পিস্তলই চালাতে জানেন না, রাইফেল তো আরও পারবেন না। মাঝখান থেকে হয়তো আমাদের গায়েই গুলি করে বসবেন।'

'তা হলে আমি আত্মরক্ষা করব কীভাবে?' প্রতিবাদ করলেন সিদ্দিকী। 'খোদা না-করুন, আপনাদের কিছু হয়ে গেলে তো আমার হাতে একটা অস্ত্র থাকা দরকার।'

'প্রার্থনা করুন, যাতে তেমন কিছু না ঘটে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আর যদি প্রার্থনাটা কবুল না-ই হয়, তা হলে আমাদের লাশের হাত থেকে অস্ত্র নিয়েই ব্যবহার করতে পারবেন আপনি।'

'হায় আল্লাহ্! কী সব বলছেন আপনি!'

'দেখুন, কীভাবে ফায়ার করতে হবে,' নিজের রাইফেলটা দিয়ে ডেমোনস্ট্রেশন দেখাল রানা। 'স্টকটা কাঁধে ঠেকাবেন, ব্যারেলটা তাক করে রাখবেন টার্গেটের দিকে। দম বন্ধ করে ট্রিগার চাপবেন, ঠিক আছে? ফায়ারের সময় কিন্তু প্রচণ্ড একটা লাথি মারে এম-১৬, শক্ত করে ধরবেন, নইলে যত গুলিই করুন... সব আকাশের দিকে চলে যাবে। মনে থাকবে তো?'

'আশা করি,' নার্ভাস গলায় বললেন সিদ্দিকী।

'আবার বলছি, একেবারে বাধ্য না হলে অস্ত্র নেবেন না। আমরা মরলেও ক্ষতি নেই, হাত-পা ঝাড়া থাকলে সহজেই গাছগাছালির কাভার ব্যবহার করে দৌড়ে পালাতে পারবেন। হাতে অস্ত্র থাকলে স্রেফ বোঝা বাড়বে। বুঝেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী।

ইতোমধ্যে দৌড়ে গিয়ে কিচেনের স্টোভ আর আভেন বন্ধ করে এসেছে শাহরিয়ার। ও ফিরতেই সবার দিকে শেষবারের মত তাকাল রানা। বলল, 'রেডি? চলো বেরিয়ে পড়ি।'

লিভিং রুম হয়ে প্যাসেজওয়ে ধরে দ্রুত এগোল দলটা। দরজার কাছে গিয়ে প্যানেলে কোড চাপল মনসুর, খুলে গেল পাল্লা। বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

ভোর হয়েছে, কিন্তু ঘন গাছগাছালির কারণে পুরো উপত্যকা এখনও গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। ঠিকমত কারও মুখও দেখা যাচ্ছে না। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে মাটিতে সোঁদা গন্ধ, ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে। দূর থেকে ভেসে আসা রোটরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—প্রতি মুহূর্তে জোরাল হয়ে উঠছে শব্দগুলো। মারুফের দিকে তাকাল রানা, আগেই ঠিক করা হয়েছে—হেলিকপ্টার নিয়ে ও যাবে।

'গুড লাক, মারুফ,' বলল রানা। 'সাবধানে থেকো।'

'চিন্তা করবেন না,' হাসিমুখে বলল স্পেশালিস্ট টিমের ডেপুটি। 'ব্যাটারা অনেকক্ষণ থেকে উড়ছে, খুব বেশি ফিউয়েল বাকি আছে বলে মনে হয় না। অথচ আমার ট্যাঙ্ক একদম ভর্তি। বেশিক্ষণ ধাওয়া করতে পারবে না। সহজেই ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারব। সাবধানে বরং আপনারা থাকবেন!'

'ঠিক আছে। যাও।'

ঢাল বেয়ে নেমে গেল মারুফ, ল্যাণ্ডিং প্যাডের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। ও দৃষ্টিসীমার আড়ালে যেতেই সচল হলো রানা, সবাইকে অনুসরণ করতে বলে এগোল আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজের এন্ট্র্যান্সের দিকে।

বড় বড় কয়েকটা ঝোপের আড়ালে লুকানো দরজাটার কাছে পৌঁছে থামল ও। মনসুরকে সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করার ইশারা দিয়ে ডাকল, 'ড. সিদ্দিকী! আমার কাছাকাছি থাকুন।'

জবাব পাওয়া গেল না, বিজ্ঞানী এগিয়েও এলেন না। বিরক্ত

ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরল রানা, চোখে বিস্ময় ফুটল ভদ্রলোককে দেখতে না পেয়ে।

'ড. সিদ্দিকী! কোথায় আপনি?'

বাকিরাও এবার পিছনে তাকাল। সত্যিই দেখা যাচ্ছে না ড. সিদ্দিকীকে। আবছা আলোয় শুধু চোখে পড়ছে উপত্যকার গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভৌতিক অবয়ব, কোথাও কেউ নেই।

আগ্রাসী হেলিকপ্টারগুলোর আওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। শঙ্কা অনুভব করল রানা। চেঁচাল, 'ডক্টর সিদ্দিকী!!'

নিরুত্তর রইলেন বিজ্ঞানী।

'কী আশ্চর্য!' বিস্মিত গলায় বলল রফিক। 'গেলেন কোথায় ভদ্রলোক?'

'আমাদের সবার পিছনে ছিলেন সিদ্দিকী,' শাহরিয়ার বলল। 'পিছু পিছুই তো আসছিলেন, বাঙ্কার থেকে বেরুনোর পর অবশ্য আর খেয়াল করিনি।'

'এ-কথা বলিস না যে, ভদ্রলোক ভিতরেই রয়ে গেছেন!'

'তা বলছি না। তবে ভদ্রলোক ভীষণ নার্ভাস হয়ে ছিলেন, ও-অবস্থায় ব্লাডারের চাপ বাড়ে। বাথরুমে ঢুকেছেন হয়তো।'

সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করে ফেলেছে মনসুর, গুমগুম শব্দ তুলে খুলে যেতে শুরু করল গ্যারাজ ডোরের পাল্লা। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'নষ্ট করবার মত সময় হাতে নেই। শাহরিয়ার-রফিক, জিপদুটো নিয়ে এসো বাইরে। আমি দেখে আসছি ডক্টর বাঙ্কারেই রয়ে গেছেন কি না।'

'তোমার যাবার দরকার নেই,' রানা বলল, 'আমি যাচ্ছি...'

'সব কাজ আপনি করলে হবে?' বাধা দিয়ে বলল মনসুর। 'তা হলে আমরা আছি কীসের জন্যে? আপনি এখানেই থাকুন,

মাসুদ ভাই। শাহরিয়ার আর রফিককে নিয়ে তৈরি হোন, কোন্‌দিকে কীভাবে যেতে হবে, সেসব ঠিক করতে হবে না! আমি ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে নিয়ে আসছি।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না মনসুর, ছুটে চলে গেল বাঙ্কারের দিকে। রফিক আর শাহরিয়ারের দিকে তাকাল রানা। 'জিপ নিয়ে এসো,' বলল ও। 'আমি দেখি, ডক্টর বাইরেই কোথাও আছেন কি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যারাজে ঢুকে গেল দুই অপারেটর। রানা গিয়ে ঢুকল ঝোপঝাড়ের ভিতরে, চেঁচিয়ে ডাকছে সিদ্দিকীকে—কে জানে, ভয়ের চোটে কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারেন ভদ্রলোক। কিন্তু ডাকাডাকিই সার হলো, বিজ্ঞানীর খোঁজ পেল না ও। হাল ছাড়ল না রানা, ঝোপঝাড় ভেঙে খুঁজতে থাকল লোকটাকে।

আরও বেড়েছে রোটরের আওয়াজ, খুব কাছে চলে এসেছে তল্লাশিরত হেলিকপ্টার-তিনটে। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হতেই চমকে উঠল রানা—এখন পর্যন্ত মারুফের টেক-অফের শব্দ পায়নি ও। করছে কী ছেলেটা? এখনও যাচ্ছে না কেন? দেরি করলে তো পালাতে পারবে না, আটকা পড়ে যাবে।

রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে—কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে! বিজ্ঞানীকে খোঁজার চেষ্টা বাতিল করে দিল ও, দ্রুত ছুটল ল্যাণ্ডিং প্যাডের দিকে। জানতে হবে—মারুফ এখনও টেকঅফ করেনি কেন। সমস্যাটা কোথায়।

কাছাকাছি পৌঁছুতেই হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল ও, সবসময়ের মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হয়নি। মাথার উপর ক্যামোফ্লাজ নেটটাও আকাশ ঢেকে

রেখেছে আগের মত—সরানো হয়নি। আরেকটু এগোতেই নাকে ভেসে এল ঝাঁঝাঁল গন্ধ—এভিয়েশন ফিউয়েল! গন্ধের তীব্রতায় মনে হচ্ছে বড়সড় একটা লিক ঘটেছে ওখানে। তীক্ষ্ণ চোখে মারুফকে খুঁজল রানা, কিন্তু সামান্যতম নড়াচড়াও চোখে পড়ল না।

মন কু-ডাক ডাকছে, প্যাডের দিকে দৌড়াতে শুরু করল রানা... কিছু একটা ঘটেছে ওখানে—খারাপ কিছু! বেশিদূর যেতে পারল না ও, হঠাৎ পা বেধে গেল কীসের সঙ্গে যেন, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সোজা হয়ে পতনের আঘাতটা সয়ে নিল রানা, উঠে বসল। এম-১৬টা হাত থেকে ছুটে পড়ে গেছে, ওটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও কয়েক মুহূর্ত পরেই, এবার মাটির দিকে তাকাল কীসের ঠোকর খেল দেখার জন্য। পরমুহূর্তেই বুক খামচে ধরল কী যেন—দৃশ্যটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে স্পেশালিস্ট টিমের ডেপুটি, নিথর দেহ নিয়ে, ওর সঙ্গেই পা বেধে পড়ে গেছে রানা। মারুফের পিঠ থেকে বেরিয়ে আছে একটা ছুরির হাতল, পিছন থেকে ছোরা মারা হয়েছে ওকে, ল্যাণ্ডিং প্যাডে পৌঁছুতেই পারেনি বেচারা! ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে তাজা রক্ত, ভিজিয়ে ফেলছে চারপাশ। তাড়াতাড়ি পালস্ চেক করল রানা, তাতে লাভ হলো না। আগেই মারা গেছে মারুফ।

বিহ্বল হয়ে গেছে রানা, বিশ্বাস করতে পারছে না—এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথাও ঘামাতে পারল না, হঠাৎ চোখের কোণে কমলা আভা দেখে ঝট করে ঘুরল। লেলিহান শিখা দেখে থমকে গেল ও, চোখের পলকে গোটা ল্যাণ্ডিং প্যাডটাকে গ্রাস করল সেই আগুন, ছড়িয়ে

পড়ছে চারপাশের বনে-বাদাড়েও। এতক্ষণে গোটা আয়োজনটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে—শুধু মারুফকে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি খুনি, হোস ব্যবহার করে এভিয়েশন-ফিউয়েল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে পুরো প্যাড আর আশপাশের গাছপালা, তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধটা এজন্যেই পাচ্ছিল ও। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে নজর বোলাল রানা—আগুনটা কে লাগাল, দেখার জন্য। কিন্তু নেই কেউ, সম্ভবত সলতে-টলতে জাতীয় কিছুতে আগুন দিয়ে কেটে পড়েছে আগেই।

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাড়ছে আগুনটার পরিধি—অস্বাভাবিক নয় সেটা, এভিয়েশন-ফিউয়েল পৃথিবীর সবচেয়ে দাহ্য পদার্থগুলোর একটা। কাঁচা গাছপালা, ঝোপঝাড়... সব অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে আগুনের কাছে, চড়চড় করে পুড়ছে ওগুলো। চামড়ায় তীব্র আঁচ অনুভব করে নিজের অজান্তেই দু'পা পিছিয়ে গেল রানা, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। অসহায়ভাবে তাকাল মারুফের লাশের দিকে, ওকে আগুনে ফেলে রেখে যেতে মন চাইছে না, আবার লাশটা সঙ্গে নিলেও বাকিদের কাছে দ্রুত পৌঁছুতে পারবে না। ইতোমধ্যে ওদের হেলিকপ্টারটাকে গ্রাস করেছে আগুন, ফিউয়েল ট্যাঙ্কে পৌঁছুলেই বিশাল বিস্ফোরণ ঘটবে। ক্যামোফ্লাজ নেটটাও পুড়তে শুরু করেছে। সেফ-সাইটের অস্তিত্ব ফাঁস হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখুনি সরে যেতে হবে ওদের।

কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল রানা, তারপর ভাবাবেগটাকে দমন করে উল্টো ঘুরেই ছুটতে শুরু করল বাঙ্কারের দিকে। একটু পরেই পিছনে গগনবিদারী শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল—দূর থেকেও পিঠে শকওয়েভের ধাক্কা অনুভব করল ও। তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল পুরো উপত্যকা, চোখ ঝলসে যেতে

চাইল।

থামল না রানা, ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটতে থাকল গ্যারাজের এণ্ট্র্যান্সের দিকে। একটু পরেই ঢালের গোড়ায় পৌঁছে গেল ও, দূর থেকে দেখতে পেল জিপদুটোকে–গ্যারাজ থেকে বের করে এনেছে শাহরিয়ার আর রফিক। ড্রাইভিং সিটে হতচকিত চেহারা নিয়ে বসে আছে দুজনেই—আগুন আর বিস্ফোরণের শব্দে বোকা বনে গেছে। মনসুরকে দেখা গেল না, এখনও ফেরেনি বোধহয়। ওকে উদয় হতে দেখে চেঁচিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল শাহরিয়ার, কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না।

রানার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে দুটো রকেট এসে আঘাত করল জিপগুলোকে। নিমেষে আগুনের গোলায় পরিণত হলো বাহনদুটো, টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। দুই আরোহীও একই সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

বজ্রাহতের মত থমকে গেল রানা, কোনোমতে মাথা ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই একটা অ্যাসল্ট চপার দেখতে পেল, ডানায় রকেট লঞ্চার বসানো আছে... ওখান থেকেই ছোঁড়া হয়েছে রকেটগুলো। জিপদুটোকে ধ্বংস করে এবার রানার দিকে মনোযোগ দিল চপারের আরোহীরা, হোভার করতে করতে ক্রমশ ওটা ঘুরে যাচ্ছে ওর দিকে।

নিজেকে নাঙ্গা মনে হলো রানার কাছে, কোনও কাভার নেই কাছাকাছি, পাহাড়ি ঢালে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় রকেট তো দূরের কথা... বুলেটের হাত থেকেও বাঁচাতে পারবে না ওকে। চপারের নাক এখন রানার দিকে, ফিউজলাজের তলায় বসানো হেভি মেশিনগানটা তাক হয়ে গেছে একই সঙ্গে। মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখা যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। ঠিক তখুনি ঢালের আরেক পাশে উদয় হলো একটা ছায়ামূর্তি, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে

এম-১৬ থেকে অঝোর ধারায় গুলি ছুঁড়তে শুরু করল চপারের উপর—রানার দিক থেকে ওটার গানারের মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে চায়।

'মাসুদ ভাই!' ডাক শোনা গেল। 'চলে আসুন এদিকে!'

মনসুর। বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসেছে ও।

ডাক শুনে ঝট করে বাঙ্কারের এন্ট্রান্সের দিকে ঘুরল রানা। ছুটতে শুরু করল। পিছনে গর্জে উঠল হেলিকপ্টারের হেভি মেশিনগান, রানাকে না পেয়ে কামড় বসাল মাটিতে—ধুলোর ঝড় উঠল ওর পিছনে, একই সঙ্গে ছিন্নভিন্ন ঝোপঝাড় উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা, গানার যেন লক্ষ্যস্থির করতে না পারে। শরীরের খুব কাছ দিয়ে বেশ কিছু বুলেট ছুটে গেল, তবে কাজ হলো কৌশলটাতে, ওর গায়ে লাগল না একটাও। হেলিকপ্টার-মাউণ্টেড মেশিনগান আসলে বড় আকারের স্থির গ্রাউণ্ড-টার্গেট ধ্বংস করার জন্য উপযোগী অস্ত্র, ওটা দিয়ে ছুটন্ত একজন মানুষকে ঘায়েল করা কঠিন।

বাঙ্কারের এন্ট্রান্স বেশি দূরে নয়, খুব দ্রুত ওখানে পৌঁছে গেল রানা, মনসুরকে নিয়ে ঢুকে পড়ল প্যাসেজওয়েতে, কনসোলের বাটন টিপে বন্ধ করে দিল দরজাটা। দু'সেকেণ্ড পরেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ওপাশটা—রকেট ছোঁড়া হচ্ছে এন্ট্রান্স লক্ষ্য করে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, এত সহজে ভাঙবে না দরজাটা। সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ করল ও শান্তভাবে—ভুলক্রমে যাতে কাজটা বাদ না পড়ে, তা হলে নকআউট গ্যাস ছড়িয়ে গিয়ে ওদেরকেই বেহুঁশ করে ফেলবে।

কনসোলে সবুজ বাতি জ্বলতেই ঘুরল ও, মুখোমুখি হলো

মনসুরের। স্পেশালিস্ট টিম-লিডারের চেহারায় একটা বিহ্বল ভাব ফুটে আছে, হঠাৎ করে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখে হতচকিত হয়ে গেছে ও। রানাকে ঘুরতে দেখে কোনোমতে শুধু বলল, 'মাসুদ ভাই, রফিক আর শাহরিয়ার...'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'সরি, প্রথম রকেটদুটো ওদেরকেই হিট করেছে...'

'আর মারুফ?'

'ল্যাণ্ডিং প্যাডের পাশে পেয়েছি ওকে... পিঠে ছুরি মারা অবস্থায়।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মনসুর।

'এসব নিয়ে আলোচনার এখন সময় নেই,' রানা বলল। 'ড. সিদ্দিকীকে পেয়েছ?'

নিজেকে সামলে মনসুর বলল, 'ভিতরে নেই ভদ্রলোক। তবে পিছনের ইমার্জেন্সি একজিটটা খোলা পেয়েছি আমি—বিপদ দেখে ওখান দিয়েই বেরিয়ে গেছেন হয়তো। আর একটা ব্যাপার... দরজাটার তলায় গোঁজ লাগানো ছিল, যাতে আবার ওখান দিয়ে বাঙ্কারে ঢোকা যায়। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অবস্থা বেগতিক দেখলে আবার ফিরে আসার প্ল্যান করেছেন।'

'বন্ধ করেছ ওটা?'

'সময় পাইনি, তার আগেই তো নরক ভেঙে পড়ল। এখন যাব?'

'আগে কন্ট্রোল রুমে চলো, বাইরের অবস্থা দেখে নিই। আমাদেরকেও হয়তো পিছনের দরজাটা দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে, খামোকা বন্ধ করে লাভ নেই।'

মনসুর-সহ কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকল রানা—মনিটরিং

কনসোলটা চালু রেখে গিয়েছিল মারুফ, ওটার দিকে তাকাল। বেশ কিছু স্ক্রিন ফিড হারিয়েছে—ঝিরঝির করছে ওগুলো, সম্ভবত বাইরে বসানো ক্যামেরাগুলো আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে। যে-ক'টা অক্ষত আছে, সেগুলো থেকে দেখা গেল—আগুনটা বিশাল আকার ধারণ করেছে, উপত্যকার বেশিরভাগ অংশই এখন লেলিহান শিখার দখলে। চোখের সামনে আরও কয়েকটা মনিটর ঝিরিঝিরিতে ঢেকে গেল—বাইরের ক্যামেরাগুলো একে একে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একটা স্ক্রিনে হামলাকারী কপ্টারগুলোকেও দেখা গেল—হোভার করতে করতে রকেট ছুঁড়ছে বাঙ্কারের প্রবেশপথের দিকে। অবশ্য তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই—দরজাটা পুরু টাইটেনিয়ামের তৈরি, সহজে ভাঙবে না।

নাকে একটা কটু গন্ধ ভেসে আসতেই মনসুরের দিকে তাকাল রানা। 'ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই ভেন্টিলেশন শাফট দিয়ে আসছে,' বলল মনসুর। কনসোলের একটা বাটন চাপল। 'মুখটা বন্ধ করে দিলাম। এখন আর বাইরের বাতাস বা ধোঁয়া ঢুকবে না। ভিতরে যা বাতাস আছে, তা দিয়ে আগামী দু'দিন কাটিয়ে দিতে পারব আমরা। অবশ্য না পারলেও ক্ষতি নেই। ফিউয়েল শেষ হয়ে গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে যেতেই হবে ওদের।'

'যাবার আগে কয়েকজনকে নামিয়ে রেখে যেতে পারে,' বলল রানা। 'নাহ্, কোণঠাসা হওয়া যাবে না, তার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল মনসুর। 'কিন্তু সান্টানা এভাবে মরিয়া হয়ে উঠল কেন, বুঝতে পারছি না। যেভাবে হামলা চালাচ্ছে, তাতে আমাদের পাশাপাশি তো ড. সিদ্দিকীও

মারা পড়তে পারেন।'

'এরা কলাম্বিয়ান নয়... হতে পারে না,' বলল রানা, কণ্ঠে নিশ্চিত ভাব। সামনের স্ক্রিনগুলোর উপর দ্রুত চোখ বোলাচ্ছে ও—ওগুলোর আউটপুট প্রতি-মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট তীব্র আলোর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হতে পারছে না লেন্সগুলো। 'সাণ্টানার কাছে এ-ধরনের ইকুইপমেণ্ট থাকতে পারে না।'

'তা হলে কে...'

কথা শেষ হলো না মনসুরের, তার আগেই মাথার উপরের ভেণ্টিলেশন ডাক্ট দিয়ে ভক ভক করে ঢুকে পড়ল রাশ রাশ কালো ধোঁয়া, পুরো রুমটাকে ছেয়ে ফেলছে। কাশতে শুরু করল রানা ও মনসুর, নাক আর গলা জ্বালাপোড়া শুরু হয়েছে... ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে।

'শাফটের মুখ বন্ধ হয়নি, মনসুর,' কোনোমতে কাশি সামলে বলল রানা।

'কী বলছেন!' বলল মনসুর। 'হবে না কেন? আপনার সামনেই তো বন্ধ করলাম। সিস্টেমে কোনও ত্রুটি থাকলে লাল বাতি জ্বলত।'

'তা হলে ধোঁয়া আসছে কোত্থেকে?'

'কী জানি!' বোকা বোকা দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকাল মনসুর। 'বুঝতে পারছি না।'

ঘন কালো ধোঁয়া নেমে আসছে ডাক্টের ছাকনি ভেদ করে। কয়েক সেকেণ্ড স্থির রইল স্পেশালিস্ট টিম-লিডার, তারপর হঠাৎই সচকিত হয়ে উঠল ও। ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'মাসুদ ভাই, গন্ধটা...'

রানাও চিনতে পেরেছে। 'এভিয়েশন ফিউয়েল!' ঝট্ করে

ডাক্টের দিকে তাকাল ও, তারপর মনসুরের দিকে। 'বেরোও! এখানে থাকা চলবে না!'

দরজা খুলে ছিটকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা আর মনসুর, সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল। চোখের সামনে পুরো বাঙ্কারের ভিতরটায় আগুনের উদ্বাহু নৃত্য দেখতে পাচ্ছে, এভিয়েশন ফিউয়েলের তীব্র গন্ধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে জায়গাটা। পিছনে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ হলো—ভেণ্টিলেশনের ছাকনিটা ভেঙে গেছে.... ডাক্ট ধরে আগুনের শিখা পৌঁছে গেছে কণ্ট্রোল রুমে।

'ইয়াল্লা... ক্...কীভাবে...' থতমত খেয়ে গেছে মনসুর, মুখের কথা আটকে যাচ্ছে।

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। এটা দুর্ঘটনা নয়, আগুনটা শাফট দিয়ে ভিতরে ঢোকেনি। সিকিউরিটি ক্যামেরায় ও দেখতে পেয়েছে, পাহাড়ের মাথায়... যেখানে শাফটের মুখ... বাইরের দাবানল এখনও ওখান পর্যন্ত পৌঁছেনি। সেক্ষেত্রে ভিতরে আগুন লাগার একটাই কারণ থাকতে পারে।

স্যাবোটাজ!

কিন্তু কে এই কাজ করল, কীভাবে করল, কেন করল... এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন। আগে নিজেদের বাঁচতে হবে। ভিতরের আগুন এখনও ততটা তীব্র হয়ে ওঠেনি, ওটা ওদের আটকে ফেলার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে বাঙ্কার থেকে। মনসুরের হাত ধরে টান দিল রানা। 'এসো, বেরোতে হবে!'

'সামনের দিকে যাওয়া যাবে না,' কাশতে কাশতে বলল মনসুর। 'হেলিকপ্টারগুলো আছে ওখানে, আগুনও বেড়ে গেছে।'

'পিছনের ইমার্জেন্সি একজিটটা ব্যবহার করব,' বলল রানা। 'ওদিককার জঙ্গলে এখনও আগুন পৌঁছায়নি।'

ছুটতে ছুটতে করিডর পেরিয়ে লিভিং এরিয়ায় বেরিয়ে এল ওরা—এখানে আগুনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। আগুনের পয়েন্ট অভ অরিজিন বোধহয় এটাই।

ব্যস্ত চোখে জ্বলন্ত লিভিং এরিয়ার উপর নজর বোলাল রানা, ভাবছে এই নরক ভেদ করে কীভাবে অন্যপাশে যাবে। দেখতে পেল একটা পথ, মনসুরকে দেখিয়ে বলল, 'এগোও, আমি পিছনে আছি!'

ডানদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে এগোতে শুরু করল দুজনে একজিট ডোরের দিকে, ওখানটায় এখনও সামান্য ফাঁকা জায়গা রয়েছে। তারপরেও উন্মুক্ত মুখ আর শরীরের সামনের অংশে তীব্র হলকা লাগল, বেশিক্ষণ থাকলে আগুন ধরে যাবে পোশাকে। ভাগ্য ভাল, উত্তাপটা অগ্রাহ্য করে দ্রুত ওরা পৌঁছে যেতে পারল অন্যপাশে। বেরুনোর দরজাটা এখন মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

লাথি মেরে দরজার তলায় লাগানো গোঁজটা খুলল মনসুর, তারপর হাতল টেনে খুলে ফেলল পাল্লাটা। দুজনে বেরিয়ে গেল জ্বলন্ত বাঙ্কার থেকে। ওপাশটায় সামনের দিকের মত আরেকটা কংক্রিটের প্যাসেজওয়ে আছে, সেটা ধরে ছুটতে থাকল ওরা—সামনে স্পেশালিস্ট টিম লিডার, পিছনে রানা। ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে খোলা দিকটা থেকে, সবুজ অরণ্য দেখে বোঝার উপায়ই নেই, ছোট্ট পাহাড়টার ঠিক উল্টোপাশে কী তাণ্ডব চলেছে।

প্রায় শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে... এমন সময় হঠাৎ ঝাঁকি খেল মনসুর, চিৎকার করে ছিটকে গেল পিছনে। তৈরি ছিল না

রানা, ভারী দেহটা গায়ের উপর পড়তেই ভারসাম্য হারাল, হুড়মুড় করে সঙ্গীসহ পড়ে গেল প্যাসেজের মেঝেতে। দুজনের হাত থেকেই ছুটে কয়েক হাত দূরে চলে গেল এম-সিক্সটিন।

সামনে কী ঘটেছে দেখতে পায়নি রানা, কানে শুধু ভেসে এল অটোমেটিক রাইফেলের গুরুগম্ভীর গর্জন... এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে কেউ ওদের লক্ষ্য করে। মাথার উপর দিয়ে মাতালের মত ছুটছে এলোমেলো বুলেট, কংক্রিটে ঘষা খেয়ে ফুলকি ছোটাচ্ছে, প্রতিধ্বনি তুলছে।

যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ করে থেমে গেল গুলিবর্ষণ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কর্ডাইটের গন্ধ। মনসুরের দেহের নীচে চাপা পড়ে গুঙিয়ে উঠল রানা, বাম কাঁধে প্রচণ্ড একটা আঘাত লেগেছে কীভাবে। গাছের সারি থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ কানে এল ওর—মনে হলো, অ্যাসল্ট রাইফেলের ফায়ারিং চেম্বারে আটকে যাওয়া শেল খোলার চেষ্টা করছে কেউ।

গায়ের উপর নিস্তেজ হয়ে রয়েছে মনসুর। রানা ডাকল, 'মনসুর!'

জবাব পাওয়া গেল না।

'মনসুর, সরো।'

এবারও নিরুত্তর স্পেশালিস্ট টিম লিডার। নাক কোঁচকাল রানা, কর্ডাইটের গন্ধ ছাপিয়ে কটু আরেকটা গন্ধ পাচ্ছে... রক্তের! তাড়াতাড়ি নিস্তেজ দেহটা দুহাতে ঠেলে সরাল ও, উঁচু হলো কনুইয়ে ভর দিয়ে... এবং থমকে গেল।

চেহারা চেনার আর জো নেই, অন্তত তিনটে বুলেট আঘাত করেছে মনসুরকে, উড়িয়ে নিয়ে গেছে মুখমণ্ডল। ঘন লাল রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষতগুলো থেকে। নিজের কাঁধটার দিকে তাকাল

ও—হ্যাঁ, গুলি লেগেছে ওর-ও। কেভলার ভেস্টের স্ট্র্যাপ আর গলার মাঝখানের উন্মুক্ত অংশটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট, রক্ত বেরুচ্ছে... ব্যথা লাগছিল সেজন্যেই।

জঙ্গলের দিক থেকে শাপশাপান্ত ভেসে আসতেই চমক ভাঙল রানার, মাথা ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকে তাকাল ও। বাতাসে একটা ঝোপের পাতা নড়ে উঠতে দেখল, আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়—ড. সিদ্দিকী! হাতে একটা রাইফেল রয়েছে বিজ্ঞানীর... ঠিক মারুফেরটার মত! ককিং মেকানিজম নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে লোকটা, নিশ্চয়ই আবার গুলি করবার মতলব!

পরমুহূর্তেই চেম্বারে জ্যাম হয়ে থাকা শেলটা খসে পড়বার আওয়াজ পেল রানা, ড. সিদ্দিকীর চেহারাটা খুশি খুশি হয়ে উঠতে দেখল। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও, অস্ত্র কুড়ানোর সময় নেই, তাই উল্টো ঘুরে খালি হাতেই ফের ছুটল বাঙ্কারের দিকে। পিছনে গর্জে উঠল সিদ্দিকীর রাইফেল, এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে এল রানার ডাইনে-বাঁয়ে। একজিট ডোরের আধখোলা পাল্লাটা ঠেলে ডাইভ দিল ও, ঢুকে পড়ল বাঙ্কারের ভিতরে। পা দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ওপাশে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শোনা গেল—নিশানা ঠিক করে ফেলেছেন বিজ্ঞানী, প্রতিটা বুলেট এসে বিঁধছে এখন দরজায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে দরজা আর পিছনের আগুনের দিকে পালা করে তাকাল রানা।

ফাঁদে পড়ে গেছে ও।

পনেরো

তীব্র একটা ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রানার ভিতরে। ইচ্ছে হলো এক্ষুনি ড. সিদ্দিকীকে ধরে এনে খুন করে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। একজিট ডোরের ওপাশের প্যাসেজওয়ে এখন শুটিং গ্যালারিতে পরিণত হয়েছে, দরজা খুললেই ওকে মোরব্বার মত কেঁচে ফেলবে বিজ্ঞানীর ছোঁড়া বুলেটবৃষ্টি। একটু আগেও তা-ই ঘটতে চলেছিল, শুধুমাত্র মনসুর সামনে থাকায় এবং সিদ্দিকীর রাইফেল জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বেঁচে গেছে ও।

কিন্তু এখানেও থাকা চলে না—মোরব্বা হবে না বটে, কিন্তু আগুন ওকে রোস্ট বানিয়ে ফেলবে। উভয় সঙ্কটে পড়েছে রানা। বেরুনোর বিকল্প রাস্তা হচ্ছে সামনের এণ্ট্র্যান্সটা, কিন্তু সিকিউরিটি ক্যামেরা নষ্ট হবার আগে ওদিককার প্যাসেজটায় আগুন ধরে যেতে দেখেছে ও, ঢালের কাছাকাছিও দাবানল পৌঁছে গেছে। হামলাকারী চপার-তিনটে তো আছেই। ওখান দিয়ে কি আদৌ বেরুনো সম্ভব? আরেকটা গোপন পথ আছে অবশ্য... একটা টানেল, ওটার কথা ড. সিদ্দিকীকে জানায়নি ওরা। টানেলটা অ্যামিউনিশন রুমের ভিতর থেকে সোজা চলে গেছে হেলিপ্যাড পর্যন্ত। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড শুরুই হয়েছে ওই হেলিপ্যাড থেকে, আগুনের তীব্রতা তাই সবচেয়ে বেশি হবার

কথা ওখানটায়। তা ছাড়া সংকীর্ণ টানেলটায় বাতাস কী পরিমাণ আছে, কে জানে। ধোঁয়া ঢুকে পড়লে সর্বনাশ হবে। সবদিক ভেবে টানেলটা ব্যবহারের পরিকল্পনা বাতিল করে দিল রানা।

আর কোনও বুদ্ধি আসছে না মাথায়, কী করবে—বুঝে উঠতে পারছে না ও। হঠাৎ নজর পড়ল কাঁধের দিকে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে। ওটা না থামালে আগুন বা গুলির চেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি দেয়াল ঘেঁষে লিভিং এরিয়া পেরুল রানা, করিডর ধরে ছুটল কিচেনের দিকে... ওখানে ফার্স্ট এইড কিট আছে।

ফুসফুসে কালো ধোঁয়া ঢুকছে, খক খক করে কাশতে শুরু করল ও। ডান হাত ভাঁজ করে নাক-মুখ ঢাকল রানা, এলোমেলো পায়ে এগোতে থাকল—শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। কমে গেছে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ, রিফ্লেক্স কাজ করছে না ঠিকমত, রক্তক্ষরণে দুর্বলও হয়ে পড়েছে ও। চোখদুটোও জ্বালাপোড়া করছে ভীষণ।

লিভিং এরিয়া থেকে কিচেনের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু এসব সমস্যার কারণে ওটুকুই পেরুতেই যেন যুগ-যুগান্তর লেগে গেল। ভিতরে ঢুকে সামান্য স্বস্তি অনুভব করল রানা, এখানে এখনও আগুন পৌঁছেনি। কিন্তু কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলেছে অভ্যন্তর, তার মধ্যেই দেয়াল হাতড়ে ফার্স্ট এইড বক্সটা খুঁজে বের করল ও।

কাঁপা কাঁপা হাতে বক্সটা খুলল রানা, টান দিয়ে ভিতরের সমস্ত জিনিস এনে ফেলল কিচেনের কাউন্টারের উপর। লাল রঙের কয়েকটা পাউচ রয়েছে ওর মধ্যে, প্রত্যেকটার ভিতরে হাতের মুঠি আকারের *ব্লাড-স্টপার* গজ থাকে। কিন্তু দরজায়

আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠতে দেখে ও বুঝতে পারল, ব্লাড-স্টপার ব্যবহার করে ড্রেসিং নেবার সময় নেই, তার আগেই পুড়ে মরবে। তাই ঝট্ করে রূপালি রঙের এক রোল ডাক্ট-টেপ তুলে নিল, মাথাটা খুলে ওটা থেকে দুটো টুকরো বের করল। শার্টের হাতা ছিঁড়ে ঘাড়ে লেগে থাকা রক্ত মুছল রানা, তারপর টেপের টুকরোদুটো ক্রস আকারে বসিয়ে দিল ক্ষতের উপর। টেপদুটো হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরল ও, আঠালো দিকটা এর ফলে ভালমত আটকে গেল চামড়ায়, রক্তপাত বন্ধ হলো সাময়িকভাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ হতেই আবার ছুটল রানা, আগুনের শিখা টপকে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে। লিভিংরুমের পাশেই একটা বাথরুম আছে, ঢুকল গিয়ে ওটায়। শাওয়ার ছেড়ে পুরো শরীর ভালমত ভেজালো ও, তারপর একটা টাওয়েল ভিজিয়ে পাগড়ির মত বেঁধে ফেলল মাথাতে। শরীর ভিজে যাওয়ায় আগুন কিছুটা সময় ওর নাগাল পাবে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রথমে আশপাশের রুম আর করিডর থেকে তিনটে ফায়ার-এক্সটিংগুইশার জোগাড় করল ও, তারপর ছুটতে শুরু করল বাঙ্কারের এণ্ট্র্যান্সের দিকে। বেরুনোর জন্য ওই পথটাই ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে—আগুন আছে বটে, তবে সেটা এক দিক থেকে সুবিধেজনক ওর জন্যে। হামলাকারী চপারগুলোর আরোহীরা আগুনের ভিতর ওকে দেখতে পাবে না, আগুনের কারণে নীচে নামারও সাহস পাবে না। একটু বুদ্ধি খাটালেই ওখান দিয়ে পালানো সম্ভব।

দরজার কাছে এসে এক্সটিংগুইশারগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। আল্লাহ-খোদার নাম জপে সিকিউরিটি কোড পাঞ্চ

করল—অটোমেটিক তালাটা না খুললে সর্বনাশ হবে! তবে ওর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন সৃষ্টিকর্তা, কোড টেপা শেষ হতেই সবুজ বাতি জ্বলে উঠল কনসোলে, তালার বোল্ট সরে যাবার মৃদু খুট্ শব্দও শোনা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাতলে হাত দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাহতের মত পিছিয়ে গেল। ধাতব হাতলটা ভীষণ গরম হয়ে আছে!

পকেট থেকে রুমাল বের করল রানা, ওটার সাহায্যে ধরল আবার হাতলটা, মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল। পাল্লাটা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো ও। এবারও উত্তাপ অনুভব করছে, তবে সেটা শুধু হাতে নয়, সারা শরীরে! খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে আগুনের হলকা, যেন হিংস্র পশু, কামড় বসাচ্ছে গায়ে।

এণ্ট্রান্স ডোরের ওপাশে প্যাসেজওয়েটা জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়েছে। শোঁ-শোঁ করে প্রচণ্ড আওয়াজ উঠল বাতাসের। চরম উত্তাপ বাঙ্কারের ভিতরের সমস্ত অক্সিজেন শুষে নিচ্ছে। দৃশ্যটা ভয়াবহ।

তবে বিচলিত হলো না রানা, কীভাবে এই আগুনকে মোকাবেলা করবে, তা ঠিক করে ফেলেছে আগেই। পিছন থেকে এক্সটিংগুইশার তিনটে তুলে নিল ও, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জ্বলন্ত প্যাসেজওয়ে-র ভিতরে ছুঁড়ে দিল একে একে। ঠং ঠং করে আছড়ে পড়ল ওগুলো। নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে গেল রানা। অপেক্ষা করছে ফলাফল দেখবার জন্য।

উচ্চচাপে ধাতব সিলিণ্ডারে ভরে রাখা হয় অগ্নিনির্বাপনী কেমিক্যালগুলোকে। ও আশা করছে, আগুনের তাপে সিলিণ্ডারের বহিরাবরণ দুর্বল হয়ে গেলে বিস্ফোরণ ঘটবে। এতে শকওয়েভের ধাক্কায় সমস্ত বাতাস সরে যাবে, অক্সিজেন

না পেয়ে আগুনটা বাধ্য হবে নিভে যেতে। এভাবে বিস্ফোরণের মাধ্যমে তেল ও গ্যাসকূপের আগুন নেভানো হয়, জানা আছে রানার। এখানে কতদূর কার্যকর হয় কৌশলটা—সেটাই দেখার বিষয়।

কয়েক সেকেণ্ড পরই বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। দরজা থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল রানা, তারপরও শকওয়েভের ধাক্কাটা এসে বুকে লাগল ঘুসির মত। পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে দেয়াল ধরে তাল সামলাল। আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটতেই লাফ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও, ছুটে আসা শকওয়েভের হাত থেকে বাঁচল এবার—শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল ওটা। তৃতীয় বিস্ফোরণটা ঘটল ঠিক দু'সেকেণ্ড পর। শকওয়েভটা চলে যেতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, দরজা পেরিয়ে প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পড়ল।

পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই কাজ হয়েছে বিস্ফোরণে। প্যাসেজের অনেকখানি অংশ ফাঁকা দেখতে পেল রানা—আগুন নিভে গেছে। এক্সটিংগুইশার থেকে ছিটকে বেরুনো কেমিক্যালও ভূমিকা রেখেছে এতে।

দম বন্ধ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রানা, ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেল নিমেষে, সামনে আবার আগুনের দেয়াল দেখতে পেল, কিন্তু থামল না। জ্বলন্ত শিখা ভেদ করে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে এসে ডাইভ দিল বাইরে। ঢালের উপর কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়ল ও, ঝোপঝাড় ভেঙে গড়াতে শুরু করল নীচে। বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা বড় পাথর পড়ল, সেটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল গড়ানো। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও।

কয়েক সেকেণ্ড নিস্পন্দভাবে পড়ে রইল রানা, আঘাতটা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। এই ফাঁকে আশপাশটা ব্যস্ত চোখে

জরিপ করল ও—দাউ দাউ করে জ্বলছে গাছপালা, পাহাড়ের ঢাল আর জঙ্গল অনেকটাই গ্রাস করে ফেলেছে আগুন। চপারগুলোও যায়নি, নিরাপদ দূরত্বে থেকে হোভার করছে।

উঠে দাঁড়াল রানা। মাথা থেকে খুলে ফেলল টাওয়েলটা—সারা শরীরের মতই ওটা তীব্র উত্তাপে খটখটে শুকনো হয়ে গেছে। রোটরের গর্জন বেড়ে যেতে শুনে শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা তুলে তাকাল, ওকে দেখে ফেলেছে নাকি? কিন্তু না, ওর দিকে নয়, ঢালের যে-পাশটায় আগুন ঠিকমত পৌঁছায়নি, সেদিকে গিয়ে পজিশন নিয়েছে দুটো চপার।

দুপাশের হ্যাচ খুলে যেতে দেখল রানা, সেখান দিয়ে দড়ি ফেলা হলো, কয়েক মুহূর্ত পরেই র‍্যাপলিং করে নামতে শুরু করল কয়েকজন মানুষ। মোট পাঁচজন—প্রত্যেকের পরনে কালো রঙের কমব্যাট ফেটিগ, পিঠে ঝুলছে কম্প্যাক্ট সাবমেশিনগান, মাথায় হেলমেট আর কানে ইয়ারফোনও রয়েছে। লোকগুলোর গতিবিধি মুগ্ধ করবার মত—বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই, সহজ-সাবলীলভাবে দড়িতে পিছলে নেমে আসছে। সন্দেহ নেই, উঁচু মানের ট্রেইনিং পাওয়া সৈনিক এরা।

ধীরে ধীরে ঢাল ধরে নেমে যেতে শুরু করল রানা, যা-দেখার দেখে ফেলেছে। খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, মিগুয়েল সাণ্টানা কেন, দুনিয়ার কোনও ড্রাগলর্ডের পক্ষেই এ-ধরনের প্রশিক্ষিত সৈনিক ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র মিলিটারিতেই এ-ধরনের ট্রেইনড্ পার্সোনেল থাকে, তা-ও আবার সব শাখায় নয়, শুধুমাত্র স্পেশাল অপারেশন্সে! টাকা খরচ করে এসব লোক ভাড়া করা যায় না।

হেলিকপ্টারগুলোকে আবার নড়তে দেখে সংবিৎ ফিরল

ওর—বিপদ কাটেনি। দাবানলে আক্রান্ত জঙ্গলের উপর ট্যাকটিক্যাল পজিশন নিতে যাচ্ছে ওগুলো, যাতে ওদের গ্রিড ভেদ করে কেউ পালাতে না পারে। নীচে তল্লাশি চালাবে গ্রাউণ্ড-টিম, উপর থেকে চপারগুলো থারমাল সেন্সরের মাধ্যমে লুকআউট রাখবে—একেবারে ছক-বাঁধা প্রসিডিওর ফলো করছে হামলাকারীরা।

আগুন এড়িয়ে চলতে পারবে না রানা, ওকে দেখতে পাবে ওরা। দৌড়ুনোও যাবে না, সেন্সরে মুভমেণ্ট ধরা পড়বে। বাঁচতে হলে একটাই উপায় আছে—আগুনের শিখার যতটা সম্ভব কাছাকাছি থেকে ধীরে-ধীরে সরে যেতে হবে। সেটাই করবে বলে ঠিক করল ও।

একটা শুকনো প্রাকৃতিক নালা দেখতে পেল রানা, জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে উত্তরমুখী হয়ে। তলায় তেমন ঝোপঝাড় নেই, ফলে আগুন ধরেনি। আশান্বিত হয়ে উঠল ও, ক্রল করে ওটাতে নেমে পড়ল। চারপাশের গনগনে বাতাস ঘিরে ধরেছে ওকে, ঠুস-ঠাস করে ফাটছে আশপাশের ডালপালা। শরীর ঝলসে যেতে চাইছে, তারপরও স্বস্তি অনুভব করল ও—নড়াচড়ার শব্দ ঢাকা পড়ে যাবে এই নরকযজ্ঞের ভিতরে, তীব্র উত্তাপ ওকে চপারগুলোর থারমাল সেন্সরের চোখ থেকেও অদৃশ্য করে রাখবে।

উঠে দাঁড়াল রানা, নিচু হয়ে এগোতে শুরু করল নালা ধরে। তবে ধীরগতিটা বেশিক্ষণ চালু রাখা গেল না, আগুনটা এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, নালার ভিতরেও ওকে পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে, রুদ্ধ করে দিতে চাইছে শ্বাস-প্রশ্বাস; বাধ্য হয়ে একটু পরেই ছুটতে শুরু করল ও, যত দ্রুত সম্ভব এই মরণফাঁদ থেকে বেরুতে হবে ওকে। নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

চোখে ঝাপসা দেখছে রানা, চামড়া শুকিয়ে খসখসে কাগজের মত হয়ে গেছে, চুল আর চোখের পাপড়ি পুড়তে শুরু করেছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, বিশুদ্ধ বাতাসের স্বল্পতার কারণে ঘন ঘন শ্বাস নিতে হচ্ছে... হাইপার-ভেণ্টিলেশনের তালে তালে হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। দাঁতে দাঁত পিষে শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে ও। চেষ্টা করছে নালার দুপাশে নজর রাখার। প্রচলিত ট্যাকটিকস্ অনুসারে অগ্নিকাণ্ডের পেরিমিটারে পজিশন নেবার কথা গ্রাউণ্ড টিমের সদস্যদের, যাতে চপারের থারমাল সেন্সরকে ফাঁকি দিলেও মনুষ্য-চোখকে ফাঁকি দিতে না পারে শত্রু।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানোর ফল মিলল কিছুক্ষণের মধ্যে, এগোতে থাকা আগুনের দেয়ালকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল রানা। নালার এই অংশটা বেশ গভীর, তলাটা এবড়ো-থেবড়ো। চোখে ঝাপসা দেখায় ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না ও, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ওর।

ব্যথা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, ঝট্ করে উঠে বসে পিছনে তাকাল। দাবানলের পরিধি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, খুব একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি ও নিজের আর আগ্রাসী আগুনের মাঝে! দ্রুত সরে না পড়লে আবার আটকা পড়বে। উঠে দাঁড়াতে গেল ও, কিন্তু থমকে গেল নালার কিনারায় একটা ছায়ামূর্তি উদয় হতে দেখে।

কালো রঙের কমব্যাট ফেটিগ পরা সশস্ত্র এক সৈনিক, গ্রাউণ্ড টিমের সদস্য। নালাটা সম্ভবত সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছে তার মনে, তাই দেখতে এসেছে। ডাইভ দিয়ে তলায় শুয়ে পড়ল রানা, নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। সারা শরীর ধোঁয়ায়

কালো হয়ে আছে, ভাল করে খেয়াল না করলে ওকে আলাদা করা যাবে না। সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল না ও, মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অদ্ভুত এক জিনিস... কেউ তাকিয়ে থাকলেই কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়। ট্রেইনিঙের সময় তাই রানাকে শেখানো হয়েছে—যত চমৎকার ক্যামোফ্লাজ-ই থাকুক, টার্গেটের দিকে সরাসরি তাকাবে না; তাকাবে আড়চোখে। এখনও তা-ই করল ও। মুখ ঘোরানো থাকল মাটির দিকে, চোখের কোণ দিয়ে প্রতিপক্ষের গতিবিধির উপর লক্ষ রাখল রানা।

নালার পাশে এসে থামল সৈনিক, তীক্ষ্ণ চোখে নজর বোলাল ভিতরে। রানার শরীরের উপর দিয়ে একবার তার দৃষ্টি ঘুরে এল, তবে এখন নোংরা দেহটাকে মরা গাছের কাণ্ডের মত দেখাচ্ছে দূর থেকে। তারপরও শিয়োর হতে চাইল লোকটা নামতে গেল তলায়, কিন্তু তার আগেই বিকট শব্দে একটা ফাঁপা গাছের ডাল ফাটল—বিস্ফোরণের মত শোনাল শব্দটা। পাঁই করে ঘুরল সৈনিক, তাকাল আগুনের দিকে—এখানটায় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ কি না, তা বোঝার চেষ্টা করছে।

কেভলার ভেস্টের নীচে গুঁজে রাখা সিগ-সাওয়ারটা এখনও রয়েছে, সাবধানে ওটা বের করে হাতে নিল রানা। সৈনিক লোকটা যদি শেষ পর্যন্ত নালায় নামে, তা হলে গুলি করবে। তবে তার প্রয়োজন হলো না। ধাবমান আগুনের দেয়ালকে দেখে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিল লোকটা, নালার ভিতরে দায়সারাভাবে শেষবার নজর বুলিয়ে সরে গেল কিনার থেকে।

নড়াচড়া না করে আগের মতই খানিকক্ষণ পড়ে রইল রানা, লোকটা দূর থেকে নজর রাখতে পারে। তবে একটু পরেই আগুনের উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠায় আর ঘাপটি মেরে থাকা

সম্ভব হলো না। ঝুঁকি নিয়ে উঠল রানা, মাথা নিচু করে আবার এগোতে শুরু করল। এখন আর দৌড়ুতে পারছে না, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে, নইলে ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে সৈনিক লোকটা। লোকটা আশপাশে আছে কি নেই, সেটা বোঝা যাচ্ছে না, মাথা নিচু রাখায় বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, সে-চেষ্টা করাটাও উচিত হবে না।

ধীর গতিতে এগোনোর মাশুল গুনতে হলো অল্প সময়ের ভিতরেই। পিঠে আগুনের আঁচ অনুভব করল রানা, লেলিহান শিখা ওর নাগাল পেয়ে গেছে প্রায়। বাধ্য হয়ে আবার ছুটতে শুরু করল রানা, ক্লান্ত পায়ের থপ থপ আওয়াজ হচ্ছে। নালার বাইরে একটা চিৎকার শুনল ও, বুঝতে পারল—সন্দেহটা ঠিক ছিল, পেরিমিটার গার্ড নালার কাছাকাছিই আছে, ওর পায়ের আওয়াজ কানে গেছে লোকটার। থেমে গেল রানা, আর দৌড়ানো ঠিক হবে না, ওর পজিশন বুঝে ফেলবে প্রতিপক্ষ। সামনে একটা খোঁড়ল দেখতে পেল, পাহাড়ি ঢলের পানির আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ওটাতে।

খোঁড়লের ঠিক উপরে এসে থামল সৈনিক, ছাদটা খুব একটা পুরু নয়, পায়ের শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল, কয়েক টুকরো আলগা মাটি খসে পড়ল রানার গায়ে। লোকটা এখন মেশিনগান বাগিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। শঙ্কিত বোধ করল রানা, ছাদটা না ধসে পড়ে ব্যাটার ওজনে! সোজা তা হলে ওর গায়ের উপর পড়বে শত্রু। এদিকে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যেতে শুরু করেছে খোঁড়ল আর আশপাশের জায়গাটুকু। চোখ জ্বালাপোড়া করছে, দম আটকে কাশি ঠেকিয়ে রাখল ও... তবে কতক্ষণ পারবে, সেটাই প্রশ্ন। ট্রেনিঙের সময় পানির নীচে একটানা সাড়ে তিন মিনিট দম ধরে রাখতে পারত, এখনও সে-ক্ষমতা

আছে কি না, বলা কঠিন। অনেকদিন হলো এভাবে দম আটকে রাখতে হয়নি ওকে।

আরও কয়েক টুকরো মাটি খসে পড়ল। লোকটা তাড়াতাড়ি সরে না গেলে সমূহ বিপদ। পিস্তল মুঠো করে ধরে দাঁতে দাঁত পিষল রানা। আর কোনও উপায় না পেলে নীচ থেকে প্রতিপক্ষকে গুলি করতে হবে, তারপর ছুটতে হবে পরিষ্কার বাতাসের জন্য। এভাবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু গুলি করলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। শব্দ শুনতে পাবে গ্রাউণ্ড টিমের অন্য সদস্যরা, যদি না-ও শোনে, মৃত লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে দেখেই ছুটে আসবে এদিকে। চপার তিনটে থাকবে সঙ্গে, একা কিছুতেই পেরে ওঠা যাবে না তাদের সঙ্গে।

আশার কথা একটাই, উপরের লোকটাকেও ধোঁয়ার মধ্যে দম বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে, তার পক্ষেও বেশিক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব নয়। রানাকে শুধু ওই লোকটার চেয়ে বেশি সময় দম ধরে রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ চলে যাবার পর খোঁড়ল থেকে বেরুতে পারে। চোখ বন্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাস ধরে থাকল তাই রানা।

উপরে আবছা শব্দ শোনা গেল, সৈনিক লোকটা রেডিও মাইক্রোফোনে কথা বলছে। কয়েক সেকেণ্ড পরই হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ কয়েক গুণ বেড়ে গেল. নীচের দিকে নেমে আসছে ওগুলো। পায়ের শব্দ হলো, মাটি খসে পড়ল আবার... মনে হলো লোকটা চলে গেছে।

বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে চোখে আঁধার দেখছে রানা, লাল-নীল ফুটকির মত কী সব ভাসছে সামনে। আর সম্ভব নয়, ছিটকে খোঁড়ল থেকে বেরুল ও, বিপদের তোয়াক্কা না করে

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল নালা ধরে... আগুন আর ধোঁয়া থেকে দূরে। দম আটকে মরতে না চাইলে পরিষ্কার বাতাস দরকার আগে, অস্ত্রধারী শত্রুদের নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে।

হোঁচট খেয়ে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছুটতে থাকল ও। কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কতদূর যাচ্ছে... কোনও হিসেব নেই। জ্বলন্ত নরক থেকে বেরুনোই এখন আসল লক্ষ্য। খানিকদূর যেতেই নালাটা শেষ হয়ে গেল, কিনার আঁকড়ে উপরে উঠে এল রানা, তারপর আবার ছুটল।

এভাবে দৌড়ুনোয় লাভ হলো, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারল ও, বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। বুকের জ্বালাপোড়া কমে যেতে শুরু করেছে, চঞ্চল দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল রানা। একটা পাহাড়ি ঢালে রয়েছে ও—সেফ সাইট থেকে দেড়শ' গজ দূরে। বড় একটা পাথর দেখতে পেয়ে ওটার আড়ালে গিয়ে লুকাল। হেলিকপ্টারগুলোর গগনবিদারী আওয়াজ কমেনি, উঁকি দিল ও।

এদিকটায় আসছে না ওগুলো, উচ্চতা কমিয়ে স্থির হয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে কেইবল্ ঝুলতে দেখে পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারল রানা। দাবানলের তীব্রতা বেড়ে গেছে, গ্রাউণ্ড টিমের জন্য নীচে থাকা আর নিরাপদ নয়, ওদেরকে পিকআপ করতে যাচ্ছে চপারগুলো। কয়েক মুহূর্ত পর অনুমানটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ঝুলন্ত কেইবলের সঙ্গে যার যার বেল্টের হারনেস আটকাল গ্রাউণ্ড টিমের পাঁচ সদস্য, তার পর-পরই যন্ত্রচালিত উইঞ্চের সাহায্যে তুলে নেয়া হলো তাদের। নিখুঁত পিক-আপ... হ্যাচ ঠিকমত বন্ধ হবার আগেই মুখ ঘুরিয়ে ফেলল চপারগুলো, উচ্চতা বাড়িয়ে তীব্র গতিতে

চলে পশ্চিমমুখী একটা রুট ধরে—একটু পর হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। ইঞ্জিনের আওয়াজও মিলিয়ে গেল। এখন শুধু উন্মত্ত আগুনের গর্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল রানা, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল, দাবানল থেকে দূরে সরে যেতে হবে ওকে যত দ্রুত সম্ভব। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পিছনে একটা চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ও, তবে তাকাল না ওদিকে। কী ঘটেছে বুঝতে পারছে—বাঙ্কারের ভিতরের আগুনটা ওদের অ্যামিউনিশন রুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও, সমস্ত মনোযোগ এখন সামনে এগোনোর দিকে। রক্তক্ষরণে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীর, দেহটা বারবার থেমে বিশ্রাম নিতে চাইছে, কিন্তু তীব্র মনোবলের জোরে সে-ইচ্ছে অগ্রাহ্য করল রানা। থামলে আবার চলতে পারবে না, তাই দাঁতে দাঁত পিষে সমস্ত কষ্ট সহ্য করল ও, এলোমেলো পা ফেলে চলতেই থাকল বনভূমির এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে।

কতক্ষণ হেঁটেছে বলতে পারবে না, হঠাৎ নতুন শব্দ শুনতে পেল ও। সাইরেন বাজছে... একটা না, কয়েকটা। ভুরু কুঁচকে স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা করল ও—সাইরেনের উৎস কী হতে পারে, তা ভাবল। মনে পড়ে গেল, এই বনভূমির সীমানা থেকে মাত্র আট মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহর আছে। নিশ্চয়ই ওখান থেকে দাবানল নেভাতে ছুটে আসছে পুলিশ আর দমকলের ইমার্জেন্সি ক্রু-রা। সেফ-সাইটে যাবার জন্যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে পথটা আছে, নিশ্চয়ই সেটা ধরেই আসছে। পথটা লুকানো বটে, তবে খুঁজে পেতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয় তাদের।

খুব ইচ্ছে হলো পথটায় গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে।

উদ্ধার পাওয়া যাবে, বিশ্রাম পাওয়া যাবে, কাঁধের ক্ষতটার চিকিৎসাও পাবে। সবচেয়ে বড় কথা, তৃষ্ণা মিটবে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে রানার, জিভ যেন শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে কেউ। পানি না পেলেই নয়। ফায়ার ব্রিগেড ক্রু-দের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিপদ কাটাবার এই সহজ উপায়টা খুব প্রলুব্ধ করছে ওকে।

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে দমে যেতে হলো। সন্দেহ নেই, অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ওকে... একটারও জবাব দিতে পারবে না। অন্তত যতক্ষণ না ড. আন্দালিব সিদ্দিকীকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কারণ জানতে পারছে... যতক্ষণ না ওর এজেন্সির নিবেদিতপ্রাণ চার এজেন্টকে কেন খুন হতে হলো, সেটা বের করতে পারছে। এ-মুহূর্তে পুলিশের সামনে গেলে বরং ওকেই সন্দেহ করা হবে সেফ-সাইটে আবিষ্কার হতে চলা লাশগুলোর জন্য। অ্যারেস্ট করা হতে পারে। যারা স্পেশাল ফোর্স কিংবা মিলিটারি টেকনোলজি ব্যবহার করে, তারা সাধারণ কেউ নয়; এমন প্রতিপক্ষের জন্য পুলিশ কাস্টডিতে রানাকে নিকেশ করা অত্যন্ত সহজ কাজ। ওর মুখ বন্ধ রাখার জন্য সেটাই করবে তারা।

মানে হচ্ছে, গা-ঢাকা দিতে হবে ওকে। গোপনে রহস্যটা ভেদ করতে হবে। মাথায় আগুন জ্বলছে রানার, মনসুর আর তার টিমের কথা ভাবলেই বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। সবকিছুর জন্য দায়ী ওই ড. সিদ্দিকী। তাকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে, সেই সঙ্গে শায়েস্তা করতে হবে অচেনা ওই ঘাতকদের—নিজের কাঁধে একটা গুরুদায়িত্ব চাপাল রানা।

সাইরেনের শব্দ খুব কাছে চলে এসেছে, সতর্ক পায়ে বনের আরও ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, কারও চোখে পড়তে চায় না। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল, শারীরিক কষ্টকে আর গ্রাহ্য করছে না। কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছে মনে মনে, আত্মপ্রত্যয় ভুলিয়ে দিচ্ছে যাতনাকে।

তবে সবার আগে সাহায্য দরকার ওর। ...আর সেটা একজনই করতে পারে এ-মুহূর্তে।

সোহানা।

ষোলো

'ওয়ারউইক হোটেল!' তরুণ রিসেপশনিস্টের গলাটা কেমন যেন ঘুমজড়িত শোনাল, হয়তো সারারাত জাগবার ফলে। রাতের শিফট শেষ করে এনেছে সে, আটটা বাজলেই নতুন একজন এসে জায়গা নেবে রিসেপশনে।

'পাঁচশো চার নম্বর রুমে দিন, প্লিজ।'

নিচু গলায় সেলফোনে কথা বলছে রানা, মেইনরোডের পাশে একসারি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ও, একটানা প্রায় দু'ঘণ্টা হেঁটে বনভূমির সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট শহরটার সিকি মাইল দূরে এই জায়গাটায় এসে পৌঁছেছে। ফোন করবার আগে এতটা সময় নেবার পিছনে কারণ একটাই,

ইমার্জেন্সি সার্ভিস দাবানলের এলাকায় সম্ভাব্য সার্ভাইভারের খোঁজে সেল-ফোন স্ক্যানার ব্যবহার করবে; ও চায়নি সোহানার সঙ্গে ওর কথোপকথন কেউ মনিটর করুক। শহরের কাছাকাছি এসে পড়ায় সম্ভাবনাটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এখানকার এয়ারস্পেসে শহরবাসীদের হাজারো ফোনকলের মাঝখান থেকে ওরটা আলাদা করা যাবে না।

'একটু জোরে বলুন, সার,' রিসেপশনিস্ট বলল। 'আমি আপনার কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছি না।'

'পাঁচশো চার নম্বর রুম। আমি সোহানা চৌধুরীকে চাইছি।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সার, এত সকালে ওঁকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? এখনও রুম সার্ভিস ব্রেকফাস্ট নিয়ে যায়নি, তারমানে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন...'

'আমি ওঁর স্বামী বলছি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। সহজ একটা কৌশল।

'ও! ঠিক আছে, হোল্ড অন প্লিজ।'

খুটখাট শব্দ হলো, তারপর ওপাশে রিং হতে শোনা গেল। কয়েকবার বাজল ফোন, সোহানা ধরছে না। পথশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমাচ্ছে বোধহয়। জরুরি প্রয়োজনে সাপোর্ট দেবার জন্যে রানার কথামত গতকালই ওই হোটেলটায় উঠেছে ও, পৌঁছেছে বেশ রাতে। সকাল হতে না হতেই ডাক পড়বে, নিশ্চয়ই আশা করেনি।

মোট দশবার হলো রিং, তারপর রিসিভার তোলার আওয়াজ পেল রানা। ঘুম-ঘুম কণ্ঠে সোহানা বলল, 'উম্‌ম্‌... হ্যালো?'

'সোহানা... আমি,' বাংলায় বলল রানা। যোগাযোগের

মাধ্যম হিসারে সেলফোন সবচেয়ে অরক্ষিত, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকলে যে-কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারে। বাংলায় বলেও স্বস্তি নেই, যতটা সম্ভব আভাসে-ইঙ্গিতে কথা বলতে হবে ওদের।

রানাকে নাম বলতে না শুনে সোহানাও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। ঘুম-টুম মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল ওর চোখ থেকে। পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'হাই ডার্লিং! হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইয!'

'সারপ্রাইয তো বটেই,' রানা বলল। 'কাল রাতের ওই ঝগড়ার পর আবার এই সাতসকালে ফোন করব, তা নিশ্চয়ই আশা করোনি?'

'উঁহুঁ। হঠাৎ বদলে গেলে কেন?'

'ভেবে দেখলাম, দোষটা আমারই। তুমি আমার চেয়ে বেশি আয় করো, তা নিয়ে আমার জেলাস হওয়াটা ঠিক হয়নি। তোমার টাকায় কিছু কিনব না বলে জেদ দেখানোও অন্যায় হয়েছে।'

'হুম, বুঝতে পারছ তা হলে?'

'হ্যাঁ, আমি সরি। প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'কীভাবে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'চলো, লং ড্রাইভে যাই,' রানা প্রস্তাব দেয়ার ভঙ্গিতে বলল। 'আগামী কয়েকটা দিন শুধু ঘুরে বেড়াব আমরা, কাজকর্ম কিচ্ছু করব না। ছুটি কাটাব... একসঙ্গে।'

'লোভনীয় প্রস্তাব... আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'গুড। তুমি আমাকে তুলে নিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। কী ধরনের গাড়ি আনব?' গল্পের ছলে এবার কাজের কথা পাড়ল সোহানা।

'ফোর্ড টরাস,' নির্দেশ দিল রানা। 'বেশি ঝকমকে হবার

দরকার নেই। গাঢ় নীল বা গাঢ় সবুজ রং কেমন লাগে তোমার?'

'খুবই ভাল,' সোহানা বলল। বেশিরভাগ টরাস গাড়িই নীল বা সবুজ রঙের, জানা আছে ওর। এই দু-রঙের হাজার হাজার গাড়ি চলে আমেরিকার রাস্তাঘাটে, সহজে অন্যান্য গাড়ির ভিড়ে মিশে যাওয়া যাবে। 'আগের গাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে, ওটা বিক্রি করে নতুন একটা কিনে ফেলি, কী বলো?' রানা এজেন্সির কোনও গাড়ি যে ব্যবহার করা ঠিক হবে না, সেটা বুঝতে পারছে ও।

'আমিও তা-ই চাইছি,' রানা বলল। 'আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ভাল মডেলটা কিনো।' ওটার ইঞ্জিন দুইশ' হর্স-পাওয়ারের, রাস্তায় যে-কোনও বিপদ মোকাবেলায় বাড়তি শক্তিটা কাজে লাগবে।

'ঠিক আছে,' সোহানা বলল।

'কিছু নতুন জামা-কাপড়ও দরকার,' রানা যোগ করল। 'বেশ কয়েকদিন ট্র্যাভেল করব তো, আমি তো সঙ্গে কিছুই আনিনি।'

'কী কী লাগবে?'

'স্ল্যাকস্, একটা স্পোর্টস কোট, জুতো, জিন্স, একটা পুলোভার, এক জোড়া রকপোর্টস্ বুট... আমার সাইজ তোমার মনে আছে তো?'

'তা কি ভোলা যায়?'

'আজে-বাজে রঙের কিছু কিনবে না কিন্তু!'

'আমার পছন্দের ওপর আস্থা নেই তোমার?' পাকা গিন্নির মত অভিমানী সুরে বলল সোহানা।

'আছে তো! তাও মনে করিয়ে দিচ্ছি আর কী!'

'হুম! আর কী চাই?'

'আণ্ডারওয়্যার...'

'ভেরি সেক্সি!' মুচকি হাসল সোহানা।

পাত্তা না দিয়ে বলে চলল রানা, '...মোজা, টুথব্রাশ, রেযার, একটা ফার্স্ট এইড কিট—রাস্তায় কত রকম বিপদ ঘটতে পারে!'

'বুঝেছি। সতর্ক থাকা ভাল। আর?'

'কিছু স্যাণ্ডউইচ এনো, সঙ্গে পানি... প্রচুর পরিমাণে বটলড্ ওঅটর।'

একটু নীরবতা, সোহানা সবকিছু কাগজে লিখে নিচ্ছে। খানিক পর বলল, 'আমাকে একটু সময় দিতে হবে... খুব বেশি না, কয়েক ঘণ্টা। তোমাকে কোত্থেকে পিকআপ করব?'

'এখনও ঠিক বলতে পারছি না, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমি পরে তোমার সেলফোনে রিং করে জানাব। নতুন নাম্বারটা সঙ্গে রেখো।' ওটা ইমার্জেন্সিতে ব্যবহারের জন্য একটা স্পেশাল সেলফোন, লাইনটা স্ক্র্যাম্বল করা। এমনিতে অফ করা থাকে, তাই ফোনটা চালু করতে নির্দেশ দিল রানা।

'ওকে।' বুঝতে পেরে বলল সোহানা। 'টেক কেয়ার, ডিয়ার।'

'তুমিও।'

লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা অফ করে দিল রানা, ব্যাটারির আয়ু টিকিয়ে রাখতে হবে। সেটটা ঢুকিয়ে রাখল প্যান্টের পকেটে, তারপর উঁকি দিল গাছের আড়াল থেকে। শহরের দিক থেকে হৈচৈ... সেইসঙ্গে ইমার্জেন্সি ভেহিকলের আওয়াজ ভেসে আসছে। দাবানলটা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, শহর পর্যন্ত গ্রাস করবার একটা সম্ভাবনা থাকায় স্টেট পুলিশ ওখানকার

বাসিন্দাদের ইভ্যাকুয়েট করতে শুরু করে দিয়েছে। একটু পরেই রাস্তা ধরে একের পর এক বিভিন্ন ধরনের যানবাহন শহরে ঢুকতে-বেরুতে শুরু করল। সাধারণ লোকজন আছে, আছে করাত-কুঠারসহ ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কর্মীও—দাবানলের বিস্তৃতি ঠেকাতে জঙ্গলের একটা অংশের গাছপালা কেটে পেরিমিটার তৈরি করবে ওরা। এতসব মানুষের চোখ এড়িয়ে শহরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ—রানার বিধ্বস্ত অবস্থা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কী করা যায়, ভাবছে ও।

মাথার উপর এরোপ্লেন আর হেলিকপ্টারের গর্জন শোনা গেল। চোখ তুলে তাকিয়ে স্বস্তি অনুভব করল রানা—অ্যাসল্ট টিম নয়, স্পটার আর ফায়ার-ফাইটারেরা যাচ্ছে আগুন নেভাতে... আকাশ থেকে ছড়াবার মত ফায়ার-রেটার্ড্যান্ট কেমিক্যাল নিয়ে। শঙ্কিত হবার মত কিছু নেই; যে-তাণ্ডব শুরু হয়েছে, তার ভিতর খুনিদের আর ফিরে আসবার কথা নয়।

কিন্তু এখানে বসে থাকাও চলে না। সন্দেহ নেই, শেরিফস্ ডিপার্টমেন্ট শহরের বাইরে রাস্তায় ব্লকেড বসিয়েছে, যাতে বিপজ্জনক এলাকায় সাধারণ লোকজন যেতে না পারে। এর অর্থ, সোহানাও আসতে পারবে না ওর কাছে। ব্লকেড পেরিয়ে রঁদেভু'র জন্য নিরাপদ স্পট খুঁজে বের করতে হবে। চোখ বন্ধ করে এলাকার মানচিত্রটা স্মরণ করল রানা, বুঝতে পারল ছোট্ট এই শহরটা পেরিয়ে পরের শহরে যেতে হবে ওকে। হাইওয়ে ধরে গেলেই হয়, নিউ ইয়র্ক থ্রু-ওয়ে এখান থেকে চার মাইল দূরে হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে। রাস্তাটা ধরে আরও পাঁচ মাইল গেলে পড়বে দ্বিতীয় শহরটা। মোট ন'মাইল দূরত্ব... লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে—সাধারণ অবস্থায় পায়ে হেঁটে যাওয়া কোনও ব্যাপারই

নয়, কিন্তু রক্তক্ষরণে দুর্বল দেহ নিয়ে এ-কাজ সহজ হবে না।

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না রানা, উঠে দাঁড়াল। বসে থাকলে বরং শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাবে, তারচেয়ে চলার উপরে থাকাই ভাল। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

রোদ চড়তে শুরু করল খানিক পর, দাবানলের দিক থেকে ভেসে আসা বাতাসও গরম। ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেল রানা, কাঁধের ক্ষতটা জ্বলতে শুরু করেছে। তবে যন্ত্রণা থেকে মনকে সরিয়ে রাখল ও, চোখ রাখল সামনের দিকে, মনোযোগ পরের পদক্ষেপের উপর। আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলল, কেমন যেন মাতালের মত লাগছে। টলছে। দেহটা যেন নিজের নয়, স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না কিছু, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ফেলছে পা। মাঝে মাঝেই চোখ কচলাতে হলো, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছে। গলাও শুকিয়ে কাঠ, প্রথম দিকে থুতু গিলছিল, এখন গ্রন্থিগুলোও শুকিয়ে গেছে। বিস্ময় বোধ করল রানা—মরুভূমিতে এ-ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা আছে ওর, কিন্তু সবুজ-সুনিবিড় জঙ্গলের ভিতরও যে এমন বুকফাটা তৃষ্ণায় আক্রান্ত হতে হবে, সেটা কখনও কল্পনা করেনি।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও, অনেক চেষ্টায় দিকটা ঠিক রেখেছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে হাইওয়েটা দেখে নিচ্ছে, ঠিক করে নিচ্ছে কোন্‌দিকে এগোতে হবে। এভাবে অসহ্য পরিশ্রম আর যন্ত্রণার মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল, তবে সেটা বুঝল না ও। ওর কাছে পদযাত্রাটার স্থায়িত্ব অনন্তকাল মনে হচ্ছে।

হঠাৎ সামনে একটা ছোট্ট সবজি-খেত দেখতে পেল রানা, ওপাশে একটা দোচালা বাড়ি রয়েছে। সম্ভবত কোনও

কৃষি-পরিবারের আবাস। একপাশে ছোট ছাউনি আর গ্যারাজ রয়েছে—রং উঠে সবকিছু বিবর্ণ হয়ে রয়েছে। তবে অন্যপাশের আঙিনায় দড়িতে শুকাতে দেয়া কাপড় দেখে বোঝা যাচ্ছে, পরিত্যক্ত নয় বাড়িটা, মানুষ আছে। খেতটাও সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা—গাঢ় সবুজ শাক-লতা-পাতা দুলছে বাতাসে, নিয়মিত যত্ন পাবার ফল। বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিতে ইচ্ছে হলো রানার, সাহায্য চাইবে। কিন্তু দমে গেল বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ভেবে। ওর রক্তাক্ত শরীর দেখে নিঃসন্দেহে ভয় পাবে তারা; সাহায্য করবে কি না ঠিক নেই, কিন্তু পুলিশে খবর দেবে অবশ্যই। সেটা হতে দেয়া যায় না।

মুষড়ে পড়ার মত অবস্থা হলো রানার, সহ্য ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, সাহায্য ছাড়া একটুও এগোনোর উপায় নেই। অথচ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাহায্য চাইতে পারছে না। আনমনে মাথা নাড়তে গিয়ে দেখতে পেল পানির কলটা, খেতের একপাশে ওটা, সেচের জন্য ব্যবহার হয়, পাইপ লাগানো আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে কলটার কাছে চলে গেল রানা, প্যাঁচ খুলে পাইপের মুখটা ভরে দিল মুখে। ঠাণ্ডা, মিষ্টি পানিতে ভরে গেল ভিতরটা, ঢক ঢক করে গিলতে থাকল ও। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, বাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে যেতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি পাইপটা নামিয়ে রাখল রানা, কলের মুখ বন্ধ করে এক ছুটে ফিরে এল গাছপালার আড়ালে। কয়েক সেকেণ্ড পরই গাউন-পরা মাঝবয়েসী এক মহিলা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। খেতের কিনারে এসে হাত দিয়ে চোখদুটোকে রোদের আড়াল করল সে, মাথা তুলে তাকাল পূর্ব দিকে। আকাশ কালো হয়ে

আছে দাবানলের কালো ধোঁয়ায়—সেদিকেই তার নজর।

'অ্যাই, শুনছ?' বাড়ির দিকে মুখ ফেরাল মহিলা, গলা চড়িয়ে স্বামীকে ডাকছে। 'আগুন তো এদিক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে বলে মনে হচ্ছে। মদ গেলা বন্ধ করে বাইরে এসো, সাহায্য করো আমাকে। পানি দিয়ে বাড়ির ছাদ আর দেয়াল ভিজিয়ে রাখতে হবে।'

অস্ফুট একটা গাল ভেসে এল বাড়ির ভিতর থেকে। শুনে খেপে গেল মহিলা। 'ওয়াল্টার, আবার যদি মুখ খারাপ করো, তা হলে কিন্তু ভাল হবে না। বেরোও বলছি!'

রাগে গজ গজ করতে করতে খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা এক লোককে বেরুতে দেখা গেল। স্ত্রী-র বকাঝকা খেয়ে কলের দিকে এগিয়ে গেল সে, পানির পাইপটা নেয়ার জন্য। আর কিছু দেখার প্রয়োজন মনে করল না রানা, সাবধানে সরে এল খেতের কাছ থেকে। গাছপালার গভীরে ঢুকে স্বস্তি অনুভব করল, ওকে দেখতে পায়নি স্বামী-স্ত্রী। পানি খেতে পারায় কিছুটা শক্তিও পাচ্ছে শরীরে।

আবার চলতে শুরু করল ও, মিনিট দশেক পর হাইওয়ের কাছে ফিরে এল। সামনেই নিউ ইয়র্ক থ্রু-ওয়ের সংযোগস্থল। একটা কালভার্ট চোখে পড়ল, তলাটা খটখটে শুকনো। ওখানে গিয়ে ছায়ার মধ্যে আশ্রয় নিল ও, জায়গাটা নিরাপদ মনে হচ্ছে। পকেট থেকে বের করল সেলফোনটা, সুইচ অন করে ডায়াল করল সোহানার নাম্বারে।

রিং হলো কি হলো না, সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পাওয়া গেল। উৎকণ্ঠা নিয়ে ওর কলের অপেক্ষায় ছিল সোহানা। বলল, 'হ্যালো?'

'আমি।'

'বুঝতে পেরেছি। এত দেরি করলে কেন ফোন করতে?'

'সুযোগ পাইনি,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'তুমি কেনাকাটা সেরেছ?'

'হ্যাঁ, এখন গাড়ির শো-রুমে। পেমেন্ট মিটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু পেপারওয়ার্কে দেরি হচ্ছে। আশা করি পনেরো মিনিটের মধ্যেই রওনা হতে পারব।'

'কিছু ক্যাশ টাকা সাথে এনো।'

'কত?'

'দু'হাজার...'

'আমার কাছে তিন হাজার ডলার আছে।'

'গুড। তা হলে চিন্তা নেই।'

'কোথায় আসতে হবে, তা তো বললে না।'

'আটলান্টিক সিটির রাস্তা ধরবে, তবে ওখানে যাবে না। উত্তর দিকে এগোলেই নিউ ইয়র্ক স্টেট থ্রু-ওয়ে; ওটা ধরে কিংস্টনের একজিট থেকে পঞ্চাশ মাইল পেরুলেই একটা মোড় আছে... বাস্কারভিলে যাবার জন্য। ওই রাস্তায় এগোতে থেকো, একটা হাইওয়েতে এসে উঠবে। ডানদিকে একশো গজ দূরে একটা কালভার্ট দেখতে পাবে। ওটায় উঠে একটু অভিনয় করতে হবে 'তোমাকে... টায়ার-পাংচার, কিংবা ইঞ্জিন নষ্ট হবার...'

'কালভার্ট থেকে উঠবে তুমি?'

'হ্যাঁ। যদি না দাবানলটা এখান পর্যন্ত পৌঁছে যায় আরকী!'

'দাবানল!' একটু অবাক হলো সোহানা। 'কীসের মধ্যে পড়েছ তুমি, বলো তো?'

'এলেই দেখতে পাবে,' রানা বলল। 'আমি সেলফোন অন্ রাখছি, কাছাকাছি পৌঁছে রিং দিয়ো।'

‘ঠিক আছে,’ বলে একটু থামল সোহানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি ঠিক আছো তো?’

‘আছি। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।’

লাইন কেটে দিল রানা। আর কিছু করবার নেই এ-মুহূর্তে। কালভার্টের তলায় একটা খাদের মত আছে, ওটার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়ল ও। চারপাশ থেকে শুকনো পাতা কুড়িয়ে শরীর ঢাকল, তারপর শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম দরকার, ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

তবে কাঁধের ক্ষতটার ব্যথা, সেইসঙ্গে নানা রকম দুশ্চিন্তা ঘুমকে যোজন যোজন দূরে সরিয়ে রাখল। ড. সিদ্দিকীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণটা বুঝতে পারছে না রানা। সন্দেহ নেই, ভোররাতে সে-ই ভিএইচএফ সেট ব্যবহার করে অ্যাসল্ট টিমকে খবর দিয়েছে। কিন্তু কেন? প্রোটেকশন টিম আর রানাকে খতম করবার জন্য? সেজন্যেই কি তাকে প্ল্যান্ট করেছিল কেউ? ওদের বিরুদ্ধে এমন মরিয়া হয়ে উঠল কে? হামলাকারীরা মিলিটারি ট্রেইনড্ সৈনিক ছিল, তারমানে আমেরিকান সরকার এর পিছনে আছে। ওদের হাইটেক ইকুইপমেন্টও তা-ই প্রমাণ করে। কিন্তু রানা কিংবা প্রোটেকশন টিমের পিছনে এত নিখুঁত আয়োজন করে হামলা চালাবার মত যুক্তিযুক্ত কারণ তো নেই। সম্প্রতি আমেরিকানদের কোনও ক্ষতি করেনি ও, ওর উপর কেউ খেপে থাকলেও নাহয় একটা কথা ছিল!

ড. সিদ্দিকীকে উদ্ধারের পুরো ঘটনাটা নিয়ে ভাবল রানা। লোকটার আচার-আচরণ খতিয়ে দেখল। সত্যিই আতঙ্কে আধমরা হয়ে ছিল সে, ব্যাপারটা অভিনয় ছিল না। কথা হলো, বিপন্ন একজন মানুষ যাদের সাহায্য পাচ্ছে, তাদেরকেই খুন

করতে চাইবে কেন? পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে।

হেলিকপ্টারের আওয়াজে চিন্তায় ছেদ পড়ল। উঁকি দিয়ে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের একটা যান্ত্রিক ফড়িংকে উড়ে যেতে দেখল রানা, পেটে বিশাল একটা টিউব বাঁধা... পানি নিয়ে যাচ্ছে। আবার শুয়ে পড়ল ও, কেভলার ভেস্টটার কারণে অস্বস্তি বোধ করায় ওটা খুলে ফেলল। কাঁধের ডাক্ট টেপটাও পরখ করল—এখনও শক্তভাবে আটকে আছে ওটা, রক্তক্ষরণ ঠেকাচ্ছে। তবে ফুলে গেছে আহত জায়গাটা, আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করল রানা, পারল না।

এবার পা নাড়ার চেষ্টা করল ও, কেমন যেন বেঁকে আছে দুই হাঁটু, চেষ্টাটা সফল হলো না। এতক্ষণ চলার মধ্যে থাকায় অ্যাড্রেনালিন কাজ করছিল, কিন্তু বিশ্রামের জন্য থামতেই ওটার প্রভাব কেটে গেছে। আহত শরীর কুঁকড়ে যেতে বসেছে। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা—সোহানা যেন তাড়াতাড়ি আসে, খুব দ্রুত চিকিৎসা দরকার ওর।

বাইরে তীব্র গরম, তারপরও শীত শীত করতে থাকল ওর। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। নিজের অজান্তেই পা-দুটো গুটিয়ে ফেলল রানা, হাতদুটো ভাঁজ করে নিয়ে এল বুকের কাছে। সবকিছু কেমন যেন ঘোলা হয়ে আসছে চোখের সামনে। ঘুম নয়, জ্ঞান হারাতে চলেছে ও। তাড়াতাড়ি সেলফোনটা বের করে রিঙ্গার অফ করল, ভাইব্রেশন মোডে নিয়ে এল ওটাকে। সজ্ঞান থাকতেই কাজটা না করলে পরে বিপদ হতে পারে। রিংটোনের শব্দে ওকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারে অযাচিত কেউ।

কাজ শেষ করে আবার সেলফোনটা রেখে দিল ও, এবার বুক-পকেটে। বিপদ মোকাবেলার জন্য ভাঁজ করা হাতের

মুঠোয় নিয়ে নিল সিগ-সাওয়ারটা। তারপর চোখ মুদল। কাঁপুনি কমল না শরীরের, ওই অবস্থাতেই চৈতন্য হারাল রানা কয়েক মুহূর্তের ভিতর।

সতেরো

বুকের কাছে সেলফোনের কাঁপুনি অনুভব করে জেগে উঠল রানা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর ট্রেইনিঙের ফলে সচেতন হয়ে উঠল মুহূর্তে, তবে সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করল না। আশপাশে কোনও মানুষ আছে কি না, দেখতে হবে—কথোপকথন শুনে যাতে ওর সন্ধান পেয়ে না যায় কেউ, সেটার জন্যই এই সতর্কতা। হামাগুড়ি দিয়ে কালভার্টের তলা থেকে একটু বেরুল ও, নাকে ধোঁয়ার গন্ধ পেল। এদিকটায় এখনও আগুন পৌঁছেনি, তবে বাতাসে ভেসে আসছে পোড়া গন্ধ।

কাউকে দেখা গেল না কালভার্টের কাছাকাছি, সন্তুষ্ট হয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল রানা। ফোনটা তৃতীয়বারের মত সঙ্কেত দিতেই রিসিভ করল।

'ম্যাকডোনাল্ডস্!' আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোড ওয়ার্ড উচ্চারণ করল ও, ঠিক জবাব পেলে বুঝতে পারবে, ওপাশ থেকে সোহানা নির্বিঘ্নে কথা বলছে। কেউ ওর পিঠে বন্দুক

ঠেকিয়ে রাখেনি।

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোহানা। 'বন্ধুর কাছ থেকে নম্বর নিয়েছি, ও একটা ডিজিট ভুল করে ফেলেছে। গত পনেরো মিনিট ধরে খালি রং-নাম্বারে ডায়াল করে মরছি। অথচ এই মুহূর্তে কয়েকটা হ্যামবার্গার আমার খুবই দরকার।'

নিশ্চিন্ত হলো রানা—ঠিকঠাক কোডেই জবাব দিয়েছে সোহানা। তাই অভিনয় ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তুমি?'

'রোড-জাংশানের কাছে। এক্ষুনি পৌঁছুব তোমার ওখানে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা, বারোটা বাজে। 'দেরি করলে কেন?'

'আগুন কীভাবে লেগেছে, টের পাচ্ছ না? পুরো এলাকাই ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। একটা রোডব্লকে পড়েছিলাম, পুলিশ এই এলাকায় কোনও গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না, সব ডাইভার্ট করে দিচ্ছে। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ওদের কনভিন্স করতে হয়েছে আমাকে, তাই একটু দেরি হয়ে গেল। সরি।'

'ঠিক আছে, চলে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।'

কানেকশন কেটে দিয়ে সেলফোনটা পকেটে ভরে ফেলল রানা, শার্টের তলায় গুঁজে রাখল সিগ-সাওয়ার। তারপর কেভলার ভেস্টটা কুড়িয়ে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল। একটু পরই ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল ওর—ভারী গর্জন, ফোর্ড টরাসের হতে পারে না। ধারণাটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো কয়েক সেকেণ্ড পর, কালভার্টকে কাঁপিয়ে চলে গেল গাড়িটা, থামল না। সম্ভবত ট্রাক, অনুমান করল রানা, ফায়ার-ফাইটিং ক্রু আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল, তারপর পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত আওয়াজটা। কারের হালকা ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঠিক কালভার্টের উপর এসে থেমে গেল ওটা। দু'বার

গোঁ গোঁ শব্দ হলো, যেন ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছে। লাভ হলো না তাতে, নারীকণ্ঠের শাপ-শাপান্ত ভেসে এল উপর থেকে। দরজা খোলা হলো, তারপর পায়ের আওয়াজ... কার থেকে বেরিয়ে বনেট খুলল চালক।

'কোথায় তুমি?' কয়েক সেকেণ্ড পর চাপা গলা শোনা গেল।

সাবধানে কালভার্টের কিনারা বরাবর চলে গেল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তায় কেউ আছে?'

সামনে-পিছে তাকাল সোহানা, তারপর বলল, 'না, একটা গাড়িও নেই।'

'গুড। উঠে পড়ো গাড়িতে, আসছি। আমি ব্যাক-সিটে ওঠার পর স্টার্ট দিয়ো। স্বাভাবিক গতিতে চালাবে, কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করে।'

'ঠিক আছে।'

পায়ের শব্দ হলো, তারপর আবার দরজা খোলার আওয়াজ। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল সোহানা। হামাগুড়ি দিয়ে কালভার্টের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা, একছুটে রাস্তার পাশের ঢাল অতিক্রম করল, পৌঁছুল টরাসের পাশে। মাথা নিচু করে ব্যাকডোর খুলল ও, কেভলার ভেস্টটা ছুঁড়ে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল পিছনের সিটে। সোহানাকে দেখতে পেল এবার, লিনেনের একটা জ্যাকেট পরেছে, মাথার চুল খোলা... উইণ্ডশিল্ডের কাঁচে অপূর্ব সুন্দর মুখটার ছায়া পড়ছে। লোকজনের দৃষ্টি এড়াতে শুয়ে পড়ল রানা, তারপর টেনে বন্ধ করল দরজাটা।

'গো!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল,

গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়াল টরাসকে। পাক্কা প্রফেশনালের আচরণ করছে, তীব্র কৌতূহল সত্ত্বেও পিছনে তাকাল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

'মুখ ঘোরাও গাড়ির,' রানা বলল। 'গা-ঢাকা দেবার জায়গা দরকার। এখান থেকে *অলব্যানি* মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ওদিকেই চলো।'

সায় দিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল সোহানা; যে-পথে এসেছে, সে-পথেই ফিরে চলল। বেশ কিছুদূর যাবার পর যখন কাজটা নিরাপদ মনে হলো, তখনই কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল ও। রানার ছেঁড়া-ফাটা পোশাক, শুকিয়ে আসা রক্ত আর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আঁতকে উঠল ও।

'ইয়াল্লা! এ কী অবস্থা তোমার?'

'সামনে তাকাও,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'যতটা দেখাচ্ছে, ততটা খারাপ নয় অবস্থা।'

রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল সোহানা। 'গুলি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।' কারের মেঝেতে রাখা কাগজের ক্রেট থেকে একটা পানির বোতল তুলে নিল রানা, মুখ খুলে ঢক ঢক করে খেতে থাকল।

'তারপরও বলছ অবস্থা খারাপ নয়?'

'হুঁ। কাঁধে লেগেছে গুলি, হার্টে বা মাথায় লাগলে নাহয় খারাপ বলতাম!' হালকা সুরে বলল রানা।

'কী বলছ!' চকিতে পিছনে তাকাল একবার সোহানা। 'কী লাগিয়েছ ওটা... ডাক্ট টেপ?'

'খুব কাজের জিনিস, তাই না?'

একটু যেন রেগে গেল সোহানা। 'হ্যাঁ, কাজের তো বটেই! যদি তুমি পানির পাইপ হও, আর কাঁধের ক্ষতটা একটা লিক

হয়ে থাকে!’

‘কী করব... আর কিছু খুঁজে পাইনি।’ রানা কাঁধ ঝাঁকাল।

‘ড. সিদ্দিকী কোথায়? মনসুরেরা?’

‘সব বলব, আগে কিছু খেয়ে নিই। কী এনেছ?’

‘ব্যাকরেস্ট সরালে একটা কুলার পাবে, ওটাতে স্যাণ্ডউইচ আর পটেটো সালাদ আছে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সিটের পিছনটা সরাতে গেল রানা, কিন্তু গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়।

‘তোমাকে এখুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে,’ সোহানা বলল। ‘কাঁধের ক্ষতটায় ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। শুয়ে থাকো, ডাক্তারখানা দেখলে আমি থামব।’

‘না!’ বাধা দিল রানা। ‘ডাক্তার-টাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে না। গানশট দেখলে ওরা পুলিশকে রিপোর্ট করতে বাধ্য।’

‘আমাদের এজেন্সির বিশ্বস্ত ডাক্তার আছে, ওদের কাউকে খবর দিই? জাকিরকে বললে এক্ষুণি একটা হেলিকপ্টারে করে...’

মাথা নাড়ল রানা। ‘উঁহুঁ, এ-মুহূর্তে কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত হবে না। গা-ঢাকা দিতে হবে।’ কষ্টে-সৃষ্টে ব্যাকরেস্টটা সরাল ও, বের করে আনল কুলারটা।

‘কিন্তু কেন?’ সোহানার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘কাউকে জানতে দেয়া যাবে না যে, আমি বেঁচে আছি। ...অন্তত এ-মুহূর্তে নয়।’

‘তোমাকে মারতে চাইছে কেউ? সেজন্যেই এই অবস্থা?’

‘হ্যাঁ, তবে টার্গেট শুধু আমি একা নই, আমাদের পুরো প্রোটেকশন টিমই ছিল। ড. সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সোহানা। সেফ-সাইটে একদল খুনিকে নিয়ে এসেছিল সে।'

'কী!!!' সোহানা চমকে গেল।

'ঠিক শুনছ। মনসুর আর ওর টিম... কেউ বেঁচে নেই। আমাকেও খুন করবার চেষ্টা করেছে সিদ্দিকী। বনের দাবানল... ও-ই লাগিয়েছে এভিয়েশন ফুয়েল ছিটিয়ে। বাঙ্কারেও একই কাজ করেছে।'

মুখের কথা আটকে গেছে সোহানার। কী বলবে, বুঝতে পারছে না।

'সব খুলে বলব তোমাকে... ধীরে-সুস্থে। তবে আগে একটু খাওয়া-দাওয়া আর ট্রিটমেন্ট দরকার। ফার্স্ট এইড কিট এনেছ?'

'হ্যাঁ। ফ্লোরে... কাপড়ের ব্যাগটার তলায় পাবে।'

বক্সটা তুলে নিল রানা, ভিতর থেকে গজ-ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে এক পাতা পেইনকিলার বের করল। একটা স্যাণ্ডউইচ খেল ও প্রথমে, তারপর পানি দিয়ে গিলে ফেলল দুটো ট্যাবলেট। বলল, 'ড্রেসিং করা দরকার...'

'গাড়ি থামাব?'

'না, অলব্যানির কাছে গিয়ে একটা মোটেল খুঁজে বের করো। সস্তা... ক্রেডিট কার্ডের ঝামেলা যেন না থাকে। নগদে পেমেন্ট করব আমরা, কোনও ট্রেইল থাকবে না তাতে। ওখানে গিয়ে তুমি আমার ক্ষতটার ড্রেসিং করে দিতে পারবে।'

'ঠিক আছে।'

'আমি একটু চোখবন্ধ করি, কেমন? শরীর আর চলছে না।'

'নিশ্চয়ই। তুমি ঘুমাও, রানা।'

সিটে মাথা রেখে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে গেল রানা।

মোটেলের নাম *সানসেট হাউজ*। অলব্যানির সীমানায়, হাইওয়ে থেকে একশো গজ দূরে এক অর্থে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওটা—অবাক হবার কিছু নেই, *হলিডে ইন্* আর *বেস্ট ওয়েস্টার্নের* মত বিখ্যাত হোটেলগুলোর এলাকায় আর কোনও জরাজীর্ণ মোটেল না-থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে ব্যবসা বেশ রমরমা সানসেট হাউজের; কারণ সবার তো আর নামী-দামি হোটেলে ওঠার সঙ্গতি থাকে না, পয়সা বাঁচানোর জন্য সস্তা লজিং খুঁজতে হয় তাদেরকে... আর এ-এলাকায় এটাই একমাত্র সস্তা মোটেল। ব্যবসার ফন্দি-ফিকির ভালই জানে মালিক, খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকার কারণ বুঝতে পেরে ইচ্ছে করেই করুণ দশা ধরে রেখেছে মোটেলটার, মেরামত করছে না। যা আয় হচ্ছে, তা সে খাটাচ্ছে একটা করে ডাইনার, গ্যাস স্টেশন আর মোটর গ্যারাজের পিছনে—মোটেলের পাশেই ওগুলো।

মোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ড টরাস, রানা বসা ভিতরে। সোহানা গেছে রুম ভাড়া করতে, কিন্তু ও যায়নি—ওর বিধ্বস্ত, অসুস্থ চেহারা ম্যানেজারের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে। ইতোমধ্যে গাড়িতে বসেই পানি দিয়ে মুখ-হাত ধুয়েছে রানা, শরীরে লেগে থাকা জমাট রক্ত পরিষ্কার করেছে; পোড়া, ছেঁড়া-ফাটা পোশাক ফেলে দিয়ে গায়ে চড়িয়েছে সোহানার আনা নতুন প্যান্ট আর পুলোভার। মাথায় দিয়েছে চওড়া কার্নিশঅলা একটা বেসবল ক্যাপ—চেহারা ঢেকে রাখবার জন্য। ওষুধ খেয়েছে রানা, তারপরও আচ্ছন্ন ভাবটা পুরোপুরি দূর হয়নি, জ্বরটা সামান্য কমেছে শুধু। এই অবস্থাতেই সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে ও, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারদিকে; বিপদ দেখলে রিঅ্যাক্ট করবার জন্য টান টান সজাগ

রেখেছে স্নায়ুকে।

একটু পরেই ফিরল সোহানা—হাতে একটা হলুদ রঙের ট্যাগ লাগানো চাবি।

'ক্যাশে ভাড়া মিটিয়েছ?' নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' সোহানা মাথা ঝাঁকাল। 'বলেছি, আমাদের ক্রেডিট কার্ড চুরি হয়ে গেছে।'

'বিশ্বাস করেছে?'

'মনে হয় না। তবে ব্যাটা বলল, আমাদের মত জুটিরা নাকি ক্যাশেই সবসময় পেমেন্ট করে।'

'আমাদের মত জুটি?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

সোহানা হাসল। 'ম্যানেজার ভাবছে, আমরা পরকীয়া করছি।'

'তাতে দোষ দেয়া যায় না। রাখঢাক দেখলে অমনটা ভাবাই স্বাভাবিক। খালি রিপোর্ট করে না দিলেই হয়।'

'করবে বলে মনে হয় না, তাতে ব্যবসার বদনাম হবে না?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল সোহানা, ফোর্ড টরাসকে নিয়ে গেল ওদের ভাড়া করা রুমটার সামনে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে নামল গাড়ি থেকে, রানা ওকে অনুসরণ করল। ট্রাঙ্ক খুলে ব্যাগ নিল ওরা, বারান্দায় উঠে রুমের দরজা খুলল, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কামরাটা মাঝারি আকারের। রং-ওঠা চাদর বিছানো দুটো সিঙ্গেল খাট রয়েছে, মাঝখানের টেবিলটার বার্নিশ উঠে গেছে। মেঝেতে কার্পেট আছে—ছেঁড়ে-ছেঁড়ে অবস্থা। দেয়ালে ব্র্যাকেটে ঝোলানো টিভিটা অন্তত দশ বছরের পুরনো।

ড্রেসিং-টেবিল আছে একটা, আয়নাটার এক কোণা ফাটল ধরা। সব মিলিয়ে বিতিকিচ্ছিরি একটা আবাস।

'চমৎকার!' শিস দিয়ে উঠল রানা।

ভুরু কোঁচকাল সোহানা। 'আমি কিন্তু মুগ্ধ হতে পারছি না। যা অবস্থা... এখানে থাকব কী করে?'

'রুমের চেহারা দেখে খুশি হইনি,' রানা বলল। 'অবস্থা খারাপ নিঃসন্দেহে, তবে সেটাই তো চাই। এমন একটা জায়গায় আমাদের খোঁজার কথা ভাববে না কেউ।'

'হুম। তুমি রেস্ট নাও। আমি গাড়ি থেকে বাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসছি। তোমার কিছু লাগবে?'

'ফার্স্ট এইড কিট। ওটা আগে আনো।'

'আনছি। তুমি বরং গোসল করে ফেলো, ময়লা শরীরে জীবাণু থাকে। ইনফেকশন হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। সোহানা বেরিয়ে যেতেই জামা-কাপড় ছাড়ল, তারপর ঢুকে পড়ল বাথরুমে। ভাগ্য ভাল, ওখানটা রুমের তুলনায় পরিষ্কার—নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় নিঃসন্দেহে।

শাওয়ারে ঢুকে গরম পানি ছাড়ল রানা, শরীর ধুয়ে ফেলতে শুরু করল। কাঁধ থেকে ডাক্ট টেপটা খোলেনি এখনও, তবে শরীরের এখানে-সেখানে আরও কাটা-ছেঁড়া আছে, উন্মুক্ত ক্ষতে পানি লাগতেই জ্বালাপোড়া শুরু হলো। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সহ্য করতে হলো।

দরজায় শব্দ হলো, সোহানা ঢুকল বাথরুমে। জিজ্ঞেস করল, 'সাহায্য দরকার?'

'করলে খুব ভাল হয়। ব্যথায় নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'ঠিক আছে।'

শাওয়ারের পর্দা সরাল সোহানা, থমকে গেল মুহূর্তের জন্য। দৃশ্যটা ভয়াবহ—রানার শরীরের অগণিত আঘাত থেকে ঝরছে রক্ত, স্বচ্ছ পানির রং বদলে গেছে, লাল একটা ধারা গড়াচ্ছে মেঝেতে। উঠে আসা আবেগটাকে কোনোমতে দমাল ও, গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'তোমার অবস্থা খুব খারাপ, রানা। ঠিক করে বলো, সত্যিই ডাক্তার ডাকব না?'

'নিজেই চিন্তা করে দেখো, ডাকা ঠিক হবে কি না।'

আসবার পথে সোহানাকে পুরো ঘটনা ভেঙেচুরে খুলে বলেছে রানা। মনোযোগী শ্রোতার মত শুনেছে ও, কোনও প্রশ্ন করেনি। কিন্তু এখন আর না-করে পারল না।

'আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের কেন খুন করতে চাইবে সিদ্দিকী? ও অভিনয় করেছে বলে মনে হয় না। নিউয়ার্কে ওর উপর সত্যি সত্যি হামলা হয়েছিল... তুমি নিজেই বলেছ আমাকে। ওটা সাজানো ঘটনা ছিল না।'

'সেফ-সাইট আর নিউয়ার্কের দলদুটো একই ছিল বলে মনে হয় না,' রানা বলল। 'এখানে যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের ভাবভঙ্গি স্পেশাল ফোর্সের কমাণ্ডোদের মত লেগেছে আমার কাছে। যে-ধরনের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছিল, তা কেবল ইউএস আর্মির কাছেই আছে।'

এক টুকরো কাপড়ে সাবান মাখিয়ে রানার পিঠ ডলতে শুরু করল সোহানা। 'আর ওয়্যারহাউসের ওরা?'

'হার্ডওয়্যার ভালই ছিল, তবে ওদের ট্যাকটিকস্ ছিল একেবারেই কনভেনশনাল।' ঘষাঘষিতে মুখ কুঁচকে কথা বলছে রানা। 'সেফ-সাইটের দলটার মত শৃঙ্খলা ছিল না ওদের মধ্যে। হামলা শুরুর আগে ঠিকমত চারপাশ কাভার করেনি,

শুরুতেই আমার গাড়িটাও উড়িয়ে দিয়েছে বোকার মত... ওটার কারণে সতর্ক হতে পেরেছি আমি। স্পেশাল ফোর্স হলে এ-কাজ করত না। অ্যাসল্ট শুরু হয়ে যাবার পর গাড়ি-ধ্বংস করত, যাতে রিঅ্যাকশন টাইম না-পায় টার্গেট।'

আর কিছু বলল না সোহানা। ভাল করে রানার শরীর থেকে সমস্ত ময়লা ও রক্ত পরিষ্কার করে ফেলল, তারপর বন্ধ করে দিল শাওয়ারটা। বলল, 'এবার আসল কাজ।'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'সাবধানে কোরো।'

'নিশ্চিন্তে থাকো।'

রানার ঘাড়ে লাগানো ডাক্ট টেপটার কোণা ধরল সোহানা, আস্তে আস্তে তুলতে শুরু করল। তাড়াহুড়ো করল না, তাতে ক্ষতটার আকার আরও বড় হয়ে যেতে পারে। ধীর-স্থির ভাবে এগোলেও ব্যথা কম পেল না রানা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রাখতে হলো ওকে।

খুলে গেল টেপটা কিছুক্ষণের মধ্যে, রক্ত বেরুতে শুরু করল অঝোর ধারায়। তাড়াতাড়ি শাওয়ার আবার ছেড়ে দিল সোহানা, পানির ধারার পাশাপাশি ছোট কাপড়টা দিয়ে হালকা ঘষা দিয়ে ক্ষতের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলতে থাকল। খানিক পরে থামল ও, শাওয়ার বন্ধ করে বলল, 'হয়ে গেছে।'

মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে আছে। তাই জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা দেখছ?'

'চওড়া একটা গর্ত,' সোহানা বলল। 'ভাল খবর হচ্ছে, বুলেট দেখতে পাচ্ছি না; ওটা বেরিয়ে গেছে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছিল। কিন্তু খারাপ খবরটা কী?'

'গর্তটা দু'ইঞ্চি লম্বা।'

'হুম। দাঁড়িয়ে থেকো না, কাজ শেষ করো।'

কাপড়টা রানার হাতে দিল সোহানা। 'চেপে ধরে থাকো। আমি বোতলটা নিয়ে আসছি।'

নির্দেশটা পালন করল রানা, সোহানা বেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে, ফিরল হাতে একটা মাঝারি আকারের বোতল নিয়ে। মোটেলে আসবার পথে একটা ড্রাগস্টোরে থেমে ওটা কিনে এনেছে ও—হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড। জিনিসটা দেখে ঢোঁক গিলল রানা, পরের কাজটা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হতে যাচ্ছে।

'রেডি?' সোহানা জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা, সরিয়ে নিল কাপড়টা। বোতলের মুখ খুলে ভিতরের দ্রবণটা ক্ষতের উপর ঢেলে দিল সোহানা।

তীব্র একটা হিসহিস শব্দ আর ফেনা তুলে উন্মুক্ত মাংসে হামলা চালাল হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড, সমস্ত জীবাণু ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষতটাকে জীবাণুমুক্ত করে ফেলছে। কিন্তু ওসব মাথায় নেই রানার। ওর মনে হলো ছুরি চালিয়েছে কেউ, চোখে আঁধার দেখল অসম্ভব ব্যথায়। প্রায় চেঁচিয়েই উঠছিল, কোনোমতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে থামাল নিজেকে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সোহানা, তারপর ছেড়ে দিল শাওয়ারটা। পানির ধারার সঙ্গে ফেনা-ওঠা তরলটা গড়াতে শুরু করল। পরিষ্কার হয়ে যেতেই শাওয়ারটার গতি কমাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা পার-অক্সাইড ঢালল সোহানা ক্ষতের উপর। এবার আর সহ্য করতে পারল না রানা, গুঙিয়ে উঠল। ওর অবস্থা দেখে সোহানার ভিতরটাও কেমন কেমন করছে, কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নয়। ক্ষতটা ঠিকমত পরিষ্কার না করলে নির্ঘাত ইনফেকশন হয়ে যাবে রানার। নিজেকে সামলাল ও। ভালমত দ্বিতীয়বার ফেনা উঠতে দিল, তারপর বলল, 'হয়ে

গেছে, এবার ধুয়ে ফেলো।'

শাওয়ারের গতি বাড়িয়ে দিল রানা, ক্ষত থেকে দ্রবণটা বেরিয়ে যেতেই টলে উঠল। পা কাঁপছে ওর, পড়ে যাচ্ছিল... সোহানা ধরে ফেলল এক হাতে। অন্যহাতে হ্যাঙ্গার থেকে টাওয়েল নিয়ে গা মুছে দিল, তারপর জড়িয়ে দিল কোমরে। বলল, 'রুমে চলো। হাঁটতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে—পারবে না।

'দরকার নেই, আমার গায়ে ভর দাও,' সোহানা বলল।

ধরাধরি করে রানাকে রুমে নিয়ে গেল ও, বসাল বিছানায়। ফার্স্ট এইড কিট থেকে গজ, ব্যাণ্ডেজ আর অ্যাণ্টিবায়োটিক ক্রিম বের করল। ক্ষতটা বাঁধার আগে আলোতে ভাল করে দেখে নিল ও—খটখটে শুকনো ওটা এখন, আকার-আয়তন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'কী বুঝছ?' কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল রানা।

'দু'পাশের চামড়া লাল হয়ে আছে,' সোহানা জানাল।

'টেপটার কারণে হতে পারে।'

'উঁহুঁ, অন্য রকম। মনে হচ্ছে, অলরেডি ইনফেকশন ধরে ফেলেছে। ওষুধ দরকার তোমার।'

'ওটা পরে হবে। আগে ব্যাণ্ডেজ করো। আমি আর বসে থাকতে পারছি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষতের মধ্যে ক্রিম লাগাল সোহানা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধল যত্ন করে। কাজটায় বেশ দক্ষ ও, বিসিআই-এর বেসিক ট্রেনিঙে প্রত্যেক এজেণ্টকেই ফার্স্ট এইড আর ছোটখাট অপারেশনের কোর্স করতে হয়।

'হয়েছে?' ধৈর্যহারা কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। দুলতে শুরু

করেছে ও, শরীরটা যেন আর নিজের নয়, কোনও কথাই শুনতে চাইছে না।

'হ্যাঁ, শোও।'

সোহানা সাহায্য করল ওকে, শুইয়ে দিল ঠিক করে। গায়ের উপর টেনে দিল একটা কম্বল। কপালে হাত রেখে দেখল, শরীর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা, ডাক্তার ডাকার উপায় নেই। জ্বর কমাতে হবে স্পঞ্জিং করে।

'চোখ-কান খোলা রেখো...' দুর্বল স্বরে বলল রানা, 'অচেনা কাউকে...'

'ওসব আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল সোহানা। 'তুমি ঘুমাও।'

চুপ হয়ে গেল রানা। নিঃসাড় হয়ে গেছে, শুধু দম নেবার তালে তালে ওঠানামা করছে বুকটা।

এতক্ষণে কঠিন ভাবটা খসে পড়ল সোহানার চেহারা থেকে। চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল ওর।

আঠারো

কাঁধে নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠল রানা। চোখ মেলল ও, জানালার ভারি পর্দা গলে আসা ম্লান আলোয় সোহানাকে

দেখল—ব্যাণ্ডেজ বদলাচ্ছে। সুন্দর চোখদুটোর উপরে ভুরুদুটো কুঁচকে রয়েছে ক্ষতের দিকে তাকিয়ে।

'কেমন দেখছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখনও লাল হয়ে আছে,' শান্ত গলায় জানাল সোহানা।

শঙ্কা অনুভব করল রানা।

'তবে তোমার জ্বর নেমে গেছে,' সাহস জোগানোর সুরে বলল সোহানা।

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। 'যাক, অন্তত একটা ভাল খবর শোনালে।'

'আরও আছে। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে না আর।'

'শুনে খুশি হলাম।'

আরেক দফা অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম লাগাল সোহানা, তারপর নতুন ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিল জায়গাটা।

'বাজে ক'টা?' রানা জানতে চাইল।

হাতঘড়ি দেখল সোহানা। 'সোয়া চারটে।'

'এই সময়ে এত আলো!'

'ভোর না, এখন বিকেল।'

'কী!'

'হ্যাঁ, জনাব,' সোহানা হাসল। 'পুরো চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঘুমিয়েছ তুমি। কেন, মনে নেই? রাতে আর সকালে তোমাকে বসিয়ে খাবার আর ওষুধ খাইয়েছি আমি... একবার বাথরুমেও নিয়ে গেছি।'

শূন্য দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'কী আশ্চর্য! আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

'ও কিছু না, শকের সাইড-এফেক্ট।'

'এভাবে ঘুমাচ্ছি... মোটেলের লোকজন সন্দেহ করেনি

তো?'

'নাহ্। সকালে রুম পরিষ্কার করতে একজন মেইড এসেছিল, ওকে বলেছি—বাসি স্যাণ্ডউইচ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছ তুমি। ডেস্ক-ক্লার্ক সেটা জানতে পেরে কিছু ওষুধও পাঠিয়েছে।'

'ভাল।'

'ওঠো, কিছু মুখে দাও। ঘুমের মধ্যে খাইয়েছি... ঠিকমত খাওনি কিছু। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

'নাহ্।'

'তাও খেতে হবে।' রানাকে বসতে সাহায্য করল সোহানা। 'না খেলে সুস্থ হবে কী করে?'

'কী খাওয়াবে?' বেডরেস্টে হেলান দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সরি, সঙ্গে নেই কিছু। পিৎজা আনানো যায়, তবে রুম ডেলিভারি চাইলে সিকিউরিটি হ্যাজার্ড দেখা দেবে। তারচেয়ে তুমি বসো, আমি কিছু কিনে নিয়ে আসি। কী খাবে—ফ্রায়েড চিকেন? মিল্ক শেক? কী খেতে ইচ্ছে করছে, বলো?'

সোহানার আগ্রহ দেখে আর মানা করতে পারল না রানা। বলল, 'চিকেনটাই লোভনীয় শোনাচ্ছে।'

'বসো তা হলে।' সোহানা উঠে দাঁড়াল। 'আমি এক্ষুনি পাশের ডাইনারটা থেকে নিয়ে আসছি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আগে বাথরুমে নিয়ে চলো আমাকে। ভাল কথা, রেজার-শেভিং ক্রিম... এসব কিনেছিলে?'

'হ্যাঁ, ব্যাগে আছে। শেভ করতে চাও?'

মুখে গজিয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল রানা, মাথা

ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। নাও ওগুলো।'

শেভের সরঞ্জামসহ ওকে বাথরুমে পৌঁছে দিল সোহানা। জানতে চাইল, থাকবে কি না।

'দরকার নেই, এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি,' রানা বলল। 'তুমি যাও, খাবার নিয়ে এসো।'

'একা থাকতে তোমার কোনও সমস্যা হবে না তো?' সোহানার সন্দেহ দূর হচ্ছে না।

'কীসের সমস্যা? আমি কি কচি খোকা নাকি? যাও তুমি, দরজায় *ডু নট ডিস্টার্ব* সাইন-টা ঝুলিয়ে দিয়ে যেয়ো। আর হ্যাঁ, যাবার আগে আমার পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে যাও। তুমিও তোমারটা সঙ্গে রেখো।'

ভুরু কোঁচকাল সোহানা। 'বিপদের আশঙ্কা করছ? আমাদের খবর যদি শত্রুরা জানত, তা হলে এতক্ষণে এসে পড়ত না?'

'হতে পারে। তবে সতর্ক থাকলে ক্ষতি আছে?'

'তোমার যা ইচ্ছা।' কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা, তারপর বেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে। একটু পরই রুমের দরজা খোলা-বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা।

তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও। দরজাটা ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি না, চেক করল। তারপর তাকাল ঘড়ির দিকে। সাড়ে চারটে বাজে। কী মনে হতে রিমোট তুলে নিয়ে টিভি অন্ করল—একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

খবরের খোঁজে একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে চলল ও। চ্যানেল সিক্স-এ পাওয়া গেল, শিরোনাম পড়ছে পাঠক। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। অগ্নিকাণ্ডের কথা বলাই হলো না।

বিস্তারিত সংবাদে মিনিট পাঁচেক পরে একটা প্রতিবেদন দেখানো হলো, তাতে ফায়ার-সার্ভিসের তৎপরতার ভিডিও-র পাশাপাশি জানানো হলো, রাত নাগাদ পুরো আগুনই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছে। এলাকা এখন বিপদমুক্ত।

তাড়াতাড়ি চ্যানেল বদলে আরেকটা খবর দেখল রানা, ওখানেও একই অবস্থা। দাবানলের মত বিশাল একটা দুর্ঘটনা মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের কাভারেজ পেল। সংবাদ-পাঠক দর্শকদের আশ্বস্ত করল, আগুনটা পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

থম মেরে বসে রইল রানা।

বিশ মিনিট পর দরজায় আওয়াজ হলো। পর পর তিনবার নক করল সোহানা, বিরতি নিয়ে আরও একবার—এক ধরনের কোড ওটা, রানাকে আশ্বস্ত করছে নিজের বিষয়ে। সিগ-সাওয়ারটা হাতে নিয়ে ফেলেছিল রানা, নক শুনে আবার ঢুকিয়ে রাখল বালিশের তলায়।

লক খুলে ভিতরে ঢুকল সোহানা, হাতে একটা কাগজের ব্যাগ, তাতে খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে। রানার চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'টিভিতে খবর দেখলাম...'

'কী দেখিয়েছে?' টেবিলের উপর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল সোহানা, ভিতর থেকে প্লাস্টিকের লাঞ্চবক্স বের করতে শুরু করল।

'দেখায়নি কিছু... সেটাই অবাক করছে আমাকে।' ঘড়ির দিকে তাকাল রানা—প্রায় ছ'টা বাজে। বলল, 'আবার হবে খবর, এদিকে এসে বসো, নিজের চোখেই দেখো।'

'দাঁড়াও, এক মিনিট। খাবার নিয়ে আসি।'

লাঞ্চবক্স আর পানির বোতল নিয়ে বিছানার কাছে এল

সোহানা, রানার হাতে তুলে দিল, নিজের জন্যও রাখল। তারপর বসল পাশে।

ঠিক ছ'টায় আট নম্বর নিউজ চ্যানেলে খবর শুরু হলো। খেতে খেতে দেখল দুজনে। আগের দুটো খবরেরই পুনরাবৃত্তি—অগ্নিকাণ্ডের কথা বলা হলো বটে, তবে দায়সারা ভঙ্গিতে... খুব স্বল্প পরিসরে। বোঝা গেল, দর্শকদের শুধু আশ্বস্ত করবার জন্যই রাখা হয়েছে বিষয়টা, নইলে বাদ দিয়ে ফেলা হত। কে জানে, রাতের সংবাদে হয়তো আর দেখানোই হবে না কিছু।

'দেখলে ব্যাপারটা?' বলল রানা। 'এক ফোঁটাও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না খবরটাকে। অথচ আগুনের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা গোপন বাঙ্কার পাবার কথা ওদের... চারটে লাশ পাবার কথা... লুকানো একটা হেলিপ্যাড, পোড়া একটা হেলিকপ্টার... হইচই পড়ে যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক ছিল না?'

সোহানারও ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, 'এভাবে আসলে চিন্তা করিনি। কাল রাতেও খবর দেখেছি আমি, চ্যানেলগুলোয় এ-সংক্রান্ত কিছু না উল্লেখ করায় মনে হয়েছিল, তখন পর্যন্ত কিছু খুঁজে পায়নি ওরা।'

'না-পাবার কোনও কারণ নেই। আগুনের সোর্স অভ অরিজিনের খোঁজে স্পটার প্লেন উড়িয়েছে ফায়ার-ফাইটাররা। আকাশ থেকে আমাদের হেলিপ্যাড আর হেলিকপ্টারটা স্পষ্ট দেখা যাবার কথা। তা ছাড়া গাছপালা পুড়ে শেষ হয়ে যাবার পর সেফ-সাইটেই সবার আগে আগুন নিভবে। ওখানে গ্রাউণ্ড-ক্রু পাঠালে বাঙ্কার আর লাশগুলো খুঁজে পেতে মোটেই সময় লাগার কথা নয়। তা ছাড়া যেভাবে হামলা চালানো হয়েছে, তাতে গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ আশপাশের

শহরের মানুষজনের শোনার কথা।'

'বলতে চাইছ, সবকিছু খুঁজে পেয়েও চুপচাপ রয়েছে ওরা? নিউজ ব্ল্যাকআউট?'

'তেমনটাই মনে হচ্ছে না?'

'হুম,' একমত হলো সোহানা। এগিয়ে গিয়ে খাবারের ব্যাগ থেকে একটা খবরের কাগজ বের করল। 'আজকের পেপার নিয়ে এসেছি—*অলব্যানি টাইমস্ ইউনিয়ন*। সকালের এডিশন, খুব বেশি কিছু না থাকারই কথা, তারপরও এসো পড়ে দেখি। আমার ধারণা, অন্তত টিভির চেয়ে বেশি ইনফরমেশন পাওয়া যাবে।'

পেপারটা রানার কাছে নিয়ে এল ও। দুজনে একসঙ্গে পড়তে শুরু করল।

সামনের পাতাতেই ছাপা হয়েছে দাবানলের খবর—দু'কলাম জুড়ে। একটা ছবি আছে, তাতে কালি-ঝুলি মাখা কয়েকজন ফায়ার-ফাইটারকে আগুনের একটা পাঁচিলের দিকে পানি ছুঁড়তে দেখা যাচ্ছে। প্রথম পাতায় শেষ খবরটা, বাকি অংশের জন্য অষ্টম পৃষ্ঠায় যেতে হলো। পড়তে পড়তে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল সোহানা।

'এই দেখো,' একটা প্যারার উপর আঙুল রেখে বলল ও। 'শহরের একজন' বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছে... বেশ বড়-সড় বিস্ফোরণ!'

'নিশ্চয়ই আমাদের এভিয়েশন ফুয়েল ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণ," অনুমান করল রানা।

'লোকটারও তা-ই ধারণা,' সোহানা বলল। 'অন্তত একটা ফুয়েল ডিপো উড়ে না গেলে এমন জোরাল আওয়াজ হতে পারে না।'

'কর্তৃপক্ষ বলছেন, আগুনটা পাহাড়ি ঢালে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ায় ওখানকার হলিডে কেবিনগুলোর ফুয়েল রিজার্ভে ওই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে,' রানা পড়ল।

'সেফ-সাইটের আশপাশে কোনও কেবিন নেই,' মনে করিয়ে দিল সোহানা।

'সেটা সাধারণ লোকজন জানে না। মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে আসল ঘটনা চেপে যাচ্ছে ওরা।'

'এই যে,' আরেকটা অংশ দেখাল সোহানা। 'এখানে লিখেছে, অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে একটা বিশেষ টিম নিয়োগ করা হয়েছে। কে করেছে, তা কিন্তু লেখেনি।'

'লেখেনি, কারণ ওদের আনা হয়েছে পুরো ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য; তদন্ত করবার জন্য নয়।'

'সেটা কি সম্ভব?' সোহানা সন্দেহ প্রকাশ করল। 'তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে তো সেফ-সাইটের ওই ধ্বংসস্তূপ ফায়ার-ফাইটারদের চোখে পড়বেই। এ-কথা বোলো না যে, ইমার্জেন্সি সার্ভিসের প্রত্যেকটা সদস্যকে হাত করা হয়েছে। সেটা কোনোদিনই সম্ভব নয়।'

'অতকিছুর দরকার কী?' রানা বলল। 'লোকাল অথরিটির উপর চাপ সৃষ্টি করা কঠিন কিছু নয়। ওদেরকে হয়তো ইনভেস্টিগেশন টিমের এলাকা থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের সেফ-সাইটটা খুবই নির্জন এলাকায়, ধারেকাছে কেউ না থাকলে... আর সঙ্গে যদি কয়েকটা হেলিকপ্টার থাকে, তা হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই জায়গা থেকে সব ধরনের এভিডেন্স সরিয়ে ফেলা সম্ভব। ওই স্পেশাল টিমটা খুব সম্ভবত তা-ই করেছে।'

'কিন্তু লোকাল অথরিটি শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশে কাজ

করে। আর কেউ তো ওদেরকে জায়গাটা থেকে দূরে থাকতে বলতে পারে না!'

'ঠিক ধরেছ,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'একমাত্র আমেরিকান সরকার এর সঙ্গে জড়িত থাকলেই ব্যাপারটা সম্ভব।'

'হুম,' সোহানা একমত হলো। 'ওরা শুরু থেকেই জড়িত। পালানোর আগে ড. সিদ্দিকী তো ডি.ই.এ.-র হয়ে কাজ করছিল, তাই না?'

'কিন্তু ডি.ই.এ.-তে স্পেশাল-অপ্‌স্‌ টিম নেই,' রানা বলল। 'থাকলেও ওরা আমাদের টিমকে কেন খুন করতে চাইবে, সেটা বুঝতে পারছি না। আমেরিকায় অন্তত এই একটা সংস্থার সঙ্গে রানা এজেন্সি বা বিসিআই-এর কোনও শত্রুতা নেই।'

'ওদের টার্গেট যদি ড. সিদ্দিকী হয়ে থাকে?'

'সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু সমস্যা হলো, দলটাকে সিদ্দিকী নিজেই খবর দিয়েছিল... আমার তা-ই বিশ্বাস।'

একটু ভাবল সোহানা। তারপর বলল, 'সেক্ষেত্রে সিদ্দিকীকে প্ল্যান্ট করা হয়েছিল আমাদের রিলোকেশন-টিমকে বাগে পাবার জন্য। পুরো ব্যাপারটার এই একটাই ব্যাখ্যা।'

'এই ব্যাখ্যাতেও সমস্যা আছে,' রানা মাথা নাড়ল। 'মনসুরের টিমের সমস্ত কেসের ডিটেইলস্‌ জানা আছে আমার। ওরা অন্তত এমন কোনও শত্রু তৈরি করেনি, যার পক্ষে আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের একটা টিম বা ইকুইপমেন্ট জোগাড় করা সম্ভব।'

'কিন্তু তোমার তো অমন শত্রু আছে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি টার্গেট ছিলাম বলেও মনে হয় না।

আমাকে ফাঁদে ফেলবার আরও অনেক উপায় আছে। তা ছাড়া লোকেশনটা ভেবে দেখো, সেফ-সাইটের মত সুরক্ষিত জায়গায় হামলা চালালে আসলে সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু? আমাকে যদি কোণঠাসাই করতে হয়, তা হলে সঙ্গে চারজন ট্রেইনড্ অপারেটর থাকা অবস্থায় চেষ্টা চালাবে কেন?'

'তুমি নও, মনসুরের টিমও নয়। তা হলে তো শুধু ড. সিদ্দিকীই বাকি থাকে। কিন্তু ওকে কেন খুন করতে চাইবে আমেরিকানরা? তোমার মুখেই শুনেছি, ওয়্যারহাউসে ওরা তাকে খুন করতে চায়নি, জ্যান্ত ধরতে চেয়েছে।

"এই ব্যাপারটা আমার কাছেও ঘোলাটে,' রানা স্বীকার করল। 'খুন হবার সম্ভাবনাই যদি থাকে, তা হলে সিদ্দিকী ওদেরকে খবর দিল কেন?'

"একটা কথা আমি ভাবছি...' ইতস্তত করে বলল সোহানা। 'স্রেফ একটা আইডিয়া, তবে...'

'বলে ফেলো, আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না।'

সোজা হয়ে বসল সোহানা। 'টিমদুটো যদি এক দলের না হয়ে থাকে? তুমিই বলেছ, ওদের ট্যাকটিকস্ দু'রকম ছিল। এমন কি হতে পারে না, দুটো পক্ষ লেগেছে ড. সিদ্দিকীর পিছনে? একদল তাকে জ্যান্ত চায়, অন্যদল চায় খুন করতে? তুমি আর মনসুরের টিম ছিলে স্রেফ সেকেণ্ডারি টার্গেট, সিদ্দিকীকে খতম করবার পথে একমাত্র বাধা।'

'হতে পারে,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে সিদ্দিকী আমাদেরকেই খুন করতে শুরু করল কেন? ওকে একমাত্র আমরাই রক্ষা করতে পারতাম। ওর সঙ্গে যদি দ্বিতীয় দলটার যোগসাজশ না থাকে, তা হলে তো ব্যাপারটা একেবারেই খাপ খায় না।'

'তা বটে,' সোহানা একমত হলো। 'আচ্ছা, তুমি তো দ্বিতীয় দলটাকে হেলিকপ্টারে চড়তে দেখেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, চলে যাবার সময়।'

'সবাইকে চড়তে দেখেছ?'

'অবশ্যই। পুরো টিমটা চলে গেছে কি না, শিয়োর হতে হয়েছে আমাকে।'

'সিদ্দিকী ছিল ওদের মধ্যে?'

'না।'

'তুমি শিয়োর?'

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট।'

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না? ও যদি দ্বিতীয় দলটার লোক হত, তা হলে কি ওকে ফেলে যেত ওরা?'

'খুঁজে পায়নি হয়তো। আগুনটা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল, তাতে কপ্টারের কাছে ফিরতে পারেনি হয়তো লোকটা, পুড়ে মরেছে।'

'অনেকগুলো *হয়তো* তোমার কথায়,' বড় করে শ্বাস ফেলল সোহানা, তাকাল পেপারের দিকে। 'আচ্ছা, এত জটিল করে ভাবছি কেন? সহজ হতে পারে না পুরো ব্যাপারটা? দুটো পক্ষ লেগেছে সিদ্দিকীর পিছনে... একদল তাকে মারতে, অন্যদল তাকে জ্যান্ত ধরতে চাইছে। দুটোকেই ভয় পাচ্ছে লোকটা। আর তোমাদেরকে সে খুন করবার চেষ্টা করেছে যাতে ওর রিলোকেশন সংক্রান্ত ইনফরমেশন ফাঁস না হয়, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য। অবশ্য হ্যাঁ, দ্বিতীয় টিমটাকে কেন খবর দিল, সেটা একটু অস্পষ্টই বটে...'

আচমকা যেন একটা হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল রানার সামনে। পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেল ওর

কাছে। 'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও।

'কী, ভুল কিছু বলেছি?'

'না, সোহানা। ঠিক বলেছ... একদম ঠিক। কোনোকিছুই অস্পষ্ট নয়...'

'মানে!'

'সিদ্দিকী যে একটা জিনিয়াস, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি,' উত্তেজিত গলায় বলল রানা। 'সাধারণ মানুষের কাতারে ফেলা যাবে না তাকে। অ্যাসল্ট টিমকে সে খবর দিয়েছে বটে, তবে সেটা একটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক ছিল। এ-ধরনের রিস্ক একমাত্র ও-ই নেবে, আর কেউ নয়।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না!'

'পুরো ব্যাপারটা সিদ্দিকীর মাস্টার প্ল্যানের অংশ, সোহানা,' রানা বলল। 'তোমার ধারণা ঠিক, সত্যিই বিপদে পড়েছে সে, দুটো দল পিছনে লেগেছে তার। বাঁচার জন্য গা-ঢাকা দিতে হবে তাকে। কিন্তু দেবে কীভাবে? ও একজন বিজ্ঞানী, এ-ধরনের কাজে কোনও অভিজ্ঞতা নেই তার। সেজন্যে ভাড়া করেছে আমাদেরকে। কিন্তু ও জানে, একটা নিখুঁত রিলোকেশন শুধু তখনই হতে পারে, যখন কেউ-ই নতুন পরিচয়টা সম্পর্কে জানবে না। সেটাই ওর প্ল্যান ছিল—রিলোকেশনের সমস্ত কায়দা-কানুন জেনে আমাদেরকে খুন করবে বলে শুরু থেকেই ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পাঁচজন ট্রেইনড্ এজেন্টকে খুন করা সম্ভব নয় তার একার পক্ষে। সেজন্যে রাতের আঁধারে দ্বিতীয় টিমটাকে মেসেজ পাঠিয়েছে... হয়তো ইনফর্মার সেজে। এই টিমটা ওকে খুন করতে চায়। তারমানে পথে যত বাধা-বিপত্তি আসবে, সবই শেষ করে দেবে। ইনডাইরেক্টলি আসলে আমাদেরকেই

খুন করতে ওদের ডেকে এনেছে সে...'

'কিন্তু তোমরা নাহয় মারা পড়লে,' বাধা দিয়ে বলল সোহানা। 'ও নিজেই ওই টিমটার হাত থেকে বাঁচত কীভাবে?'

'আগুন... সোহানা। ওটা ছিল ডাইভারশন... পালাবার জন্য। সেই সঙ্গে ওটা আরেকটা কাজ করত—সেফসাইটের সমস্ত লাশ এমনভাবে পুড়িয়ে ফেলত, যাতে আইডেণ্টিফাই করার কোনও উপায় না থাকে। আমি শিয়োর, সে প্রোটেকশন টিমের সদস্য-সংখ্যা একজন কমিয়ে খবর দিয়েছে, যাতে ধ্বংসস্তূপে পাঁচটা লাশ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে খুনিরা, ছ'জনকে না খোঁজে। প্ল্যানটা পারফেক্ট নয়?'

'তারপরও অনেক অনিশ্চয়তা থেকে যায়,' সোহানার খটকা লাগছে। 'আগুনকে... খুনিদের থারমাল সেন্সরকে কীভাবে ফাঁকি দেবে সে?'

'ঠিক যেভাবে আমি দিয়েছি। লোকটা একজন জিনিয়াস, সোহানা। অত্যন্ত স্মার্ট। খুব দ্রুত সব শিখে নেয়, উপস্থিতবুদ্ধিও চমৎকার। থারমাল সেন্সরের ব্যাপারে আইডিয়া আছে তার। ফাঁকি দিতে মোটেই অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'কিন্তু তুমি আমার সাহায্য পেয়েছ। ও কার সাহায্য নেবে? কাউকেই তো বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া লোকটার ফিযিকাল ফিটনেস তোমার চেয়ে অনেক... অনেক কম। এরিয়া থেকে পায়ে হেঁটে বেরুনো সম্ভব নয় তার পক্ষে।'

'সাহায্য নেয়নি, তা নিশ্চিত হচ্ছি কেমন করে? হয়তো নিয়েছে, এলাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে হয়তো তাকে খুনও করে ফেলেছে। এটুকুর জন্য তো বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন নেই, তাই না? ওর মত লোক রাস্তায় উঠে কাউকে জিম্মি করেও পালাতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়।'

'তারপরও বলব, টাইমিং ঠিক ছিল না ওর,' সোহানা মাথা নাড়ল। 'ওর রিলোকেশনের কাজ শেষ করিনি আমরা। আগেই খুনোখুনি শুরু করল কেন?'

থমকে গেল রানা। ঠিকই তো! রিলোকেটেড হবার আগেই ওদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিল কেন লোকটা? ভাবতে শুরু করল ও, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে গেল জবাবটা।

না, টাইমিঙে ভুল করেনি সিদ্দিকী। রিলোকেশন টিমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল তার কাছে, ট্রেইনিং শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাকি শুধু পেপারওঅর্ক... সেটার জন্য রানা কিংবা মনসুরের টিমের কোনও দরকার নেই। দরকার শুধু...

আচমকা একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। ড. সিদ্দিকী কেন ওদের কম্পিউটার ঘেঁটেছে, কেন রিলোকেশন টিম-মেম্বারদের পার্সোনাল ডেটাগুলো দেখেছে, সেটা বুঝতে পারছে। ভয়াবহ সম্ভাবনাটা টের পেয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর। কোনোমতে উদ্বেগ চাপা দিয়ে সোহানাকে বলল, 'আমার কাপড়-চোপড় দাও।'

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও।

'করছ কী!' আঁতকে উঠল সোহানা। 'নিজের অবস্থা দেখেছ? কাপড় চাইছ কেন?'

'কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, সিদ্দিকী এবার কোথায় যাবে,' সংক্ষেপে বলল রানা। বেডসাইড টেবিলের সামনে গিয়ে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার, ডায়াল করতে শুরু করল।

ওপাশে রিং বাজতে শুরু করল।

'রানা...' ডাকল সোহানা।

'কুইক!' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কাপড় আনো। আমাদের এখুনি বেরুতে হবে!'

আর প্রতিবাদ করল না, ব্যাগ খুলে রানার পোশাক বের করতে শুরু করল সোহানা।

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত এখনও নিরুত্তর, রিং বেজেই চলেছে।

'তোলো ফোনটা... তোলো!' বিড়বিড় করল রানা।

ওর তাগিদেই যেন খুট করে শব্দ হলো, শোনা গেল নারীকণ্ঠ। মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেল রানা—সত্যিকার মানুষ নয়, অ্যান্সারিং মেশিনের টেপ বাজছে। বাড়ির মালিক নেই, মেসেজ রেকর্ড করে রাখবার অনুরোধ জানাচ্ছে।

সরোষে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা।

'কী হয়েছে, রানা?' সোহানা জানতে চাইল। 'কাকে ফোন করলে?'

জবাব না দিয়ে বিছানার উপর থেকে একটা শার্ট তুলে নিল রানা। গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, 'আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সোহানা। অন্তরার ব্যাপারে সবকিছু জানে ড. সিদ্দিকী, সেফ-সাইটের কম্পিউটার থেকে সব তথ্য জেনে নিয়েছে। ওকেই খুন করতে গেছে বদমাশটা!'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অন্তর্ধান

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ঠাণ্ডা মাথার, প্রতিভাবান এক ম্যানিয়াককে
প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে মাসুদ রানা।
উধাও হয়ে গেছে লোকটা ওরই দেখানো পথে,
ওকেই ধোঁকা দিয়ে। পিছনে ফেলে গেছে
ওর প্রিয় কয়েকজন বন্ধুর লাশ।
মরতে বসেছে সোহানাও!
এ ছাড়া রয়েছে অচেনা আরও দুই প্রতিপক্ষ দল,
ড. সিদ্দিকীকে হাতে পাবার জন্য
মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। শুরু করে দিয়েছে
খুন, অপহরণ আর ধ্বংসযজ্ঞ। তারপর?

অসুস্থ সোহানা শত্রুর হাতে...
রানার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়...
সিদ্দিকীর হাতে মৃত্যুর নির্যাস!
আর আপনার হাতে? বইটির দ্বিতীয় খণ্ড!
রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ ফয়সাল উদ্দিন
প্র: শেখ সাইদুল হক, ১৩৭ পৃ মাদারবাড়ী, দারোগাহাট রোড, চট্টগ্রাম।

কাজীদা, কেমন আছেন? চৈত্রের এই কাঠফাটা রোদে আমার পক্ষ থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবত গ্রহণ করুন। কী, শরবত খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছেন তো! এই-বার আমাকে ঠাণ্ডা করুন, কেননা মাসুদ রানা আমার মাথা গরম করে দিয়েছে।

মাসুদ রানার স্নাইপার গল্পের কথা বলছি। এর ২য় খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় ভসকভ রানাকে বলে, 'আমাকে শিকার করার জন্যেই আপনি কঠোর সাধনা করে স্নাইপিং শিখেছেন।' কিন্তু কাজীদা ভসকভকে মারার জন্যে যদি মাসুদ রানা এই গল্পে স্নাইপিং শিখে থাকে তবে আগের গল্পগুলোতে মাসুদ রানা যে ঝলক দেখাত তা কীভাবে সম্ভব?

সবশেষে সেবা প্রকাশনীর সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

❋আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিন। ...শুটিং ও স্নাইপিং দুটো ভিন্ন বিদ্যা। দুটোতেই ট্রিগার টিপতে হয়, তবে অস্ত্র আলাদা, ক্যালকুলেশন আলাদা। রানা বরাবরই ভাল শুটার ছিল, সেই ঝলকই দেখেছেন এতদিন। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে বলে স্নাইপিং শিখতে হয়েছে ওকে সেরা ট্রেইনারদের কাছে—সেটাও দেখে নিলেন এবার। এ বিষয়ে আরও আছে ১ম খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায়।

মোঃ শোয়েব হাসান, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ,
বাংলা শাখা, পিরোজপুর, বরিশাল। মোবা: ০১৬৭০৬৯৭৮৭৩

কাজীদা, কেমন আছেন? শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন। ইদানীং অলসতা নামক এক প্রেতাত্মা ভর করেছে আমার উপর, সেবার বই পড়তে আগে খুবই কম সময় ব্যয় হত, আর এখন তিন দিনেও একটা বই পড়তে পারি না। সোহানাকে চাচ্ছিলাম এবং পেলাম। অনেকদিন পর সলীলকে পেলাম। রানা এবং জো-লুই-এর পানিতে লড়াইটাও বেশ জমেছে। সাথে তো

শীত ছিলই। সবশেষে মুক্তির আনন্দে দু'চোখে জল। অসাধারণ। রনবীর আহমেদ বিপ্লব-এর প্রচ্ছদও দারুণ।

❋আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুব খুশি হলাম। ধন্যবাদ।

জোবায়ের আহমেদ

৫-৪/সি মণিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ মো: ০১৯১৭৭৯৪৬৫৬

আশাকরি ভালই আছেন, কাজীদা। মাসুদ রানা'র 'ব্ল্যাকমেইলার' পড়লাম। অনেকদিন পর উত্তেজনাকর একটা বই পড়ে বেশ ভাল লাগল। তারমানে এই নয় যে আগের বইগুলো উত্তেজনাকর ছিল না। আসলে এস এস সি পরীক্ষা থাকার কারণে অনেক দিন গল্পের বই পড়তে পারিনি। আশা করি আমি আবার এমআর নাইন-এর সাথে দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করতে পারব। সবাইকে শুভেচ্ছা।

❋ব্ল্যাকমেইলার ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগল। আশাকরি এসএসসি রেযাল্ট খুব ভাল হবে।

মোঃ মোস্তফা ছিদ্দীক, ১১/৩, সাতরং ২ নং গেট, ওয়াপদা রোড

মোস্তফা ভিলা, গ্রাম: গোপালপুর, থানা: টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর।

সত্যি কথা বলতে কী, আমার জীবনের প্রথম চিঠি আপনাকে, অর্থাৎ মাসুদ রানার স্রষ্টাকে লিখছি। তাই একটু ভয়মিশ্রিত আনন্দ লাগছে। মাসুদ রানা সিরিজের এমন কোন বই নাই যেটা আমার সংগ্রহে নাই (ইনশাল্লাহ্)। অথচ মাসুদ রানা পড়ছি মাত্র ৬ বছর পেরিয়ে ৭ বছর হতে চলল। অনেক বাধা পেরিয়ে, অনেক কটু উক্তিকে পেছনে ফেলে আজ এখানে। যা হোক। 'ব্ল্যাকমেইল' বইটা পড়লাম। সোহানা এবং সোহানা। ধন্যবাদ দাদা সোহানাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনার জন্য। বইটিতে মাসুদ রানার চেয়ে সোহানার ভূমিকাই ছিল মুখ্য। একসাথে প্রেমিকা, মমতাময়ী, সেবিকা, কঠোর, কোমল—সকল ভূমিকাই ছিল সোহানার মধ্যে।

এবার যে কারণে লিখতে বসছি: 'সহযোদ্ধা' বইটি খুব ভাল লেগেছে। বন্ধুত্ব যে কী জিনিস তা মাসুদ ভাই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে। বইটিতে কিছু লাইন আছে যেগুলো হৃদয়স্পর্শ করে। যেমন:

'সোহেল, তুই বেঁচে আছিস। বাঁচতে হবে তোকে। বাঁচতেই হবে। খবরদার, মরবি না তুই!'

মাসুদ রানার পাঠক হতে পেরে আমি গর্বিত। সহযোদ্ধা নয়, অন্তত সহযাত্রী হতে পেরে আনন্দিত। সবশেষে বলব, 'আই লাভ ইউ, ম্যান।'

❋আপনার ভালবাসা পেয়ে রানা নিজেকে ধন্য মনে করছে।

ফরহাদ

৩২২ পঃ রামপুরা, উলনরোড, ঢাকা-১২১৯।

কাজী দা, সালাম নিবেন। গত একুশে বইমেলায় গিয়ে মনে করেছিলাম আপনার ৭৩তম জন্মদিন আর রানার কোয়াড্রুপল সেঞ্চুরি এক সাথে পালন করব। কিন্তু বিধি বাম, সময়ের মারাত্মক রিভার্স সুইং-এর কারণে রানা নিয়মিত ব্যাট করতে না পারায় তা আর সম্ভব হলো না। ভয় লাগছে রানা না আবার নার্ভাস নাইনটিজ-এর শিকার হয়। তাকে একটু সাবধানে ব্যাট করতে বলবেন।

কমপক্ষে আপনার সেঞ্চুরী আর রানার ৬৫০ রান হবে, এই আশা করছি।

হ্যাকার-১, ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা: '১৯৭৭ সনে ভয়েজার-টুকে লঞ্চ করার চল্লিশ বছর পরও তা কার্যক্ষম', এখন ২০০৯, তা কীভাবে সম্ভব? ববি মুরল্যাণ্ডকে কি সামনের কোন বইয়ে আনা সম্ভব? গিল্টি মিয়াকে আর আনতে বলব না, মিশ্রি খানের মতন তাকে না আবার শেষে মেরে ফেলেন। বেঁচে তো আছে তাই বা মন্দ কী? কাজীদা, নববর্ষের পান্তা ভাত আর ইলিশ ভাজার শুভেচ্ছা, সাথে মরিচ পেঁয়াজও আছে।

❋আপনি অঙ্কে খুব পাকা দেখতে পাচ্ছি, তার উপর হুঁশিয়ার পাঠকও। হ্যাঁ, সনে গোলমাল আছে। ...ফেব্রুয়ারিতে আমার ৭৩তম জন্মদিন, এটা কোথায় পেলেন?

নোবেল, C/o মোঃ আব্দুর রব শিকদার,
গ্রাম+পোস্ট: মৌকরণ জেলা: পটুয়াখালী।

প্রথমেই সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। 'মাসুদ রানা' সিরিজের অনেক পুরানো পাঠক আমি। রানার সাথে আমার যাত্রা শুরু 'আই লাভ ইউ, ম্যান' দিয়ে। এরপর দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আছি রানার সাথে। অবসরের একমাত্র সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছি রানাকে। তারই ফলস্বরূপ আমাদের বাসার একটা ক্ষুদ্র অংশ বর্তমানে রানা লাইব্রেরি। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রানার সাথে থাকতে পারি। সবশেষে 'ব্ল্যাকমেইলার'-এর জন্য আমার পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

❋জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন আপনাকে সঙ্গে পাই, এ-ই আমার আন্তরিক কামনা। রানা ভাল লাগছে জেনে খুব ভাল লাগল। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস শুভ, বটতলা মনসুর কোয়ার্টার, বরিশাল
মোবা: 01731399703

কাজীদা, আশা করি ভালই আছেন। আমি মাসুদ রানার একজন বড় ভক্ত। প্রথমে তিন গোয়েন্দা দিয়ে সেবা প্রকাশনীর বই পড়া শুরু করলাম। তারপর মাসুদ রানার অনেক নাম ডাক শুনে শুরু করলাম মাসুদ রানা। প্রথমে 'ধ্বংসপাহাড়' দিয়েই শুরু করলাম যেন প্রথম থেকেই বুঝতে পারি। মাসুদ রানার বইয়ের সাথে জেমস বণ্ডের গল্পের তুলনা করলে আমার কাছে দুটোই প্রায় এক ধাঁচের গল্প মনে হয়'। মোটকথা দুটোই চমৎকার। হলিউডে জেমস বণ্ডের ২২টি সিনেমা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে মাসুদ রানার সিনেমা তৈরি হলেও তা অতি অল্প বাজেটের জন্য উঁচু মানের তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কি বেশ ভাল বাজেট দিয়ে মাসুদ রানার সিনেমা তৈরির কোন পরিকল্পনা রয়েছে যা বলতে গেলে জেমস বণ্ডের সিনেমার মতই উঁচু মানের হবে? জানালে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। আশীর্বাদ করবেন, যেন আগামী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করে 'ফিল্ম মেকিং' কোর্সে ভর্তি হতে পারি।

❋ভাল বাজেট হয়তো অনেকেই সরবরাহ করতে পারবেন, কিন্তু আমাদের আসল সমস্যা তো নো-হাউ। আমরা জানি না কীভাবে ভাল ছবি তৈরি করতে হয়। এখানে ওই মানের ছবি করা সম্ভব মনে করি না।

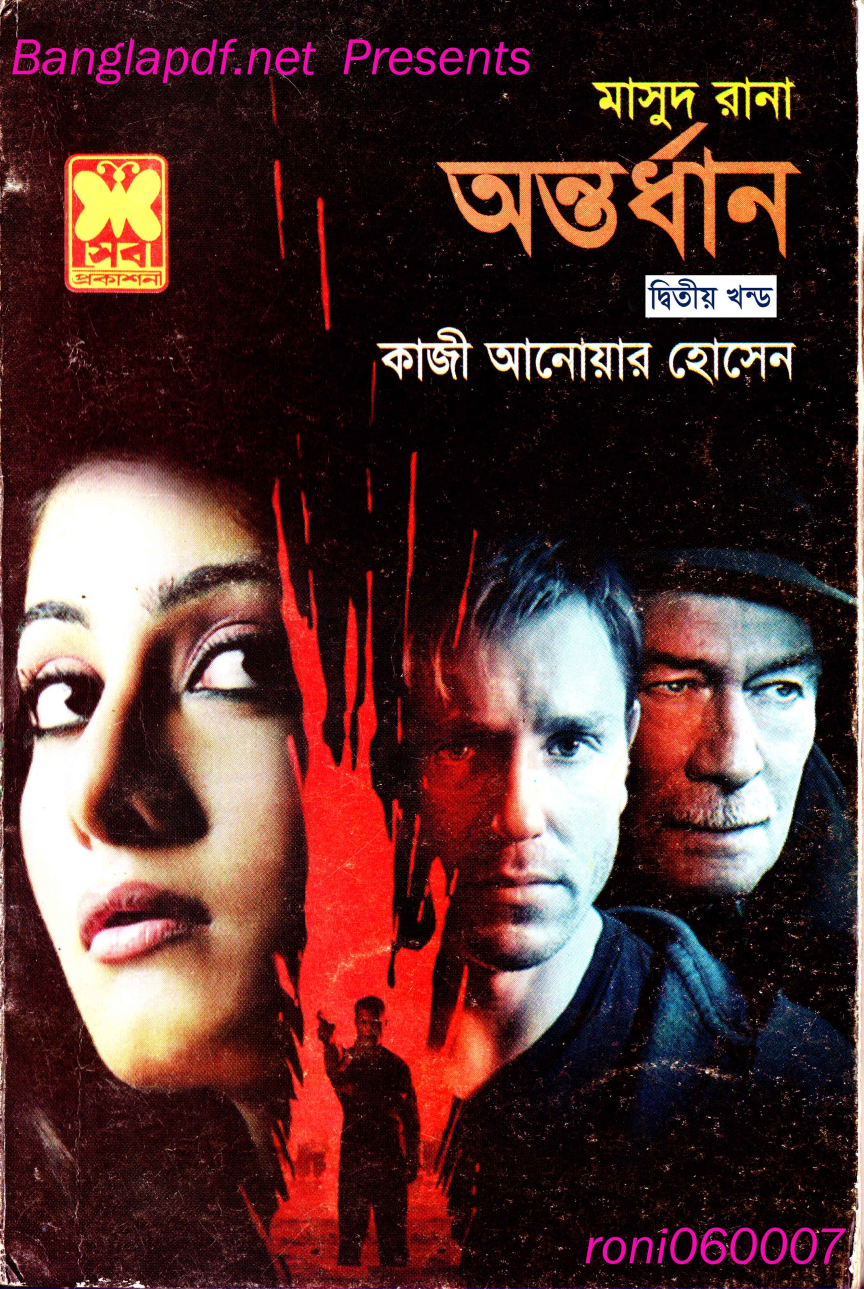

Banglapdf.net Presents
মাসুদ রানা
অন্তর্ধান
দ্বিতীয় খন্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
roni060007

মাসুদ রানা ৩৯৪

অন্তর্ধান

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7394-0

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অন্তর্ধান

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ঠাণ্ডা মাথার, প্রতিভাবান এক ম্যানিয়াককে
প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে মাসুদ রানা।
উধাও হয়ে গেছে লোকটা ওরই দেখানো পথে,
ওকেই ধোঁকা দিয়ে। পিছনে ফেলে গেছে
ওর প্রিয় কয়েকজন বন্ধুর লাশ।
মরতে বসেছে সোহানাও!
এ ছাড়া রয়েছে অচেনা আরও দুই প্রতিপক্ষ দল,
ড. সিদ্দিকীকে হাতে পাবার জন্য
মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। শুরু করে দিয়েছে
খুন, অপহরণ আর ধ্বংসযজ্ঞ। তারপর?

অসুস্থ সোহানা শত্রুর হাতে...
রানার হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়...
সিদ্দিকীর হাতে মৃত্যুর নির্যাস!
আর আপনার হাতে? বইটির দ্বিতীয় খণ্ড!
রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-394
ANTORDHAN
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

একষট্টি টাকা

অন্তর্ধান
দ্বিতীয় খণ্ড

এক

সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই, লালচে একটা আভায় ঢেকে গেছে গোটা অলব্যানি। সেই আলোয় পথ দেখে গাড়ি চালাচ্ছে সোহানা চৌধুরী, পাশে বসে আছে মাসুদ রানা। খুব দুর্বল ও, ড্রাইভ করবার মত শক্তি নেই, শুধু পথনির্দেশ দিয়ে চলেছে সঙ্গিনীকে। অন্তরা আশরাফের বাড়ি চেনে না সোহানা, তাই রানার কথামত এগোতে হচ্ছে ওকে। তাড়া অনুভব করছে দুজনেই, তারপরও সাবধানে যেতে হচ্ছে, স্পিড লিমিটের মধ্যে থেকে। পুলিশ আটকালে সব ভজকট হয়ে যাবে।

পথনির্দেশ দেবার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে রানা, সবকিছু ব্যাখ্যা করছে সোহানার কাছে। 'অন্তরা আমাদের রিলোকেশন টিমের ফর্জার, সেটা গোপন রাখা হয়েছিল ড. সিদ্দিকীর কাছে। তাই সেদিন ভোররাতে অ্যাসল্ট টিমকে খবর পাঠানোর আগে সেফ-সাইটের কম্পিউটার হ্যাক করেছে সে। আমাদের টিমের পার্সোনাল ডেটা ঘেঁটেছে। অন্তরার নাম-ঠিকানা সব জেনে নিয়েছে।'

বাঁক ঘোরার জন্য একটু চুপ করে থাকল সোহানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ওকে খুন করবে কেন সিদ্দিকী? এখনও নতুন পরিচয়ের কাগজপত্র কিছুই দেয়নি অন্তরা। ওগুলো হাতে পাবার আগ পর্যন্ত ওকে জীবিত রাখতে হবে তাকে। অন্তরাকে আমি ভাল করে চিনি, ও এত সহজে কিছুই দেবে না সিদ্দিকীকে।

তা ছাড়া সেফ-সাইটে কী ঘটেছে, সেটাও নিশ্চয়ই টিভি আর খবরের কাগজের বদৌলতে জেনে ফেলেছে ও। না জানলেও সন্দেহ করেছে।'

'তাতে লাভ নেই,' রানা বলল। 'সিদ্দিকী যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেটা জানা নেই ওর। লোকটা একজন চতুর ম্যানিপুলেটর, আমাকে পর্যন্ত গাধা বানিয়েছে। অন্তরার দোরগোড়ায় হাজির হয়ে নতুন একটা গল্প ফেঁদে বসবে সে... অবিশ্বাস করবার উপায় থাকবে না ওর...'

'শুধু লোকটার অভিনয় দেখে নতুন পরিচয়ের কাগজপত্র বানিয়ে দেবে অন্তরা? নাহ্, আমার তা মনে হয় না।'

'কাগজপত্র সব বানানো আছে, সোহানা,' রানা বলল। 'বাকি ছিল শুধু নাম লেখা আর ছবি তুলে ডকুমেণ্টগুলোয় বসিয়ে নেয়া। নতুন কী নাম, আর কী ধরনের চেহারা নেবে সিদ্দিকী, সেটা ঠিক করা হয়নি বলে কাগজপত্র ফাইনাল হয়নি। লোকটা সব জানে, তাই সেদিন ও অ্যাসল্ট টিমটাকে খবর দিয়েছে। আমার আর মনসুরের টিমের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর কাছে, তা ছাড়া নতুন নাম-পরিচয়টা আমাদেরকে জানতে দিতে চায়নি, সেজন্যেই খতম করে দিতে চেয়েছে। অন্তরার কাছে এখন সবকিছু রেডিমেড আছে, ওকে বোকা বানিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারলেই সিদ্দিকীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পঙ্গু একটা মেয়ে কিছুই করতে পারবে না লোকটার বিরুদ্ধে, ওকে খুন করে সবকিছু সহজেই হাতিয়ে নিতে পারবে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল সোহানা। 'লোকটা মানুষ, না পিশাচ?'

'আরও খারাপ,' রানা গম্ভীর গলায় বলল। 'আন্দালিব সিদ্দিকী একজন ম্যানিয়াক... ঠাণ্ডা মাথার অত্যন্ত প্রতিভাবান এক ম্যানিয়াক!'

'কিন্তু এভাবে খুনখারাপিতে মেতে ওঠার কারণটা কী? সে যদি সত্যিকার অর্থে বিপদে পড়ে থাকে, তা হলে সরাসরি আমাদের সাহায্য না নিয়ে এসব করছে কেন?'

'গূঢ় কোনও রহস্য যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আগে সিদ্দিকীকে ঠেকাই। ওই যে, বাঁয়ের রাস্তাটায় যাও।'

মোড় ঘুরল সোহানার ফোর্ড টরাস। সামনেই আবাসিক এলাকা—রাস্তার দু'ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক ডুপ্লেক্স বাড়ি। ধীর গতিতে এগোল সোহানা।

একটু পরেই আঙুল তুলে দেখাল রানা, 'ওই যে... ওটা!'

বাড়িটা দোতলা, পুরনো আমলের ভিক্টোরিয়ান ধাঁচে গড়া। নীচতলায় বিশাল বিশাল কয়েকটা থাম রয়েছে, ঢালু ছাতগুলোর কিনারা বেঁকে গেছে খান্দানি গোঁফের মত। এমনিতে বিল্ডিংটার রং সাদা, তবে দীর্ঘদিনের অযত্নে এখন ধূসর দেখাচ্ছে। সামনে বড় একটা লন আছে, ঘাসগুলো সুন্দরভাবে ছাঁটা। বেশ কয়েকটা বড় বড় গাছ ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। পোর্চের নীচের সিঁড়ির পাশে একটা র‍্যাম্প দেখতে পেল সোহানা; পঙ্গু অন্তরা আশরাফ যেন হুইলচেয়ার নিয়ে সহজে ওঠানামা করতে পারে, সেজন্যে তৈরি করা হয়েছে ওটা।

'দূরে পার্ক করো,' রানা নির্দেশ দিল। 'সিদ্দিকী যদি বাড়ির ভিতরে থাকে, ও যেন আমাদের দেখতে না পায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির সীমানা থেকে একশো গজ দূরে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল সোহানা। ইঞ্জিন বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে আর কেউ থাকে?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'আণ্ডারকাভারে রেখেছি আমি অন্তরাকে... আত্মকেন্দ্রিক একজন শিল্পী হিসেবে। বাড়ির বেজমেন্টে একটা স্টুডিও আছে, ওখানে বসে ফর্জারির সব কাজ

করে ও... ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য ওকে একাই থাকতে হয়।'

'কিন্তু পঙ্গু একটা মেয়ের জন্য এত বড় একটা বাড়ি মেইনটেন করা কঠিন কাজ না? তার ওপর দিয়েছ দোতলা বাড়ি... ওঠানামা করে কীভাবে?'

'পুরনো একটা রিকণ্ডিশনড্ এলিভেটর আছে ভিতরে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ আমাদের এজেন্সিরই এক বৃদ্ধা অপারেটর করে। হাউসমেইডের কাজটা কাভার, ওই ভদ্রমহিলা আসলে অন্তরার সঙ্গে আমাদের কণ্ট্যাক্ট হিসেবে কাজ করে। সপ্তাহে দু'দিন আসে সে, ওই ফাঁকে অন্তরাকে অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে দেয়... পুরনো অ্যাসাইনমেন্টের ফলস্ ডকুমেন্টও সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।'

অন্তরাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনলেও রানা এজেন্সির সঙ্গে সোহানা সরাসরি জড়িত নয় বলে এসব খুঁটিনাটি জানে না। সব শুনে তাই মুগ্ধ হলো ও। বলল, 'হুম, ভাল ব্যবস্থা। কিন্তু ওর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কী?'

'নরমাল অ্যান্টি-বার্গলারি সিস্টেম। হাইটেক কিছু বসাতে রাজি হয়নি অন্তরা, তাতে নাকি প্রতিবেশীরা সন্দিহান হয়ে উঠবে। এমনিতে সঙ্গে একটা পিস্তল রাখে ও, খুবই আত্মবিশ্বাসী। পা-দুটোই শুধু খারাপ, নইলে সম্পূর্ণ সুস্থ। ফোন না-ধরবার কোনও কারণ নেই ওর, দুশ্চিন্তা হচ্ছে সেজন্যেই।'

'বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে।'

'সম্ভব,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু যদি না যায়?'

'তোমার উদ্বেগটা বুঝতে পারছি,' সোহানা বলল। 'কিন্তু ওর বাড়িতে তুমি হাজির হলে কাভারটা নষ্ট হয়ে যাবে না? আসলে হয়তো কিছুই ঘটেনি ওখানে।'

'শিয়োর হবার বিকল্প কোনও কায়দা জানা আছে তোমার?'

'পুলিশে ফোন করো... প্রতিবেশী সেজে। বলো যে, বাড়িটার ভিতর থেকে সন্দেহজনক আওয়াজ পেয়েছ।'

'সমস্যা তো একটাই, আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। আমেরিকান পুলিশ আজকাল হাইটেক কলার আই.ডি. ব্যবহার করে, ওতে আমাদের সেলফোনের নাম্বার উঠবে... নাম্বারটা ট্রেস করে আমাদেরকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে ওরা।'

'পে-ফোন ব্যবহার করো যদি?'

'একজন প্রতিবেশী পে-ফোন ব্যবহার করবে কেন? বাড়ির টেলিফোন ব্যবহার করাটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়? কলার আই.ডি.-তে পে-ফোনের নাম্বার দেখলে কলটাকে ভুয়া ভাবতে পারে ওরা।'

'হুম, সমস্যাই দেখছি!'

'শুধু ফোন নিয়েই সমস্যা নয়,' রানা বলল। 'সমস্যা পুলিশকে নিয়েও। ওরা বাড়ির ভিতর তল্লাশি চালালেই অন্তরার সমস্ত ফর্জারির ইকুইপমেন্ট দেখতে পাবে। আমাদের এজেন্সির পুরো রিলোকেশন প্রোগ্রাম বিপদে পড়ে যাবে তাতে।'

'বাড়িতে তা হলে আমাদেরকেই যেতে হবে?'

'আমাদেরকে নয়, আমাকে,' রানা শুধরে দিল। 'সিদ্দিকী যদি ওখানে থাকে, তা হলে পুরো ব্যাপারটা খুব বিশ্রী আকার ধারণ করতে পারে। তোমাকে ব্যাকআপ হিসেবে প্রয়োজন হবে আমার।'

'কিন্তু তোমাকে আমি একা যেতে দিই কী করে?' সোহানা প্রতিবাদ করল। 'বিছানায় পড়ে থাকা উচিত তোমার, অবস্থা খুবই খারাপ। এই শরীর নিয়ে ওই ম্যানিয়াকটাকে মোকাবেলা করবে কীভাবে? পিছনে থাকতে হয় তুমি থাকো, আমি যাব আগে।'

'না, সোহানা,' রানা মাথা নাড়ল। 'যেতে হবে আমাকেই। সিদ্দিকী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ওর সঙ্গে

বোঝাপড়া আমাকেই করতে হবে!'

'কিন্তু...'

'আর কোনও কিন্তু নয়,' বাধা দিয়ে দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'আমি যাচ্ছি। তুমি সতর্ক থেকো। বিপদ দেখলেই আমি সেলফোনে রিং দেব তোমাকে।'

সোহানাকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে শুরু করল অন্তরার বাড়ির দিকে।

কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে সোহানা ডাকল, 'রানা!'

থামল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'আমার ভয় করছে।'

'আমারও,' সরল গলায় বলল রানা, তাকাল দোতলা বাড়িটার দিকে। 'তবে সেটা অন্তরার জন্য।'

ঘুরে আবার চলতে শুরু করল ও।

সূর্য ইতোমধ্যে ডুবু ডুবু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। দীর্ঘ, গাঢ় ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। একদিক থেকে ব্যাপারটা ভাল, অন্ধকারে চেহারা দেখা যাবে না। বাড়ির কাছে পৌঁছুনোর আগেই পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে মুশকিল, কারণ সরাসরি সামনের দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে রানাকে... সাধারণ একজন অতিথির মত।

অন্তরার বাড়িটা আশপাশের অন্যান্য বাড়িঘরের চেয়ে বড়, গড়ে উঠেছে জমিটার পিছনদিককার পুরো সীমানা ছুঁয়ে। ফলে পিছনদিকে কোনও রাস্তা বা গলি নেই। রাস্তা ফেলে ওখান দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে এগোতে গেলে প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে যাবে রানা, সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে। ওকে চোর ভেবে পুলিশে ফোনও করা হতে পারে। কিন্তু এ-মুহূর্তে পুলিশকে সংক্রামক ব্যাধির মত এড়িয়ে চলতে চাইছে ও। আর যা-ই ঘটুক, পুলিশ কিংবা আইন-প্রয়োগকারী কোনও সংস্থাকে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে

জড়াতে দিতে চায় না কিছুতেই।

আঁধার নেমে এলেও অন্তরার বাড়ির কোনও জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে না—ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল রানাকে। লক্ষণটা খারাপ হতে পারে, আবার ভালও হওয়া বিচিত্র নয়—হয়তো বাড়িতে নেই মেয়েটা, কোথাও বেড়াতে গেছে। ওকে সিনেমাপাগল বলে জানে রানা, হয়তো নতুন কোনও মুভি দেখতেই বেরিয়েছে। ফোন রিসিভ না-করার পিছনে সেটা একটা সুন্দর ব্যাখ্যা হতে পারে।

তারপরও খটকা লেগে রইল রানার মনে। বেরুবার সময় যদি অন্তরার জানা থাকত যে, ফিরতে রাত হবে, তা হলে দু-একটা বাতি জ্বেলে রেখে যেত না কি? নিরাপত্তার জন্য ওটুকু তো করা উচিত ছিল ওর।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল রানা। লনের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সাইডওয়াক ধরে এগোল পোর্চের দিকে, ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে রয়েছে স্নায়ু, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে জানালাগুলোর উপর—কোথাও বিপদের আভাস দেখলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতে পারে।

বারান্দার সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে নিজেকে নাঙ্গা মনে হলো রানার, আশপাশে কোনও আড়াল দেখতে পাচ্ছে না। একই সঙ্গে উদ্বেগ অনুভব করছে—অন্তরার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না ও। পঙ্গু মেয়েটাকে ও-ই তো নিয়ে এসেছে এই বিপজ্জনক পেশায়। কোটের ভিতর বগলের কাছে ডান হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, মুঠোয় ধরা সিগ-সাওয়ারের বাট।

বারান্দায় উঠে এসেছে ও, সামনে বাড়ির সদর দরজা—মুখ বরাবর উচ্চতায় এক টুকরো স্বচ্ছ কাঁচ লাগানো আছে। সাবধানে ওখান দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। ছায়ায় ঢাকা করিডোর ছাড়া কিচ্ছু চোখে পড়ল না—জনমনিষ্যির সাড়া নেই। কী মনে হতে নব ধরে

মোচড় দিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে খুলে গেল পাল্লাটা। বিস্মিত হলো রানা—দরজাটা খোলা পাবে আশা করেনি, সেটা স্বাভাবিক নয়।

শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ও, সাবধানে আবার ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। আহত কাঁধের কারণে স্থির থাকছে না পিস্তল-ধরা হাতটা, দু'হাতেই তাই ধরতে হলো অস্ত্রটা, চোখ বোলাল চারপাশে। করিডোরের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি, দোতলায় চলে গেছে; ডানে-বাঁয়ে দুটো দরজা। ওর নিজের শ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই বাড়ির ভিতরে। একেবারে সুনসান নীরবতা, যেন শ্মশানে এসে পড়েছে।

ভিতরের স্বল্প আলোর সঙ্গে চোখ সইয়ে নিতে একটু অপেক্ষা করল রানা, তারপর ধীর গতিতে এগোতে শুরু করল। সতর্কভাবে পা ফেলছে যাতে শব্দ না হয়, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে সেফটিক্যাচ অফ করা সিগ-সাওয়ারটা। একটা বন্ধ দরজা পেরুল ও—এলিভেটরের এন্ট্রান্স। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল করিডোরের শেষ প্রান্তে। ওপরতলায় যাবার আগে নীচটা দেখে নেবে বলে ঠিক করল, তাই সিঁড়ির পাশে বামদিকের দরজাটা খুলে উঁকি দিল ভিতরে।

কিচেন ওটা। পুরনো আমলের গ্যাসের চুলা লাগানো আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে একটা ফায়ারপ্লেস। কুকিং এরিয়ার একপাশে ডাইনিং স্পেস—সেখানে ছোট্ট একটা গোলাকার টেবিল ঘিরে চারজনের বসার ব্যবস্থা। আবছা আলোয় সিঙ্কে একগাদা এঁটো থালাবাসন দেখা গেল—কখন থেকে পড়ে আছে, কে জানে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরল রানা, ঝট্ করে তাক করল পিস্তলটা।

'গুলি কোরো না!' চাপা নারীকণ্ঠ ভেসে এল ছায়ার ভিতর

থেকে। 'আমি।'

সোহানা।

'চলে এসেছ কেন?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমাকে গাড়িতে থাকতে বললাম না?'

'সরি, তোমাকে ঝুঁকির মধ্যে রেখে আমার পক্ষে বসে থাকা সম্ভব হলো না,' এগিয়ে এসে বলল সোহানা। 'তোমার শারীরিক অবস্থার খবর আমার চাইতে ভাল কেউ জানে না। জেদের বশে এসেছ বটে, কিন্তু লড়াই বাধলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। তাই ভেবে দেখলাম, যদি ব্যাকআপ সাপোর্ট প্রয়োজন হয়... সেটা বাড়ির ভিতরেই দিতে হবে তোমাকে।'

'কথার মারপ্যাঁচ তো ভালই রপ্ত করেছ দেখছি।'

মুচকি হাসল সোহানা। 'কথা শুনিনি বলে শাস্তি দিতে পারো, আমার আপত্তি নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'থাকো তা হলে, চোখ-কান খোলা রেখো।'

'রেখেছি,' সোহানা বলল। ওর হাতেও একটা পিস্তল রয়েছে, রানাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকল কিচেনের ভিতরে। সিঙ্কের কাছে গিয়ে এঁটো থালাবাসন পরীক্ষা করে দেখল। বলল, 'বেশি পুরনো নয় এগুলো। লেগে থাকা খাবার শুকোয়নি; মনে হচ্ছে, লাঞ্চের পরে রাখা হয়েছে।'

হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। বলল, 'কিন্তু এতক্ষণে ডিনারও করে ফেলার কথা অন্তরার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুবই নিয়ম মেনে চলে ও। ওখানে আরও থালা-বাসন থাকার কথা।'

'বাইরে খেতে যায়নি তো?'

'গেলে এগুলো এঁটো ফেলে যাবে কেন? ধুয়ে ফেলত না?'

'হুম,' বলে দরজার কাছে ফিরে এল সোহানা। 'ব্যাপারটা

সুবিধের মনে হচ্ছে না। পুরো বাড়ি সার্চ করে দেখা দরকার। ভাগ হয়ে যেতে চাও?'

'না, একসঙ্গে থাকাই ভাল হবে। এসো আমার সঙ্গে, আগে বেযমেণ্টে যাব। অন্তরার ওঅর্কশপ ওখানে, সিদ্দিকী যদি আমাদের আগে এ-বাড়িতে পৌঁছে থাকে, তা হলে ওখানে ওর চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

'চলো তা হলে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির ডানপাশের দরজার দিকে এগোল রানা, সোহানা অনুসরণ করল ওকে। কবাটের পাশে গিয়ে থামল দুজনে, একটু অপেক্ষা করল, তারপর নব ঘুরিয়ে খুলে ফেলল রানা দরজাটা, চৌকাঠের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল।

সংকীর্ণ একটা স্টেয়ারওয়ে দেখতে পেল ও, ধাপে ধাপে নীচের দিকে চলে গেছে। তলার দিকটায় জমাট বেঁধে আছে ঘন অন্ধকার। সাড়াশব্দ নেই কোনও, কারও নড়াচড়ারও আভাস পাওয়া গেল না।

রানার পকেটে একটা ছোট ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে, বের করল ওটা; তুলে ধরল মাথার উপরে, তারপর জ্বালল। আত্মরক্ষার টেকনিক এটা—অ্যামবুশকারীরা সাধারণত আলোর উৎসের দিকে গুলি চালায়, ফ্ল্যাশলাইটটা মাথার উপর ধরে রাখায় গুলি ওদিকেই যাবে, গায়ে লাগবে না; বরং মাজল ফ্ল্যাশ দেখে ও-ই হয়তো উল্টো ঘায়েল করতে পারবে শত্রুকে।

তবে সতর্কতাটুকুর কোনও সুফল পাওয়া গেল না। আলো জ্বালবার পর কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেলেও গুলি ছুটে এল না নীচ থেকে। সোহানার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল রানা, তারপর নামতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। পায়ের নীচে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল পুরনো কাঠের ধাপ, তবে শব্দ বলতে ওটুকুই। পুরো বাড়ির মত বেযমেণ্টেও কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। তীক্ষ্ণ

চোখে তাকিয়ে রইল ও, ছায়ার আড়াল থেকে আচমকা কোনও বিপদ হলেই মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

অশুভ কী যেন অনুভব করছে রানা—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে জানান দিচ্ছে, কিছু একটা গোলমাল আছে এখানে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। অস্বস্তি বোধ করছে সেজন্যে। আড়চোখে একবার পিছনে তাকাল—সোহানা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছু পিছু আসছে। ওকে উপরে থাকতে বলবে কি না ভাবল, পরমুহূর্তেই আবার বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কাছাকাছি থাকলেই ভাল, বিপদ দেখা দিলে বাঁচাতে পারবে পরস্পরকে।

একটু পরেই বেযমেন্টের মেঝেতে পা রাখল ওরা। আলো ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখল রানা—এটা ভাঁড়ার ঘর। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো কয়েকটা র‍্যাকে রাখা হয়েছে নানা রকম খাবার-দাবার। একপ্রান্তে একটা বন্ধ দরজা—ওপাশে অন্তরার ওঅর্কশপ। ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার আর স্পেশাল প্রিন্টারসহ নানা রকম ফর্জারির ইকুইপমেন্ট রাখে ওখানে অন্তরা, কাজও করে।

হঠাৎ করে নাকে একটা পোড়া গন্ধ পেল রানা, মাথা ঘোরাতেই ওঅর্কশপের দরজার নীচে আলোর আভা দেখতে পেল। বুকটা খামচে ধরল কী যেন, দৌড়ে দরজাটার দিকে ছুটে গেল ও। নবে হাত দিতেই তড়িতাহতের মত ঝটকা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হলো—ওটা প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে!

সময় নষ্ট করল না রানা, পিছিয়ে গিয়ে সজোরে লাথি হাঁকল পাল্লায়। কাঠ ভাঙার শব্দ হলো, নবের দাঁত ছিটকে গেল, ধড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত বাতাসের একটা হলকা ছুটে এল ভাঁড়ারের দিকে। নিজের অজান্তেই পিছু হটল রানা সোহানা। যখন সোজা হলো, তখন দুজনেরই দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

পুরো ওঅর্কশপে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন—কম্পিউটার, ফটোগ্রাফিক ইকুইপমেণ্ট, আসবাবপত্র... সবকিছুর উপর উদ্বাহু নৃত্য জুড়েছে কমলা রঙের শিখা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অন্ধ হয়ে গেল রানা, অন্ধকার থেকে হঠাৎ তীব্র আলোর মুখোমুখি হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ক্ষমতা হারাল। তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও, চেঁচিয়ে উঠল, 'অন্তরা! তুমি আছ ভিতরে?'

জবাব পাওয়া গেল না। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হতেই আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ করল সোহানা, রানার বাহু খামচে বলল, 'রানা! দেখো!!'

তাকাল রানা, স্থবির হয়ে গেল। লেলিহান শিখার মাঝখানে হুইলচেয়ারে নিস্পন্দভাবে বসে আছে একটি নারীমূর্তি—মাথাটা একদিকে হেলে রয়েছে। ইতোমধ্যে পোশাক পুড়তে শুরু করেছে, উন্মুক্ত মুখের পাশটা কালো হয়ে গেছে আগুনের আঁচে। হালকা একটা মাংস-পোড়া গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

'অন্তরা!!!' প্রায় আর্তনাদের মত করে উঠল রানা, আগুনের দেয়াল ভেদ করে ঢুকে পড়ল ওঅর্কশপের ভিতর।

'রানা, ফিরে এসো!' চেঁচিয়ে উঠল সোহানা পিছন থেকে।

তবে ওর ডাক শুনতে পাচ্ছে না রানা, অন্তরার পাশে ছুটে গেল ও, গায়ের কোট খুলে চাপড় দিয়ে নেভাল জামা-কাপড়ের আগুন। তারপর হাত রাখল ঘাড়ে—পালস্ দেখার জন্য।

আঙুলের তলায় রক্তবাহী শিরার কোনও লাফানি অনুভব করল না ও—অর্থটা পরিষ্কার, মারা গেছে অন্তরা। বুকের মধ্যে শূন্যতা ভর করল রানার, তীব্র শোক আর বিষাদ ছেয়ে ফেলছে পুরো অস্তিত্বকে। ভাবছে, আরও আগে কেন টের পেল না ড. সিদ্দিকীর মতলব... কেন আগেভাগেই অন্তরাকে সতর্ক করে দেয়নি?

সোহানা এসে ঢুকল ওঅর্কশপে, ওর কাঁধে হাত রেখে বলল,

'চলে এসো, রানা। ওর জন্যে আর কিছু করবার নেই আমাদের।'

ঘোর লাগা দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'আ... আমার জন্য ও মারা গেল, সোহানা। আমার জন্য!'

'না!' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সোহানা। 'শুধু শুধু নিজেকে দোষারোপ কোরো না, রানা। ড. সিদ্দিকী ওকে মেরেছে। তুমি নও।'

কথাটা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল যেন রানা। ঠিক বলেছে সোহানা। ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, বুকের ভিতর থেকে হুতাশ সরে গিয়ে সেখানে তীব্র প্রতিহিংসা ভর করছে। ড. সিদ্দিকীকে জবাবদিহি করতে হবে ওর কাছে, কেন নিরীহ একটা পঙ্গু মেয়েকে খুন করেছে এভাবে। নিজের জীবন দিয়ে হলেও শয়তানটাকে প্রায়শ্চিত্ত করাবে ও এর জন্য।

'আমাদেরকে বেরুতে হবে, রানা,' চারদিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল সোহানা। 'নইলে পুড়ে মরব।'

ঝুঁকে অন্তরার লাশটা কাঁধে তুলে নিল রানা। বলল, 'এগোও, আমি পিছনে আছি।'

আগুনের দেয়াল ভেদ করে ভাঁড়ার ঘরে ফিরে এল ওরা। পিছনে তাকিয়ে দেখল, ইতোমধ্যে কাঠের মেঝে ধরে বিস্তৃতি পেতে শুরু করেছে লেলিহান শিখা। ব্যাপারটা লক্ষ করে রানা বলল, 'ওঅর্কশপের দরজাটা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ সম্ভব আগুনটাকে চার দেয়ালের ভিতর আটকে রাখতে হবে। পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে গেলে সর্বনাশ!'

'কবাট ভেঙে ফেলেছ তুমি,' মনে করিয়ে দিল সোহানা।

'তা হলে ভেজিয়ে দাও। তাতেও কিছুটা কাজ হবে।'

দরজাটা টেনে দিল সোহানা, রানার কাছ থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল, তারপর আলো জ্বেলে এগোতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে। অন্তরার লাশ কাঁধে পিছনে থাকল রানা।

স্টেয়ারকেসে পৌঁছুতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সোহানা,

উপরে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছে। চোখ তুলে তাকাতেই ছায়ার মধ্যে একটা স্থূলদেহী ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু লোকটা ক্ষিপ্রগতিতে সরে গেল আলোকরশ্মির সামনে থেকে। পরমুহূর্তেই চৌকাঠের আড়াল থেকে কী যেন উড়ে এল ওদের লক্ষ্য করে।

'রানা! সাবধান!!' চেঁচিয়ে উঠল সোহানা। পাঁই করে উল্টো ঘুরল ও, ধাক্কা দিয়ে রানাকে সরিয়ে দিল স্টেয়ারকেসের সামনে থেকে।

কাঁধে অন্তরা থাকায় তাল সামলাতে পারল না রানা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। বেকায়দা আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল ব্যথায়। ওই অবস্থায় ঠং করে একটা শব্দ শুনল ও, সিঁড়ির মাথা থেকে ছুঁড়ে দেয়া জিনিসটা এসে আছড়ে পড়েছে সোহানার পায়ের কাছে। চোখ ফেরাতেই একটা ছোট্ট ধাতব সিলিণ্ডার দেখতে পেল ও—অ্যারোসলের ক্যান কেটে বানানো হয়েছে। মেক-শিফট একটা ফিউয রয়েছে সিলিণ্ডারের উপরে, জ্বলছে ওটা... দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে দ্রুত।

'সোহানা! সরে যাও! সরে যাও ওটার কাছ থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

নির্দেশটা অনুধাবন করতে পারল না সোহানা; সম্মোহিতের মত ও তাকিয়ে রয়েছে সিলিণ্ডারটার দিকে। ঠিক পরমুহূর্তেই ওটা বিস্ফোরিত হলো।

দুই

বুক কেঁপে উঠল রানার, সোহানাকে ছিন্ন-ভিন্ন হতে দেখবে ভেবে আতঙ্কে চোখদুটো বড় হয়ে গেল। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটল না সোহানার ভাগ্যে। সিলিণ্ডারটা জোর আওয়াজ তুলে ফেটে গেল ঠিকই, তবে আগুনের গোলা বা শকওয়েভের পরিবর্তে হিস হিস করে প্রায় বর্ণহীন একটা গ্যাস বেরিয়ে এল ওর ভিতর থেকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে সোহানা, ঝাঁঝালো একটা গন্ধ নাকে আঘাত করতেই সংবিৎ ফিরে পেল। বুঝতে পারল, ওটা শোঁকা ঠিক হবে না। দম বন্ধ করে ফেলল ও, রানাও একই কাজ করেছে আগেই। ফেটে যাওয়া সিলিণ্ডারটার কাছ থেকে সরে গেল তাড়াতাড়ি।

ফড় ফড় করে শব্দ হলো, রানা শার্টের তলার অংশটা ছিঁড়ে ফেলেছে। দুই টুকরো করে একটা দিয়ে নাক-মুখ বাঁধল, অন্যটা বাড়িয়ে দিল সোহানার দিকে। রানার মত নিজেও নাক-মুখ ঢাকল ও, যাতে গ্যাসটা সহজে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকতে না পারে। তারপর লাথি দিয়ে ভাঁড়ারের এক কোণে সরিয়ে দিল সিলিণ্ডারটা।

'কী মনে হয়?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'নক-আউট গ্যাস?'

'জানি না,' সোহানা বলল। 'তবে নক-আউট হলে এতক্ষণে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'কিসের ওটা?' রানা শঙ্কিত।

'ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়েছি। একটু নিশ্চয়ই গেছে ফুসফুসে, তবে কোনও রিঅ্যাকশন বুঝতে পারছি না। সব স্বাভাবিকই লাগছে।'

'আশ্চর্য তো!' রানা অবাক হলো। অল্প একটু টানলেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া তো হবার কথা। ভুরু কুঁচকে ও জানতে চাইল, 'কে ছুঁড়েছে ওটা, দেখতে পেয়েছ?'

'মোটাসোটা একজন... চেহারা দেখা যায়নি, তবে ড. সিদ্দিকী হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

পিছন দিকে তাকাল রানা। ওঅর্কশপ থেকে ভেসে আসা কালো ধোঁয়ায় ভাঁড়ার ঘরটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস টানলেই ফুসফুসে জ্বালাপোড়া অনুভব করছে ওরা। গ্যাসের রহস্যটা পরে ভেদ করলেও চলবে, তার আগে জরুরি হলো জীবন বাঁচানো। ও বলল, 'আমাদেরকে বেরুতে হবে এখান থেকে...'

'উপরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে সিদ্দিকী,' সোহানা বলল।

'এসো দেখি, খোলা যায় কি না।'

সিঁড়ি ধরে এগোলো ওরা, একদম উপরের ধাপে পৌঁছে দরজার নব ধরে মোচড় দিল। ঘুরল ওটা, তবে দরজা খুলল না। বন্ধ দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে শুরু করল রানা। কিন্তু অনড় রইল শক্ত দরজা, কিছুই হলো না। বুঝতে পারল, ওপাশ থেকে ছিটকিনি আটকে দেয়া হয়েছে।

'গুলি করো,' সোহানা বলল পিছন থেকে। 'ছিটকিনি উড়িয়ে দাও।'

'লাভ নেই,' রানা মাথা নাড়ল। 'পাল্লাটা আড়াই ইঞ্চি পুরু। গুলি করলেও যাতে না ভাঙে, ওভাবেই তৈরি করিয়েছিলাম আমি। ওঅর্কশপের সিকিউরিটির জন্যে।'

'তা হলে?'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল রানা, বেযমেণ্টের খুঁটিনাটি মনে

করছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওঅর্কশপের ভিতর অ্যাকসেস আছে এলিভেটরটার—ওটা দিয়ে ওঠানামা করত অন্তরা, হুইলচেয়ারের কারণে সিঁড়ি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। কথাটা সোহানাকে বলল ও।

'সমস্যা একটাই,' তিক্ত গলায় বলল সোহানা। 'জায়গাটা এখন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। তা ছাড়া এলিভেটরের কথাটা সিদ্দিকীর মত মিস্‌গাইডেড জিনিয়াস ভাববে না, তা কি হয়? নিশ্চয়ই অচল করে রেখেছে।'

'তাতে অসুবিধে নেই,' রানা বলল। 'এলিভেটর না চললেও শাফট ধরে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'কিন্তু আগুনের ব্যাপারে কী করবে?'

'ভাঁড়ারের একপাশে একটা বাথরুম আছে, ওখান থেকে শরীর ভিজিয়ে নেব। এসো।'

বাথরুমে ঢুকে আলগা কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল ওরা, বালতির পানিতে ভেজালো ভাল করে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে শরীরও ভেজালো। যখন সন্তুষ্ট হলো, তখনই আবার ভেজা কাপড় চড়াল শরীরে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা-সোহানা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝোঁকাল, তারপর দরজা খুলে একছুটে ঢুকে পড়ল ওঅর্কশপের ভিতরে। এখন পুরো কক্ষটাই আগুনের দখলে, চোখ খুলে রাখা দায়—চারপাশে শুধু কমলা রঙের নাচন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শরীর শুকিয়ে যেতে শুরু করল।

সময় নষ্ট করল না রানা, এলিভেটর ডোরটা কোন্‌দিকে, তা জানা আছে ওর। চোখ খুলল না, আন্দাজের উপর ছুটল ওদিকে, এক হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সোহানাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এলিভেটর ডোরের সামনে পৌঁছে গেল ওরা, তবে দরজাটা বন্ধ। উপরে যাবার বাটন চেপে লাভ

হলো না, মেকানিজমটা কাজ করছে না—তীব্র উত্তাপে, কিংবা ড. সিদ্দিকীর কারিগরি ফলানোর কারণে। ও নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, কোমর থেকে খুলে ফেলল চামড়ার বেল্টটা, বাকলের সরু কিনারটা ঢুকিয়ে দিল দুই পাল্লার মাঝখানের খাঁজে, চাড় দিতে শুরু করল।

একটু পরেই সামান্য ফাঁক হলো দরজা, দু'হাত ভেজা কাপড়ে মুড়ে তাতে ঢুকিয়ে দিল সোহানা, টান দিয়ে সরিয়ে ফেলল পাল্লাদুটো। ভিতরে তাকিয়ে এলিভেটর কারটাকে নীচেই দেখতে পেল রানা, সিদ্দিকী সম্ভবত সিঁড়ি ধরে উপরে ফিরেছে। তাড়াতাড়ি সোহানাকে নিয়ে এলিভেটরে ঢুকে পড়ল ও, দরজা আবার টেনে দিল।

ভিতরটা উত্তপ্ত তন্দুরের মত গনগনে হয়ে আছে, খুবই অস্বস্তিকর। এর মধ্যেই ক্ষণিকের জন্য অন্তরার কথা মনে পড়ল রানার—লাশটা ভাঁড়ার ঘরে রয়ে গেছে, নিয়ে আসা যায়নি... আনার উপায়ও ছিল না। অপরাধবোধ মাথা চাড়া দিতে চাইলে চোয়াল শক্ত করে চাপা দিল ওটাকে। আগে বাঁচতে হবে, তারপর শায়েস্তা করবে ড. সিদ্দিকীকে। সোহানা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলেছে, উপরে তাকিয়ে সেই আলোয় একটা মেইণ্টেন্যান্স হ্যাচ দেখতে পেল রানা। ছাতটা বেশি উঁচু নয়, হাত তুলতেই নাগাল পাওয়া গেল ওটার। ধাক্কা দিয়ে হ্যাচটার মুখ সরিয়ে ফেলল ও, অন্ধকার একটা ফোকর উন্মুক্ত হয়ে গেল।

এলিভেটরের ভিতরে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে। সেদিকে এক পলক তাকাল রানা, তারপর এক লাফে আঁকড়ে ধরল ফোকরের কিনারা, উঠতে শুরু করল উপরে। সোহানা নীচ থেকে ঠেলে ওকে সাহায্য করল। শরীরের পুরো ভর পড়ছে হাত আর কাঁধের পেশির উপর। চড়চড় করে ব্যাণ্ডেজটার একপাশ আলগা হয়ে যেতে শুরু করল, একই সঙ্গে হামলা করল তীক্ষ্ণ

ব্যথা—ক্ষতটার মুখ খুলে গেছে আবার। রক্ত গড়াতে শুরু করল রানার কাঁধ আর বুক বেয়ে।

যন্ত্রণাটা মুখ বুজে সহ্য করল ও, উঠে পড়ল এলিভেটর কারের ছাদে। তারপর উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ফোকরের ভিতরে, সোহানাকে টেনে তুলল।

ওর রক্তে-ভেজা শার্ট আর কোটের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সোহানা। বলল, 'ইয়াল্লা! তোমার কাঁধের ক্ষতটা...'

'জানি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ওটা নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ো। আগে চলো বেরোই এখান থেকে।' শাফটের দেয়ালে বসানো লোহার ল্যাডার দেখাল ও। 'উঠতে শুরু করো।'

'না, আগে তুমি,' মাথা নেড়ে বলল সোহানা। 'তোমার হাতের অবস্থা খারাপ, পড়ে যেতে পারো। নীচে থাকলে আমি কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারব।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল রানা। সোহানার মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিছুতেই ওকে টলানো যাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করবারও সময় নেই। তাই কাঁধ ঝাঁকাল ও, ঘুরে ল্যাডারের ধাপ আঁকড়ে ধরল, উঠতে শুরু করল উপরদিকে।

বাড়ির গ্রাউণ্ড ফ্লোরের অ্যাকসেস ডোরে পৌঁছুতে সময় লাগল না, তবে ওখান দিয়ে বেরুবার ইচ্ছে নেই রানার। ড. সিদ্দিকীর মত প্রতিভাবান দুষ্টবুদ্ধির লোক ঠিকই অনুমান করবে, স্টেয়ারকেসের দরজা বন্ধ থাকায় ওরা এলিভেটর শাফট দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। কিচ্ছু করতে হবে না তাকে, শুধু দরজাটার দিকে অস্ত্র তাক করে বসে থাকবে, ওরা বেরুতে গেলেই গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে। কাজটা কঠিন নয়, যদি মারুফের এম-১৬ অ্যাসল্ট রাইফেলটা এখনও থাকে তার কাছে। থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

জেনেশুনে ফাঁদের ভিতর পা দেয়ার কোনও মানে হয় না।

নীচের দিকে তাকিয়ে সোহানাকে ইশারা করল রানা, যাতে শব্দ না করে। তারপর একতলার লেভেল পেরিয়ে উঠে চলল উপরে। সিদ্দিকী নিশ্চয়ই ভাববে না, ওরা দোতলা দিয়ে বেরুতে পারে।

আহত কাঁধটা টনটন করছে ব্যথায়, অবিরাম ধারায় রক্ত বেরুচ্ছে। কষ্টটা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু শরীর হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসল। ঘেমে হাতের তালু তেলতেলে হয়ে গিয়েছিল আগেই, একতলা অতিক্রম করে কিছুদূর উঠতেই হাত ফসকে গেল ওর। মুঠিতে শক্তি পেল না, পড়ে যেতে শুরু করল। নীচেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পড়তে থাকা দেহটাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে ফেলল সোহানা, ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেল ওরও। ধাম করে দুজনে প্রায় একসঙ্গে বাড়ি খেল ল্যাডারের শক্ত ধাপে। ক্ষতের উপর চাপ পড়েছে রানার, সবকিছু ভুলে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। একতলার এলিভেটর ডোর ভেদ করে বৃষ্টির মত ছুটে এল তপ্ত বুলেট, বিঁধতে শুরু করল শাফটের দেয়ালে। অল্পের জন্য রক্ষা পেল রানা-সোহানা, বুলেটের ধারা থেকে মাত্র তিন ইঞ্চি উপরে ঝুলছে ওদের পা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুজনে, তারপরই একটা আর্তনাদ ছেড়ে চাপা গলায় রানা বলল, 'উপরে... কুইক!'

গোলাগুলির তাণ্ডবকে পিছনে ফেলে আবার ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। আকস্মিক বিপদ রানার শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে—শারীরিক দুর্বলতা, ব্যথা-বেদনা সব ভুলিয়ে দিয়ে বাড়তি শক্তি যোগাচ্ছে। তর তর করে উপরদিকে উঠছে এখন ও।

দোতলায় থামল না রানা। সিদ্দিকীর পরবর্তী স্টপেজ এই ফ্লোরটাই হবে, তাই ওই দরজাটা পেরিয়ে আরও এগিয়ে চলল ও; বাড়িটা দোতলা হলেও টপ ফ্লোরের উপরে একটা অ্যাটিক আছে,

এলিভেটরটা চলে গেছে ওই পর্যন্ত। ওরাও ওখান দিয়েই বেরুবে। দোতলা বাদ দিয়ে অ্যাটিকে হানা দেবে না খুনে বিজ্ঞানী, কাজেই শাফট থেকে বেরুবার জন্য একটু হলেও সময় পাবে ওরা।

ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে একটু পরেই আবার দোতলার এলিভেটর ডোর ঝাঁঝরা হয়ে যেতে শুরু করল। তবে ততক্ষণে নিরাপদ উচ্চতায় পৌঁছে গেছে রানা-সোহানা। পাশেই অ্যাটিকের একজিট দেখতে পেয়ে বেল্টের বাকলটা আবার ব্যবহার করল রানা, চাড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অন্ধকার অ্যাটিকে পা রাখল দুই বিসিআই এজেন্ট। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, এখান থেকে বেরুবার পথটা খুঁজে বের করতে হবে। নইলে বদ্ধ কামরাটা ওদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে উঠতে পারে।

অ্যাটিকের একপ্রান্তের মেঝেতে লাগানো ট্র্যাপডোরটা নজরে পড়ল কিছুক্ষণের ভিতর। সেটার উপর আলো ফেলতেই সোহানা বলল, 'ওখান দিয়ে বেরুনো যাবে না। নীচে সিদ্দিকী অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।'

'জানি,' রানা বলল। 'তবে ভাব দেখাতে হবে যেন আমরা এ-পথেই যাবার চেষ্টা করছি।'

'আসলে যাব কোন্ পথে?'

আলো ঘুরিয়ে অ্যাটিকের ছোট্ট স্কাইলাইটটা দেখাল রানা। 'ওখান দিয়ে যাবে তুমি। বাড়ির চাল বেয়ে নীচে চলে যাবে। আমি এদিকে সিদ্দিকীকে ব্যস্ত রাখব। তুমি নীচ দিয়ে ফিরে এসো। দ্বিমুখী হামলা চালাব। ফাঁদে আমরা নই, লোকটা নিজেই পড়বে তা হলে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, এগিয়ে গেল স্কাইলাইটের দিকে। ছাতটা নিচু, সহজেই শার্সি সরিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল ও।

সোহানার বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর গেল ট্র্যাপডোরের দিকে। সাবধানে হাতলটা ধরল ও, তারপর টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা। ওপাশে একটা ছোট্ট সিঁড়ি, নীচে গিয়ে মিশেছে দ্বিতীয় তলায়।

নামবে কি না ভাবছিল রানা, ঠিক তক্ষুণি অন্ধকারে আলোর ঝলকানি দেখতে পেল। সিঁড়ির নীচ থেকে ভেসে এল গুলিবর্ষণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে পিছিয়ে গেল ও, ধপ করে বসে পড়ল মেঝেতে, একই সঙ্গে সুস্থ হাতটা দিয়ে কোমর থেকে বের করে এনেছে সিগ-সাওয়ার। ড. সিদ্দিকীর গুলিবর্ষণে বিরতি পড়ার অপেক্ষায় রইল... আর সেটা পেতেই ট্র্যাপডোরের ফোকর দিয়ে হাত বের করল; ধাঁই ধাঁই করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল শত্রুর উদ্দেশে।

ম্যাগাজিন খালি হওয়া পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে গুলিবর্ষণ চালিয়ে গেল রানা, খালি চেম্বারে হ্যামারটা খটাস করে পড়তেই ঝট্ করে সরে গেল ট্র্যাপডোরের কাছ থেকে। কয়েক সেকেণ্ড যেতেই নীচ থেকে আবার গুলি ছোঁড়া হলো। অ্যাটিকের কাঠের মেঝে ভেদ করে, ট্র্যাপডোরের ফোকর গলে ছুটে এল এম-১৬-এর একরাশ বুলেট। কাঠের চলটা উড়তে শুরু করল, বাতাস ভারি হয়ে উঠল পোড়া বারুদের গন্ধে। ট্র্যাপডোরের কাছ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো রানা, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে গুলি খাবে।

পিছিয়ে এলেও মনে মনে হিসেব রাখছে ও—এম-১৬-এর ম্যাগাজিনে মোট বিশ রাউণ্ড বুলেট থাকে, শেষ হতে সময় লাগবে না। সেক্ষেত্রে রিলোড করতে হবে সিদ্দিকীকে—আনাড়ি একজন অস্ত্রধারীর পক্ষে কাজটা খুব দ্রুত করা সম্ভব নয়। ওই সুযোগে আরেক দফা হামলা চালাবে বলে ঠিক করেছে। হিসেব কষতে কষতে দ্রুত নিজের সিগ-সাওয়ারে গুলি ভরল ও।

একটু পরেই থেমে গেল সিদ্দিকীর এম-১৬। ঠিক বিশটা গুলি করেছে সে। সন্তুষ্ট হয়ে আবার ট্র্যাপডোরের দিকে এগোল রানা, সিগ-সাওয়ার থেকে থেমে থেমে গুলি করছে। চকিতে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল—সোহানার এতক্ষণে পজিশন নিয়ে ফেলবার কথা। তাই শেষ বুলেটটা চেম্বারে রেখে ছুটল ও—দুদ্দাড় করে নামতে শুরু করল অ্যাটিকের সিঁড়ি ধরে। ল্যাণ্ডিঙের কাছাকাছি পৌঁছে ডাইভ দিল, ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে এল দোতলার করিডোরে।

হাঁটু গেড়ে ফায়ারিং পজিশন নিল রানা, ঝড়ের বেগে ঘোরাল হাতের পিস্তলটা... যেখান থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল, সেদিকে। কিন্তু পরমুহূর্তে অবাক হয়ে গেল—কোথায় ড. সিদ্দিকী! শূন্য করিডোর খাঁ খাঁ করছে চোখের সামনে।

পায়ের নীচে উত্তাপ অনুভব করল ও, ফ্লোর গরম হয়ে উঠেছে—সিদ্দিকী সম্ভবত নীচতলাতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ইতোমধ্যে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সিঁড়ির খোলা জায়গাটা দিয়ে রাশ রাশ কালো ধোঁয়া উঠে আসতেই সন্দেহের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দোতলা। চোখ জ্বালাপোড়া করতে শুরু করল, পোড়া বাতাস ফুসফুসকেও ভোগাতে শুরু করেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল রানা—ড. সিদ্দিকী গেল কোথায়? পালিয়ে গেছে? নাকি আশপাশের কোনও রুমে ঢুকে ঘাপটি মেরে রয়েছে ওর জন্যে? কাছাকাছি গেলেই গুলি ছুঁড়বে?

সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তাই বলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। ডান হাতে পিস্তলটা শক্ত করে ধরল রানা, পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে, সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে—কোনও দরজায় সামান্যতম নড়াচড়ার আভাস পেলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। তবে একটু

পরেই বোঝা গেল, এত সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না; এম-১৬-এর গুলি ফুরিয়ে যেতেই পালিয়ে গেছে সে, রানাকে ঘায়েল করবার জন্য অপেক্ষা করেনি।

সিঁড়ি পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছে গেল ও। ততক্ষণে পুরো দোতলা ছেয়ে গেছে ধোঁয়ায়। খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করেছে রানা, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে—হাইপারভেন্টিলেশনের প্রভাবে। তারপরও স্বস্তি পাচ্ছে না একটুও—শ্বাসনালী আর গলা এমনভাবে জ্বলছে যেন মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখদুটো হয়ে গেছে টকটকে লাল, অনবরত পানি ঝরছে। কাঁধের ব্যথাটাও ভোগাচ্ছে খুব, শরীরের ওই পাশটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, ঢেউয়ের মত কিছুক্ষণ পর পরই ব্যথার স্রোত ছুটে আসছে স্নায়ু বেয়ে।

কষ্টে-সৃষ্টে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল রানা। রেলিং আঁকড়ে অন্ধের মত যাচ্ছে, ধোঁয়ার একটা কালো পর্দা ঢেকে রেখেছে ওকে। দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে শূন্যের কোঠায়, চোখের জ্বালাপোড়ার কারণে পাতাদুটো খোলাও রাখতে পারছে না। হাতড়ে হাতড়ে অর্ধেক পথ গেল ও, দুই ফ্লোরের মাঝামাঝি ল্যাণ্ডিংটা অতিক্রম করতেই দুর্বল বোধ করতে শুরু করল—শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। হাতদুটো নড়তে চাইছে না, হাঁটুতেও জোর পাচ্ছে না... অক্সিজেনের অভাবে নিজেকে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত রোগীর মত মনে হচ্ছে। কয়েক ধাপ নামতেই দুলতে শুরু করল সারা দুনিয়া।

হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল ও, নিজের উপর আর নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনোমতে রেলিঙে হাত ঠেকিয়ে শরীরটাকে সিধে রাখল বটে, তবে নীচতলার ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুতেই উধাও হয়ে গেল অবলম্বনটা। টলে উঠল রানা, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে শুরু করল।

ঠিক তক্ষুণি পিছন থেকে এক জোড়া হাত ধরে ফেলল ওকে... পতন ঠেকাল, তারপর টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল

বাড়ির পিছনদিকে। চোখ মেলে সোহানার অপরূপ মুখশ্রী দেখতে পেল রানা—আগুনের আভায় অন্যভুবনের অপ্সরার মত লাগছে ওকে। হাঁপাচ্ছে ও, এখানে-সেখানে মুখ ব্যাদান করে থাকা আগুনের শিখা এড়িয়ে রানার ভারী শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে বেচারির।

'ছাড়ো আমাকে,' মৃদু স্বরে বলল রানা। 'হাঁটতে পারব।'

'বোকার মত কথা বোলো না!' চোখ রাঙাল সোহানা। 'নিজের অবস্থা দেখেছ? এখন বাহাদুরি দেখাবার সময় নয়।'

'সত্যিই পারব,' রানা বলল। 'তোমার গায়ে একটু ভর দিতে হবে আর কী। ছাড়ো আমাকে, এভাবে টেনে বেশিদূর নিতে পারবে না।'

যুক্তিটা বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা, রানাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। একটা হাত কাঁধের উপর ফেলে ওকে ভর দেয়ালো, তারপর ছোট ছোট কদমে দুজনে এগোতে থাকল বাড়ির পিছনদিকে।

'সিদ্দিকী কোথায়, দেখেছ?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' সোহানা মাথা নাড়ল। 'চোখে পড়েনি। উপরে ছিল না?'

'উঁহুঁ, ভেগেছে,' রানা বলল। 'আমাদের প্ল্যানটা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছিল। পিঠটান দিয়েছে তাই।'

'আমি সামনে দিয়ে এসেছি... কই, ওকে তো বেরুতে দেখলাম না।'

'পিছন দিয়েই হয়তো পালিয়েছে।'

'ওখান দিয়ে যাবার পথ আছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ, আঙিনার সীমানায় একটা ছোট গেট...'

সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল হঠাৎ করে, দমকল-বাহিনী আসছে। বাড়িতে আগুন লাগতে দেখে প্রতিবেশীদের কেউ

সম্ভবত খবর দিয়েছে ওদের। ঝট্ করে পিছনে তাকাল সোহানা, যেন দেখতে পাবে গাড়িগুলোকে। তবে সেটা স্রেফ রিফ্লেক্স। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে ও বলল, 'আমাদের তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, রানা। পুলিশ বা ফায়ার ব্রিগেডের সামনে পড়া চলবে না।'

'জানি,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'এগোতে থাকো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে পিছনের আঙিনায় পৌঁছে গেল ওরা। বাড়ির ভিতর থেকে আগুনের আভায় পুরো জায়গাটাই আলোকিত হয়ে আছে। ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস পেয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করল রানা, ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসছে। আঙুল তুলে বেড়ার গায়ে ছোট্ট গেটটা সোহানাকে দেখাল ও, দুজনে দ্রুত এগোতে থাকল ওদিকে।

বাড়ির সামনে থেকে দমকলকর্মীদের হৈচৈ ভেসে এল, সেইসঙ্গে ফায়ার-ট্রাকের ইঞ্জিনের ভারি গর্জন। ল্যাডার আর হোস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা।

পিছনের আঙিনাটা বেশ বড়, আগুনের আভা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে না। তা ছাড়া সীমানার কাছটায় দুটো বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ আছে, তলাটা ওগুলোর ছায়ায় ঢাকা পড়ে রয়েছে। ওখানে পৌঁছে স্বস্তি বোধ করল রানা—আঁধারের কাভার পেয়ে গেছে, এখন আর ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন ওদেরকে দেখতে পাবে না।

বেড়ার পাশে গুল্মের নিচু ঝোপ, মাঝখানটায় একটুখানি ফাঁকা... সেখানে দেখা গেল সাদা রঙের ছোট গেটটাকে। রানা বলল, 'অন্তরা লাগিয়েছিল এটা। পাশের বাড়ির ছেলেরা ওর লনের ঘাস কেটে দিয়ে যায়, পিছনে গেট থাকলে লনমোয়ার মেশিন আনতে সুবিধে হয় ওদের।'

'তালা মারা নেই তো?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'থাকলে কিছু করার নেই। টপকে ওপারে যেতে হবে।'

রানার কথাটা শেষ হতে না হতে ঝট্ করে খুলে গেল গেটের পাল্লা। মাঝবয়েসী এক পুরুষ, এক মহিলা আর অল্পবয়েসী একটা ছেলে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে ঢুকল আঙিনায়। প্রতিবেশী এরা, পিছনের বাড়িটাতে থাকে—বুঝতে পারল রানা।

'কী হয়েছে?' দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'আপনারা কারা?'

'অন্তরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,' রানা বলল। 'কীভাবে যে আগুন লাগল, বুঝতেই পারিনি। কোনোমতে বেরিয়ে এসেছি...'

'মিস আশরাফ কোথায়?'

'বেযমেন্টে... ওর কাছে পৌঁছুতেই পারিনি...'

'গুলির শব্দ শুনলাম মনে হলো?'

'পেইন্ট-ক্যান ফাটার শব্দ,' তাড়াতাড়ি বলল সোহানা। 'আপনারা যান, ফায়ার-ফাইটারদের বলুন যেন আগে বেযমেন্ট থেকে অন্তরাকে বের করে আনে। আমরা আসলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না...'

কী বুঝল কে জানে, লোকটা আর কথা বাড়াল না, ছেলেকে নিয়ে ছুট লাগাল অন্তরার বাড়ির দিকে। কিন্তু মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে বিহ্বল হয়ে... ইতস্তত করছে।

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' সোহানা বলল। 'যান, নিজের বাড়িটা অন্তত বাঁচান।'

'মানে!' চমকে উঠল মহিলা।

'আগুনটা এদিকে চলে আসতে পারে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বাড়ির দেয়াল আর ছাদ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা। যান, দেরি করবেন না।'

পড়িমরি করে ছুটে চলে গেল মহিলা।

'আমাদেরকে দেখে ফেলল ওরা,' অনুযোগের সুরে বলল সোহানা। 'পুলিশকে বলে দেবে...'

'তাতে অসুবিধে নেই,' রানা নির্বিকার। 'শুধু চেহারার বর্ণনা দেবে, পরিচয় তো আর জানে না। তা ছাড়া, ব্যাপারটা এড়াবারও উপায় ছিল না।'

চারদিক থেকে হৈ-হল্লা বাড়ছে—আরও লোকজন জড়ো হচ্ছে জ্বলন্ত বাড়িটার আশপাশে। সেটা লক্ষ করে রানা বলল, 'চলো, আর দেরি করা উচিত হবে না। একটা ফ্যামিলিই যথেষ্ট, আর কারও চোখে পড়তে চাই না।'

সোহানার সাহায্য নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে শুরু করল ও। পিছনের বাড়িটার আঙিনা হয়ে সরু একটা গলিতে পৌঁছুল, সেটা ধরে পুরো দু'ব্লক দূরে চলে গেল। তারপর ঘুরে উঠে এল মেইন রোডে, ধীরে ধীরে এগোতে থাকল নিজেদের পার্ক করা গাড়িটার দিকে।

একটু পরেই শক্তি ফুরিয়ে এল রানার—রক্তক্ষরণে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, হাঁটতে পারছে না আর। এমনিতে লোকজন সবাই অগ্নিকাণ্ড দেখায় ব্যস্ত, ওদের দিকে নজর দিচ্ছে না; তবে হঠাৎ রক্তাক্ত একজন মানুষকে দেখে যে সন্দিহান হয়ে উঠবে না, তার নিশ্চয়তা নেই। অবস্থাটা বুঝতে পেরে রাস্তার পাশের একটা গাছের আড়ালে রানাকে অপেক্ষা করতে বলল সোহানা, একা চলে গেল গাড়ি আনতে।

বেশি সময় নিল না ও, মিনিট পাঁচেক পরেই ফোর্ড টরাসের কালচে অবয়বটা উদয় হলো রানার দৃষ্টিসীমায়। ঠিক গাছের পাশে এসে থামল গাড়িটা, প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে গেল নিঃশব্দে। চারপাশটা দেখে নিল রানা, তারপর দ্রুত উঠে পড়ল টরাসে। দরজা বন্ধ করতেই অ্যাকসেলারেটর চাপল সোহানা, গতি বাড়িয়ে ছোটাতে শুরু করল গাড়ি। অন্তরার বাড়িটাকে

পিছনে ফেলে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

'গাড়ি আনতে কোনও অসুবিধে হয়েছে?' রানা জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল সোহানা। 'নাহ্। পুলিশ বরং আমি গাড়ি সরানোয় খুশি হয়েছে, আরেকটা ফায়ার-ট্রাক রাখার জায়গা পেয়েছে ওরা।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল দুজনে। শেষে নীরবতা ভেঙে সোহানা বলল, 'তোমার ক্ষতটার অবস্থা কী?'

'আবার মুখ খুলে গেছে। বুঝতে পারোনি?'

'হ্যাঁ, আন্দাজ করেছি। আবার ড্রেসিং করতে হবে, তাই না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'হ্যাঁ।'

একটু ইতস্তত করল সোহানা। তারপর ডাকল, 'রানা?'

'বলো।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব। বাড়ির ভিতরে... যখন আগুন আর গোলাগুলি চলছিল... তোমার ভয় করেনি?'

ভুরু কুঁচকে সোহানার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'হঠাৎ এ-কথা জানতে চাইছ কেন? এ-ধরনের সিচুয়েশনে ভয় তো স্বাভাবিক রি-অ্যাকশন... সেটা খুব ভাল করেই জানো তুমি। আমাদের ট্রেইনিঙের একটা বড় অংশ ছিল এই ভয়টাকে ট্যাকেল করবার নিয়ম শেখা...'

'না...' আবার ইতস্তত করল সোহানা। 'আমি সে-কথা বলছি না। আমি আসলে... আমি আসলে সত্যিকার ভয়ের কথা বলছি... মানে... যেটা ট্রেইনিং দিয়ে ঠেকানো যায় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সরল গলায় বলল, 'তোমার জন্য ভয় হচ্ছিল আমার।'

'আমারও।'

'মানে!'

'নিজেকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম আমি, রানা,' বলল সোহানা। 'এখনও পাচ্ছি!' স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত সরিয়ে রানার দিকে তুলে ধরল ও—হাতটা কাঁপছে ভীষণভাবে।

'রিল্যাক্স!' মোলায়েম গলায় বলল রানা। 'পরিস্থিতিটা গুরুতর ছিল। এটা শকের সাইড-এফেক্ট।'

'না, রানা,' ঘাবড়ে যাওয়া ভঙ্গিতে বলল সোহানা। 'এই ভয়টা স্বাভাবিক নয়। কিছু একটা ঘটে গেছে আমার ভেতর। গোটা ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মত সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছি আমি। বিশ্বাস করো!'

তিন

প্রায় নগ্ন অবস্থায় বাথটাবের পানিতে গা ডুবিয়ে শুয়ে আছে রানা, পরিধেয় বলতে রয়েছে শুধু আণ্ডারওয়্যারটা। কয়েক গজ দূরে বাথরুমের কাউন্টারের উপর... মেকআপ মিররের সামনে রাখা হয়েছে একটা বিদ্যুৎ-চালিত হটপ্লেট—কয়েলগুলো গনগনে লাল হয়ে গেছে, তাপ ছড়াচ্ছে। একটা সসপ্যান বসানো হয়েছে বৈদ্যুতিক এই চুলার উপর—পানি ফুটছে, তাতে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে একটা বাঁকানো সুঁই আর মাছধরা ছিপের এক বাণ্ডিল নাইলন মনোফিলামেণ্ট সুতো। অন্তরার বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পথে একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে থেমে সমস্ত সরঞ্জাম কিনে এনেছে সোহানা—রানার ক্ষতটা সেলাই করবার জন্য।

মোটেলে ফিরে এসেছে ওরা। ড্রেসিঙের জন্য বাথরুমে

ঢুকবার আগে সেলফোনের মাধ্যমে ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারের স্ক্র্যাম্বলড্ লাইনে যোগাযোগ করেছে রানা; কথা বলেছে চিফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে। এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুর রিপোর্ট দিয়েছে ও সংক্ষেপে; কী করতে চায়, তা-ও জানিয়েছে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেছেন রাহাত খান, কিছুক্ষণ কথা বলেননি। শেষে মুখ খুলে শুধু অনুমতি দিয়েছেন, 'গো অ্যাহেড।'

'ইয়েস, সার।'

'খুব বিশ্বস্ত ছাড়া কারও সামনে দেখা দিয়ো না, রানা। সেফ-সাইটের হামলায় তুমি মারা গেছ বলে ভাবছে সবাই, কাজেই লুকিয়ে কাজ করতে সুবিধে হবে,' বলেছেন রাহাত খান। 'মনে হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে আমেরিকানরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তোমাকে সাবধানে এগোতে হবে। তোমার ইনজুরি কেমন?'

'সিরিয়াস নয়, সার,' নিজের সত্যিকার অবস্থাটা চেপে গিয়ে বলেছে রানা। বুকে আগুন জ্বলছে ওর, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ড. সিদ্দিকীকে নিজ হাতে শাস্তি দিতে না পারলে আগুনটা নিভবে না। 'মিশন কণ্টিনিউ করতে পারব।'

'সোহানার কী অবস্থা?'

আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়েছে রানা, মায়া অনুভব করেছে। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় থাকার কারণে হঠাৎ নার্ভ দুর্বলতায় আক্রান্ত হতে পারে—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। শুধু শুধু কথাটা বসকে জানাবার কোনও মানে হয় না। তাই বলেছে, 'ও ঠিক আছে, সার। একদম ঠিক।'

'একা কিছু করতে যেয়ো না,' বলেছেন চিফ, 'ওকে সঙ্গে রেখো। আহত হয়েছ, সাহায্যের জন্য সোহানাকে দরকার হবে তোমার।'

'জী, সার।'

'বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন। আমাদের পাঁচজন এজেন্টকে খুন করে কেউ পার পেয়ে যাবে—তা হতে দেয়া যায় না। তা ছাড়া তলে তলে কী ঘটছে, সেটা জানাও প্রয়োজন। আই ওয়ান্ট আন্সারস্, রানা!'

'পাবেন, সার,' কথা দিয়েছে রানা।

আর কিছু না বলে ফোন রেখে দিয়েছেন রাহাত খান। রানা এসে ঢুকেছে বাথরুমে। জামা-কাপড় ছেড়ে বাথটাবে নেমে পড়েছে, ড্রেসিঙের আগে পরিষ্কার করে নিচ্ছে শরীরে জমে থাকা সব ময়লা। একটু পরেই ব্যাণ্ডেজ, মলম আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলো সোহানা, সবকিছু নামিয়ে রাখল কাউন্টারের উপর।

'কী অবস্থা তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'স্বাভাবিক হয়েছ?'

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না,' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মুখটা আমসি হয়ে আছে।'

'আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না,' মৃদু প্রতিবাদ করল সোহানা। 'নিজের দিকে নজর দাও।'

'সেজন্যেই তো মাথা ঘামানো দরকার,' রসিকতা করল রানা। 'তুমি আমার ডাক্তার, নার্ভাস হয়ে ভুল ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফেলো যদি!'

হাসল না সোহানা। বলল, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, ঠিকমত কাজ করতে পারব। তবে মনের অবস্থা যদি জানতে চাও... কী যেন ঘটে গেছে আমার মধ্যে, রানা। এমন ভয় আমার জীবনে হয়নি, মনে হচ্ছে আর কোনোদিন স্বাভাবিক হতে পারব না।'

'রিল্যাক্স,' হালকা সুরে বলল রানা। 'এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। সবসময় বিপদের মাঝে থাকতে হয় আমাদেরকে, উত্তেজনা দমিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। সবকিছুরই তো সীমা আছে... কখনও-সখনও নার্ভ যদি হার মানে, সেটাকে সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেই। বিশ্রাম পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী জানি, হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা।

'ঠিক তো বটেই,' রানা সহজ ভঙ্গিতে হাসল। 'এবার কাজ শুরু করো, ডাক্তার মেমসাহেব!'

মাথা ঝোঁকাল সোহানা, তাকাল রানার শরীরের দিকে। বলল, 'তোমার গায়ে আরও কালসিটে পড়েছে। যে-অবস্থা দেখছি, তাতে কাল সকালে আর হাঁটতে পারবে না।'

'কাল আমাকে হাঁটতে হবে না,' রানা বলল। 'সারাদিন আমরা গাড়িতে থাকব... চলার মধ্যে।'

'সেটা আজ রাতেই শুরু করা দরকার,' বলল সোহানা। 'মোটেলটা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া অন্তরার পড়শিরা আমাদেরকে দেখেছে, পুলিশও দেখেছে আমাকে। গাড়িটা ছিল ওদের চোখের সামনে, নাম্বার প্লেট মনে থাকবে অনেকেরই। কানেকশন খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। যত দ্রুত সম্ভব, এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমাদের।'

'ঠিক বলেছ,' রানা একমত হলো। 'ড্রেসিংটা হয়ে গেলেই রওনা হব।'

হটপ্লেটের উপর বসানো সসপ্যানের দিকে তাকাল সোহানা। 'কী মনে হয়—পরিষ্কার হয়েছে ওগুলো?'

'দশ মিনিটের বেশি হলো ফুটছে পানিটা। এতক্ষণে তো হয়ে যাবার কথা।'

'তা হলে শুরু করি, কী বলো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা।

এক টুকরো সার্জিক্যাল গজ দিয়ে ওর কাঁধের ক্ষতটা মুছে শুকনো করল সোহানা। আজ আর হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ব্যবহারের দরকার নেই, তাই শুধু জীবাণুনাশক বেটাডিন ঢেলে পরিষ্কার করল। এরপর অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম মেখে দিল জায়গাটায়। এবার সসপ্যান থেকে সুঁই আর সুতো তুলে নিল ও, ধুয়ে ফেলল অ্যালকোহল দিয়ে। একটা ছোট কাঁচিও সেদ্ধ করা হয়েছে পানিতে—তুলে নিল ওটাও। তারপর দক্ষ হাতে সুঁইয়ে সুতা পরাতে শুরু করল।

'তোমার আসলে ডাক্তার, কিংবা নার্স হওয়া উচিত ছিল,' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' বক্রোক্তি করল সোহানা, 'মানুষের শরীরের কাটা-ছেঁড়া সেলাই করতে তো খুব ভাল লাগে আমার!'

মোটা সুঁইটা দেখে কাষ্ঠ হাসি হাসল রানা। 'তা হলে সেলাইটা না-ই বা করলে।'

'আর কোনও উপায় নেই,' এগিয়ে এল সোহানা। 'ক্ষতের মুখটা বন্ধ রাখতে হবে। ব্যাণ্ডেজে কাজ হচ্ছে না, দেখছই তো। সেলাই-টাই একমাত্র বিকল্প।'

'ভুল বললে,' ঠাট্টা করল রানা। 'স্ট্যাপল করে দিলেও কিন্তু হয়!'

'মার খাবে!' চোখ রাঙাল সোহানা। 'সোজা হও। কাজ করতে দাও আমাকে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বাথটাবে সিধে হয়ে বসল।

'তৈরি থাকো,' সোহানা বলল, 'বেশ ব্যথা লাগবে কিন্তু!'

'অসুবিধে নেই,' রানা হাসল। 'দেহ-মনে ব্যথা পেতে পেতে

অভ্যেস হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমার মত সুন্দরীর হাতে চিকিৎসা পাবার সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়?'

'তা-ই?' কটাক্ষ করল সোহানা। পরমুহূর্তে ঘ্যাঁচ করে সুঁইটা বিঁধিয়ে দিল রানার কাঁধের চামড়ায়।

গাড়ির মৃদু ঝাঁকিতে চোখ মেলল মাসুদ রানা। উল্টোদিক থেকে পার হতে থাকা বেশ কয়েকটা হেডলাইট চোখে পড়ল ওর, নিজেকে আবিষ্কার করল টরাসের পিছনের সিটে—গলা পর্যন্ত কম্বল-ঢাকা অবস্থায়। আশপাশে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কেনা জিনিসপত্রের স্তূপ। ওর শরীর থেকে ঝরা রক্তের দাগ ঢাকতে সবক'টা সিট মুড়ে ফেলা হয়েছে নতুন চামড়ার কাভার দিয়ে, সেগুলোর কটু গন্ধে বাস্তবে ফিরে এল ও। তাকাল সোহানার দিকে। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে মেয়েটা।

'কোথায় আমরা?'

'উঠেছ?' মাথাটা একটু ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল সোহানা, আবার সোজা হলো। '*পুকিপ্সি* পেরিয়ে এসেছি একটু আগে, এখন দক্ষিণে আছি। তোমার ঘুম কেমন হলো?'

'ভাল,' ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসতে থাকা গাড়িগুলোর হেডলাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

'কাঁধের কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'সাড়া পাচ্ছি না,' বলল রানা। 'অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে গাড়িতে তুলতে খুব কষ্ট হয়েছে।'

'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল রানা। 'সামান্য একটা সেলাইয়ের ব্যথা সইতে পারব না—এটা ভাবিনি।'

'দোষটা তোমার নয়, শরীরের। এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সামান্য ব্যথাও আর সইতে পারছে না।'

'হুঁ।' সিটের তলা থেকে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল তুলে নিল রানা। মুখ খুলে চুমুক দিল পানিতে।

'খিদে পেয়েছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'নাহ্।'

'তাও কিছু মুখে দাও। শরীরে শক্তি পাবে। সিটের উপর স্যাণ্ডউইচের একটা প্যাকেট আছে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিল রানা, একটা স্যাণ্ডউইচ বের করে কামড় বসাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বাজে?'

'প্রায় একটা।'

'মোটেল রুমটা পরিষ্কার করতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'উঁহুঁ। তোমার রক্তমাখা তোয়ালে আর কাপড়-চোপড় একটা কনস্ট্রাকশন সাইটের ডাম্পস্টারে ফেলে দিয়ে এসেছি। তোয়ালে-তে মোটেলের নাম নেই, কাজেই ওগুলো থেকে আমাদেরকে ট্রেস করতে পারবে না কেউ।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'প্রত্যেকটা ফার্নিচার, দরজা-জানালার হাতল... ভালমত মুছেছি। বিছানার উপর রুমের চাবি আর খামের ভিতর ভাড়া-সহ মোটা বখশিশ রেখে এসেছি। সবদিক কাভার করা হয়েছে, তোমাকে ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'খুব ভাল।' স্যাণ্ডউইচটা দ্রুত শেষ করল রানা, পানি খেল। রাস্তার হালকা ট্রাফিক দেখল কিছুক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার টায়ার্ড লাগছে না?'

'কিছুটা তো লাগছে। কেন?'

'সামনে কোথাও সাইড করো। আমি কিছুক্ষণ ড্রাইভ করি।'

'পারবে?' ভুরু কোঁচকাল সোহানা।

'ডান হাতটা চালু আছে এখনও। অসুবিধে হবার কথা নয়। তা ছাড়া তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।'

'হুম। ভাল কথা, কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ?'

'নিউ জার্সি। ওখানে পৌঁছে আরেকটা মোটেল খুঁজে নেব।'

'তারপর?'

'খানিকটা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেই ফাঁকে প্রস্তুতিও নেব।'

'কীসের জন্য?'

'সিদ্দিকী,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'ওকে শিকার করতে বেরুব আমি!'

চার

'হায়! হায়! এ কী অবস্থা?' প্রায় হাহাকার করে উঠল অটোমোবাইল পেইন্ট-শপের মালিক লোকটা। 'এত সুন্দর একটা গাড়ি... কে করেছে এ-অবস্থা?'

আঁতকে ওঠার মত দৃশ্যই বটে। ঝকঝকে নতুন টরাস গাড়িটার সারা শরীর ঢেকে গেছে কটকটে সবুজ আর টকটকে লাল রঙা স্প্রে-পেইন্টের হিজিবিজি দাগে। কিম্ভূতকিমাকার একটা বস্তুর মত মনে হচ্ছে বাহনটাকে।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, 'বজ্জাত ছেলেপুলেদের কাণ্ড। আধঘণ্টার জন্য রাস্তার পাশে রেখে একটা কাজে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি এ-অবস্থা। বদমাশগুলোকে হাতের কাছে পেলে বেত মেরে পিঠের ছাল তুলে ফেলতাম...'

'এ-গাড়ি তো এখন পুরোটা নতুন করে পেইন্ট করতে হবে!'

বলল মালিক।

'জানি,' চেহারায় তিক্ততা ফোটাল রানা। 'ডিলারশিপে গিয়েছিলাম, ওরা বলল—ওয়ারেন্টিতে ভ্যাণ্ডালিজম কাভার করে না। নতুন করে রঙ করে দিতে পারে, তবে সেজন্য আমাকেই গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে। অ্যামাউন্টটা শুনে ভিরমি খাবার জোগাড় হয়েছে আমার, বলতে গেলে পালিয়ে এসেছি।'

'কত চেয়েছে ওরা?'

আকাশছোঁয়া একটা অঙ্ক বলল রানা। এই পেইন্ট-শপে ওটার তিন ভাগের দু'ভাগ নিলেও বিশাল লাভ থাকবে।

লোকটার চোখ চকচক করে উঠতে দেখে বোঝা গেল, টোপটা গিলেছে সে। স্বাভাবিক, এমন একটা দাঁও মারার সুযোগ কোনও সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যবসায়ী হাতছাড়া করবে না। মুখে হাসি ফুটিয়ে সে প্রস্তাব দিল, 'আমি যদি ওদের চেয়ে দুইশ' ডলার কমে করে দিই, তা হলে চলবে?'

'দুইশ'?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'বাজেট তো তারপরও ফেল মারছে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল পেইন্ট-শপের মালিক। 'আমি আরও পঁচিশ ডলার ডিসকাউন্ট দেব, কারণ আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ভেবে দেখুন, এই রেটে কিন্তু আর কেউ রাজি হবে না। ডিলারদের অবস্থা তো দেখেই এসেছেন, ওরা স্রেফ জবাই করবে আপনাকে।'

শ্রাগ করল রানা। 'কী আর করা! ঠিক আছে, রাজি আমি।'

খুশিতে বত্রিশ দাঁত বেরিয়ে পড়ল পেইন্ট-শপের মালিকের। জিজ্ঞেস করল, 'রঙ কি অরিজিনালটাই রাখতে চান, নাকি অন্য কিছু?'

'না, না,' আপত্তি জানাল রানা, 'নীল রঙটা প্রথম দিন থেকেই আমার বউ সহ্য করতে পারছে না। আমাকে বলে দিয়েছে, যাতে

ধূসর রঙ করি।'

'ঠিক আছে, তা-ই হবে।'

সোহানাকে নিয়ে এরপর ফিলাডেলফিয়ার একটা ব্যাঙ্কে গেল রানা। কাউন্টারের সামনে গিয়ে ক্লার্কের কাছে পরিচয় দিল, 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ কায়সার।'

একটা ফর্ম বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক। 'এখানে সই করুন, মি. কায়সার।'

করল রানা। অ্যাকাউন্ট নাম্বারও লিখল।

কম্পিউটারে সইটা মিলিয়ে দেখল ক্লার্ক। শেষ ট্র্যানজ্যাকশনের তারিখটা লক্ষ করে বলল, 'অনেকদিন পর এলেন আপনি, মি. কায়সার।'

'হ্যাঁ, এক বছর,' রানা বলল। 'তবে ঠেকায় না পড়লে সেফটি-ডিপোজিট বক্স ব্যবহার করি না আমি। ঠেকাটা যত দেরিতে আসে, ততই মঙ্গল।'

ভুরু কুঁচকে মক্কেলের দিকে তাকাল ক্লার্ক। মুখের কালসিটে আর স্লিঙে ঝোলানো বাম হাত দেখে বুঝল—ঠেকা হোক বা না-হোক, অন্তত ঝামেলার মধ্যে আছেন ভদ্রলোক। চেহারায় সহানুভূতি ফোটাল সে। বলল, 'আপনার চাবিটা বের করুন প্লিজ।'

ক্লার্কের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিচলিত হলো না রানা। ইতোমধ্যে চুল ছোট করে ছেঁটে নিয়েছে ও, চোখে চশমা দিয়েছে, নাকের নীচে লাগিয়েছে একটা পুরু গোঁফ। ব্যাঙ্কের ফাইলের ছবির সঙ্গে চেহারাটা হুবহু মিলে যাবে। সোহানাও ছদ্মবেশ নিয়েছে—মাথায় পরচুলা পরেছে, চোখের মণির রঙ পাল্টে ফেলেছে নীল রঙের কণ্ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে। ওদের আসল পরিচয় ফাঁস হবার ঝুঁকি নেই।

চাবিটা ক্লার্কের হাতে তুলে দিল রানা। লোকটা জানতে চাইল, 'আপনারা কি কিউবিকল ব্যবহার করতে চান?'

'অবশ্যই!'

'ঠিক আছে, আসুন।'

মার্বেল পাথরে মোড়া একটা সিঁড়ি ধরে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ওদেরকে নিয়ে গেল ক্লার্ক। সামনেই একটা ভারি লোহার দরজা, পাশে ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক। প্যানেলে কোড চেপে দরজাটা খুলল লোকটা, দুই মক্কেলকে নিয়ে ঢুকল আলোকিত একটা ভল্ট-রুমে। চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে স্টিলের তৈরি অসংখ্য ছোট ছোট হ্যাচে, চাবির নম্বর দেখে নির্দিষ্ট বক্সটা খুঁজে বের করল ক্লার্ক। ওটায় দুটো চাবির ফুটো আছে—একটায় রানারটা ঢোকাল লোকটা, আরেকটায় ঢোকাল নিজের একটা চাবি। দুটো একসঙ্গে ঘোরাতেই খুলে গেল বক্সের তালা। হ্যাচটা খুলে ভিতর থেকে একটা ধাতব কণ্টেইনার বের করে আনল ক্লার্ক, তুলে দিল রানার হাতে।

'কিউবিকলগুলো ভল্টের বাইরে,' জানাল সে।

'ধন্যবাদ।'

'মোস্ট ওয়েলকাম,' হাসল ক্লার্ক। 'কিউবিকলে কলিং বেলের সুইচ আছে। কাজ শেষ হলে ওটা বাজিয়ে খবর দেবেন আমাকে। কণ্টেইনারটা আবার ঢুকিয়ে রাখব।'

'আপাতত তার প্রয়োজন হবে না,' রানা বলল। 'আজ শুধু জিনিস নিতে এসেছি, কিছু রাখতে নয়।'

'আপনার যা মর্জি।' রানার চাবিটা ফিরিয়ে দিল ক্লার্ক।

মক্কেলদের রেখে ভল্ট থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। সোহানাকে নিয়ে কিউবিকলের দিকে এগোল রানা।

একসারিতে ছোট ছোট কয়েকটা কামরা ওগুলো। একটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা, টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল

কণ্টেইনারটা। ঢাকনা খুলে ভিতর থেকে কয়েকটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করল রানা, সঙ্গে দুটো মখমলের পাউচ।

'ব্যাগ দাও,' বলল ও।

একটা হ্যাভারস্যাক এনেছে সোহানা, ওটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। মুখ খুলে সবক'টা খাম আর পাউচ ভরল রানা, তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্যাঙ্ক থেকে।

নিউ জার্সির মোটেলে ফিরে এল রানা-সোহানা। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে হ্যাভারস্যাক থেকে সবকিছু ঢালল বিছানায়। ম্যানিলা খামগুলো খুলতেই ছোট ছোট নোটে দশ হাজার ডলার বেরুল।

'চমৎকার!' মন্তব্য করল সোহানা। 'খরচা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'এগুলো সরকারি টাকা—বিসিআই থেকে ধার হিসেবে নেয়া... ইমার্জেন্সি সামলানোর জন্য,' নীরস গলায় বলল রানা। 'ভেবো না গয়না কিনতে পারবে।' ঠাট্টা করছে ও।

'মনটাই খারাপ করে দিলে!' সোহানা ভান করল।

হাসল রানা।

'আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে,' সোহানা বলল। 'আমার সমস্ত ইমার্জেন্সি ফাণ্ড একত্র করলেও তো এত টাকা হবে না।'

'সবচেয়ে অ্যাকটিভ এজেণ্ট হবার কুফল,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'কুফল! এত টাকা... তোমার কাছে কুফল মনে হচ্ছে?'

'নয়তো কী? সবই তো ধার নেয়া। যদি কোনও রকমে হারাই, আমার সাত জনমের পেনশন খতম হয়ে যাবে ফেরত দিতে দিতে।'

'বলো কী! তোমার সব ইমার্জেন্সি ফাণ্ডেই কি এত টাকা আছে নাকি?'

‘তা অবশ্য নেই। ফিলাডেলফিয়ার ফাণ্ডটা সবচেয়ে রিচ। সেজন্যেই ওখান থেকে তুলে এনেছি।’

‘কিন্তু আমেরিকায় এত জায়গা থাকতে ফিলাডেলফিয়াতে কেন বেশি টাকা রাখতে গেলে?’

‘সিম্পল—জায়গাটা নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের মাঝামাঝি। এদেশের ও-দুটো শহরেই সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হয় আমাকে।’

খামের ভিতর থেকে দুটো ক্রেডিট কার্ড বেরিয়েছে। সেগুলো দেখিয়ে সোহানা জিজ্ঞেস করল, ‘এগুলো মেইনটেন করো কীভাবে?’

‘রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসের ঠিকানায় বিল যায়। নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চ থেকে জাকির ওগুলোর পেমেন্ট দেয়। বছরে দু’একবার আমি ব্যবহার করি কার্ডগুলো, যাতে ক্যানসেল না হয়ে যায়।’

‘হুম, এজেন্সিটা থেকে ভালই সাপোর্ট পাও তুমি। আমাকে তো এ-ধরনের সবকিছু নিজেকেই ম্যানেজ করতে হয়।’

জবাবে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা। সোহানা বাধা দিয়ে বলল, ‘জানি, জানি, কী বলবে। সবচেয়ে অ্যাকটিভ এজেন্ট হবার কুফল... তাই না?’

‘এজেন্সি নিয়ে যে কত ঝামেলা পোহাতে হয়, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।’

‘তার দরকার নেই। আর কী কী এনেছ, সেগুলো দেখাও।’

একটা পাউচ খুলল রানা। ভিতর থেকে বের করল নকল পরিচয়ের বিভিন্ন রকম ডকুমেন্ট। আইডি কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে শুরু করে হরেক রকম কাগজপত্র।

‘এগুলো সব অন্তরার তৈরি করে দেয়া,’ বলতে বলতে গলাটা ধরে এল রানার।

ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল সোহানা। 'রিল্যাক্স, ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে তারপর দেখা করব আমরা অন্তরার সঙ্গে।'

নিজেকে সামলে মাথা ঝাঁকাল রানা, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ওর।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য দ্বিতীয় পাউচটা দেখাল সোহানা। 'ওটায় কী?'

'এটা? গিফট... তোমার জন্য।'

'তাই নাকি?' পাউচটা তুলে মুখ খুলল সোহানা, উঁকি দিল ভিতরে। পরমুহূর্তে নিঃশব্দে হাসল। 'হ্যাঁ, একজন এসপিয়োনাজ এজেন্টের জন্য উপযুক্ত উপহারই বটে!' জিনিসটা বের করে আনল ও।

'তা হবে কেন?' হালকা সুরে বলল রানা। 'মেয়েরা তিনটে জিনিস দেখে আকৃষ্ট হয়, এটা জানো না? গাড়ি, টাকা আর আগ্নেয়াস্ত্র!'

'বুঝেছি, তোমাকে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের উপর সবক দিতে হবে।'

সোহানার হাতে শোভা পাচ্ছে একটা সিগ-সাওয়ার নাইন মিলিমিটার পিস্তল—রানারটার যমজ। ওটার মত এটাও মডিফাই করা—ফ্যাক্টরি-ইকুইপড্ সাইট সরিয়ে একটা রিয়ার সাইট বসানো হয়েছে; ফ্রন্ট সাইটের পরিবর্তে রয়েছে একটা লিউমিনাস বিন্দু। নিকষ অন্ধকারেও লক্ষ্যস্থির করতে অসুবিধে হয় না এর ফলে। ভিতরের মুভিং পার্টস্‌গুলো ঘষে মসৃণ করে ফেলা হয়েছে, প্রলেপ দেয়া হয়েছে পার্মানেন্ট ফ্রিকশন রিডিউসার দিয়ে। এই পিস্তল কিছুতেই জ্যাম হবে না। বাইরের দিকটাও বিশেষ ধরনের কালো রঙে ঢাকা—আলো প্রতিফলিত হয় না।

দক্ষ হাতে পিস্তলটা নেড়ে-চেড়ে দেখল সোহানা। সিগ-সাওয়ার ব্যবহার করে না ও, তবে চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি বলে

দিচ্ছে—অস্ত্রটা ওর পছন্দ হয়েছে।

'তোমার হাতে মানিয়েছে বেশ!' প্রশংসার সুরে বলল রানা।

'হুম,' বলল সোহানা। 'কিন্তু সিগ সাওয়ারের তো সেফটি ক্যাচ নেই। সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়... ব্যাপারটা ভাল লাগে না আমার।'

'তাতে কী? কনসিলড্ ওয়েপন হিসেবে তো অতুলনীয়। এমন ফায়ার-পাওয়ার লুকিয়ে বহন করা... ব্যাপারটা চমৎকার নয়?'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ।' পিস্তলটা নামিয়ে রেখে ম্যাগাজিন তুলে নিল সোহানা। 'আটটা অ্যামিউনিশন ধরে, তাই না?'

'হ্যাঁ, চেম্বারে একটা রাখলে নয়টা বুলেট। শক্তিও অন্যান্য অ্যামিউনিশনের চেয়ে বেশি।'

'ফুললি লোডেড,' ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করে বলল সোহানা। 'ইমার্জেন্সির জন্য রেডি। তবে পিস্তলটার যে-অবস্থা, পরিষ্কার করতে জান বেরিয়ে যাবে।'

'চার বছর ধরে তেল পড়েনি ওটায়। সেফটি-ডিপোজিট বক্সে পড়ে ছিল। একটু কষ্ট তো হবেই।'

'এবং কষ্টটা করতে হবে আমাকেই,' ভুরু কুঁচকে বলল সোহানা। 'তুমি তো সময়মত একটা হাত অচল করে বসে আছ।'

হাসল রানা। সকৌতুকে বলল, 'পাশ থেকে আমি উৎসাহ দেব। কিচ্ছু ভেবো না!'

কয়েক ঘণ্টা পর রানা প্রস্তাব দিল, 'চলো, শপিঙে যাই।'

'চমৎকার আইডিয়া!' সোৎসাহে বলল সোহানা। 'বসে থাকতে একটুও ভাল্লাগছে না।'

'ড্রাইভ কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। আমি বাম হাতটা নড়াতে পারছি না।'

'কোনও অসুবিধে নেই। কোথায় যাবে?'

ফোনবুক খুলে কয়েকটা ঠিকানা আর ম্যাপ দেখাল রানা। হার্ডওয়্যার স্টোর, অটো-সাপ্লাই স্টোর আর একটা গান-শপ।

'কেনাকাটার জন্য ভাল জায়গাই বেছেছ দেখছি,' বলল সোহানা। 'আমি ভেবেছিলাম গহনার দোকান! কী কিনবে?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে হাতুড়ি, ডাক্ট টেপ, স্ক্রু-ড্রাইভার, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ায়্যার, টগল সুইচ, গ্লাভ, কভারঅল, পানির টিউব আর একগাদা স্ক্রু-ক্ল্যাম্প কিনল রানা।

'এসব কীসের জন্য?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সোহানা।

সংক্ষেপে রানা শুধু বলল, 'ইঁদুর ধরার ফাঁদ বানাব।'

হেঁয়ালি শুনে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা।

অটো-পার্টসের দোকান থেকে কেনা হলো একটা এয়ার-ফিল্টার, দুটো ফগ-ল্যাম্প আর চার টুকরো চামড়ার কাপড়।

ওগুলো দেখে বিভ্রান্ত বোধ করল সোহানা। শ্যামোয়া লেদার দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করা হয়; কিন্তু রানা নিশ্চয়ই সে-মতলবে নেই? গাড়ি যত নোংরা হয়, ততই ভাল। মানুষ আগ্রহ নিয়ে তাকায় না। প্রশ্ন করে কোনও সদুত্তর পেল না ও।

গান-শপে ঢুকে সোহানাকে গানবেল্টের র‍্যাকের কাছে নিয়ে গেল রানা। বলল, 'ভাল দেখে দুটো বেল্ট বের করো। আমাদের পিস্তলদুটোর জন্য।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে র‍্যাক থেকে এক জোড়া বেল্ট নামাল সোহানা। ঠাট্টার সুরে বলল, 'আমার কানের দুলের সঙ্গে মানাবে বেশ, কী বলো?'

মুচকি হাসল রানা, কাউন্টারে গিয়ে দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে *কাইডেক্স* হোলস্টার আছে?' জিনিসটা পাতলা এক ধরনের চামড়ায় তৈরি, বৃষ্টি বা ঘামে ভেজে না। পাতলা হওয়ায় কাপড়ের তলায় কাইডেক্সের উপস্থিতি চোখে পড়ে

না।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল দোকানি। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ মডেলের পিস্তল রাখবেন?'

বলল রানা।

কাউন্টারের তলা থেকে কালো রঙের এক জোড়া শোল্ডার-হোলস্টার বের করে দিল দোকানি। আকারে বেশি বড় নয়, রঙটাও আলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে না। নেড়ে-চেড়ে দেখল রানা, সন্তুষ্ট হলো।

'আর কিছু?' জানতে চাইল দোকানি।

'সিগ-সাওয়ারের দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন,' সোহানা বলল। 'আর একটা ক্লিনিং কিট।'

'অ্যামিউনিশনও দরকার আমাদের,' রানা যোগ করল। '*ম্যাগসেফ* নাইন মিলিমিটার—একশো বিশ রাউণ্ড।' অত্যাধুনিক বুলেট ওটা, রেসিন-কোটেড। বুলেটের ভগ্নাংশ ছিটকে গিয়ে আশপাশের কোনও নিরীহ টার্গেটকে আহত করে না।

অ্যামিউনিশনের নাম আর পরিমাণ শুনে সন্দেহ ঘনাল দোকানির চোখে। এই বুলেট প্র্যাকটিস-শুটিঙে ব্যবহার হয় না। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের লাইসেন্স আছে?'

'অবশ্যই!' বলে পকেট থেকে একটা ফায়ারিং লাইসেন্স বের করে দেখাল রানা। 'চাইলে ভেরিফাই করে নিতে পারেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল দোকানি, ভেরিফিকেশনের ঝামেলায় যেতে চাইছে না। বড় মাপের ক্রেতা পেয়েছে, তাতেই খুশি। বলল, 'বাদ দিন, আমি অ্যামিউনিশন নিয়ে আসছি।'

'আর হ্যাঁ,' বলল রানা। 'গোটাকয়েক লেড-সিঙ্কার পেলে খুব ভাল হয়।'

মোটেলে ফিরে সবকিছু আনপ্যাক করল ওরা। ভুরু কুঁচকে

সোহানা বলল, 'শুধু পিস্তলের জিনিসপত্র ছাড়া বাকি কোনও কিছুরই পিছনে যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'ড্রেসিঙের জন্য যে সুঁই-সুতা আর কাঁচি কিনেছিলাম, সেগুলো কোথায়?'

'ফার্স্ট এইড কিটে। কেন, তোমার সেলাই আবার খুলে যাচ্ছে নাকি?'

'না। আনো তো ওগুলো, অন্য কাজ আছে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি থেকে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে ফিরে এল সোহানা। ওটা বিছানার উপর রেখে ভুরু নাচাল।

'তোমার ব্লেজারটা খোলো,' রানা বলল। 'লাইনিং কেটে লেড সিঙ্কার ঢোকাতে হবে। ভিতর দিকে বগলের জায়গাটায় শ্যামোয়া লেদারও পট্টির মত সেলাই করতে হবে। কীভাবে করবে, আমি দেখিয়ে দেব।'

'কেন?'

'বড্ড প্রশ্ন করো! কাজ শেষ হলেই তো দেখতে পাবে!'

আর কথা বাড়াল না সোহানা। লক্ষ্মী মেয়ের মত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রানা নির্দেশ দিয়ে গেল, সেই অনুসারে লাইনিং খুলে সিঙ্কার ঢোকাল ও; ব্লেজারের ভিতর দিকে চামড়ার পট্টিও বসাল। পুরো পনেরো মিনিট ব্যয় হলো কাজটা সারতে।

'সর্বগুণে গুণান্বিতা তুমি!' হেসে বলল রানা। 'সেলাইটা চমৎকার হয়েছে। প্রফেশনাল দর্জিরাও ফেল!'

'দেখো, দর্জির সঙ্গে তুলনা করবে না, খবরদার!' চোখ রাঙাল সোহানা।

'সরি। তবে কাজটা আসলেই ভাল হয়েছে।'

'ঘোড়ার ডিম! কী যে করলাম, তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'এখুনি বুঝবে। পিস্তলসহ গানবেল্ট আর হোলস্টার পরো। উপরে চড়াও ব্লেজারটা।'

পরল সোহানা। ঘুরে ঘুরে চারপাশ থেকে ওকে দেখল রানা। সন্তুষ্টি ফুটল চেহারায়। বলল, 'গুড। পিস্তলটা বোঝা যাচ্ছে না।'

'তা তো এমনিতেও বোঝা যেত না। ব্লেজারটা অল্টার করবার দরকার কী ছিল?'

'পিস্তলটা ড্র করো, তা হলেই বুঝতে পারবে।'

'ড্র করব?' ভ্রূকুটি দেখা দিল সোহানার কপালে।

'হ্যাঁ। থ্রি, টু, ওয়ান... ড্র!'

ঝট্ করে ব্লেজারের ফ্ল্যাপ সরাল সোহানা, ডান হাতে অবলীলায় বের করে আনল সিগ-সাওয়ারটা। ক্লাসিক ভঙ্গিমা—এক হাতে তুলল, অন্য হাতটা এনে মুঠো করে ধরল প্রথম হাতটাকে। দু'হাতে স্থির হয়ে রইল অস্ত্রটা, তাক করা আছে অদৃশ্য টার্গেটের দিকে, দু'হাঁটু সামান্য ভাঁজ হয়ে রয়েছে। পজিশনটা গুলি ছোঁড়ার জন্য একেবারে আদর্শ।

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'কী? বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, চেহারায় বিস্ময়। বলল, 'চামড়ার পট্টির কারণে হোলস্টারের উপর দিয়ে খুব সহজে পিছলে গেছে ফ্ল্যাপটা, সিঙ্কারের ওজনের কারণে সরে যাবার পর স্থির থেকেছে... আগের জায়গায় ফিরে আসেনি। ড্র করতে সুবিধে হয়েছে আমার।'

'কারেক্ট!'

'এটা তোমার আবিষ্কার?'

'আবিষ্কার বলা ঠিক না, স্রেফ একটা মডিফিকেশন।' বিনয় ঝরল রানার কণ্ঠে।

'ভালই বলেছ।' সোজা হলো সোহানা। 'তবে ফগ-লাইট আর হার্ডওয়্যারগুলো কী কাজে লাগবে, সেটা এখনও পরিষ্কার হয়নি।'

'ওটা আরেকটা কাজ,' বলল রানা। 'এবং বরাবরের মত...

কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

'জানতাম!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা।

হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে কেনা গ্লাভস্ আর কভারঅল পরে কাজ শুরু করে দিল সোহানা—টরাসের পিছনদিকে ফগ-ল্যাম্প দুটো লাগাচ্ছে। পাশ থেকে রানা বলল, 'সম্ভব হলে কাজটা আমিই করতাম। কিন্তু সেলাইয়ে টান পড়ছে, বাম হাতটা এখনও নড়াতে পারছি না।' বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা ফোটাল ও।

'বাদ দাও তো,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সোহানা। 'আসল কথা বলো—ফগ-লাইট পিছনদিকে বসাচ্ছি কেন? ওগুলো তো গাড়ির সামনের দিকে থাকবার কথা।'

'এগুলো সাধারণ ফগ-ল্যাম্প না; এক হাজার ওয়াটের কোয়ার্টয্ হ্যালোজেন ল্যাম্প,' রানা বলল। 'চার লাখ আশি হাজার ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার রয়েছে একেকটার—খুবই শক্তিশালী বাতি।'

'বুঝলাম। কিন্তু পিছনদিকে কী কাজে লাগবে এগুলো?'

'কেউ ধাওয়া করলে তাকে অন্ধ করে দেব,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'ড্যাশবোর্ডে সুইচ থাকবে, সেটা টিপে দিলেই তীব্র আলো পিছনের গাড়ির ড্রাইভারের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে।'

'সুন্দর বুদ্ধি,' স্বীকার করল সোহানা। 'ইমপ্রোভাইজেশনে তোমার জুড়ি নেই।' কণ্ঠে প্রশংসার সুর ফুটল।

'ধ্যাত্, কী যে বলো!' অপ্রস্তুত দেখাল রানাকে। 'একটু ভাবলে তোমার মাথা থেকেও এ-রকম কয়েক হাজার বুদ্ধি বেরুবে।' আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উল্টো ঘুরল ও।

'যাচ্ছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'তোমার কাজ কমাতে। দেখি, এয়ার-ফিল্টারটা বদলাতে পারি কি না।'

'আগেরটা থাকলেই বা ক্ষতি কী?'

'নতুনটা বিশেষ ধরনের—পিকআপ বাড়ায়। তা ছাড়া এয়ার সাপ্লাইয়ের লাইনটাও বদলাব। ইঞ্জিনে এয়ার-ফ্লো বাড়াতে পারলে হর্সপাওয়ারও বেড়ে যাবে।'

'পাইপ, হুক আর ক্ল্যাম্প কি সেজন্যেই কিনেছ?'

'হুঁ।'

টরাসের সামনের হুড খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। ফিল্টার বদলাতে বিশেষ অসুবিধে হলো না, একহাতেই কাজটা করা যায়। কিন্তু লাইনে হাত দিয়েই বুঝল, একা পারবে না। পুরনো ক্ল্যাম্পগুলো খুলে অপেক্ষায় রইল ও, সোহানার কাজ শেষ হলে নতুন লাইন বসানো শুরু করবে।

একটু পরেই ফগ-ল্যাম্পের ফিটিং শেষ করল সোহানা, এসে হাত লাগাল রানার সঙ্গে।

'গাড়ির কম্পিউটার চিপটা বদলাব,' কাজের ফাঁকে বলল রানা। 'ডেটোনা বিচের একটা স্পেশালিটি কার-পার্টস শপের সঙ্গে কথা বলেছি একটু আগে; ওরা একটা হাই-পারফর্মেন্স চিপ দেবে।'

'আর কোনও মডিফিকেশন করবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'হেভি-ডিউটি শক অ্যাবজর্ভার বসাব। তা ছাড়া ইগনিশনেও কারিগরি ফলানো দরকার, যাতে ইমার্জেন্সিতে চাবি ছাড়াও দ্রুত স্টার্ট দেয়া যায়।'

'বাহ্, তোমার দেখছি কিছুই চোখ এড়ায় না। কখন করবে ওসব?'

'সময় আছে। সবার আগে তোমাকে ট্রাঙ্কে ঢুকতে হবে।'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সোহানার। 'ট্রাঙ্কে ঢুকব! কেন? মতলবটা কী তোমার?'

'গুমখুন করব না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,' হাসল রানা।

'আমার আসলে একটা মাপ দরকার...'

'কীসের জন্যে?'

'আধ-ইঞ্চি পুরু একটা স্টিলের পাত বসাব পিছনের ট্রাঙ্কে—বুলেটপ্রুফ আর্মার হিসেবে কাজ করবে ওটা। শত্রুদের ছোঁড়া গুলি ট্রাঙ্ক ফুটো করে গাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

'হুম! তুমি কোনও চান্স নিতে চাও না, তাই না?'

'নট এনি মোর।'

কয়েকদিন পর।

'নোড়ো না!' শাসনের সুরে বলল সোহানা।

'কী করব, তোমার হাতদুটো বরফের মত ঠাণ্ডা,' অনুযোগ করল রানা। 'চামড়ায় লাগলেই সারা শরীর শিরশির করে উঠছে।'

'নালিশ বাদ দিয়ে মূর্তি হয়ে যাও। এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে, বুঝতেও পারবে না কীভাবে কী হলো।'

হেসে ফেলল রানা।

সোহানার ভুরু কুঁচকে গেল। 'হাসছ কেন?'

'একটা কৌতুক মনে পড়ে গেল।'

'শোনাও।'

'পচা কৌতুক... মাইণ্ড কোরো না আবার!'

'আগে শুনেই দেখি না!'

'সেক্স-এডুকেশন ক্লাসে এক টিচার বলছেন—*পনেরো মিনিটের আনন্দের জন্য বাকি জীবন মাটি কোরো না।* সেটা শুনে এক ছাত্রী উঠে দাঁড়াল। বলল—*পনেরো মিনিট!! এত লম্বা সময় কীভাবে আনন্দ পাওয়া যায়, টিচার? আমি তো কীভাবে কী ঘটে, টেরই পাই না।*'

'তাই নাকি?' অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা। কৌতুক শোনায় মন নেই ওর, রানার কথার ফাঁকে দ্রুত হাতে কেটে ফেলছে

কাঁধের স্টিচগুলো। 'এই তো, হয়ে গেছে। টের পেয়েছ কিছু?'

'নাহ্। আশ্চর্য তো! ভালই ডাক্তারি শিখে ফেলেছ দেখি!'

মুচকি হেসে কাঁচি আর চিমটে সরিয়ে রাখল সোহানা। কাছ থেকে দেখল ক্ষতটাকে। সন্তুষ্ট গলায় বলল, 'সুখবর। ক্ষতটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে, ইনফেকশনও নেই। তবে তোমার শরীরে গুলি আর কাটাছেঁড়ার কালেকশনে আরেকটা দাগ যোগ হলো।'

'ওভাবে বোলো না। এগুলো আমার বিউটি স্পট!'

'যত্ন না নিলে বিউটিটা বিস্ট হয়ে যেতে পারে। সাবধানে থেকো। আমি একটা ব্যাণ্ডেজ দিচ্ছি।'

অ্যাডহিসিভ টেপ আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে কাঁধের উন্মুক্ত ক্ষতটা ঢেকে দিল সোহানা। রানা বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

হেঁটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল ও, নিজেকে দেখল। সেফ-সাইটের হামলার পর দশদিন পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে কয়েক দফা মোটেল পাল্টেছে ওরা, গাড়ির নাম্বার প্লেটও বদলেছে প্রতিটা মোটেলে চেক-ইন করবার আগে। ছোটাছুটি ওই মোটেল পাল্টানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাকি পুরোটা সময় বিশ্রাম এবং সুস্থ হবার পিছনে ব্যয় করেছে ও। মাঝে-মাঝে ঢাকায় যোগাযোগ করেছে ওরা, পরিস্থিতি জানিয়েছে; তবে আমেরিকায় রানা এজেন্সির কোনও শাখা বা অপারেটরের সঙ্গে কথা বলেনি। বিসিআই চিফ নির্দেশ দিয়েছেন—যা-করবার, তা ওদের দুজনকেই করতে হবে... এবং গোপনে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখল রানা। কাঁধের ক্ষত ছাড়া বাকি সমস্ত আঘাতের চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। শরীরে শক্তি ফিরে পেয়েছে ও, কাঁধের আড়ষ্ট ভাবটাও তেমন একটা নেই আর। স্বস্তি বোধ করল—চুপচাপ বসে থাকার সময় শেষ হয়েছে। গত দশটা দিন স্রেফ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে ওকে। সোহানার সঙ্গে যতই

খুনসুটি করুক, বাস্তবে এক ধরনের বিষণ্নতা ও ক্রোধ অনুভব করছিল রানা। ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি একটা রাতও, চোখ বুজলেই ভেসে উঠছিল মনসুর, মারুফ, রফিক আর শাহরিয়ারের মৃত্যু-দৃশ্য। অন্তরার প্রাণহীন দেহটাও মানসচোখে দেখতে পাচ্ছিল ও, অবর্ণনীয় এক যন্ত্রণা গ্রাস করছিল সমগ্র অস্তিত্বকে। একজন মাত্র মানুষ দায়ী এর জন্য। ড. আন্দালিব সিদ্দিকী। তাকে নিজের হাতে শায়েস্তা করতে না পারলে কষ্টটা কমবে না। অথচ এতগুলো দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছে ওকে।

অবশেষে অবসান ঘটেছে অপেক্ষার। সুস্থ ও, ড. সিদ্দিকীকে মোকাবেলা করবার জন্য। চেহারায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল, ঘুরে দাঁড়াল রানা।

বলল, 'আমি তৈরি, সোহানা। চলো, গর্ত ছেড়ে বেরুনোর সময় হয়েছে এবার।'

পাঁচ

ওয়াশিংটন ডি.সি.। ভোর সাড়ে ছ'টা।

যুবকটি আমেরিকান, সুঠামদেহী। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় একটা উলের ট্রাউজার পরেছে, উপরে রয়েছে নীল রঙের সোয়েট-শার্ট। জগিং করতে করতে একটা বাঁক ঘুরল সে, ঢুকে পড়ল মিউনিসিপাল পার্কে। ঘাসে ঢাকা জমিন পেরিয়ে নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়েতে উঠল, গতি বাড়িয়ে ছুটতে থাকল পার্কের ভিতরদিকে। একটু পর বাদামি চামড়ার আরেক যুবক উদয় হলো

তার পাশে—প্রথমজনের মত পোশাক এর-ও পরনে, শুধু সোয়েট-শার্টটার রঙ ধূসর; মাত্র দু'কদম দূরত্ব রেখে তাল মিলিয়ে ছুটতে থাকল। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না আমেরিকান যুবক, অযাচিত দ্বিতীয় জগারের দিকে তাকালও না। সময়টা সাতসকাল হলেও পার্কে স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষের অভাব নেই, সবাই কোনও না কোনও শারীরিক ব্যায়াম করছে; এদের মধ্যে কেউ যদি জগিঙে ওর সঙ্গী হতে চায়, তাতে আপত্তির কী আছে?

তবে বেশ কিছুক্ষণ দৌড়ুনোর পরও যখন দ্বিতীয় জগার সঙ্গ ছাড়ল না, তখন আমেরিকান যুবক কৌতূহলী হয়ে উঠল, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল মানুষটার দিকে। চেহারাটা দেখে থমকে গেল সে, দাঁড়িয়ে পড়ল—দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটেছে।

'দৈব অভিজ্ঞতা হচ্ছে নাকি?' সকৌতুকে বলল আমেরিকান যুবক। 'ধর্মীয় স্তরে এতই উন্নতি হয়েছে যে, মৃত মানুষ হাজির হচ্ছে আমার সামনে?'

'কেন, দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না?' ভুরু নাচাল দ্বিতীয় যুবক।

'চোখের দেখাই শেষ কথা নয়, মি. রানা। আমাদের বাইবেলের কতটুকু পড়েছেন, জানি না; তবে সেইন্ট টমাস কিন্তু যিশু খ্রিস্টের বুকের ক্ষতের উপর হাত না রাখা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করেননি।'

'গল্পটা জানা আছে আমার,' হাসল রানা। 'তবে মাই ডিয়ার এরিক, আমি যিশু খ্রিস্ট বা মৃত মানুষ... কোনোটাই নই। তা ছাড়া দেখাবার মত ক্ষত-টতও নেই আমার গায়ে।'

এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নের মুখেও এবার পাল্টা হাসি দেখা দিল। ছ'মাস হলো ওয়াশিংটনে ব্যুরো হেডকোয়ার্টারে বদলি হয়ে এসেছে ও, এর মধ্যে দুজনের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কুশল বিনিময়ের ভঙ্গিতে বলল, 'কেমন আছেন, মি. রানা?'

'ভাল। তোমার ওই *মিস্টার* ডাকার স্বভাবটা এখনও যায়নি দেখছি।'

'আগেই বলেছি, গুরুকে সম্মান না দেখিয়ে থাকতে পারব না আমি।'

'তা অবশ্য বলেছ।' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল রানা। দৌড়ানোর সময় ঝাঁকি খাওয়ায় আহত বাম কাঁধটা ব্যথা করছে, হালকা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওটা সয়ে নেয়ার প্রয়াস চালাল।

'হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হয়েছেন, বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল এরিক। 'আমি তো শুনেছি, আপনি নিখোঁজ হয়েছেন। অনেকের ধারণা, মারা গেছেন।'

'গুজবে কান দিয়ো না। এ-সব উড়ো কথা কে শুনিয়েছে তোমাকে?'

'আপনার এজেন্সি থেকেই বলেছে। একটা কাজে যোগাযোগ করেছিলাম, ওরা বলল—চারজন এজেন্ট আর একজন ক্লায়েন্টসহ আপনি উধাও হয়ে গেছেন। আপনাদের একটা সেফ-সাইট ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি অবশ্য তেমন উদ্বিগ্ন হইনি। বেড়ালের মত আপনারও যে ন'টা প্রাণ—তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।'

'হুঁ। ক্লায়েন্ট বা সেফ-সাইটের ব্যাপারে ওরা কিছু বলে দেয়নি তো?'

'নাহ্,' এরিক মাথা নাড়ল। 'আপনার লোকজন মুখে তালা এঁটে রাখায় ওস্তাদ। আমি বলে ওটুকু জানিয়েছে, অন্য কেউ হলে তা-ও বলত বলে মনে হয় না। আমাকে অবশ্য জিজ্ঞেস করেছে, পুরো ঘটনাটা সম্পর্কে কিছু শুনেছি কি না।'

'শুনেছ?'

'উঁহুঁ। কানাঘুষোও না।'

ধীর পায়ে হেঁটে পার্কের জলাশয়ের পাশে চলে এল ওরা,

একটা বেঞ্চ দখল করে বসল। এরিক বলল, 'কী ঘটেছে, খুলে বলবেন আমাকে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বলব বলেই এসেছি। তোমার সাহায্যও দরকার। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। পারবে তো?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন আমাকে করা উচিত হচ্ছে না আপনার,' আহত সুরে বলল এরিক।

প্রশ্নটা অবান্তরই বটে। এরিক স্টার্ন রানার পরীক্ষিত বন্ধুদের একজন। বছরদুয়েক আগে নিউ অর্লিয়েন্সে একটা জনসভায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, আর গুপ্তঘাতক বলে ফাঁসিয়ে দেয়া হয় রানাকে। পুরোটাই ছিল ষড়যন্ত্র, র‍্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা গোপন অঙ্গ-সংগঠন নিজেদের কুটিল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘটায় কাণ্ডটা। ওদের ছড়িয়ে রাখা মিথ্যে সূত্র দেখে আমেরিকার প্রতিটা নিরাপত্তা-বাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত রানার শত্রু হয়ে পড়েছিল, মরতে বসেছিল ও। ষড়যন্ত্রের জাল ছেঁড়া স্রেফ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনই ওর সাহায্যে এগিয়ে আসে এই এরিক। নিজের চাকরি, এমনকী জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে রানাকে সাহায্য করে সে... কোনোরকম প্রতিদানের আশা না করে। ওর কারণেই শেষ পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সমর্থ হয় রানা, শত্রুদের বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নিতে পারে। এমন একজন বন্ধুকে অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই।

'সরি,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল রানা। 'মুখ ফসকে বলে ফেলেছি কথাটা। কিছু মনে কোরো না।'

'ইটস্ ওকে,' বলল এরিক। 'কী গোপন রাখতে হবে, সেটা বলুন। অবৈধ কিছু?'

'তা না, শুনলেই বুঝবে। আর হ্যাঁ, আমার ব্যাপারে

যে-গুজবটা শুনেছ, সেটাকে সত্যি দেখাতে হবে। মানে, আজ... এখানে আমাকে দেখোনি তুমি। আমাদের মধ্যে কোনও কথাও হয়নি। তুমি যদ্দূর জানো, আমি মারা গেছি। ঠিক আছে?'

'পরিষ্কার। আপনার বাকি চার এজেন্টের খবর কী? ওরাও কি গা-ঢাকা দিয়ে আছে?'

'উঁহুঁ, ওদেরকে দেখতে চাইলে সত্যিই দৈবদৃষ্টি প্রয়োজন হবে তোমার।'

'মারা গেছে?' ভুরু কোঁচকাল এরিক।

'খুন হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'নৃশংসভাবে।'

'বলেন কী!' আঁতকে উঠল এরিক। 'চিনি ওদের?'

'হ্যাঁ। মনসুরের টিম।'

'গুড গড! ওদের সঙ্গে তো কয়েকবারই দেখা হয়েছে আমার। খুবই ভাল ছিল ওরা সবাই... দক্ষ, দুঃসাহসী। আর আপনার ক্লায়েন্ট? সে-ও মারা পড়েছে নাকি?'

'সমস্যাটা ওকে নিয়েই,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'ওর জন্যেই খুন হয়েছে সবাই।'

'মানে!' এরিক বুঝতে পারছে না।

'লোকটা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মারুফকে কিচেন নাইফ দিয়ে, আর মনসুরকে গুলি করে খুন করেছে। ওর কারণে রকেট বিস্ফোরণে উড়ে গেছে রফিক আর শাহরিয়ার। আমাকেও আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল শয়তানটা।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' এরিক বিভ্রান্ত। 'মনসুরের টিম সম্পর্কে জানা আছে আমার—ওরা তো স্পেশাল প্রোটেকটিভ কেস হ্যাণ্ডেল করে। আপনি বলতে চাইছেন, যাকে প্রোটেকশন দেয়া হচ্ছিল, সেই ক্লায়েন্টই ওদেরকে খুন করেছে?'

'একজ্যাক্টলি।'

'কিন্তু কেন?'

'আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর কাছে। তাই গোপনে নিজের শত্রুদেরকে খবর দিয়ে একটা অ্যাসল্ট টিম আনায় সে। সেফ-সাইটের উপর যখন হামলা চলছিল, সেই ফাঁকে খুন-খারাপি করে নিরাপদে সটকে পড়েছে। আমার ধারণা, হামলাতে সে নিজেও মারা পড়েছে বলে প্রচার করার জন্য কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।'

'এ-ধরনের লোকের জন্য নরকে আলাদা জায়গা বরাদ্দ করা আছে,' রাগী গলায় বলল এরিক। 'হারামজাদার নামটা জানতে পারি?'

'ড. আন্দালিব সিদ্দিকী।'

'নাম শুনিনি কখনও।'

'অবাক হবার কিছু নেই। তোমাদের সরকারের হয়ে গবেষণার কাজ করত সিদ্দিকী... গোপন গবেষণা! তাকে সবসময় লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হত।'

'হুম! কোন্ ডিপার্টমেন্টের হয়ে কাজ করত, এটা জানেন?'

'শিয়োর না। তবে ও বলেছে, পালিয়ে আসবার আগে ডি.ই.এ.-র হয়ে *এলিক্সিয়ার* নামে একটা বায়ো-ল্যাবে গবেষণা করছিল—ওষুধের মাধ্যমে মাদকাসক্তি সারাবার জন্যে। কিন্তু প্রজেক্টটা ব্যাকফায়ার করে—এমন একটা ওষুধ ও আবিষ্কার করে বসে, যেটা তাৎক্ষণিকভাবে যে-কাউকে অ্যাডিক্টেড করে তুলতে পারে। খুবই পাওয়ারফুল ড্রাগ।'

ভুরু কোঁচকাল এরিক। 'আমি ডি.ই.এ.-র সঙ্গে প্রায়ই কাজ করি; এ-ধরনের কোনও ঘটনা শুনিনি তো!'

'ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে,' রানা বলল। 'কিন্তু যেভাবেই হোক, খবরটা চলে গেছে কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড মিগুয়েল সান্টানার কাছে। নতুন ড্রাগটার জন্য সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালায় সে। ডি.ই.এ. কিংবা আমেরিকান সরকারের কাউকে

বিশ্বাস করতে পারছিল না সিদ্দিকী, তাই আমাদের কাছে এসেছিল প্রোটেকশনের জন্য...'

'জাস্ট আ মিনিট, মি. রানা,' বাধা দিয়ে বলল এরিক 'সান্টানার ব্যাপারে জানি আমি—দু'মাস আগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে খুন হয়েছে। ওর পুরো কার্টেলেরই এখন ছন্নছাড়া অবস্থা, কারও পিছনে লাগবার সময় নেই ওদের। আপনার ওই সিদ্দিকী একটা ফাঁপা গল্প গিলিয়েছে আপনাকে।'

রানা থমকে গেল—তথ্যটা একেবারেই নতুন। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শিয়োর?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট, এতে কোনও ভুল নেই। কলাম্বিয়ায় আমাদের আণ্ডারকাভার এজেন্টরা লাশের ডিএনএ টেস্ট করে নিশ্চিত হয়েছে। তা ছাড়া আপনি বলছেন অ্যাসল্ট টিমের কথা। সান্টানার ওই কোমরভাঙা আউটফিটের পক্ষে আমেরিকায় কোনও অ্যাসল্ট টিম পাঠানো সম্ভব নয়।'

'ওটা আরেকটা পক্ষ বলে সন্দেহ করছি আমি,' রানা বলল। 'স্পেশাল ফোর্সের মত আচরণ করছিল ওরা।'

'আমেরিকান?' এরিকের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' এরিক বোকা বনে গেছে। 'এসবের মধ্যে আমাদের মিলিটারি কেন জড়িত হবে?'

'ওয়েল এরিক,' বলল রানা। 'সেটা জানার জন্যই তোমার সাহায্য চাই আমি।'

দু'দিন পর। বিকেল বেলা।

একটা শপিং মলের সামনে গাড়ি থামাল সোহানা। ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ করল না, শুধু আইডলে রাখল—বিপদ দেখা দিলে মুহূর্তেই সরে পড়তে পারবে। গাড়ি থেকে নেমে মলের বাইরের

পে-ফোনের দিকে এগোল রানা, স্লটে পয়সা ফেলে নির্ধারিত নাম্বারে ডায়াল করল।

তিনবার রিং হতেই রিসিভ করা হলো কলটা। ওপাশে শোনা গেল এরিকের পরিচিত কণ্ঠ, 'হ্যালো?'

'পিকিং ডাক রেস্টুরেন্ট থেকে বলছি, সার,' চিনা উচ্চারণে বলল রানা। 'আপনি কি একশো ছাব্বিশ ডলারের একটা হোম-ডেলিভারির জন্য অর্ডার দিয়েছেন?'

'মাথা খারাপ?' বিরক্ত গলায় বলল এরিক। 'তোমাদের ওসব চাইনিজ খাবার একেবারেই সহ্য হয় না আমার। কী সব মশলা দাও, রীতিমত বুক জ্বলে।'

'সরি, সার,' বলল রানা। পূর্ব-নির্ধারিত কোড বিনিময় হয়ে গেছে, এবার কাজের কথা পাড়ল ও। স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'খবর কী?'

'অনেক খোঁজখবর নিয়েছি। কিন্তু আপনার ওই ড. সিদ্দিকী, কিংবা ডি.ই.এ.-র হয়ে তার ড্রাগ-রিসার্চ সম্পর্কে কোনও সত্যতা পাইনি। সত্যি কথা বলতে কী, এ-ধরনের রিসার্চ-ওয়ার্ক ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আওতায় পড়ে না। ওসবের দায়িত্ব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ হেলথের।'

'ওখানে খোঁজ নিতে বলছ?'

'উঁহুঁ, খোঁজ আমি নিয়ে ফেলেছি। ফলাফল—লবডঙ্কা!'

'তা হলে? কোনও সাজেশন আছে তোমার?'

'গো টু দ্য সোর্স, মি. রানা। ড. সিদ্দিকীর ল্যাবে খোঁজ নিন।'

'এলিক্সিয়ার বায়ো-ল্যাব? কাল সারাদিন আমি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে কাটিয়েছি। বইপত্র বা ইন্টারনেট... কোথাও ল্যাবটার নামগন্ধ খুঁজে পাইনি।'

'আমি অন্যভাবে খুঁজেছি,' এরিক বলল। 'পেয়েও গেছি। তবে ল্যাবটা আসলে কী ধরনের কাজ করে, সেটা জানতে

পারিনি।'

'কোথায় ওটা?'

'ভার্জিনিয়ায়। বেইলি'জ রিজ নামে একটা জায়গায়।'

'পুরো ঠিকানা বলো।'

বলল এরিক। শেষে যোগ করল, 'সরি, এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারলাম না।'

'যা করেছ, যথেষ্ট,' রানা বলল। 'ধন্যবাদ। তোমার জন্য চাইনিজ খাবারটা পাঠিয়ে দেব।'

'মাফ করুন, গুরু। বুক জ্বলার কথাটা বানিয়ে বলিনি। আসলেই সহ্য হয় না।'

'কী আর করা! ঠিক আছে, কাল আবার কথা হবে। ঠিক এই সময়ে। আশা করি ভেরিফিকেশনের জন্য তখন নতুন কিছু তথ্য দিতে পারব।'

'আমি অপেক্ষা করব।'

'বাই।' ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এল গাড়িতে।

'কিছু জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'এরিক যখন কথা বলছিল, তখন কেউ একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছিল ওর মাথায়। জলদি গাড়ি ছাড়ো, আমাদের খোঁজে খুব শীঘ্রি অন্তত এক ডজন লোক চলে আসবে এখানটায়!'

ছয়

'আমাদের মধ্যে একটা প্রি-অ্যারেঞ্জড্ কোড আছে,' রানা বলল। 'টেলিফোনে খোলাখুলিভাবে কথা বলা কতটা নিরাপদ, সেটা জানার জন্য ফোনের শুরুতে চাইনিজ খাবার নিয়ে আলোচনা করি আমরা। যদি চাইনিজ খেতে আপত্তি না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে—সব ঠিকঠাক আছে। আর যদি কোথাও সমস্যা থাকে, আমাদের মধ্যে কেউ বিপদে থাকি... তা হলে রাজি হই না, বুক জ্বলার অজুহাত দেখাই।'

দ্রুতগতিতে ছুটছে টরাস, পিছনে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে রানা। বোঝার চেষ্টা করছে, কেউ অনুসরণ করছে কি না। তবে এখন পর্যন্ত তেমন কোনও আভাস পাওয়া যায়নি।

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেছে এরিক?'

'সিদ্দিকীর ল্যাবের লোকেশন দিল। ভুয়া হবারই সম্ভাবনা বেশি। আমার ধারণা, ওটা একটা ফাঁদ।'

'জোর করে বলানো হয়েছে, তাই না?'

'কোনও সন্দেহ নেই,' চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠেছে রানার। এরিকের মত অকৃত্রিম বন্ধু বিপদে পড়েছে... ওর-ই কারণে। 'ওকে সাহায্য করতে হবে আমাদের।'

'রানা,' ইতস্তত করে বলল সোহানা। 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ফোনটুকুর পর ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওকে এবার ওরা...'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'আমাকে বাগে পাবার আগ পর্যন্ত ওকে প্রয়োজন হবে ওদের। সেজন্যেই একটা কৌশল খাটিয়েছি—এরিককে বলেছি, আগামীকাল আবার ফোন করব আমি... একই সময়ে। ফাঁদটা কাজ না-ও করতে পারে, কাজেই আমাকে পাবার জন্য এরিককে এখন বাঁচিয়ে রাখবে ওরা... অন্তত আগামীকাল পর্যন্ত।'

'এর ভিতর ওকে আমরা উদ্ধার করব?'

'দ্যাটস্ দ্য প্ল্যান,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

হঠাৎ করেই চেহারাটা মলিন হয়ে গেল সোহানার। পরিবর্তনটা চোখে পড়বার মত। নার্ভাস ভঙ্গিতে প্যান্টে হাত মুছল ও, তালুদুটো ঘেমে উঠেছে। নীচের ঠোঁটটাও জিভ দিয়ে ভেজাল একবার। ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'কই... কিছু না তো,' এড়িয়ে যেতে চাইল সোহানা।

'কিছু একটা তো বটেই,' রানা বলল। 'আমার কাছে লুকিয়ো না, সোহানা। কী হয়েছে, খুলে বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। রানার দিকে তাকাল এক পলক, তারপর আবার রাস্তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'আমার ভয় করছে, রানা।'

'স্বাভাবিক,' রানা বলল। 'শত্রু সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমাদের। এরিককে কারা আটকে রেখেছে, ওকে উদ্ধার করতে গেলে কী ধরনের বিপদ মোকাবেলা হবে—কিছুই জানি না। অনিশ্চয়তা মানুষের মনে ভয়ের জন্ম দেয়।'

'এ-ভয়টা আরও সিরিয়াস, রানা। সেদিন অন্তরার বাড়িতে যে রকম ভয় পেয়েছিলাম, ঠিক সে-রকম ভয় পাচ্ছি এখন আবার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে...'

দুশ্চিন্তা ভর করল রানার ভিতরে। মাঝে ক'দিন বেশ

স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল সোহানাকে, তবে এর মধ্যে তেমন কোনও বিপদ মোকাবেলা করতে হয়নি ওদের। আজ একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির আভাস পাওয়ামাত্র আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে ও—ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বিসিআই-এর একজন অভিজ্ঞ এজেন্টের সঙ্গে আচরণটা একেবারেই খাপ খায় না। সেদিন ভেবেছিল, সমস্যাটা সাময়িক; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ধারণাট ভুল।

'কী হয়েছে তোমার, সোহানা?' নরম গলায় জানতে চাই রানা।

'আমি জানি না, রানা,' সোহানা মাথা দোলাল। 'অন্তরা বাড়িতে কিছু একটা ঘটে গেছে আমার ভিতর। ওর লাশ, আগুন গোলাগুলি... সবকিছু এমনভাবে মনের পর্দায় গেঁথে গেছে যে, চোখ বুজলেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো দেখতে পাই। মন কু-ডাক ডাকতে শুরু করে, বিচারবুদ্ধি আর কাজ করতে চায় না। সাহস-আত্মবিশ্বাস... সব নড়বড়ে করে ফেলে। এই যে, এখন আবার এরিককে উদ্ধার করার কথা বললে... ওটা শুনতেই আবার নার্ভাস ফিল করছি আমি।'

'শান্ত হও। সেদিন সত্যিই মস্ত বিপদে পড়েছিলাম আমরা, তাতেই হয়তো নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছ... আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছে।'

'এসব আমার জন্য নতুন কিছু নয়, তুমি সেটা ভাল করেই জানো। আমি কখনও বিপদে নিয়ন্ত্রণ হারাই না। ওভাবেই ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। সেদিন কেন এমন হলো, সেটা বলতে পারো?'

ধারণা করতে পারছে রানা, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। যতই ট্রেইনিং দেয়া হোক, প্রত্যেক মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে। ভাবতে ভাল লাগছে না, কিন্তু হয়তো এটাই তিক্ত

সত্য—সোহানা সেই সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। বিপদের আভাস পেতেই স্নায়ুর বিশ্বাসঘাতকতা সেটাই প্রমাণ করে। মানেটা পরিষ্কার—ওর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে, স্পাইয়ের বিপজ্জনক পেশা আর ধরে রাখা সম্ভব নয় সোহানার পক্ষে।

'আমার মনে হয়, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন,' গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল রানা। 'এরিকের ওখানে তোমার না-গেলেও চলবে। আমি একাই সামলে নেব ব্যাপারটা।'

'না!' দৃঢ় গলায় বলল সোহানা। 'যত ভয়ই করুক, তোমাকে আমি একা যেতে দেব না, রানা। একজন এফবিআই এজেন্টকে আটকে রাখার মত দুঃসাহস যাদের আছে, তারা সাধারণ কেউ না। একা গেলে নির্ঘাত তুমি বিপদে পড়বে।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়। সমস্যাটা আমার, সেজন্যে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। তা ছাড়া হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ব্যাপারটার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। বিপদকে মোকাবেলা করতে হবে আমাকে, একমাত্র ওভাবেই আবার সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব।'

'কাজটা সহজ নয়, সোহানা। লড়াইয়ের মাঝখানে তুমি অচল হয়ে পড়লে ঝামেলা বাড়বে আমার। শুধু এরিককে নয়, তোমাকেও উদ্ধার করে আনতে হবে।'

জোর করে একটু হাসল সোহানা। 'ভয় পেয়ো না, অন্তত তোমার ঘাড়ের বোঝা হব না—এটুকু গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বুঝতে পারছে—সোহানাকে নিরস্ত করা যাবে না। কাজ বাড়ল ওর।

'কেউ কি ফলো করছে আমাদের?' প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা ঘুরিয়ে পিছে তাকাল রানা। 'না।'

'গুড। কোথায় যাব তা হলে?'

'মিউনিসিপ্যাল পার্ক। এরিকের বাসাটা পাশেই। ওখানেই ওকে বন্দি করে রেখেছে ওরা।'

'রিস্কি স্টেপ—একজন এফবিআই এজেন্টকে তার বাড়িতেই আটকে রাখা। তুমি শিয়োর?'

'বাসায় ফোন করেছিলাম ওকে, রিসিভ তো করল। ওখানেই আছে।'

'কলটা ফরোয়ার্ড করে রাখা হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। এরিক একা মানুষ, বউ মারা যাবার পর আর বিয়ে-শাদী করেনি। সামাজিকতাও করে না খুব একটা। বাসাতে ওকে আটকে রাখলে তেমন অসুবিধে নেই, শুধু অফিসে একটা খবর পাঠাতে হবে যে, ও অসুস্থ। তা হলেই আর কেউ মাথা ঘামাবে না। আমি শিয়োর—ও বাড়িতেই আছে।'

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পার্কিং গ্যারাজে গাড়ি রেখে মিউনিসিপ্যাল পার্কে ঢুকল রানা-সোহানা, নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়ে ধরে চলে গেল উত্তরদিকের সীমানায়। গাছগাছালির ছায়ায় পৌঁছে থামল ওরা, সাবধানে উঁকি দিল। ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, ওটার দিকে নজর ওদের।

'ছ'তলা,' বলল রানা। 'ডানদিকে চার নাম্বার ইউনিটটা এরিকের।'

ওদিকে তাকাল সোহানা। বলল, 'একটা মাত্র জানালায় আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটা লিভিংরুম,' রানা জানাল। 'পার্কের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করে এরিক।'

'আজ দেখছে না। জানালার পর্দা টানা। পাশে আরেকটা

জানালা আছে অবশ্য...'

'বেডরুম। তবে আলো জ্বলছে না।'

'ওটারও পর্দা টানা। আর কোনও বেডরুম আছে?'

'না, ওই একটাই। গেস্টরুমও নেই।'

'রুমগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, একবার গেছি ওখানে,' রানা বলল। 'মেইন ডোর পেরুলেই একটা করিডোর—চলে গেছে একেবারে ভিতর পর্যন্ত। করিডোরের শেষ মাথায় একটা আর্চওয়ে আছে—বামদিকে ছোট্ট কিচেন, ডানদিকটায় লিভিংরুম। বেডরুমের দরজা লিভিংরুমের বামদিকের দেয়ালে।'

'বাথরুম?'

'বেডরুমের ভিতরে, আউটার সাইডে।'

'হুম, লুকানোর খুব বেশি জায়গা নেই তা হলে।'

'ঠিক ধরেছ।'

পর্দার আড়ালে নড়াচড়া দেখতে পেল রানা, একটা ছায়া সরে গেল যেন।

'ক'জন থাকতে পারে ওখানে?' আনমনে প্রশ্ন ছুঁড়ল সোহানা।

'কমপক্ষে দু'জন,' রানা বলল। 'যাতে পালা করে একজন পাহারা দিতে আর অন্যজন ঘুমাতে পারে।'

'বেশিও তো হতে পারে!'

'সর্বোচ্চ তিনজন,' প্রফেশনাল দৃষ্টিতে বিচার করল রানা। 'অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট, খুব বেশি মানুষ থাকলে পড়শিরা টের পেয়ে যাবে।'

'হুঁ। এরিককে কোথায় রেখেছে, সেটা বুঝতে পারলে সুবিধে হত।'

'আমি হলে লিভিংরুমে রাখতাম—চেয়ারে হাত-পা বেঁধে,' বলল রানা। 'বেডরুমটা তা হলে নিজের মত পেতাম, পালা করে

ঘুমানোয় সুবিধে হত।'

'ধরে নিচ্ছি, ওরাও তা-ই করেছে,' বলল সোহানা, তারপর তাকাল রানার দিকে। 'একটা প্ল্যান দরকার আমাদের—কীভাবে এরিককে বের করে আনবে বলে ভাবছ তুমি?'

রানা জবাব দেবার আগেই এক দম্পতিকে বিল্ডিঙের দিকে এগোতে দেখা গেল। ভিতরে ঢুকে লবিতে চলে গেল তারা, রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলল। লোকটা ইন্টারকমের রিসিভার তুলে ডায়াল করল, সম্ভবত অনুমতি নিচ্ছে। একটু পরেই সন্তুষ্ট হলো সে, কাউন্টারের তলায় হাত দিয়ে একটা বোতাম চাপল, বিল্ডিঙে ঢোকার ইনার-ডোর খুলে গেল তাতে। পাশাপাশি দুটো এলিভেটর দেখা গেল দরজার ওপাশে, রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিকে চলে গেল দম্পতি, পিছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল কাঁচের দরজাটা।

লবিতে ঢোকার দরজাটাও কাঁচের, ওটার ভিতর দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটাই প্রত্যক্ষ করল ওরা। সোহানা ভুরু কুঁচকে বলল, 'বের হওয়া তো পরের কথা, বিল্ডিঙে ঢোকাটাই তো বিরাট ঝক্কি মনে হচ্ছে। অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয় না রিসেপশনিস্ট।'

'হ্যাঁ, সমস্যাই বটে,' বলল রানা। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে ওর। 'বিকল্প রাস্তা খুঁজতে হবে আমাদেরকে।'

'ইমার্জেন্সি একজিটের কথা ভাবছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আইন অনুসারে প্রত্যেক বিল্ডিঙের পিছনে একটা থাকার কথা। তালা দেয়া থাকে, তবে খুলতে অসুবিধে হবে না। ওটাই ব্যবহার করতে পারব আমরা।'

'ব্যস্ত এলাকা,' চিন্তিত গলায় বলল সোহানা। 'তালা ভাঙতে গেলে লোকে দেখে ফেলবে।'

'ঠিক বলেছ, অন্য কোনও কায়দা বের করতে হবে তা হলে,'

একটু ভাবল রানা। 'অভিনয় কেমন পারো?'

'মন্দ না। কোর্সে সেকেণ্ড হায়েস্ট মার্ক পেয়েছিলাম।'

'ভাল। মোড়ে একটা দোকান দেখতে পাচ্ছি। চলো, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসি।'

'তুমি সিগারেট ছাড়োনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোহানা।

'ধরি-ছাড়ি... এভাবেই চলছে। তবে আজকেরটা স্রেফ মিশনের স্বার্থে। তোমাকেও টানতে হবে।'

'আমি নন-স্মোকার,' মনে করিয়ে দিল সোহানা।

'কিছু করার নেই,' রানা হাসল। 'আধঘণ্টার জন্য তোমাকে ধূমপায়ী-সমাজে যোগ দিতে হবে।'

বিল্ডিঙের সামনে, এণ্ট্র্যান্সের ঠিক উল্টোপাশে, পার্কের সীমানায় একটা বেঞ্চ আছে। ওটায় গিয়ে বসল রানা-সোহানা, সদ্য-কেনা সিগারেটের প্যাকেট খুলল। একটা বাড়িয়ে ধরে রানা বলল, 'নাও।'

'সত্যি সত্যি সিগারেট খাব?' সোহানার কণ্ঠে অস্বস্তি।

'খাওয়ার দরকার নেই, টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ো শুধু, ভিতরে নিয়ো না।'

'দরকার আছে কোনও?'

'অবশ্যই!' সোহানার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল রানা, নিজেও একটা ধরাল। 'বিল্ডিঙের সামনে কিছুক্ষণ থাকতে হবে, এটা আমাদের কাভার। দেখে মনে হবে, কারও বাসায় বেড়াতে এসেছি আমরা; ওখানে সিগারেট খাওয়া যাচ্ছে না বলে নীচে নেমে এসেছি।'

সিগারেটে একটা টান দিয়েই খক খক করে কেশে উঠল সোহানা। 'কী বিচ্ছিরি স্বাদ!'

'সাবধান! আনাড়ির মত কোরো না, লোকে সন্দেহ [illegible]

বসবে।'

'কিন্তু এভাবে অপেক্ষা করে ছাই কী লাভ হবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে।'

পাঁচ মিনিট কাটল। পথ-চলতি মানুষজনের কথোপকথনের দিকে কান পেতে রেখেছে রানা। অফিস নিয়ে আলোচনা করছে কেউ কেউ, কারও চিন্তাভাবনা আবার খাওয়াদাওয়া নিয়ে, কেউ বা ব্যস্ত ছুটি কাটাবার প্ল্যান নিয়ে, মহিলারা আলোচনা করছে লেটেস্ট ফ্যাশন নিয়ে... তবে এসবের কোনোটাতেই আগ্রহ পেল না ও।

হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতেই সিগারেটের গোড়াটা ফেলে দিল রানা। প্যাকেট খুলে নতুন একটা ধরাল, সোহানার দিকেও বাড়িয়ে ধরল আরেকটা।

'অসুস্থ হয়ে যাব,' অনুযোগ করল সোহানা।

'আমি নিরুপায়,' রানা বলল। 'আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে এখানে।'

কয়েক মিনিট পরেই দুটো ট্যাক্সি এসে থামল বিল্ডিঙের সামনে, চমৎকার সান্ধ্য-পোশাক পরা চারজন নারী-পুরুষ নামল ওগুলো থেকে। একজনের হাতে একটা উপহারের প্যাকেট দেখা যাচ্ছে।

হাতঘড়ি দেখল একটি মেয়ে। ত্রস্ত গলায় বলল, 'ওহ্ গড! আটটা তো বেজে গেল প্রায়। লরা বলেছে, আটটা-পাঁচে শেষ হবে সিনেমা; তারপর জেরিকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসবে ও। আমাদের হাতে একদম সময় নেই।'

'ডিনারে যাবে না ওরা?' জিজ্ঞেস করল এক পুরুষ।

'উঁহুঁ, শরীর খারাপের অজুহাত দেখাবে লরা। জলদি চলো, আমাকে চাবি দিয়ে রেখেছে ও, অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে ওঁৎ পেতে

বসে থাকতে হবে। জেরি ঢোকামাত্র চমকে দেব একেবারে।'

লবিতে ঢুকে পড়ল ছোট্ট দলটা, রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে চলে গেল এলিভেটরের দিকে। গম্ভীর হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রানা।

'ওই জেরির জন্মদিন বোধহয়,' সোহানা বলল। 'সারপ্রাইয দিতে যাচ্ছে ওরা... আমেরিকানদের ঐতিহ্য।'

'হুঁ,' আনমনে বলল রানা। কাঁচের দরজা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ও, এলিভেটরে ঢুকতে দেখল চার অতিথিকে, ইণ্ডিকেটরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল এবার। এতদূর থেকে নম্বর পড়া যায় না, তাই আলোটা ক'বার ফ্ল্যাশ করে, সেটা হিসেব করল। উনিশ তলায় গিয়ে থামল এলিভেটর—ওখানেই সম্ভবত জেরির অ্যাপার্টমেন্ট।

সিগারেট শেষ হতেই একটা পিৎজা-ভ্যান নজরে পড়ল রানার, বিল্ডিঙের ডেলিভারি-জোনে এসে পার্ক করেছে। উঠে দাঁড়াল ও, সোহানাকে বলল, 'এসো, খাবারটা কোথায় যাচ্ছে—জানতে হবে।'

রাস্তা পেরুল ওরা, ডেলিভারি-ম্যানের পথরোধ করে দাঁড়াল এণ্ট্র্যান্সের মুখে।

'এক্সকিউজ মি!' বলল রানা। 'এগুলো সম্ভবত আমাদের জন্যে। অর্ডার দিয়ে নীচে এসেছি সিগারেট খেতে। অ্যাপার্টমেন্ট সিক্স-টু-এইট।' এরিকের অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ওটা।

ভুরু কোঁচকাল ডেলিভারি-ম্যান। 'দুঃখিত। এগুলো আপনার নয়। অন্য অ্যাপার্টমেন্টের।'

চেহারায় হতাশা ফোটাল রানা। 'নিশ্চয়ই সাততলার ওই বজ্জাত ছোকরাগুলোর। পার্টি দিচ্ছে বোধহয় ওরা। এত শব্দ করছে যে, ছ'তলাতেও টেকার উপায় নেই।'

'জী না,' চেহারা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ডেলিভারি-ম্যানের। পিৎজার প্যাকেটের উপর লাগানো নোট

দেখল। 'এগুলো যাবে উনিশ তলায়... ওয়ান-নাইন-ওয়ান-ওয়ানে।'

'অ!' পিছিয়ে গেল রানা। 'দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আসলে বেশ খিদে পেয়েছে কি না, তাই পিৎজা দেখেই মনে হলো আমাদেরটা হবে।'

'ইটস্ ওকে,' হাসল ডেলিভারি-ম্যান। 'আপনাদেরটাও তাড়াতাড়ি এসে যাবে। জাস্ট রিল্যাক্স।' দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে পড়ল সে।

এণ্ট্র্যান্স ছেড়ে একটু দূরে সরে এল রানা। সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'কী করছ, জানতে পারি? তোমার কেন মনে হলো, ওগুলো এরিকের অ্যাপার্টমেণ্টে যাবে?'

'মানব-চরিত্রের কারণে,' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। 'পাক্কা প্রফেশনালরাও মাঝে-মাঝে এ-ধরনের ভুল করে। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাউকে পাহারা দেয়া সহজ কাজ নয়—ক্লান্তি আসে, খিদে পায়। সিকিউরিটির কাজে যারা ব্যস্ত থাকে, তাদের রান্না করে খাওয়ার মত সময় বা ধৈর্য... কোনোটাই থাকে না। প্রায়ই দেখা যায়, বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে খাবার আনায় তারা।'

'বুঝলাম, কিন্তু এখনই যে ওদের খাবার আসবে—সেটা জানছ কীভাবে?'

হাতঘড়ি দেখাল রানা। 'ডিনার টাইম। এখন ওদের খাওয়ার সময়।'

'বুঝলাম, কিন্তু এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? রিসেপশনিস্ট লোকটা সন্দেহ করে বসতে পারে।'

'ও আমাদের দেখতে পাবে না। দরজা থেকে দূরে দাঁড়াব আমরা। তা ছাড়া বাইরের চেয়ে লবিটা বেশি আলোকিত। দরজার কাঁচে ভিতরের আলোটা প্রতিফলিত হচ্ছে—আয়নার মত

হয়ে গেছে এখন ওটা। দরজা বরাবর আমরা একটু দূরে দাঁড়ালেই ওর চোখে অদৃশ্য হয়ে যাব।'

'কিন্তু একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে!' আঙুল তুলে এণ্ট্র্যান্সের উপর লাগানো ক্যামেরা দেখাল সোহানা।

'দেখেছি,' রানা বলল। 'খুবই লো-গ্রেড জিনিস। ফিক্সড অ্যাপারেটাস, ঘুরতে পারে না। লাইন অভ সাইট শুধু দরজা বরাবর সামনের দিকে। পাশ থেকে আমরা দেয়াল ঘেঁষে গেলেই ওটায় আর দেখা যাবে না।'

'বিল্ডিংটার সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেণ্ট তো দেখছি খুবই ঠুনকো,' মন্তব্য করল সোহানা। 'ক্যামেরাটা থেকেও নেই। একজন মাত্র রিসেপশনিস্ট, আলাদা গার্ড নেই। ওকে কাবু করে ভিতরে ঢোকা তো কোনও ব্যাপারই নয়।'

'মন্দ লোকের জন্য,' যোগ করল রানা। 'আমরা ওভাবে ঢুকব না। তবে সিকিউরিটির যে যেন-তেন অবস্থা, তাতে সন্দেহ নেই। এরিককে বলতে হবে, আগামীতে যেন আরও সিকিউর্ড কোনও বাসায় ওঠে।'

'এমনভাবে বলছ যেন ওকে উদ্ধার করে আনাটা কোনও ব্যাপারই না!'

'কঠিন ভাবলেই কঠিন। সহজ ভাবলে সহজ।'

'শুনে খুশি হলাম।'

আরেকটা ভ্যান এসে থামল ডেলিভারি জোনে। এটা *পিৎজা হাট*-এর। রানা এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু সোহানা থামাল ওকে। বলল, 'এবার আমাকে সামলাতে দাও।'

মাঝারি সাইজের দুটো পিৎজার বাক্স নিয়ে এগিয়ে আসছে ডেলিভারি-ম্যান, তার সামনে গিয়ে ভুবনমোহিনী হাসি দিল ও। বলল, 'হাই! কষ্ট করে আর উপরে যেতে হবে না, আমিই নিয়ে যেতে পারব। সিগারেট টানতে এসেছিলাম কি না! এগুলো

নিশ্চয়ই ছ'শ আটাশ নম্বরের?'

হঠাৎ করে সামনে একজন অপরূপাকে দেখে থতমত খেয়ে গেছে তরুণ ডেলিভারি-ম্যান। প্রশ্নটা শুনে একটু আমতা-আমতা করল সে, তারপর প্যাকেটে লাগানো ডেলিভারি স্লিপ দেখে বলল, 'জী, এগুলো আপনারই। সিক্স-টু-এইট।'

'ওহ্ থ্যাঙ্কস! খিদেয় মারা যাচ্ছিলাম। ঠিকমত এনেছেন তো?'

'জী, ম্যা'ম। দুটো মিডিয়াম—একটা পেপারোনি আর ব্ল্যাক অলিভের; অন্যটা ডিলাক্স।'

'চমৎকার। বিল কত এসেছে?'

বলল তরুণ। পার্স খুলে টাকা বের করে দিল সোহানা, মোটা একটা বখশিশ-ও দিল সঙ্গে। বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল তরুণের। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যা'ম। থ্যাঙ্ক ইউ!' ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল সে।

বাক্সদুটো নিয়ে রানার কাছে ফিরে এল সোহানা। বলল, 'দুটো মিডিয়াম পিৎজা... মানে দুজন গার্ড।'

'অথবা একজন দয়াপরবশ গার্ড, বন্দির ভালমন্দের দিকে যার কড়া নজর,' হালকা সুরে বলল রানা। 'গাঁটের পয়সা খরচ করে খাবার খাওয়ায়।'

'দুনিয়া এখনও এতটা ভাল হয়ে যায়নি,' শ্লেষ প্রকাশ পেল সোহানার গলায়।

'তা অবশ্য ঠিক।'

'ভাল খবর হচ্ছে, ওদেরকে চমকে দেয়া যাবে। ঘরে বসে খাবারের অর্ডার দিচ্ছে, তার মানে বিপদের কোনও আশঙ্কাই করছে না ওরা।'

'ওভার-কনফিডেন্ট, ওয়্যারহাউসের সেই টিমটার মত,' মন্তব্য করল রানা। 'আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'কীভাবে এগোতে চাও?'

'পার্কে গিয়ে পিৎজাদুটো দান করে দেব কাউকে। আমার শুধু বাক্সদুটো দরকার। একটার তলা, আর অন্যটার উপরের অংশটা ছিঁড়ে ফেললে মাঝখানে আমার কেভলার ভেস্টটার জায়গা হয়ে যাবে।'

'ভেস্ট কেন?'

'তোমার জন্য। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'শুধু আমি পরব? আর তুমি? তোমার শরীর কি বুলেটপ্রুফ?'

'শুধু শুধু কথা বাড়িয়ো না তো!' চাপা গলায় ধমকাল রানা। 'দ্য ডিসিশান ইজ ফাইনাল।'

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সোহানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

সাত

লবির দরজায় লাগানো ঘণ্টা টুনটুন করে বাজতেই মুখ তুলে তাকাল রিসেপশনিস্ট। সুন্দরী এক তরুণী দরজা খুলে ধরেছে, বাদামি চামড়ার সুদর্শন এক যুবক হাতে দুটো পিৎজার বাক্স নিয়ে ঢুকছে ভিতরে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে—এমন চমৎকার জুটি সচরাচর চোখে পড়ে না।

'হাই!' কাছে এসে বলল রানা। 'আমরা উনিশ তলায় জেরির সারপ্রাইয পার্টিতে এসেছি।'

মুচকি হাসল রিসেপশনিস্ট। 'পিৎজা এনেছেন কেন? একটু

আগেই তো অর্ডার দিয়ে পার্টির জন্য একগাদা পিৎজা আনিয়েছে ওরা।'

সোহানা বিরক্ত হবার অভিনয় করল। রানাকে অনুযোগের সুরে বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম শ্যাম্পেন নিতে! তুমি কক্ষনো আমার কথা শোনো না।'

'মরেছি!' বলল রানা, করুণ দৃষ্টিতে তাকাল রিসেপশনিস্টের দিকে। 'কী করলেন, ভাই? বলে দিতে গেলেন কেন? ধাতানি খেতে খেতে জান খারাপ হয়ে যাবে এখন আমার।'

হেসে ফেলল লোকটা। 'যান উপরে, পার্টিতে অ্যাটেণ্ড করুন। সবাইকে বলবেন, হই-চই যেন কম করে। আশপাশের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যেন নালিশ শুনতে না হয়।'

'বলব।'

কাউণ্টারের তলার বোতাম চেপে ইনার ডোর খুলে দিল রিসেপশনিস্ট। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলিভেটরে গিয়ে উঠল রানা-সোহানা।

'আগে উনিশ তলার বাটন চাপো,' সঙ্গিনীকে বলল রানা। 'রিসেপশনিস্ট লোকটা এলিভেটরের কাউণ্টারে নজর রাখতে পারে, ওর মনে সন্দেহ জাগাতে চাই না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা পালন করল সোহানা। প্রথমে উনিশ তলায় নিয়ে গেল এলিভেটর, তারপর আবার নেমে এল ছ'তলায়। চওড়া করিডোরে পা রাখতেই আড়চোখে সঙ্গিনীকে কাঁপতে দেখল রানা। কাঁপুনিটা তীব্র নয়, নিজেকে বেশ ভালই নিয়ন্ত্রণ করছে সোহানা, তারপরও রানার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল ব্যাপারটা।

'অসুবিধে হচ্ছে?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভয় করলে বলো, এখনও সময় আছে। আমি একাই সামলাতে পারব ব্যাপারটা।'

অসুবিধে অবশ্যই হচ্ছে সোহানার। লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা, কয়েকটা দরজা পরেই রয়েছে শত্রুপক্ষ... সংঘাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সাধারণত এ-সময়টায় উত্তেজনা অনুভব করে ও, শরীরে অ্যাড্রেনালিনের বাড়তি প্রবাহ প্রতিটা পেশি আর স্নায়ুকে করে ফেলে টান টান। অথচ আজ সে-সবের কিছুই ঘটছে না, বুক খামচে ধরছে কী যেন। আতঙ্কটার কাছে একবার আত্মসমর্পণ করতে চাইল, ভাবল ফিরে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্যবোধ আর অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বুকের গহীনে। এভাবে পিঠ ফেরানোর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

দাঁতে দাঁত পিষে সোহানা বলল, 'আমাকে নিয়ে ভেবো না, কী করতে হবে, তা-ই বলো।'

চোখের সন্দেহটা দূর হলো না রানার। বলল, 'আমার কাছে লুকিয়ো না, সোহানা। অ্যাকশনের সময় তুমি অচল হয়ে পড়লে সমস্যা আছে—স্রেফ খুন হয়ে যাবে। সত্যি করে বলো, পারবে কাজটা করতে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। 'দুর্বল লাগছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাকে বাদ দিয়ে এগোতে বলছি। আই ওয়ান্ট টু হেলপ, তবে সরাসরি ফাইট করতে না হলে ভাল হয়।'

'হুম, তা হলে তোমার মূল কাজ অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলানো। বাকিটা আমার, তুমি ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কিন্তু ওরা যদি দরজা পুরোপুরি না খোলে? হয়তো শুধু ছিটকিনি নামাবে, চেইন সরাবে না।'

'চ্যাংড়া কোনও ডেলিভারি-বয় এলে তা-ই করত,' বলল রানা। 'কিন্তু নিশ্চিত থাকো, তোমার মত সুন্দরী ডেলিভারি-গার্ল এই জনমে দেখেনি ওরা। দরজা তো পুরো খুলবেই, খাতির জমাবারও চেষ্টা করবে। ওদেরকে উৎসাহিত করা দরকার। এক

কাজ করো, ব্লাউজের ওপরের তিনটে বোতাম খুলে ফেলো।'

'কী বলছ এসব অসভ্যের মত!'

'অসভ্যতা নয়, প্রফেশনাল অ্যাডভাইস।' রানা হাসল। 'নিজে খুলতে পারবে, নাকি আমি সাহায্য করব?'

চোখ পাকাল সোহানা। 'মারব এক কিল!'

চটপট বোতাম-তিনটে খুলে ফেলল ও। উঁকি দিতে শুরু করল সুডৌল বুকের উপরিভাগ আর মাঝের গহীন গিরিখাদ... দর্মবন্ধ করা দৃশ্য। সপ্রংশস দৃষ্টিতে তাকাল রানা, তাতে কামনার কোনও ছাপ ফুটল না, রইল শুধু নীরব স্তুতি।

'অ্যাই, হ্যাংলার মত তাকিয়ে রইলে কেন? সত্যি সত্যি কিল মারব কিন্তু!' ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে পিৎজার বাক্সদুটো কেড়ে নিল সোহানা। 'চলো!' হুকুম দিল ও।

এরিকের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছুল দুজনে। সোহানা দাঁড়াল দরজা বরাবর, পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা—হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। করিডোরটা শূন্য, কেউ এসে বাগড়া দেবার ভয় নেই। পজিশন নিয়ে দেয়ালে কান ঠেকাল রানা, ভিতর থেকে টেলিভিশনের আবছা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারমানে ব্যাটারা কেয়ারলেস, বিপদের আশঙ্কা করছে না। দক্ষ পাহারাদারেরা ঘরের ভিতরটা নিঃশব্দ রাখে, যাতে বাইরের যে-কোনও শব্দ শুনতে পায়, সে-অনুসারে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। কিন্তু এরা ওসব দিকে নজর দিচ্ছে না। ভালই হলো ওদের জন্য। ইশারা করল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানা বেল বাজাল।

প্রথমবার কোনও জবাব পাওয়া গেল না। তাই আবার বেল চাপল সোহানা। এবার থেমে গেল টিভির আওয়াজ; ভলিউম কমানো হয়েছে... কিংবা হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে টিভিটা। কাঠের মেঝেতে পায়ের আওয়াজ হলো, পিপহোলের সামনে

একটু ঝুঁকে দাঁড়াল ও—আবেদনময়ী ভঙ্গিতে, যাতে ভিতর থেকে ওকে ভালমত দেখা যায়।

পিপহোলে ছায়া পড়ল, কয়েক সেকেণ্ড পরেই ছিটকিনি খোলার শব্দ পাওয়া গেল। একটুখানি ফাঁক হলো পাল্লাটা, চেইন লাগানো রয়েছে এখনও। সাদা চামড়ার একটা মুখ উঁকি দিল ফাঁকা দিয়ে।

'ইয়েস?'

পিৎজা বক্সের উপরে সাঁটা চিরকুটটা দেখল সোহানা। বলল, 'আপনাদের অর্ডার নিয়ে এসেছি। দুটো মিডিয়াম—একটা পেপারোনি আর ব্ল্যাক অলিভের; অন্যটা ডিলাক্স।'

'আগে কখনও তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না,' সন্দেহ ফুটল লোকটার কণ্ঠে, বাচনভঙ্গিতে ইয়োরোপিয়ান টান স্পষ্ট। 'সাধারণত দুটো ছেলে পালা করে আসে ডেলিভারি দিতে।'

'আর বলবেন না!' গলায় তিক্ততা ফোটাল সোহানা। 'দুই হারামজাদাই আজকে গায়েব হয়ে গেছে, বলে কিনা অসুখ! আমার তো মনে হয়, গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে ডেটিঙে গেছে। আমার হাজব্যাণ্ড আর আমি হচ্ছি দোকানের মালিক, অথচ দেখুন, অর্ডার নিয়ে আমাদেরকেই ছোটাছুটি করতে হচ্ছে...'

হাসল লোকটা, চেহারা থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। বলল, 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। দাম কত হয়েছে?'

চিরকুটটা খুলে ফাঁকার দিকে বাড়িয়ে ধরল সোহানা। সেটা নিয়ে লোকটা বলল, 'জাস্ট আ মিনিট।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ঝনাৎঝন শুনে বোঝা গেল, চেইনটা খোলা হচ্ছে। পুরো দরজা খুলে পিৎজা নেবে লোকটা এখুনি। চট করে বসে পড়ল রানা, নিচু হয়ে চলে এল দরজা আর সোহানার মাঝামাঝি; বসে থাকায় ওকে পিপহোল দিয়ে দেখা যাবে না।

দরজা খুলে যেতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, ভাঁজ করা স্প্রিঙের মত ছিটকে গেল, মাথা নিচু করে কাঁধ দিয়ে সজোরে আঘাত করল প্রতিপক্ষের পেটে। হুঁক্ করে সমস্ত দম বেরিয়ে গেল লোকটার, অকস্মাৎ আক্রমণের ধাক্কা সইতে পারল না। উড়ে গিয়ে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল ইনার করিডোরের মেঝেতে।

সোজা হয়ে পিস্তল তুলল রানা, তাক করল ভূপাতিত শত্রুর দিকে। লোকটাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হলো না—কয়েক দিন আগেই দেখেছে একে... ড. সিদ্দিকীকে নিয়ে পালাবার সময়, শপিং মলের বাইরে। এ সেই টাকমাথা ড্রাইভার। লোকটা অবশ্য ওকে চেনার কোনও চেষ্টা করল না, অস্ফুট স্বরে গাল দিয়ে উঠল সে, কোটের আড়াল থেকে নিজের অস্ত্র বের করে আনার চেষ্টা করছে।

ছুটে গিয়ে ব্যাটার থুতনির নীচে একটা পেনাল্টি কিক মারল রানা। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার ভয়ঙ্কর শব্দ হলো, গুঙিয়ে উঠে মেঝেতে নিথর হয়ে গেল টাকমাথা। এক পলকের জন্য পিছনে তাকিয়ে ইশারা করল রানা। সোহানা ওর কথামত পিৎজার বাক্স তুলে ধরে রেখেছিল বুক ঢেকে, যাতে গোলাগুলি হলে কেভলার ভেস্টের আড়াল পায়; এবার বাক্স ফেলে দিল ও, নিতম্বের উপরে বেল্টে গোঁজা নিজের সিগ-সাওয়ার বের করল, তাক করল টেকো ড্রাইভারের দিকে—কাভার দেবার জন্য।

রানা অবশ্য ইশারা দিয়েই ছুটতে শুরু করেছে করিডোর ধরে। লিভিংরুমের এণ্ট্র্যান্সে পৌঁছে ডাইভ দিল ও, মেঝেতে এক গড়ান দিয়ে চলে গেল কামরার প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত। সোজা হলো এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, ক্লাসিক ফায়ারিং পজিশনে পিস্তল ধরা হাতটা প্রসারিত করে রেখেছে।

একজন মাত্র প্রহরী রয়েছে কামরাটায়—চল্লিশের কোঠায়,

পৌঁছা এক গাঁট্টাগোট্টা গোঁফঅলা পালোয়ান, বসে আছে টিভির সামনে একটা সিঙ্গেল সোফায়। রানার উদ্যত সিগ-সাওয়ার দেখে চমকে উঠল সে, চকিত দৃষ্টি বোলাল সামনের কফি-টেবিলের উপর—ওখানে তার নিজের অস্ত্রটা রাখা। হাত বাড়াবার পাঁয়তারা করছিল, কিন্তু জমে গেল রানার শীতল কণ্ঠ শুনে।

'হাতটা যেমন আছে, তেমনই থাক, মিস্টার। নইলে খামোকা প্রাণটা খোয়াবে।'

লিভিংরুমের আর্চওয়েতে সোহানাকে উদয় হতে দেখে তিক্ততা ফুটল লোকটার চেহারায়। বুঝতে পারছে, কোনও সুযোগ নেই তার; একজন হলে নাহয় কথা ছিল, কিন্তু দুজন সশস্ত্র মানুষকে কিছুতেই মোকাবেলা করতে পারবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিল সে, হাতদুটো তুলে ধরল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

এবার রুমের বাকি অংশের উপর নজর বোলাল রানা। এরিককে দেখা গেল বাম দিকের কোণে—মুখে কাপড় গোঁজা... একটা চেয়ারে বসিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখের একটা অংশ ঢেকে রয়েছে শুকিয়ে ওঠা রক্তে, উন্মুক্ত চামড়ায় কালসিটেও পড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। রানাকে দেখে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার, কিন্তু ওকে নিয়ে ব্যস্ততা দেখাল না অভিজ্ঞ বিসিআই এজেন্ট। আগে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে বুঝে নিতে হবে।

কফি-টেবিল থেকে প্রথমে পিস্তলটা তুলে নিল ও, কাছে গিয়ে ঘাড়ের উপর সিগ-সাওয়ারের বাটের বাড়ি দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলল গোঁফঅলা লোকটাকে। এরপর বেডরুমে হানা দিল। কামরাটা অন্ধকার, জানালা গলে আবছা আলো আসছে শুধু। ওর মধ্যেই পুরো ঘর তল্লাশি করল ও—আসবাবপত্রের ফাঁক, ক্লজিটের ভিতরদিক, বিছানার তলা... সব দেখল। সবশেষে

দেখল বাথরুমটা। নিশ্চিত হলো, অ্যাপার্টমেন্টে আর কেউ নেই।

'অল ক্লিয়ার,' বেডরুম থেকে বেরিয়ে সোহানাকে বলল রানা। 'মেইন ডোর বন্ধ করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'টাকলুকে সার্চ করে এসো, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র লুকানো থাকতে পারে ওর। জ্ঞান ফেরার পর ব্যাটা আবার যেন ঝামেলা পাকাতে না পারে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সোহানা। রানা এগিয়ে গেল গোঁফঅলার দিকে, মেঝেতে পড়ে আছে সে। দক্ষ হাতে তল্লাশি চালাল ও, কিন্তু কিছু পেল না লোকটার শরীরে। কফি-টেবিলে রাখা পিস্তলটাই এর একমাত্র সম্বল ছিল।

সোহানা ফিরে এল। হাতে একটা ছোট্ট পিস্তল আর ভাঁজ করা ছোরা। বলল, 'এ-দুটো পেয়েছি।'

'গুড,' বলল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে এরিকের বাঁধন খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা তোমার?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন,' কবজি ডলতে ডলতে বলল এরিক। 'একটা দাঁত ভেঙেছে।' ফোলা বাম গালে হাত বোলাল ও। 'বুকের দু-একটা হাড়েও চিড় ধরেছে বোধহয়। শ্বাস নিতে গেলেই ব্যথা পাচ্ছি।'

পাশে পড়ে থাকা একটা টিস্যু বক্স চোখে পড়ল রানার, ওটা থেকে কয়েকটা টিস্যু বের করে তুলে দিল এরিকের হাতে। 'জোরে কেশে এখানে থুতু ফেলো। তা হলে বুঝব ক্ষয়ক্ষতি কতখানি হয়েছে।'

কাশতে গিয়েই মুখ কুঁচকে ফেলল এরিক। 'উফ্‌ফ্‌, ব্যথা পাচ্ছি খুব।'

'থেমো না,' রানা বলল। 'আমাকে থুতুটা দেখতে হবে।'

বুক চেপে ধরে কাশল এরিক, একদলা থুতু ফেলল হাতে ধরা

টিস্যুতে। সেটা দেখে স্বস্তি পেল রানা। বলল, 'রক্ত বেরুচ্ছে না। তারমানে ইন্টারনাল ইনজুরি নেই কোনও। ওঠো, সোফায় শুতে হবে তোমাকে। সোহানা, তুমি ওকে একটু দেখবে? আমি বদমাশদুটোর হাত-পা বেঁধে ফেলছি।'

এফবিআই এজেন্টের পায়ের কাছে পড়ে থাকা দড়ির গোছা তুলে নিয়ে ও সরে যেতেই সোহানা এগিয়ে এল। ইতোপূর্বে রানার সৌজন্যে একবার দেখা হয়েছে দুজনের, পরিচয় হয়েছে। এরিক একটু হাসার চেষ্টা করল, 'হাই, কেমন আছেন?'

'ভদ্রতা দেখাবার সুযোগ অনেক পাবেন,' সোহানা বলল। 'উঠুন এখন।'

ওর সাহায্য নিয়ে ভর দিয়ে সোফা পর্যন্ত গেল এরিক, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শার্ট খুলে ওর বুক আর পেট পরখ করে দেখল সোহানা।

'ফোলা-টোলা দেখছি না,' বলল ও। 'অস্বাভাবিক কোনও ব্যথা অনুভব করছেন?'

'সারা শরীর টনটন করছে, আর আপনি কিনা বলছেন...'

'অস্বাভাবিক ব্যথার কথা বলছি। কোন্‌টা স্বাভাবিক, তা নিশ্চয়ই জানেন? জীবনে এই প্রথম মার খাননি নিশ্চয়ই?'

'বুঝেছি। না, ম্যা'ম... ব্যথা যা পাচ্ছি, সবই স্বাভাবিক। মানে... এভাবে মার খাওয়াকে যদি স্বাভাবিক বলেন আর কী...'

হেসে ফেলল সোহানা। 'আপনার ঘরে ফার্স্ট এইড কিট আছে?'

'হ্যাঁ। বাথরুমে, সিঙ্কের নীচে কাবার্ডে।'

ছোট্ট বক্সটা নিয়ে যখন সোহানা ফিরে এল, তখন রানার কাজ শেষ হয়েছে। অচেতন দুই দুর্বৃত্তকে বাঁধা শেষ করে এরিকের পাশে এসে বসেছে। সোফার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল সোহানা, ফার্স্ট এইড কিট খুলল। ভিতরটা নানান ধরনের

ওষুধ আর চিকিৎসা সরঞ্জামে ভর্তি—সাধারণ কিটে এত কিছু থাকে না।

'হুঁ,' বলল সোহানা। 'আপনি দেখছি খুব সাবধানী লোক, এরিক। যে-কোনও ইনজুরি সামলাবার মত প্রস্তুতি রেখেছেন!'

'মি. রানার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে তৈরি থাকি,' বলল এরিক। 'ওঁর বন্ধুত্ব একটা ইনজুরিয়াস জিনিস। শুনেছেন হয়তো, ওঁকে সাহায্য করতে গিয়ে মস্ত বিপদে পড়েছিলাম। লুইযিয়ানার জলাভূমিতে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল একদল খুনি।'

'ঠিকই বলেছেন,' হাসল সোহানা। ব্যাণ্ডেজে জীবাণুনাশক ঢেলে এরিকের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল ও। কাটা-ছেঁড়ায় জ্বালা-পোড়া শুরু হলো, মুখ কুঁচকে ফেলল এফবিআই এজেন্ট।

'নড়বেন না,' সোহানা বলল। 'ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করুন, অন্য কিছুতেই মনোযোগ দিন।'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল এরিক। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ওয়ার্নিংটা বুঝতে পেরেছিলেন তা হলে?'

'বোঝার জন্যই তো কোড, তা-ই না?' রানা বলল। 'চমৎকার দেখিয়েছ। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাউকে সতর্ক করে দেয়া সহজ কাজ নয়। ওরা বুঝে ফেললে তোমাকে খুনও করতে পারত।'

'মরলে মরতাম। তা-ও আপনাকে ফাঁদের ভিতর পাঠাতাম না।'

'আমি জানি। কিন্তু কীভাবে কী ঘটল, সেটা বলো।'

'ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলাম। ডি.ই.এ.-তে আমার পরিচিত যারা আছে, তারা কিছুই বলতে পারল না...'

'দাঁড়াও একটু,' রানা বাধা দিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় গলা শুকিয়ে গেছে এরিকের, ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছে

কণ্ঠ। 'আমি পানি নিয়ে আসছি।'

পুরো এক গ্লাস পানি ঢকঢক করে খেয়ে কিছুটা সুস্থির হলো এরিক, তারপর আবার খেই ধরল। '...আমার কণ্ট্যাক্টরা কোনও খবর দিতে পারল না। তাই ব্যুরোর কম্পিউটার ডেটাবেজ ব্যবহার করলাম, কিন্তু ওখানেও কোনও তথ্য নেই আপনার ওই বিজ্ঞানীর বিষয়ে।'

'কিছুই পাওনি?'

'নাহ্। কখনও ছিল, তা-ও মনে হয় না। সম্ভবত ইচ্ছে করেই এফবিআই ডেটাবেজে ভদ্রলোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সিদ্ধান্তটা খুব উঁচু মহল ছাড়া আর কারও পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। একটু নাড়াচাড়া করব ভেবেছিলাম বিষয়টা নিয়ে, কিন্তু তার আগেই এই হারামজাদাদের হাতে পড়ে গেলাম।' মেঝেতে পড়ে থাকা গোঁফঅলা দুর্বৃত্তকে দেখাল এরিক।

রানার কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। 'তোমার ব্যাপারে এরা জানল কী করে?'

'ব্যুরোতে ওদের লোক থাকতে পারে, আবার কম্পিউটার হ্যাক করলেও জানা সম্ভব—ফেডারেল ডেটাবেজে কে ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে। এনিওয়ে... যেভাবেই হোক, আমার খবর পেয়েছে ওরা, জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অফিস শেষে বাড়ি ফেরার জন্য যখন পার্কিং লটে গেলাম, ওখানে অপেক্ষা করছিল ওরা। পিছন থেকে একজন আমার নাম ধরে ডাকল, উল্টো ঘুরতে না ঘুরতেই ঝট্ করে একটা ভ্যান এসে থামল পাশে। তিনজন লোক জাপটে ধরে আমাকে তুলে নিল ভিতরে, মাথায় একটা কালো কাপড়ের ব্যাগ পরিয়ে দিল।'

দম ফুরিয়ে গেছে এরিকের, থেমে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকল।

'ছয়,' হিসেব করল রানা। 'একজন পিছন থেকে ডেকেছে, তিনজন তুলে নিয়েছে ভ্যানে, আর একজন নিশ্চয়ই ড্রাইভ করছিল। পাঁচজনের টিম ছিল তা হলে?'

'উঁহুঁ, ছয়,' বলল এরিক। 'আরেকজন আছে ওদের সঙ্গে, ছয় নম্বর লোকটাই ওদের লিডার। নিজের নাম বলে ডেমিয়েন। ছদ্মনাম হবারই সম্ভাবনা বেশি।' সোহানার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল। 'এক্সকিউজ মি, আপনার কি খারাপ লাগছে?'

চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে সোহানার, অনেক কষ্টে এতক্ষণ ভয়টাকে চেপে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ করে স্নায়ু বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। উঠে দাঁড়াল ও, কাঁপা গলায় বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি একটু মুখ ধুয়ে আসি।'

বেডরুমের দিকে চলে গেল সোহানা। বিস্মিত গলায় এরিক বলল, 'কী হলো ওঁর? নার্ভাস মনে হচ্ছে... আগেরবার যখন দেখেছিলাম, তখন কিন্তু খুব শক্ত মেয়ে মনে হচ্ছিল।'

'ও কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'এরপর কী ঘটল, সেটা বলো।'

'অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে এল ওরা, রিসেপশনে কেউ সন্দেহ করেনি—বন্ধু সেজে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে এসেছে, আমার গাড়িটাও নিয়ে এসেছে সঙ্গে। সারাক্ষণ আমার পিঠে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছিল, যাতে ওদের অভিনয়ে তাল দিয়ে যাই। যা হোক, বাসায় এনেই আমাকে টরচার করতে শুরু করল—একটাই প্রশ্ন, কেন ড. সিদ্দিকীর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি আমি। মার খেতে খেতে এক পর্যায়ে আর টিকতে পারলাম না, সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে ওদেরকে বললাম যে—আমি নই, আসলে সিদ্দিকীকে খুঁজছে আমার এক বন্ধু; সিদ্দিকীর সিকিউরিটি ডিটেইলে কাজ করত সে। কথাটা শুনে ব্যাটারা খুব আগ্রহী হয়ে উঠল, আমার সেই বন্ধুকে বাগে পাবার জন্য পাগলা কুকুর হয়ে

গেল।'

'হুম, ওদের ধারণা—সিদ্দিকীর সিকিউরিটি ডিটেইলে কাজ করে থাকলে নিশ্চয়ই অনেক নতুন ইনফরমেশন আছে তোমার বন্ধুর কাছে,' রানা বলল। 'এই বন্ধু হয়তো আইডিয়া দিতে পারবে, সিদ্দিকী কোথায় গেছে।'

'কারেক্ট। কিন্তু আমি ওদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আপনিও বিজ্ঞানীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ওরা যা জানে, তার চেয়ে বেশি কিছু আপনি জানেন না।'

'কিন্তু সেটা ওরা বিশ্বাস করেনি, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন। আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ভুল ইনফরমেশন দিতে বাধ্য করেছে। বলতে বলেছে যে, সিদ্দিকীর ল্যাব ভার্জিনিয়ার বেইলি'জ রিজে।'

'ছ'জনের মধ্যে মাত্র দুজন এখানে,' রানা বলল। 'বাকি চারজন নিশ্চয়ই ওখানে গেছে আমার জন্যে ফাঁদ পাততে?'

মাথা ঝাঁকাল এরিক।

সোহানা ফিরে এসেছে। ফাঁদের ব্যাপারটা শুনতে পেয়েছে ও, সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বলল, 'তুমি তো যাওনি ওখানে, এখন কী ঘটবে?'

'এখানে ফিরে আসবে ওরা। আমার আবার ফোন করবার কথা, সেটার জন্য অপেক্ষা করবে, নতুন করে ফাঁদ পাততে চাইবে।'

'কিন্তু আমরা ওদের আগেই পৌঁছে গেছি এখানে।'

'হ্যাঁ,' ভয়ঙ্কর একটা হাসি দেখা দিল রানার ঠোঁটে। 'সে-কারণেই ফাঁদটা ওরা নয়, আমরা পাতব!'

আট

পরদিন।

ইণ্টারকমে রিং বাজতে শুনে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর আস্তে করে তুলল রিসিভারটা, কানে ঠেকাল। 'ইয়েস?'

রিসেপশনিস্টের গলা শোনা গেল ওপাশ থেকে। 'মি. ডেমিয়েন এসেছেন, সার। সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক।'

'পাঠিয়ে দাও।'

'জী সার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বেডরুম থেকে লিভিংরুমে ফিরে এল রানা। এরিক আর সোহানা বসে আছে সোফায়, ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুজন এসেছে। বাকি দুজন নিশ্চয়ই রয়ে গেছে বেইলি'জ রিজে।'

'গুড,' এরিক বলল। 'আমাদের পাল্লা ভারী থাকছে তা হলে।' স্বস্তি ফুটেছে ওর গলায়। চারজন সশস্ত্র শত্রুকে এই বদ্ধ জায়গায় কীভাবে মোকাবেলা করবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। অফিসে খবর দিয়ে কয়েকজন এফবিআই এজেন্টকে আনতে চেয়েছিল, কিন্তু রানা রাজি হয়নি। ব্যুরোতে এদের চর থাকতে পারে, হয়তো খবর পেয়ে যাবে। তা ছাড়া পুরো ব্যাপারটা নিজের মত করে সামাল দিতে চায় ও, আমেরিকান কোনও সংস্থা নাক গলাক তা চায় না।

ঘড়ি দেখল সোহানা—বেলা বারোটা পেরিয়েছে কয়েক মিনিট আগে। বলল, 'তাড়াতাড়িই তো ফিরেছে দেখছি। আমি ভেবেছিলাম আরও দেরি করবে।'

'ডেমিয়েনের আর তর সইছে না আর কী!' মুচকি হাসল রানা। 'সারারাত বেইলি'জ রিজে বসে থাকতে হয়েছে তাকে, ঘুমাতেও নিশ্চয়ই পারেনি। মেজাজ খিঁচড়ে থাকার কথা। এরিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার খায়েশ জেগেছে নিঃসন্দেহে। হয়তো সন্দেহ জেগেছে, আমাকে কোনওভাবে সতর্ক করে দিয়েছে ও। সেজন্যেই আমাকে পাওয়া যায়নি ওখানে।' একটু থামল ও, মুখ ঘোরাল। 'কী, অতিথি আপ্যায়নের জন্য তৈরি আছ তোমরা?'

কথাটা দুই বন্দিকে উদ্দেশ্য করে বলা। দুটো চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে টাকমাথা আর গোঁফঅলাকে—অনেক আগেই জ্ঞান ফিরেছে ওদের। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে দুজনকে, কিন্তু কিছুই জানা যায়নি। এরা ভাড়াটে গুণ্ডা, ডেমিয়েনের হয়ে শুধু অর্ডার ফলো করছে; ড. সিদ্দিকীর বিষয়ে কিচ্ছু বলতে পারেনি।

রাতে দুবার অবশ্য ফোন করেছিল এদের নেতা, বেইলি'জ রিজ থেকে রাগত স্বরে অ্যাপার্টমেন্টের পরিস্থিতি জানতে চাইছিল। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিতে বাধ্য করা হয়েছে বন্দিদের, প্রাণভয়ে সব ঠিক আছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে ওরা।

রানার প্রশ্ন শুনে চুপ করে রইল দুই দুর্বৃত্ত। টেকো লোকটার কাছে গিয়ে পিস্তলের খোঁচা মারল রানা। 'কী বলেছি, শুনতে পাওনি? তোমাদের বসকে রিসিভ করতে রেডি আছ?'

ভয়ার্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টাকমাথা।

'গুড,' রানা বলল। 'ঠিক আছে, তা হলে কাজে নামা যাক।

সোহানা-এরিক, কী করতে হবে মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল দুজনেই। উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে।

'আমি বাইরে যাচ্ছি,' বলে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল সোহানা। ইমার্জেন্সি স্টেয়ারওয়েলের দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকবে ও—করিডোর থেকে দেখা যাবে না। ডেমিয়েন আর তার সঙ্গী ঢুকলে পিছন থেকে হামলা করবে, রানা-এরিক থাকবে সামনে। দু'দিক থেকে শত্রুদেরকে আটকাবে ওরা।

বাঁধন খুলে টেকো লোকটাকে দাঁড় করাল রানা। নির্দেশ দিল, 'হাঁটো। সাবধান, চালাকি করতে যেয়ো না। আমি পিছনে আছি, ঘাপলা হলে কিন্তু লাইন অভ ফায়ারে তুমিই সবার আগে থাকছ।'

মাথা নাড়ল টাকমাথা, আদেশ অমান্য করবার ইচ্ছে নেই। মরতে চায় না অকালে। প্যাসেজ ধরে দরজার দিকে চলে গেল সে। এরিক গেল কিচেনে, ফ্রিজের আড়ালে পজিশন নিল। রানা থাকল আর্চওয়ের পিছনে, মাথা সামান্য বের করে নজর রাখছে এন্ট্রান্সের দিকে। পুরো ব্যাপারটা আগেই রিহার্সাল দিয়ে রেখেছে ওরা, আশা করা যায় বিনা রক্তপাতে আটকানো যাবে শত্রুদেরকে।

সময় গড়াতে শুরু করল। দশ সেকেণ্ড... বিশ... ত্রিশ... চল্লিশ... পঞ্চাশ... এক মিনিট... দু'মিনিট...। এরিক উসখুস করছে, কিন্তু রানা স্থির রইল। এলিভেটরটা পুরনো, উপরে ওঠে খুব আস্তে। তা ছাড়া লোকদুটো নিশ্চয়ই চারপাশে নজর রেখে ধীরে ধীরে আসছে। দেরিটা অস্বাভাবিক নয়।

তিন মিনিটের মাথায় দরজায় টোকা পড়ল। ঠক্, ঠক্—দু'বার। একটু বিরতি নিয়ে পর পর আরও তিনবার। দুর্বৃত্তদের মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত কোড ওটা। পিছন ফিরে একটু তাকাল টাকমাথা, ইশারায় তাকে দরজা খোলার অনুমতি দিল রানা। ছিটকিনি আর চেইন নামাল সে, খুলে ধরল পাল্লাটা।

‘খবর আছে কোনও?’ খেঁকিয়ে উঠল নবাগত একজন।

‘না,’ বলল টেকো লোকটা। ‘ফোন আসেনি আর।’ উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে, দুই নবাগত যেন তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়—ওভাবেই তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘটলও তা-ই। পিছু পিছু এগোতে শুরু করল ডেমিয়েন আর তার সঙ্গী।

আর্চওয়ে ছেড়ে পিছিয়ে গেল রানা, লিভিংরুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজার কাছে উদয় হলো তিন দুর্বৃত্ত, টাকমাথা শুয়ে পড়ল ঝট্ করে। দুই নবাগত চমকে উঠল রানাকে দেখে, ওর তাক করা সিগ-সাওয়ার দেখে যন্ত্রচালিতের মত হাত ঢুকিয়ে ফেলল কোটের ভিতরে। অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে।

‘ওভাবেই জমে যাও, বাছারা!’ গমগম করে উঠল এরিকের কণ্ঠ। ‘যদি ক্রসফায়ারে কচুকাটা হতে না চাও আর কী!’

ঘাড় ফিরিয়ে কিচেনে দাঁড়ানো এফবিআই এজেন্টকে দেখতে পেল দুই দুর্বৃত্ত—ফ্রিজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ও, পিস্তল হাতে কাভার করেছে ওদেরকে পাশ থেকে। এক পা পিছিয়ে গেল লোকদুটো নিজের অজান্তেই।

‘লাভ নেই,’ রানা বলল। ‘পিছনেও তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।’

সোহানা এসে পড়েছে, মেইন ডোরে দাঁড়িয়ে আরেকটা অস্ত্র তাক করেছে রেখেছে ও। খ্যাপাটে চেহারা করল একজন। বলল, ‘হচ্ছেটা কী এসব?’

‘দেখতেই পাবে,’ রানা নির্বিকার। ‘সামনে এসো, তারপর সুবোধ বালকের মত শুয়ে পড়ো মেঝেতে। হাতদুটো যেন মাথার পিছনে থাকে।’

পালা করে তাক হয়ে থাকা তিনটে অস্ত্রের দিকে তাকাল লোকদুটো, তারপর হার মানল। লিভিংরুমে ঢুকে কার্পেটমোড়া

মেঝেতে শুয়ে পড়ল। কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে এল এরিক, দক্ষ হাতে তল্লাশি করল শত্রুদের শরীর। দুটো নাইন মিলিমিটার ব্রাউনিং পিস্তল বেরুল ওদের কাছ থেকে, সঙ্গে স্পেয়ার-ম্যাগাজিন আর ভাঁজ করা পকেট-নাইফও আছে। নিয়ে নিল সব। সোহানা ভিতরে ঢুকে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা আটকে দিল, তারপর চলে এল লিভিংরুমে।

'অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে আর কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমাকে পিস্তল হাতে দেখতে পেয়েছে?'

সোহানা মাথা নাড়ল। 'না। এদের সঙ্গে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসেছেন এলিভেটরে। ওপাশের একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন বোধহয়। উনি ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে এরা, এখন করিডোর ফাঁকা।'

'হুম!'

'তুমিই তা হলে সেই লোক?' মেঝে থেকে মাথা তুলে বলল দুই নবাগতের একজন। মাঝারি উচ্চতা, তীক্ষ্ণ চেহারা, মাথার চুল মিলিটারি ছাঁটে কাটা। কথা বলছে নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে। হাবভাবে নেতৃত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। 'গলা চিনতে পারছি আমি। মি. বডিগার্ড... ঠিক বলেছি?'

রানাও চিনতে পারল। ড. সিদ্দিকীকে নিয়ে পালাবার সময় টাকমাথা ড্রাইভারের ফোনে কথা হয়েছিল এ-লোকটারই সঙ্গে। ও বলল, 'আবার ভুল করলে। আমি বডিগার্ড নই। তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই কথা বলেছিলে। তুমি তো সেই উজবুকটা... তাই না?'

খেপল না লোকটা। বলল, 'হ্যাঁ, ভালই বোকা বানিয়েছ আমাকে। ফোনে যে ট্রান্সমিটার আছে, সেটা বুঝে ফেলেছিলে, না? কয়েক ঘণ্টা বেকুবের মত ঘুরেছি আমরা, পরে দেখলাম—ফোনটা একটা ট্রাকের পিছনে পড়ে আছে।' টেকো

লোকটার মত এ-ও ইয়োরোপীয় উচ্চারণে কথা বলছে।

'ভাল করেছ,' টিটকিরি মারল রানা। 'তোমরা যে অপদার্থ, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছ।' এরিকের দিকে তাকাল ও। 'এই গরুদুটোকে বেঁধে ফেলো তো, কোথাও যেন ঘাস খেতে চলে না যায়।'

দুই নবাগতের অস্ত্রগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখল ও। পিস্তলদুটো চমৎকার, তবে ওর নজর কাড়ল দুর্বৃত্তদের নেতার পকেট-নাইফটা। সাধারণ ছুরি নয়, সেরা কারিগরের তৈরি উৎকৃষ্ট মানের জিনিস। ব্র্যাণ্ড খোদাই করা আছে গায়ে: *আর্নেস্ট এমারসন।* ফলাটা আট ইঞ্চি লম্বা, নন-রিফ্লেকটিভ ইস্পাতে তৈরি, এপোক্সির হাতলটা খাঁজ কাটা—ঘাম, পানি বা রক্ত... যা-ই লাগুক, মুঠোতে পিছলাবে না। ক্লোজ-কোয়ার্টার কমব্যাটের জন্য বানানো প্রফেশনালের অস্ত্র, নবীশের জন্য নয়। ওর নিজের কাছেও একই রকম আরেকটা এমারসন-নাইফ আছে। এই ছুরিটা দেখেই রানা বুঝল, মালিক সাধারণ গুণ্ডা-বদমাশ নয়।

ফলাটা ভাঁজ করে রেখে ওটা পকেটে গুঁজল ও। তাকিয়ে দেখল, টাকমাথা লোকটাকেসহ এরিক নতুন দুই দুর্বৃত্তকে বাঁধা শেষ করেছে। এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে বসল রানা—মুখোমুখি, নেতা লোকটার দৃষ্টিসীমার ভিতরে।

'শুনলাম, ডেমিয়েন নাম নিয়েছ?' বলল রানা। 'কারণটা কী?'

'ছোটবেলা থেকে খুব ভাল লাগত নামটা,' হালকা গলায় বলল ডেমিয়েন। 'খুব ইচ্ছে ছিল, লোকে আমাকে এ-নামে ডাকুক।'

'তাই নাকি?' রানার চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। 'ড. সিদ্দিকী সম্পর্কে বলো আমাকে। কেন তার পিছনে লেগেছ তোমরা?'

জবাব দিল না ডেমিয়েন, নিঃশব্দে হাসল।

'প্রশ্নের জবাব দাও, ডেমিয়েন। এরিক কিন্তু ছটফট করছে,

একটা একটা করে তোমার শরীরের হাড্ডিগুলো গুঁড়ো করতে চাইছে ও।'

'আমার একটা দাঁত ভেঙেছে ওরা,' অভিযোগের সুরে বলল এরিক। 'শুধু হাড্ডি গুঁড়ো করে আশ মিটবে না। কানদুটোও কেটে নিতে চাই।'

হাসি নিভল না চতুর লোকটার। বলল, 'ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই, মি. বডিগার্ড। যা খুশি করতে পারেন।'

'আবার আমাকে অপমান করছ তুমি,' রানা বলল। 'আমি বডিগার্ড নই। হবার প্রশ্নও ওঠে না। ড. সিদ্দিকী আমার প্রিয় কয়েকজন মানুষকে খুন করে পালিয়েছে। তোমাদের মত আমিও তাকে খুঁজছি। পরস্পরের সঙ্গে লড়াই না করে এসো বরং সমঝোতা করি—কে কতটা কী জানি, খুলে বলি। তা হলে দু'পক্ষেরই লাভ হবে। লোকটাকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।' টোপ দিল ও।

লাভ হলো না। ডেমিয়েন বলল, 'দুঃখিত, প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারছি না। ভদ্রলোককে আমরাও চাই বটে, কিন্তু তোমার আর আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'তাতে অসুবিধে নেই,' রানা হাল ছাড়ছে না। 'একটা বোঝাপড়া করে নিতে পারব আমরা।'

'অসম্ভব! তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও রকম বোঝাপড়া হবে না।'

'আগেই শেষ কথা জানিয়ে দাও কেন?' বিভ্রান্ত করবার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'আলোচনার টেবিলে তো বসি!'

'আমি মেঝেতে!'

'বসার ব্যবস্থা করছি এখুনি,' টান দিয়ে ডেমিয়েনকে ওঠাল রানা। সোফায় নিয়ে বসাল। 'কী, আরাম পাচ্ছ তো? হাতের বাঁধনও খুলে দিচ্ছি।' ছুরি বের করে দড়ি কেটে দিল ও। মুখে

হাসি ধরে রেখেছে। 'এবার কেমন লাগছে?'

ডেমিয়েনের চোখে বিভ্রান্তি দেখা দিল। কী ঘটছে, বুঝতে পারছে না সে। সত্যিই কি এরা তার সঙ্গে সমঝোতা করতে চাইছে নাকি?

'আলোচনার পূর্ব-শর্ত হিসেবে আর কিছু চাও?' হাসিমুখে প্রশ্ন করল রানা। প্রতিপক্ষ নিশ্চুপ দেখে নিজেই আবার বলল, 'বুঝতে পেরেছি। কফি দরকার, তাই না? আসলেই... গল্প জুড়বার জন্য গরম গরম কফির কোনও তুলনা হয় না। এরিক, ভাল কফি আছে নাকি কিচেনে?'

'আছে মানে! একেবারে অরিজিন্যাল *মোকা জাভা* আছে!' এরিক উল্লসিত গলায় জবাব দিল।

'একসেলেণ্ট! আমাদের অতিথিকে খাওয়াবে নাকি একটু?'

'অবশ্যই!'

'কড়া করে বানিয়ো কিন্তু!' চোখ টিপল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে কিচেনে চলে গেল এরিক।

এদিক-ওদিক চাইল ডেমিয়েন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। একবার ভাবল, হাত খোলা যখন, লড়াই করে পালাবার চেষ্টা করবে কি না। পরমুহূর্তে দমে গেল। হাসিঠাট্টা করলেও রানার হাতে সিগ-সাওয়ারটা ঠিকই ধরা আছে। একটু দূর থেকে সুন্দরী মেয়েটাও তাক করে রেখেছে পিস্তল। সোহানার উপর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য স্থির হলো তার দৃষ্টি—বিসদৃশ কী যেন ঠেকছে চোখে। কপালে ঘাম জমেছে মেয়েটির, হাতও কাঁপছে অল্প অল্প। চকিতের জন্য একটু হাসি খেলা করে গেল ডেমিয়েনের ঠোঁটে, বুঝতে পেরেছে রহস্যটা। আবার চেহারা স্বাভাবিক করে সোফায় হেলান দিল সে। দেখা যাক, এরা কী করে।

'বেশ, বেশ,' পরিবর্তনটা লক্ষ করে বলল রানা। 'তোমার মুড বদলে যাচ্ছে দেখি। আলোচনায় বসতে রাজি আছ তা হলে?'

'এখনও কিছু বলতে পারছি না,' মুচকি হাসল ডেমিয়েন। 'কফিটা আসুক। সেই সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করতে চাও, সেটাও শুনি।'

'প্রথমে তোমার আসল পরিচয়টা জানতে চাই। না, না, ঠিকুজি-কোষ্ঠীর ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই আমার। তুমি কার হয়ে কাজ করছ, সেটা বলো আগে।'

'কেন, সিদ্দিকী সেটা বলেনি তোমাকে?'

'আমাকে রূপকথা শুনিয়েছে লোকটা,' বলল রানা। 'ডি.ই.এ.-র হয়ে নাকি গবেষণা করত। দুর্ঘটনাক্রমে একটা খুব পাওয়ারফুল ড্রাগ আবিষ্কার করে বসেছে, সেটা পাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে কলাম্বিয়ান ড্রাগলর্ড মিগুয়েল সাণ্টানা। তোমরা নাকি তার লোক। তবে আমি জানতে পেরেছি, লোকটা ডি.ই.এ.-র হয়েও কাজ করছিল না, আর সাণ্টানাও বেশ কিছুদিন আগেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। তারমানে তোমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনও কারণে সিদ্দিকীর পিছে লেগেছ... সম্পূর্ণ অন্য কারও হয়ে। কে সেটা? ইয়োরোপিয়ান কোনও সরকার... নাকি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন?'

'এ-প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না।'

'হুম, বলবে না? তা হলে তো কফির জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।'

'কী কফি বানাচ্ছ যে, আমি গান গাইতে শুরু করব?'

'দেখতেই পাবে।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল এরিক, হাতে স্বচ্ছ একটা কফি-মগ। থিকথিক করছে ভিতরটা। সামান্য পানিতে অন্তত দু'প্যাকেট কফি মিশিয়েছে ও। ধূমায়িত মগটা সোফার সামনের সেণ্টার-টেবিলে নামিয়ে রাখল।

ভ্রূ কুঁচকে মগের দিকে তাকাল ডেমিয়েন। আবার বিভ্রান্ত

হয়ে গেছে। হতভম্বের মত বলল, 'এটা কী?'

'তোমার কফি,' রানা হাসল। 'শরীরে গেলেই দেখবে গড়গড় করে শুধু কথা বেরুচ্ছে তোমার মুখ দিয়ে।'

'মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?' খ্যাপাটে গলায় বলল ডেমিয়েন। 'ওটা আমি খাব? খেয়ে কথা বলব? ওই জিনিস পেটে গেলে একটা বস্তু-ই শুধু গড়গড় করে মুখ দিয়ে বেরুতে পারে—বমি!'

'ছি! ছি! খাবে কেন?' কপট সুরে বলল রানা। 'খাবার কথা তো বলিনি। তা ছাড়া নিশ্চিন্ত থাকো, বমিও হবে না তোমার।'

সোফার পাশ থেকে ফার্স্ট এইড কিটটা বের করে আনল ও। ভিতর থেকে তুলে নিল একটা সিরিঞ্জ।

ডেমিয়েনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

কফির থিকথিকে মিশ্রণে সিরিঞ্জের মাথা ডোবাল রানা, প্লাঞ্জার টেনে টিউব ভরে ফেলল ওটা দিয়ে। ডাক্তারদের ভঙ্গি নকল করল ও, ভরা টিউবটা খাড়া করে বের করে ফেলল বাড়তি বাতাস। মুখে শিস দিয়ে চলেছে।

'থামো,' ঘাবড়ে যাওয়া সুরে বলল ডেমিয়েন। 'তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি ভাবছ না...'

বাধা পেল সে, এরিক এগিয়ে এসে টান দিয়ে তার শার্টটা নামিয়ে ফেলল। বোতাম ছিঁড়ে বুক পর্যন্ত গেল শার্ট, রিঙের মত আটকে ফেলল ডেমিয়েনকে। শিস দিতে দিতে উন্মুক্ত ঘাড়ের উপর সিরিঞ্জটা নিয়ে এল রানা, ডগাটা ঠেকাল জাগিউলার ভেইনে।

'যিশুর দোহাই!' চেঁচিয়ে উঠল দুর্বৃত্ত-নেতা। 'থামো বলছি!'

'চোপ!' ধমক দিল এরিক। 'নোংরা জিভ দিয়ে যিশুর নাম নিবি না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল ডেমিয়েন।

'যিশুকে ডাকব না। থামো এবার। পাগল হয়ে যাওনি নিশ্চয়ই? ও-জিনিস...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল চাপল রানা। 'কথা বোলো না। চোখ বন্ধ করে শুধু উপভোগ করতে থাকো। আমি তোমার রক্ত-চলাচল বাড়িয়ে দেব, মগজে আগুন জ্বেলে দেব। হার্টবিট যখন একশো আশি ছাড়িয়ে যাবে, কে জানে, তুমি হয়তো উড়তেও শুরু করবে...'

'না!' ঝটকা দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল ডেমিয়েন। পা বাঁধা, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ আটকা পড়ে আছে শার্টের মধ্যে... তাই পুরোপুরি সফল হলো না প্রয়াসটা। হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল সে, ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল সেণ্টার-টেবিলটা।

'আহ্‌!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'ব্যাটা দেখছি বড্ড বেরসিক। মজা পেতে চায় না। এরিক, ধরো ওকে।'

ডেমিয়েনের গায়ের উপর চড়ে বসল এফবিআই এজেন্ট, মাথা কাত করে চেপে ধরল মেঝেতে—নড়াচড়ার আর উপায় রইল না বেচারার। ঘাড়ের শিরাটা একেবারে অরক্ষিত হয়ে গেছে। শান্ত ভঙ্গিতে এগোল রানা, সিরিঞ্জের সুঁইটা আবার ঠেকাল ওখানে।

'প্লিজ!' অনুনয় করল ডেমিয়েন। 'থামো তোমরা।'

'কীসের থামাথামি?' হাসল রানা। 'শরীরের মেটাবলিজম বাড়বে তোমার। টেম্পারেচার এমন জায়গায় পৌঁছুবে, যাতে শুকনো কাঠির মত দপ্‌ করে জ্বলে ওঠো। দেখার মত একটা দৃশ্য হবে বটে!'

'কিন্তু... কিন্তু...' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরুল ডেমিয়েনের গলা দিয়ে, 'আমি মরে গেলে কিছুই জানতে পারবে না তোমরা।'

'সত্যি বলতে কী,' শীতল গলায় বলল রানা, 'জানবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি আমি। তোমার উপর ঘেন্না ধরে গেছে। মাথায়ও

আগুন জ্বলছে। যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি, আর না। আমার বন্ধুরা খুন হয়েছে, সিদ্দিকী আমাকে ব্যবহার করেছে, মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে, তোমরা এরিকের উপর পর্যন্ত নির্যাতন চালিয়েছ... এরপর আর কাউকে দয়া দেখানো সাজে না আমার। সবাইকে শাস্তি দেব আমি... সব্বাইকে! সুযোগ দেবার পরও তুমি যখন আমার কথা শুনছ না, শুরুটা তা হলে তোমাকে দিয়েই হোক।'

সুঁইটা শিরায় বেঁধাল রানা, এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল সেখান দিয়ে। কেঁপে উঠল ডেমিয়েন। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'বলছি... বলছি আমি সব। ড্রাগ-অ্যাডিকশনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়া। ড. সিদ্দিকী আসলে মিলিটারির হয়ে কাজ করত...'

'সেটা আমিও জানি,' বলল রানা। 'আমি বিশদ তথ্য চাই।'

'ওটা একটা গোপন ডিপার্টমেণ্ট... স্পেশাল-ওয়েপন ডেভেলপমেণ্টের কাজ করে।' জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো ডেমিয়েন। 'আ... আমার কাশি আসছে।'

'চেপে রাখো, কাশলে কিন্তু সুঁইটা পুরো ঢুকে যাবে। আগে কথা শেষ করো। কাদের ডিপার্টমেণ্ট ওটা?'

'ডিফেন্সের-ই। কিন্তু কাগজে-কলমে কোথাও অস্তিত্ব পাবেন না।' ভয়ের চোটে সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে দুর্বৃত্ত-নেতা। *তুমি* থেকে *আপনি*-তে চলে গেছে রানার সম্মান। 'ওটা ওদের সাব-সেকশনেরও সাব-সেকশন। স্বাধীনভাবে কাজ করে, প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত জবাবদিহি করে না। পেণ্টাগনের হাতে-গোনা কয়েকজন শুধু জানে ওটার কথা।'

ছায়া-সংগঠন, বুঝতে পারছে রানা। এ-ধরনের বহু সংগঠন রয়েছে আমেরিকান সরকারের। এরাই পঞ্চাশের দশকে ওয়াশিংটনে এলএসডি এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়েছিল, সত্তরের দশকে ইউটা-তে করেছিল নার্ভ-গ্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ও জিজ্ঞেস করল, 'ড. সিদ্দিকীর কথা বলো, ওখানে কী নিয়ে গবেষণা

করছিল সে?’

‘ভয়...’ কাঁপতে কাঁপতে বলল ডেমিয়েন। ‘মানুষের ভয় নিয়ে গবেষণা করছিল সিদ্দিকী।’

নয়

অবিশ্বাস্য কথাটা কয়েক মুহূর্ত ভাসল বাতাসে, রানা অর্থটা ঠিকমত অনুধাবন করতে পারল না। যেন নিশ্চিত হবার জন্যই আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কী বললে? ভয়?’

‘ঠিকই শুনেছেন,’ ডেমিয়েন বলল। ‘ড. সিদ্দিকীর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ভয়... আতঙ্ক।’

আচমকা কথাটা মাথায় ঢুকল রানার। হাতের তালু ঘেমে গেল ওর, ভয়াবহ একটা আশঙ্কা গ্রাস করতে চাইছে অন্তরাত্মাকে। ডেমিয়েনকে বলল, ‘ব্যাখ্যা করো।’

‘বায়ো-কেমিক্যাল একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চালাচ্ছিল ড. সিদ্দিকী। উদ্দেশ্য—যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন-বাহিনীর প্রতিপক্ষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা... কৃত্রিমভাবে। ওফ্, আমার ঘাড়! আপনি সুঁইয়ে চাপ দিচ্ছেন!’

‘শুধু তো চাপ দিচ্ছি, কথা থামালে পুরো কফিটাই পুশ করে দেব। গান গাইতে থাকো!’

‘হ্যাঁ... হ্যাঁ... বলছি। একটা সিনথেটিক হরমোন আবিষ্কার করেছে ড. সিদ্দিকী—ওটা শরীরের সংস্পর্শে এলে এত বেশি পরিমাণে অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ ঘটায় যে, আতঙ্কে পাগল হয়ে

যায় মানুষ... তাৎক্ষণিকভাবে।'

নিউ জার্সির হাইড-আউটে হামলাকারীরা কীভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ল রানার। আতঙ্কে মাথাই যেন কাজ করছিল না লোকগুলোর। নিশ্চয়ই ওই হরমোন দিয়ে ওদেরকে কাবু করেছে সিদ্দিকী। কিন্তু হরমোনটা কীভাবে ছড়াল সে? দেখা গেল না কেন? ডেমিয়েনের পরের কথায় জবাব পাওয়া গেল প্রশ্নটার।

'আবিষ্কারটায় খুব খুশি হয় সিদ্দিকীর কন্ট্রোলাররা। কিন্তু সমস্যা হলো, হরমোন জিনিসটা ইনজেক্ট করা ছাড়া কাজ করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে তো আর শত্রুপক্ষের সবার গায়ে ইনজেকশন দেয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যারও সমাধান বের করে সিদ্দিকী, ওটাকে বায়বীয় করে ফেলতে সমর্থ হয়। মানে, হরমোনটা হয়ে যায় এক ধরনের গ্যাস। ব্যস, এবার ওটাকে শুধু ক্যানিস্টারে ভরে বোমার মত ফাটিয়ে দিলেই হলো। চোখের পলকে শত্রুরা আতঙ্কে কুঁকড়ে যাবে, অকেজো হয়ে যাবে—আবিষ্কারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

আড়চোখে সোহানার দিকে তাকাল রানা। ওর অস্বাভাবিক ভীতির কারণটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। অন্তরার বাড়ির বেজমেন্টে সিদ্দিকী একটা গ্যাস-সিলিণ্ডার ফাটিয়েছিল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই শ্বাস টেনে গ্যাসটা শরীরের ভিতর নিয়েছিল সোহানা। তার পর থেকেই বিপদের মুখোমুখি হলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বেচারি, অ্যাড্রেনালিনের বাড়তি নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এই আশঙ্কাটা একবার খেলেছিল ওর মনে।

'আবিষ্কারের পর আসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা,' বলে চলেছে ডেমিয়েন। 'প্রথমে ছোট-খাট জীবজন্তুর উপর গ্যাসটা প্রয়োগ করল সিদ্দিকী। ইঁদুর পাগলামি শুরু করল, কুকুর-বেড়াল পরস্পরের ভয়ে গুটি-সুটি মেরে খাঁচার কোণায় পড়ে থাকল; এক পাল ভেড়ার উপর গ্যাসটা দিতেই ওগুলো দৌড়াদৌড়ি শুরু

করল, দেয়ালে মাথা ঠুকে মারা গেল কয়েকটা। সোজা কথায়, অ্যানিমেল টেস্টিঙে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হলো গ্যাসটা।' একটু থামল ডেমিয়েন। অনুনয়ের সুরে বলল, 'সিরিঞ্জটা একটু সরাবেন? আমি তো সবই বলছি।'

'কথা শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে। থেমো না, এরপর কী ঘটল?'

'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরবর্তী ধাপ—হিউম্যান টেস্টিং,' সিরিঞ্জটার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে বলল ডেমিয়েন। 'রাস্তাঘাটে চলতে থাকা গ্যাং-ভায়োলেন্স দমনে ব্যবহার করা হলো গ্যাসটা। দেখা গেল, ছোট্ট একটা ক্যানিস্টার ফাটালেই খেপে ওঠা মব্ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু যে-ফাটাচ্ছে, সে নিজেও আক্রান্ত হচ্ছে না? সেটা ঠেকানো হচ্ছে কীভাবে?'

'একটা নিউট্রালাইজার আছে, ড. সিদ্দিকী ওটাও আবিষ্কার করেছে। নিউট্রালাইজার নিলে ফিয়ার-গ্যাস আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না,' ব্যাখ্যা করল ডেমিয়েন। তারপর আবার খেই ধরল আগের কথার। 'এনিওয়ে, ছোট পরীক্ষাগুলো সফল হওয়ায় এরপর বড় একটা পরীক্ষা করা হলো। কিছুদিন আগে মিসৌরির সেইন্ট লুইয়ে বিশাল এক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, শুনেছেন হয়তো। ওটা ট্যাকেল করা হয় ফিয়ার-গ্যাসের মাধ্যমে।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল এরিক।

'বিশেষ একদল দাঙ্গা-পুলিশ গিয়েছিল ওখানে, খবরে দেখেছেন হয়তো। ওদের টিয়ার-গ্যাসের সঙ্গে গোপনে মিশিয়ে দেয়া হয় ফিয়ার-গ্যাস। নিউট্রালাইজার দেয়া হয় ব্রিদিং অ্যাপারেটাসে। তারপর নামানো হয় দাঙ্গা দমনে। এরপর কী ঘটেছে, নিশ্চয়ই টিভিতে দেখেছেন? হাজার হাজার মানুষ... মাত্র

দেড়শো দাঙ্গা-পুলিশের সামনে টিকতেই পারেনি। ভয়ে-আতঙ্কে আধমরা হয়ে যায় সবাই, পালিয়ে যায় মিছিল-টিছিল বাদ দিয়ে।'

'অমন ভয়ানক একটা গ্যাস ব্যবহার করা হলো, অথচ মাস-প্যানিক দেখা দেয়নি কেন?'

'লো-গ্রেডের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল,' বলল ডেমিয়েন। 'বিক্ষুব্ধ জনতা যদি ভয়ের চোটে মরতে শুরু করত, তা হলে বিরাট কেলেঙ্কারি বেধে যেত। তাই ঝুঁকি নেয়নি ওরা। তবে কেলেঙ্কারি শেষ পর্যন্ত হয়েই গেছে, সেটাই পুরো ব্যাপারটাকে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।'

'হেঁয়ালি কোরো না,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'পরিষ্কার করে বলো সব।'

'বলছি,' ডেমিয়েন আবার ঠোঁট ভেজালো। 'সেইন্ট লুইয়ে লো-গ্রেড গ্যাস ব্যবহার সত্ত্বেও সাফল্য পাওয়ায় আনন্দে আটখানা হয়ে গেল ড. সিদ্দিকীর কণ্ট্রোলাররা। অফিশিয়ালি আবিষ্কারটার রিপোর্ট সরকারের কাছে দেবার আগে শেষ একটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা... সৈনিকদের উপরে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ নয়, অভিজ্ঞ সৈন্যরাই থাকবে—যারা প্রেশার বা ভয়ের কারণে নতি স্বীকার করে না, লড়াই চালিয়ে যায়। ব্যাটলফিল্ডে গ্যাসের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য তাই বেছে নেয়া হলো আর্মি রেঞ্জারদের একটা ইউনিটকে। গোটা মার্কিন সামরিক বাহিনীতে এরাই সবচেয়ে দক্ষ সৈনিক, জানেন হয়তো। ভয়কে দমন করবার জন্য বিশেষ ট্রেইনিং দেয়া হয় এদেরকে। তাই এরাই পারফেক্ট গিনিপিগ হয়ে গেল।

'ফ্লোরিডার জলাভূমিতে ওদের ট্রেইনিং এক্সারসাইজ চলাকালে ছড়িয়ে দেয়া হলো গ্যাসটা। ফলাফলটা হলো ভয়াবহ। আতঙ্কে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল লোকগুলো, এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে পরস্পরকে খুন করে ফেলল... একজনও বাঁচল না। কাছাকাছি

দ্বিতীয় একটা দল ছিল, ওদের রাখা হয়েছিল নিউট্রালাইজার-সহ, যাতে প্রাথমিক রিঅ্যাকশন শেষে অসুস্থ ইউনিটকে উদ্ধার করে আনতে পারে... কিন্তু ওরা কোনও সুযোগই পেল না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেদের খুন করে ফেলেছিল প্রথম দলের সৈনিকরা।

'এই ঘটনার পর পাল্টে গেল পুরো দৃশ্যপট। পুরো একটা রেঞ্জার ইউনিট এভাবে খুন হয়ে যাওয়া তো আর যা-তা কথা নয়, কোনোভাবেই এতগুলো মানুষের মৃত্যুকে জাস্টিফাই করা সম্ভব নয়। পেন্টাগনের উঁচু সারির কিছু কর্তা... যাঁরা প্রজেক্টটা সম্পর্কে জানতেন না, তাঁরা হৈচৈ বাধিয়ে দিলেন—পুরো ঘটনার সঠিক তদন্ত, এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বসলেন। সরকার থেকেও সমর্থন দেয়া হলো তাঁদের। এরপরও হয়তো প্রজেক্টের কন্ট্রোলাররা পিছু হটত না, কিন্তু সমস্যা হলো—ফ্লোরিডার এক্সপেরিমেন্টে ফিয়ার-গ্যাসের একটা খুব মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কৃত হওয়ায়। জিনিসটা অস্ত্রধারী মানুষকে হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক বানিয়ে ফেলতে পারে। অর্থটা হলো, যদি কোনোভাবে... এমনকী অ্যাকসিডেন্টালি-ও মিত্রপক্ষের একজন মানুষ ওতে আক্রান্ত হয়, তা হলে সে পুরো বাহিনীর জন্যই বিপদ ডেকে আনবে। বোঝা গেল, এ-ব্যাপারে আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সুযোগ নেই। পেন্টাগন আর সরকারি বিভিন্ন মহল থেকে রেঞ্জারদের মৃত্যুর কারণ জানবার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পিঠ বাঁচাবার জন্য সবচেয়ে সহজ পথটা বেছে নিল কন্ট্রোলাররা, ঠিক করল—পুরো প্রজেক্টটাকে ধামাচাপা দেবে।'

'আর ড. সিদ্দিকী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখ বিকৃত করল ডেমিয়েন। 'আমেরিকানরা কীভাবে ধামাচাপা দেয়, জানেন না? সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস করে—হোক সেটা

জড় বস্তু, কিংবা জলজ্যান্ত মানুষ!'

'ড. সিদ্দিকীকে খুন করতে যাচ্ছিল ওরা?' রানার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। 'সেটা কীভাবে হয়? ওঁর মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তো মিলিটারির জন্য বিশাল একটা অ্যাসেট!'

'পিঠ বাঁচানোর সময় অ্যাসেট-ফ্যাসেট নিয়ে মাথা ঘামায় না আমেরিকানরা,' বলল ডেমিয়েন। 'আফটার অল, পুরো প্রজেক্টটার মূল চাবিকাঠিই ছিল সে, কাজেই ওকে তো বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেলেছিল ওরা। সিদ্দিকীর মত মানুষ বোকা নয়, রেঞ্জারদের মৃত্যু নিয়ে জল ঘোলা হতে দেখেই এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আন্দাজ করে ফেলেছিল। তখনই একটা বিকল্প প্ল্যান আঁটে সে।

'ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে আমাদের চর ছিল, তাকে কীভাবে যেন ডিটেক্ট করে ফেলে লোকটা, গোপনে যোগাযোগ করে। একটা প্রস্তাব দেয় সে—ফিয়ার-গ্যাসের ফর্মুলা বিক্রি করবে আমাদের কাছে, বিনিময়ে বাঁচাতে হবে তাকে। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবটায় রাজি হই আমরা, সুইস ব্যাঙ্কে লোকটার চাহিদা মোতাবেক টাকা জমা করি, তারপর একটা অপারেশন চালাই ওকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা করে। লড়াইয়ে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন ফিয়ার-গ্যাস ছড়িয়ে দেয় সে, দুই পক্ষকে পাগল করে দিয়ে ফাঁকতালে কেটে পড়ে...'

'হুম, ব্যাটা দেখছি জাত-মীরজাফর!' মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু পালাল কেন সে?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল এরিক। 'টাকা পেয়েছে, এরা ওকে উদ্ধারও করতে গিয়েছিল, তারপরও বেঈমানী করল কেন?'

'কারণ, লোকটা বুঝতে পেরেছে তার আবিষ্কারের মূল্য কতখানি,' এতক্ষণে ড. সিদ্দিকীর সাইকোলজি বুঝতে শুরু

করেছে রানা। ‘এরা ওকে উদ্ধার করত ঠিকই, কিন্তু ফর্মুলাটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে খুনও করে ফেলত; যাতে ওটা আর কেউ না পায়। গোটা ব্যাপারটা ওর চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যেতেই পাশার ছক পাল্টে ফেলেছে সে, ঠিক করেছে: আবিষ্কারটা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে। সিদ্দিকী উধাও হয়ে যেতে চায়, এরিক। অদৃশ্য হয়ে ফর্মুলাটা বিভিন্ন পার্টির কাছে বিক্রি করতে চায়। বিনিময়ে অজস্র টাকা আর অপরিসীম ক্ষমতার মালিক হয়ে যাবে সে—দ্যাটস্ হিজ আলটিমেট গোল।’

‘সিদ্দিকীর কন্ট্রোলাররাও জানে সেটা,’ ডেমিয়েন যোগ করল। ‘সেজন্যেই ওকে খুন করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে। আমাদেরকেও তাই মরিয়া হতে হয়েছে... যেভাবে হোক, আমেরিকানদের আগে ওকে হাতে পেতে হবে। এজেন্ট স্টার্ন এফবিআই-য়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও পিছিয়ে আসা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে...’

‘কারা তোমরা?’

‘ওটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই,’ গলায় দৃঢ়তা ফোটাল ডেমিয়েন। ‘এতক্ষণ এত কথা বলেছি, তার ফলে কারও কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। তারমানে এই নয় যে, নিজেদের সংগঠনের পরিচয়ও বলে দেব। আমি একজন আদর্শবাদী লোক, দরকার হলে মরব, তা-ও আদর্শের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না...’

‘কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তুমি একজন টেরোরিস্ট!’ রানা বিদ্রূপ করল।

‘যা খুশি ভাবতে পারেন, কিন্তু আমাদের সত্যিকার পরিচয় আপনি কোনোদিনই জানতে পারবেন না।’

‘তোমার মত মাথামোটাদের পরিচয় জানার কোনও আগ্রহ বোধ করছি না,’ সিরিঞ্জ সরিয়ে টান দিয়ে ডেমিয়েনকে দাঁড় করাল রানা। ‘তারচেয়ে বরং কচলে তোমার রস বের করবার জন্য বেশি

আগ্রহী আমি। কিছুটা তো বের হয়েইছে, বাকিটা বের করব জায়গামত নিয়ে।'

'জায়গামত! কোথায়?' বোকা বোকা কণ্ঠে প্রশ্ন করল টেরোরিস্ট।

'এখুনি দেখতে পাবে,' এরিকের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি এবার অফিসে খবর দিতে পারো।' ডেমিয়েনের তিন সঙ্গীকে দেখাল ও। 'ওদেরকে অ্যারেস্ট করো, কিন্তু পালের গোদাটাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথাও যাব না আমি!' প্রতিবাদ করল ডেমিয়েন। করুণ দৃষ্টিতে তাকাল এরিকের দিকে। 'রাজি হবেন না, প্লিজ! আপনার এই বন্ধু পাগল, আমাকে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলবে।'

একটু গম্ভীর হলো এরিক, তারপর ফিরল রানার দিকে। 'আপনার সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' বলে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'এদেরকে কাভার দাও।'

এরিকের পিছু পিছু বেডরুমে গেল ও।

দরজা ভেজিয়ে এফবিআই এজেন্ট বলল, 'আপনার মতলবটা কী, জানতে পারি?'

'লোকটাকে আমার দরকার। সিদ্দিকীর ল্যাব চেনে ও, ওখানে গেলে শয়তান বিজ্ঞানীটার ব্যাপারে কোনও না কোনও ক্লু পাব বলে মনে হচ্ছে।'

'তা হয় না, মি. রানা। ডেমিয়েন এখন এফবিআই-য়ের বন্দি, ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

'বন্দি! আমি তো হ্যাণ্ডকাফ পরাতে দেখলাম না।' হালকা গলায় বলল রানা।

'আমাকে দশ সেকেণ্ড সময় দিলেই ওটা দেখিয়ে দিতে পারি,' এরিক ঠাট্টা করছে না।

'সময়টা দু'ঘণ্টা হলে কেমন হয়?'

'মানে?' এরিক ভুরু কোঁচকাল।

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো ব্যাপারটা,' রানা বলল। 'তোমাদের কাস্টডিতে চলে গেলে আইনমাফিক কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে শুরু করবে ব্যাটা। তখন আর কোনও চাপ অনুভব করবে না, কাজেই মুখেও খিল আঁটবে।'

'একজন এফবিআই এজেন্টকে কিডন্যাপ করেছে ও—ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ। কেউ কোনও দয়া দেখাবে না। ওর পেট থেকে সমস্ত কথা বের করে ছাড়ব আমরা।'

'তোমাদের সমস্ত ইন্টারোগেশন টেকনিক সম্পর্কে জানা আছে আমার, এরিক। কাজ হয় না তা বলব না, তবে প্রচুর সময় লাগে। অত দেরি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, গন্ধ মিলিয়ে যাবার আগেই সিদ্দিকীর ট্রেইল খুঁজে পেতে হবে আমাকে। তার জন্য এ-মুহূর্তে ডেমিয়েনই আমার একমাত্র সম্বল। আই নিড হিম।'

'দুঃখিত, মি. রানা। আমি নিরুপায়। ওর মত একটা টেরোরিস্টকে যেতে দিলে আমি বিপদে পড়ব।'

'আমিও নিরুপায়, এরিক। তুমি রাজি না হলে আমাকে জোর খাটাতে হবে।'

'আপনি এত খেপেছেন কেন, বলুন তো?' বিরক্ত গলায় বলল এরিক। 'ড. সিদ্দিকীর খোঁজই তো দরকার, তাই না? আমাকে হ্যাণ্ডেল করতে দিন ব্যাপারটা, লোকটার লোকেশন বের করে আমি খবর দেব আপনাকে।'

'তা হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। 'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। পরিস্থিতি খুব গুরুতর; যত দ্রুত সম্ভব, বিজ্ঞানীটাকে খুঁজে পেতে হবে আমাকে।'

'গুরুতর পরিস্থিতি মানে? কী হয়েছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'সোহানা... ওকে অন্তরার বাড়িতে ফিয়ার-গ্যাসের একটা ডোজ দিয়েছে সিদ্দিকী। দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে জানি না, কিন্তু ভয়ানক কিছু ঘটবার আগে শুধু সিদ্দিকীকে নয়, সিদ্দিকীর ওই নিউট্রালাইজারটাও পেতে হবে আমাকে।'

'হায় যিশু!' প্রায় হাহাকার করে উঠল এরিক। 'আ... আমার জানা ছিল না, মি. রানা। সত্যি আমি দুঃখিত... ডেমিয়েনকে নিতে চাইছেন তো? নিন, এখুনি নিয়ে যান। এদিকটা নিয়ে ভাববেন না, আমি সামলে নেব যেভাবে পারি।'

'নিজের ঘাড়ে দোষ নেবার দরকার নেই,' রানা বলল। 'দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করো, আমাকে একটু লিড-টাইম দাও, তারপর অফিসে বলে দিয়ো, আমি এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছি ওকে তোমার কাছ থেকে...'

'আহ্, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না আপনাকে,' বাধা দিয়ে বলল এরিক। 'আমি আছি না! আপনি যান এখুনি।'

দরজার কাছে গিয়ে থামল রানা, উল্টো ঘুরল। 'থ্যাঙ্ক ইউ, এরিক। তুমি আসলেই একজন খাঁটি লোক, এবং... খাঁটি বন্ধু। আমাকে আবারও ঋণী করে ফেললে...'

'থামুন তো!' কপট রাগ দেখাল এরিক। 'এমনি এমনি সাহায্য করছি ভাবছেন? আপনাকে ঋণী করতে পারলে লাভ আছে, বিপদে-আপদে খুব কাজে দেয়!'

হাসল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিভিংরুমে। উদাত্ত গলায় বলল, 'চলো ডেমিয়েন, আমরা একটু সাইট-সিয়িঙে বেরুব। দর্শনীয় একটা জায়গায় তুমি নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

'ওহ্ গড!' গুঙিয়ে উঠল টেরোরিস্ট।

দশ

টরাসের সামনে, সোহানার পাশে প্যাসেঞ্জারস্ সিটে বসানো হয়েছে ডেমিয়েনকে। রানা বসেছে ঠিক তার পিছনে—কোলের উপর, একটা খবরের কাগজের তলায় রেখেছে সিগ-সাওয়ারটা। বন্দি লোকটা চালাকি করতে গেলেই গুলি করবে। বেইলি'জ রিজে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে টেরোরিস্ট। জানিয়েছে, ফাঁদের টোপটা একেবারে ভুয়া ছিল না; ড. আন্দালিব সিদ্দিকীর গবেষণাগারটা আসলেই ওখানে।

বিকেল চারটে বাজে। ওয়াশিংটন ছেড়ে একশ' মাইল পশ্চিমে এসে পড়েছে ওরা। সামনে ভার্জিনিয়া সীমান্তের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রকৃতি। ছোট-খাট বেশ কিছু পাহাড় আছে, জনবসতি কম, শহর-টহর তো নেই বললেই চলে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোবার সময় মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ফার্মহাউস, পুকুর, আবাদী জমি, আর পশুচারণ ক্ষেত্র। এলাকাটা কৃষিপ্রধান।

একে এলাকায় মানুষজন কম, তারওপর পড়ন্ত বেলা... রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। যাত্রাটা একঘেয়েভাবে কাটছে। গাড়ি বড় একটা ঢাল পেরিয়ে আসতেই ঘড়ি দেখল রানা, তারপর ডেমিয়েনকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতদূর?'

'এই তো, পাঁচ মিনিটের পথ। একটু পরেই পৌঁছে যাব।'

'সকালে যে-দুজনকে রেখে গেছ, ওরা আবার অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে নেই তো?'

'কী যে বলেন!' আহত কণ্ঠে বলল ডেমিয়েন। 'আপনার সামনেই না ফোন করে ওদেরকে চলে যেতে বললাম। সঙ্কেতও দিইনি। ওদেরকে বসিয়ে রেখে খামোকা গুলি খাব নাকি?'

রাস্তার পাশে লাগানো একটা সাইনবোর্ড পেরুল টরাস। ওটায় বেইলি'জ রিজের নাম লেখা। সোহানা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'শহরটা কোথায়? বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না।'

'বেইলি'জ রিজ কোনও শহর নয়,' উত্তর দিল ডেমিয়েন।

'তা হলে?'

'ঐতিহাসিক একটা সাইট, ওখানে আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় একটা বিখ্যাত লড়াই হয়েছিল।'

একটু পরেই পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঁচু একটা জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা, নীচে সমতল উপত্যকা চোখে পড়ছে। সামনেই রয়েছে হিস্টোরিকাল সোসাইটির লাগানো একটা বিশাল বিলবোর্ড। ওটার পাশে গাড়ি থামাল সোহানা।

বিলবোর্ডে ম্যাপ রয়েছে, তাতে লাল-নীল বিন্দু আর তীরচিহ্ন দিয়ে কনফেডারেট ও ইউনিয়ন সোলজারদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তলার বসানো হিস্টোরিকাল নোট পড়ে জানা গেল, দু'পক্ষের তুমুল লড়াইয়ে এখানকার একটা খামার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল—ওটার মালিক ছিল স্যামুয়েল বেইলি নামে এক আইরিশ ইমিগ্র্যান্ট। অতর্কিত হামলায় বেচারার স্ত্রী-কন্যা মারা যায়। এতে খেপে যায় লোকটা, নিহত এক ইউনিয়ন সোলজারের ইউনিফর্ম আর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। হারের মুখে পড়া ইউনিয়ন বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় সে, খামারের পার্শ্ববর্তী পাহাড়সারির মাঝ দিয়ে কৌশলে একটা আক্রমণ হেনে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ফেলে। সেই স্মৃতির সম্মানে জায়গাটার নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। বেইলি অবশ্য ওসব দেখে যেতে পারেনি, ক্যাপ্টেন হিসেবে ইউনিয়নে কমিশন দেয়া

হয়েছিল তাকে। একটার পর একটা যুদ্ধ করে গেছে, শেষে মারা গেছে ডিপথেরিয়ায়। নিজের খামার বা স্ত্রী-কন্যার কবরের কাছে ফিরে আসা হয়নি আর কোনোদিন।

করুণ কাহিনি, মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষকে কীভাবে বদলে ফেলে, কীভাবে প্রিয়জনকে কেড়ে নেয়—তার জলজ্যান্ত নমুনা বেইলির গল্পটা। নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তারপর ডেমিয়েনকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোন্‌দিকে?'

'এসে গেছি,' বলল টেরোরিস্ট। 'একটু সামনে এগোলেই কতগুলো চওড়া ফাটল দেখতে পাবেন... রাস্তার মত... নীচের উপত্যকায় নামা যায়। দ্বিতীয়টা দিয়ে নামতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি সামনে বাড়াল সোহানা। প্রথম ফাটলের পাশে পৌঁছুতেই রানা নির্দেশ দিল, 'মোড় নাও।'

'এটা না,' তাড়াতাড়ি বলল ডেমিয়েন। 'পরেরটা।'

'আমরা এটা দিয়েই নামব,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল ডেমিয়েন। কারণটা বুঝতে পারছে—ওকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করছে না রানা। ধরেই নিচ্ছে, দ্বিতীয় ফাটলটায় ফাঁদ পাতা আছে। সেজন্য ওপথে যাচ্ছে না।

ফাটলের মুখে গাড়ি দাঁড় করাল সোহানা, নেমে গিয়ে দেখল সামনেটা। বড় একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে রয়েছে ফাটলের মুখটা, ভাল করে তাকাতেই ওখানে একটা নিচু কাঠের গেট চোখে পড়ল। পুরনো, কালের প্রবাহে বিবর্ণ হয়ে গেছে পেইন্ট। কোনও তালা চোখে পড়ল না, শুধু একটা বড় ছিটকিনি দিয়ে আটকানো হয়েছে গেট। ওটা খুলে ফেলল সোহানা, ধাক্কা দিয়ে পাল্লা সরাল। ওপাশে নানা রকম আগাছায় ছাওয়া গিরিসঙ্কট—পথটা অব্যবহৃত।

'আগে সাইটে নামবার জন্য ভাল রাস্তা ছিল না,' ডেমিয়েন

ব্যাখ্যা করল। 'সবগুলো ফাটল দিয়ে ওঠানামা করত লোকে। কিছুদিন আগে দ্বিতীয় ফাটলটার ভিতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে—ওটাই সবচেয়ে চওড়া ফাটল। গাড়ি নিয়ে যেতে সুবিধা, তাই বলছিলাম ওখান দিয়ে যাবার কথা।'

'হুম,' রানা বলল। 'গতকাল নিশ্চয়ই ওটার মুখেই আমাদের জন্য ফাঁদ পেতেছিলে?'

'কী! ইয়ে... হ্যাঁ...' মুখ কালো হয়ে গেল ডেমিয়েনের।

'নাইস ট্রাই, ডেমিয়েন!' ইচ্ছে করেই পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অন-অফ করল রানা।

'না, না!' আঁতকে উঠল টেরোরিস্ট। 'বিশ্বাস করুন, আমার কোনও বদমতলব নেই। ওখানে তো আমার লোকেরা এখন নেই! ওরা চলে গেছে!'

'না-ও তো গিয়ে থাকতে পারে। একটা চান্স নিয়ে দেখতে চেয়েছ, তাই না?'

'না, না...'

'চুপ!' চাপা স্বরে ধমক দিল রানা। 'আর কোনও কৈফিয়ত শুনতে চাই না। যথাসময়ে এই চালাকির জন্য শাস্তি পাবে তুমি।'

কথাটা শুনে কুঁকড়ে গেল ডেমিয়েন।

সোহানা ফিরে এসেছে। ড্রাইভিং সিটে বসে বলল, 'সামনেটা ক্লিয়ার মনে হচ্ছে। এগোব?'

'এগোও,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'তবে বেশিদূর না। একটু ভিতরে গিয়েই পার্ক করো। আমরা হেঁটে নামব।'

সরু গিরিসঙ্কটের এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে নামতে শুরু করল টরাস—আগাছার দঙ্গল পিষ্ট করে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক পর ব্রেক কষল সোহানা, বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে পড়েছে গিরিসঙ্কটের; রাস্তা এবং নীচের উপত্যকা—দুটোরই দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

'ঠিক আছে?' জানতে চাইল ও।

'একদম পারফেক্ট,' মাথা ঝাঁকাল রানা। সিগ-সাওয়ার দিয়ে খোঁচা দিল বন্দির পিঠে। 'নামো।'

ডেমিয়েনকে সামনে রেখে পিছু পিছু নামতে শুরু করল রানা-সোহানা। ঢালু পথ ধরে কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল গিরিসঙ্কট থেকে, উপত্যকার মেঝেতে। খুব একটা বড় নয় উপত্যকাটা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সবদিক আধ-মাইলের মত হবে। চারপাশের পাহাড়শ্রেণীর গোড়া উঁচু উঁচু গাছ আর গোড়ালি-সমান ঘাসে ছাওয়া, এ-ছাড়া মাঝখানের পুরো জায়গাই রুক্ষ-অনুর্বর। এক মুঠো সবুজ নেই কোথাও। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বটে, এমন খটখটে জমি কখনও খামার করবার জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। কে জানে, হয়তো বা স্যামুয়েল বেইলির আমলে সুজলা-সুফলা ছিল এই জমি, অনাদরে এ-দশা হয়েছে আজ। এখন অবশ্য জায়গাটা দেখে ওসব ভাবা কঠিন। অতীতের চিহ্ন বহন করে একটা ভাঙাচোরা ফার্মহাউস শুধু দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানটায়—প্রেতাত্মার মত। দেয়াল পুড়ে কালো হয়ে আছে—এ কি সেই গৃহযুদ্ধের নিদর্শন, নাকি পরের কোনও অগ্নিকাণ্ড, তা বলা মুশকিল।

গাছের ছায়ায় একসারি পিকনিক বেঞ্চ দেখতে পেল ওরা, সেই সঙ্গে একটা সাইনবোর্ড: *ওয়েলকাম টু বেইলি'জ রিজ।* ঐতিহাসিক গুরুত্বের স্বীকৃতি বলতে এটুকুই। পাহাড়ের উপরে বিলবোর্ড, আর এখানে এই সাইনবোর্ড ও দর্শনার্থীদের বসবার জন্য বেঞ্চ। চরম সরকারি অবহেলার দৃষ্টান্ত। রানা অবশ্য ওসব নিয়ে ভাবছে না, ওর দৃষ্টি পিকনিক-বেঞ্চগুলোর দিকে। সিগারেটের পোড়া অবশিষ্টাংশ আর ফেলে দেয়া চকচকে ড্রিঙ্কসের ক্যান দেখতে পাচ্ছে পাশে। ডেমিয়েনের লোকেরা ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল ওর জন্য, এখন অবশ্য তাদের চিহ্নও দেখা

যাচ্ছে না। হয়তো সত্যি চলে গেছে।

'ল্যাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'আমি তো স্রেফ একটা পোড়া ফার্মহাউস ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওখানেই... মাটির নীচে,' জানাল ডেমিয়েন। 'গোপন গবেষণা কখনও সবাইকে দেখিয়ে-শুনিয়ে হয় না।'

'এগোও,' নির্দেশ দিল রানা।

ঘাসে ঢাকা অংশটা পেরিয়ে ফার্মহাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করল ডেমিয়েন, সোহানা-সহ তাকে অনুসরণ করল ও। সিগ-সাওয়ারটা এখন কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে, ওখান থেকেই তাক করে রেখেছে বন্দির দিকে—শয়তানির সুযোগ দিতে চায় না। কেন যেন একটা অস্বস্তি ভর করেছে উপত্যকায় নামার সঙ্গে সঙ্গে।

'গোপন ল্যাবরেটরি বসানোর জন্য এমন একটা ঐতিহাসিক সাইট খুব অদ্ভুত জায়গা না?' বলল সোহানা। 'দর্শনার্থীর আনা-গোনা থাকে এসব জায়গায়, গোমর ফাঁস হয়ে যাবার ভয় থাকে।'

'এত কাঁচা কাজ করেনি ওরা,' বলল ডেমিয়েন। 'ভালমত দেখে-শুনেই বেছেছে জায়গাটা। ওয়াশিংটনের কাছাকাছি এমন নির্জন জায়গা আর কোথাও পাবেন না। তা ছাড়া নামেই এটা পুরাকীর্তি, দর্শক-টর্শক খুব একটা আসে না। অল্প-স্বল্প যা আসত, তা-ও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রিনোভেশনের অজুহাত দেখিয়ে। ভাল রাস্তাটা দিয়ে এলে দেখতে পেতেন নোটিশটা।'

'সংস্কার অবশ্য আসলেই দরকার,' পোড়া ফার্মহাউসের উপর নজর রেখে মন্তব্য করল সোহানা। 'সেই কবে গৃহযুদ্ধ হয়েছে, এখনও এমন একটা পুরাকীর্তিকে পোড়া অবস্থায় ফেলে রাখা অন্যায়।'

'এটা বেইলির ফার্মহাউস ভাবছেন নাকি?' একটু হাসল

ডেমিয়েন। 'ওটা তো কবেই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে! সেই ১৮৬৪ সালে!'

'তা হলে এটা কোত্থেকে এল? ডিজাইন দেখে তো সেই তখনকারই মনে হচ্ছে।'

'যুদ্ধশেষে জায়গাটা কিনে নেয় এক ব্যবসায়ী—সরকারের কাছে যুদ্ধের সময় অস্ত্র আর গোলাবারুদ বেচে প্রচুর টাকা কামিয়েছিল লোকটা। বেইলির ফার্মহাউসের জায়গায় নতুন আরেকটা ফার্মহাউস তৈরি করে সে—আরও সুন্দর, আরও আলিশান করে। তবে বেশিদিন এখানে থাকা হয়নি তার, কুষ্ঠরোগে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে বাড়িতে ওঠার তিন বছরের মাথায়। বিপত্নীক ছিল বেচারা, ছেলে-পুলেও ছিল না। সংক্রমণের ভয়ে চাকর-বাকর সব পালিয়ে গিয়েছিল, একদম একা হয়ে গিয়েছিল সে শেষ দিনগুলোয়। ওর মৃত্যুর পর একটা কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ল বেইলির জমি ঘিরে। হাজার হোক, ওখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রোগ মিলিয়ে অনেক মানুষ মরেছে। ফলে কেউই ওই জমি কিনতে রাজি হলো না। ব্যবসায়ীর কোনও উত্তরাধিকারীও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ওটা সরকারের খাতায় চলে গেল। জায়গাটা ম্যানেজ করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি সিদ্দিকীর কণ্ট্রোলারদের।'

'তুমি দেখছি এখানকার ইতিহাস খুব ভাল করে জানো!' বিস্মিত গলায় বলল রানা।

'জব রিকোয়্যারমেন্ট,' ভাবলেশহীন গলায় বলল ডেমিয়েন। 'অ্যাসল্টে নামার আগে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে হয়—ভূগোল থেকে শুরু করে ইতিহাস পর্যন্ত।'

'অ্যাসল্ট... এখানেই হামলা করা হয়েছিল ড. সিদ্দিকীকে উদ্ধার করবার জন্যে? তুমিও ছিলে অপারেশনটাতে?'

মাথা ঝাঁকাল ডেমিয়েন। 'সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, না

দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। অপারেশনটা আসলে খুব একটা কঠিন ছিল না। ফার্মহাউসটায় থাকত সিদ্দিকী, ওকে পাহারা দিত মাত্র পাঁচজন মেরিন। লোকটাকে নিয়ে কন্ট্রোলাররা খুব একটা চিন্তিত ছিল না, আমি হলেও চিন্তা করতাম না। অমন গো-বেচারা, মোটাসোটা একটা লোককে সামলাবার জন্য পাঁচজনই অনেক। আর আমাদের দলে ছিল বিশজন, ওদেরকে এক আঘাতেই কাবু করে ফেলতাম।

'গোলমাল হয়ে গেল অ্যালার্ম বেজে ওঠায়—ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক, কারণ হামলা চালাবার আগে সব ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো করে দিয়েছিলাম আমরা। কোন্‌খান দিয়ে যে আরেকটা রয়ে গেল, সেটা টেরই পাইনি। যা হোক, অ্যালার্ম বাজতেই সতর্ক হয়ে গেল মেরিনরা, আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাতে পারলাম না। দু'পক্ষে ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। এর ভিতরই দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকলাম আমরা, আর তার ঠিক কয়েক মিনিট পরই পুরো বাড়িতে আগুন ধরে গেল। শুধু তা-ই নয়, আগুন ধরতে না ধরতে আতঙ্কে পাগল হয়ে গেল দু'পক্ষই। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, শত্রু-মিত্র বাছবিচার না করে খুন করতে শুরু করল একে-অন্যকে। আগুন বা গুলিতে যারা মরল না, তারা মরল তীব্র আতঙ্কে... হার্টফেল করে!'

'তুমি বাঁচলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সৌভাগ্যক্রমে ব্যাকআপ টিমে ছিলাম আমি, আরও চারজন-সহ। বাড়ির ভিতরে ঢুকিনি আমরা, তাই বেঁচে গেছি। কিন্তু ওখানে চলতে থাকা তাণ্ডব দেখে আসল ঘটনা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমাদের। পুরো ব্যাপারটাই সাজিয়েছে সিদ্দিকী—অ্যালার্ম বাজিয়েছে, বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে, ফিয়ার-গ্যাস ছড়িয়েছে। উদ্ধার হতে চায়নি লোকটা, পালাতে চেয়েছে। ডাইভারশন সৃষ্টি করেছে সেজন্যেই। ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা

বনে গিয়েছিলাম আমরা, ওই ফাঁকে কেটে পড়েছে বদমাশটা। ওই ঘটনার পর কন্ট্রোলাররা ওকে খুন করবার জন্য পাগল হয়ে গেছে, আমরাও চেষ্টা করছি তাকে বাগে পাবার জন্য। আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে হারামজাদা, কিন্তু ফর্মুলা দেয়নি। উল্টো আমাদের লোকজনকেই কোরবানির খাসি বানিয়েছে...'

এবার রানা বুঝতে পারছে, কেন রানা এজেন্সির সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ড. সিদ্দিকীর। আমেরিকান মিলিটারি, আর এদের মত টেরোরিস্ট গ্রুপ পিছনে লাগলে তার মত একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা স্রেফ অসম্ভব। একমাত্র নিখুঁত রিলোকেশনের মাধ্যমেই বাঁচতে পারে সে, আর সেটা নিশ্চিত করা সম্ভব রিলোকেশনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে। লোকটার প্ল্যানিং দেখলে অবাক হতে হয়, ঝোঁকের বশে কিচ্ছু করেনি সে। সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ছক সাজিয়েছে, সেটাকে কাজে পরিণত করেছে নিপুণভাবে। যতই ভাবছে, ততই মাথায় আগুন জ্বলছে রানার। সাহায্য চাইবার আগেই লোকটা ওকে আর ওর সঙ্গী-সাথীদের খুন করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল বুঝতে পেরে।

'ল্যাবটা এখনও আছে কি না, জানো?' কোনোমতে রাগ দমিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'ল্যাব আছে, তবে ল্যাবের ভিতরে কিছু নেই। আমেরিকানরা সমস্ত লাশ আর লড়াইয়ের আলামত পরিষ্কার করবার পর আমি একবার ঢুঁ মেরেছি ওখানে। ফর্মুলাটা সিদ্দিকীর কাছে। অন্যান্য যত ইকুইপমেন্ট আর কাগজপত্র ছিল, সব সরিয়ে ফেলেছে কন্ট্রোলাররা। আপনি ওখানে লোকটার ব্যাপারে কোনও ক্লু পাবেন না। আপনার বান্ধবীকেও বাঁচাবার মত কিছু নেই ওখানে।'

'থামো!' গর্জে উঠল রানা। 'কী বললে তুমি?'

ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল ডেমিয়েন, মুখে একটা কপট হাসি ফুটে রয়েছে। বলল, 'আমি বোকা নই, মিস্টার। আপনার বান্ধবীর অবস্থা দেখে ঘটনা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সিম্পটমগুলো সিরিয়াস আকার ধারণ করেনি বটে, তবে ওগুলো ফিয়ার-গ্যাসেরই উপসর্গ। আপনার জায়গায় আমি হলে ওঁর হাতে কোনও অস্ত্র দিতাম না।'

সোহানার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সিদ্দিকীর আবিষ্কারের কাহিনি শুনে ও-ও অনেক আগে বুঝতে পেরেছে সমস্যাটা, কিন্তু ব্যাপারটা খোলাখুলিভাবে সামনে না আসায় নিজেকে সামলে রেখেছিল। এখন সে-পর্দা সরে গেছে।

ওর দিকে একবার তাকাল রানা, দৃষ্টিতে অভয় দেয়ার চেষ্টা। এরপর চোখ ফেরাল বন্দির দিকে। 'ঝেড়ে কাশো, ডেমিয়েন। ফিয়ার-গ্যাসের প্রভাব এবং প্রতিষেধক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমি।'

'তা হলে ঠিক সন্দেহই করেছি?' হাসল টেরোরিস্ট। 'সরি, মিস্টার। এই গ্যাসের কোনও চিকিৎসা নেই। আপনি আপনার বান্ধবীর আশা ছেড়ে দিতে পারেন।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি না,' রানা-মাথা নাড়ল। 'গ্যাসটার কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ আছে আমার। তোমার ভাষ্যমতে ওটায় আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যায় মানুষ, খুনোখুনি শুরু করে, হার্টফেল করেও মারা যায়। কিন্তু আমার বান্ধবীর বেলায় তেমন কিছু ঘটেনি। প্রায় দু'সপ্তাহ আগে সিদ্দিকীর সঙ্গে এনকাউন্টার হয়েছে আমাদের, এখনও তো স্বাভাবিক আছে ও। হ্যাঁ, একটু ভয় পাচ্ছে, নার্ভাস বোধ করছে... এমনটা হতেই পারে।'

'দু'সপ্তাহ!' ভুরু কোঁচকাল ডেমিয়েন। 'হুম, একটু অস্বাভাবিক তো বটেই। তবে গ্যাস যদি লো-গ্রেডের হয়, সেই সঙ্গে কম

পরিমাণে টেনে থাকেন, তা হলে এমনটা হতে পারে।'

'সেইণ্ট লুইয়ের এক্সপেরিমেন্টের মত?'

'ওটা ছিল নন-লেথাল ডোজ। হরমোনের কনসেনট্রেশন রেট পয়েণ্ট ফাইভ পারসেন্টের চাইতেও কম। ওটা মানুষের শরীর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মল-মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে আতঙ্কটা হয় সাময়িক, জীবন-সংশয়ীও নয়। কিন্তু আপনাকে বা আপনার বান্ধবীকে তো এত দয়া দেখানোর কথা নয় লোকটার।'

'তা হলে লো-গ্রেড গ্যাস ব্যবহার করবে কেন?'

'ইচ্ছে করে হয়তো করেনি। আইডিয়াল ল্যাবরেটরি কণ্ডিশন না পেলে সর্বোচ্চ মাত্রার গ্যাস বানানো সম্ভব নয়, তা ছাড়া যে-সব কেমিক্যাল দিয়ে ওটা তৈরি হয়, সেগুলোর গুণগত মানেরও একটা ব্যাপার আছে। হয়তো কোয়ালিটি মেইনটেন করতে পারেনি সিদ্দিকী।'

যুক্তি আছে ডেমিয়েনের কথায়। ভেবে দেখল রানা, সেফ-সাইটে ড. সিদ্দিকীর কাছে আগে-বানানো ফিয়ার-গ্যাস ছিল না, অন্তরার বাড়িতে যাবার আগে বানিয়েছে ওটা। কেমিক্যাল কিনতে হয়েছে স্থানীয় দোকান থেকে, ল্যাবরেটরিও পায়নি বানাবার জন্য। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবেই সম্ভবত লো-গ্রেড গ্যাস বানাতে হয়েছে তাকে।

আশার আলো দেখতে পেল রানা, সোহানার দিকে তাকাল উজ্জ্বল চোখে। 'তার মানে তোমার ট্রিটমেণ্ট হতে পারে, সোহানা। আমাদের শুধু নিউট্রালাইজারটা দরকার।'

'আমার তা মনে হয় না,' ওর আশাতে পানি ঢেলে দিল ডেমিয়েন। 'নিউট্রালাইজারটা তৈরি হয়েছে গ্যাসের সংস্পর্শে যাবার আগে ব্যবহার করবার জন্য। ওটা দিয়ে যে ইনফেক্টেড মানুষকে সারানো যাবে, এমন কোনও গ্যারাণ্টি নেই।'

'তা হলে রেঞ্জার টিমটাকে কীভাবে বাঁচাত ওরা?'

'তখন গ্যাসটার ভয়ঙ্কর প্রভাব সম্পর্কে কেউ কিছু জানত না, মিস্টার। ওদেরকে বাঁচাবার আসলে কোনও উপায়ই ছিল না। শোনো, এসব আমি ভয় দেখাবার জন্য বলছি না। আমাদেরকে একটা লিখিত ব্রিফ পাঠিয়েছিল সিদ্দিকী, ওটাতে বলা আছে—লেথাল ডোজের আক্রান্ত মানুষকে বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। যত সামান্যই তার শরীরে যাক না কেন, সেটা নার্ভকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেবেই।'

'ওটাকে ধ্রুব সত্য ভাবার কোনও কারণ নেই। সিদ্দিকী তার আবিষ্কার বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল। তোমাদের আগ্রহ জাগাবার জন্য অনেক কিছুই সে বাড়িয়ে লিখতে পারে।'

'খামোকা নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছ, মিস্টার। আমার পরামর্শ হলো, এখুনি তোমার বান্ধবীকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। হয়তো ডাক্তাররা চেষ্টা করলে কিছু করতে পারবে ওর জন্যে...'

'তোমার উপদেশ চাইনি আমি,' পিস্তল নাড়ল রানা। 'পথ দেখাও। ল্যাবটা তন্ন তন্ন করে খুঁজব আমি। কণ্ট্রোলাররা হয়তো সবকিছু সরাতে পারেনি। ল্যাবের ভিতরে কোথাও নিউট্রাইলাজার বা গ্যাসের ফর্মুলা, কিংবা কোনও নমুনা লুকানো থাকতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল ডেমিয়েন। হাঁটতে শুরু করল ফার্মহাউসের দিকে। বেশি সময় লাগল না ওখানে পৌঁছুতে। বাড়িতে ঢুকল না টেরোরিস্ট, পোড়া ভবনটাকে পাশ কাটিয়ে পিছনের আঙিনায় নিয়ে গেল রানা আর সোহানাকে, ওখানে আগুনে পোড়া একটা আস্তাবল দেখা গেল।

'এটার তলাতে ল্যাব,' কংক্রিটের মেঝেতে পা ঠুকল ডেমিয়েন। 'এণ্ট্র্যান্সটা ওই যে।' আঙুল তুলে হ্যাচের মত একটা স্ল্যাব দেখাল।

চারপাশে নজর বোলাল রানা। আগুনে বাড়ির চেয়ে আস্তাবলের বেশি ক্ষতি হয়েছে—ছাদ-টাদ আর অবশিষ্ট নেই, প্রায় কয়লা হয়ে যাওয়া কাঠের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে। একটু খটকা লাগল ওর—বাড়ি আর আস্তাবলের মাঝখানে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরত্ব। একই সঙ্গে দু'জায়গায় আগুন লাগাল কীভাবে ড. সিদ্দিকী? প্রশ্নটা ডেমিয়েনকে করতেই হাসল।

'সিদ্দিকী শুধু বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে,' বলল সে। 'এটায় লাগিয়েছে কণ্ট্রোলারদের ক্লিনআপ টিম—সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস করবার জন্য। ফায়ার ডিপার্টমেণ্টকে বোঝানো হয়েছে যে, দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগে বাড়ি-আস্তাবল... সব পুড়ে গেছে।'

'হুম, ভালই গল্প ফেঁদেছে।'

'ওদের কাজে কোনও খুঁত পাবেন না...'

কথা শেষ হলো না ডেমিয়েনের, বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজের সঙ্গে আচমকা তাকে ঝাঁকি খেতে দেখল ওরা। রানা-সোহানার বিস্ফারিত চোখের সামনে খুলির একটা অংশ উড়ে গেল তার, মগজ-রক্ত ছিটকাল ফুলঝুরির মত। কাটা কলাগাছের মত কংক্রিটের উপর আছড়ে পড়ল দেহটা।

নার্ভ দুর্বল, ভয়ে চিৎকার করে উঠল সোহানা। রানাও থমকে গেল, তবে সেটা সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য। স্বভাবজাত রিফ্লেক্সের বশে নড়ে উঠল ও, পরমুহূর্তেই সোহানাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁপ দিল মেঝেতে। তখুনি পিছনে আবার গুলির শব্দ হলো, ওদের শরীর থেকে মাত্র এক হাত দূরে ধুলো ওড়াল ব্যর্থ বুলেট।

সোহানাকে নিয়ে ক্রল করে এগোতে শুরু করল রানা, কাভার পেতে হবে। তবে সেটা আদৌ সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। অগ্নিদগ্ধ আস্তাবলের ভিতরে নিরেট আড়াল বলতে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

আবার গুলি হলো, ওদের মাথার মাত্র দু'ফুট দূরে কংক্রিটে আঘাত করল বুলেট। রানা বুঝতে পারল, লুকাবার চেষ্টা করে

লাভ নেই, পাল্টা আঘাতই একমাত্র উপায়। হামাগুড়ি বন্ধ করে চিত হলো ও, কোমর থেকে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ একটু উঁচু করল, অদৃশ্য আততায়ীর পজিশন বুঝতে চায়। কিন্তু যা দেখল, সেটা পাথরের মত স্থবির করে ফেলল ওকে।

পোড়া ফার্মহাউসটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কয়লা হয়ে যাওয়া তক্তা ঘষা খাচ্ছে, নড়ছে, সরে যাচ্ছে নিজ নিজ জায়গা থেকে। সরে যাচ্ছে ভস্মীভূত সমস্ত জঞ্জাল—ছাই, ধুলোবালি আর ময়লার আড়াল থেকে উদয় হচ্ছে একটার পর একটা মনুষ্য-আকৃতি। সবার পরনে অ্যাসল্ট গিয়ার, শরীর আর মুখ ঢাকা নিখুঁত ক্যামোফ্লাজে। হাতে ধরা অটোমেটিক ওয়েপনগুলো স্থির, নিষ্কম্প... বুঝিয়ে দিচ্ছে, ওগুলোর মালিকেরা দক্ষ, পোড়-খাওয়া যোদ্ধা।

নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হলো রানার কাছে, এই পরাশক্তির সামনে সিগ-সাওয়ার হাতে মাত্র দুজন মানুষ কিছুই নয়। প্রবল ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে যাবে ওদের ঠুনকো প্রতিরোধ। কয়েক সেকেণ্ড পরে ঝড়-ই এল। হারিকেনের তীব্রতা নিয়ে রাশ রাশ বুলেট ছুঁড়তে শুরু করল অ্যাসল্ট টিমের সৈনিকরা, সেগুলো ছুটে এল পোড়া আস্তাবলের মেঝেতে পড়ে থাকা অসহায় দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে।

এগারো

উপুড় হয়ে সোহানাকে জাপটে ধরল রানা, নিজের শরীরকে বর্ম বানিয়ে ওকে রক্ষা করতে চাইছে। অটোমেটিক ওয়েপনের গর্জনে

কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরই ওরা বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করল, একটা বুলেটও গায়ে লাগছে না ওদের, সবগুলো কংক্রিটের মেঝেতে মাথা কুটে মরছে। একটাই কাজ হচ্ছে গুলিবর্ষণে—দুই বিসিআই এজেন্ট বাধ্য হচ্ছে মেঝেতে পিন-গাঁথা প্রজাপতির মত পড়ে থাকতে; নড়লেই খুন হয়ে যাবে।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে চলল এই তাণ্ডব, তারপর থেমে গেল। আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র তিন মিনিট। মুহুর্মুহুঃ নিনাদের পর আচমকা নেমে আসা নীরবতা যেন থামিয়ে দিয়েছে সময়কে। রানার কানে অবশ্য এখনও প্রতিধ্বনি করে চলেছে প্রবল গুলিবর্ষণের রেশ, মাথা ঝাড়া দিয়ে ঝনঝনানি-টা কাটাবার চেষ্টা করল ও। ঘোর-টা কেটে যেতেই উঠে বসল, দেখাদেখি সোহানাও।

আস্তাবলের কাছাকাছি বেশ ক'জন সৈনিককে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা, হাতের অস্ত্র তাক করে রেখেছে দুই বিসিআই এজেন্টের দিকে। এগোচ্ছে সতর্ক পদক্ষেপে। হাবভাবে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। নিখুঁত অ্যাসল্ট ট্যাকটিক্স ব্যবহার করছে এরা। একদল কাভারিং ফায়ার করে আটকে রেখেছিল টার্গেটকে, সেই ফাঁকে বাকিরা চলে এসেছে কাছাকাছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকগুলোকে দেখল রানা। ওদের ক্যামোফ্লাজ, গিয়ার—সবই উন্নত মানের, হাতের অস্ত্রগুলো এমপি-৫ সাবমেশিনগান। আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সবাই স্পেশাল-অপ্সের ট্রেইনিং পাওয়া... এরাই সম্ভবত হামলা চালিয়েছিল সেফ-সাইটে।

রানার বাহু আঁকড়ে ধরল সোহানা। শান্ত স্বরে রানা বলল, 'রিল্যাক্স। আমাদের খুন করতে চাইলে এতক্ষণে করে ফেলতে পারত।'

ঠিক দশ গজ দূরে পৌঁছে থামল সৈনিকরা, ইশারায় হ্যাণ্ডস্

আপ হয়ে দাঁড়াতে বলল ওদেরকে। আদেশটা পালন করল রানা-সোহানা, আপাতত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

পরমুহূর্তে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। চোখ ফেরাতেই উপত্যকার এক প্রান্তের গাছগাছালির আড়াল থেকে একটা গাড়িকে উদয় হতে দেখল, পিছনে ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে ফার্মহাউসের দিকে। দূরত্ব একটু কমে আসতেই গাড়িটার মডেল চিনতে পারল রানা—ফোর-হুইল-ড্রাইভ এস.ইউ.ভি.—*ফোর্ড এক্সপ্লোরার।* মিলিটারি ভেহিকেল। সূর্যের কড়া আলোর কারণে উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে বসা মানুষদু'জনকেও দেখা গেল। চওড়া কাঁধঅলা এক ড্রাইভার, তার সঙ্গে রয়েছে বছর ত্রিশেকের এক যুবতী।

একেবারে আস্তাবলের সামনে এসে থামল গাড়িটা, দরজা খুলে মাটিতে পা রাখল যুবতী। এবার তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। মুখটা ডিম্বাকৃতি, চোয়াল সুগঠিত। চেহারা মন্দ নয়, সুন্দরী-ই বলা যেত, কিন্তু সমস্যা হলো নীল রঙের চোখদুটো। কোনও মেয়ের দৃষ্টি এমন মায়া-মমতাহীন হতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। মেয়েটি বেশ লম্বা, চামড়া রোদে-পোড়া, মুখে মেকআপ নেয়নি। অ্যাথলিটদের মত ছোট সোনালি চুল—ঝুঁটি বাঁধা সম্ভব নয় বলে পিছনদিকে আঁচড়ে রাখা হয়েছে। মোটা কাপড়ের শার্ট, ম্যাচিং জ্যাকেট, খাকি প্যাণ্ট আর বুট পরে রয়েছে সে। পোশাক, সেই সঙ্গে চলন-বলনে সামরিক ছাপ স্পষ্ট।

মেয়েটির পিছু পিছু ড্রাইভারও নেমেছে গাড়ি থেকে। আকার-আয়তনে কুস্তিগীর বলা চলে তাকে। লোকটার দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল যুবতী, 'সার্চ করো এদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল কুস্তিগীর, সশস্ত্র সৈনিকরা তাকে

কাভার দিচ্ছে। সময় নিয়ে রানা-সোহানার দেহতল্লাশি করল লোকটা, ইচ্ছে করেই শরীরের এখানে-ওখানে থাবা দিল, বিশেষ করে সোহানার গায়ে। বদমাশটার বিকৃত রুচি দেখে দাঁতে দাঁত পিষল রানা, যথাসময়ে উপযুক্ত শাস্তি দেবে ও শয়তানটাকে।

দুই বন্দির কাছ থেকে পিস্তলদুটো উদ্ধার করল কুস্তিগীর, নিজের ঢোলা প্যান্টের পকেটে রাখার আগে একটু পরখ করে দেখল। সপ্রশংস দৃষ্টি ফুটল চোখে। ওস্তাদ লোক, সিগ-সাওয়ার দুটোর বিশেষত্ব ধরতে পেরেছে। বন্দিদের কাছ থেকে স্পেয়ার ম্যাগাজিন আর সেলফোন নিয়ে নিল সে, রানার গোড়ালির উপরে বাঁধা এমারসন-নাইফটাও তার পকেটস্থ হলো একটু পর। সবশেষে দুই বিসিআই এজেন্টের কাছ থেকে ওয়ালেট আর গাড়ির চাবি নিল লোকটা, সেগুলো তুলে দিল নেত্রীর হাতে।

ওয়ালেট খুলে রানার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখল যুবতী, তারপর চোখ তুলে প্রশ্ন করল, 'নাম কী তোমাদের?'

'মাসুদ কায়সার,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা।

'কেয়া কায়সার,' পিছু পিছু যোগ করল সোহানা।

মৃদু হাসল যুবতী। বলল, 'ভুয়া নাম, তাই না?'

'কেন, ড্রাইভিং লাইসেন্সে কি অন্য কিছু লেখা আছে নাকি?' হালকা সুরে বলল রানা।

'তা নেই,' বলল যুবতী। 'নাম মিলেছে। আমি শিয়োর, খোঁজ নিতে গেলে পারফেক্ট একটা ব্যাকগ্রাউণ্ডও পাওয়া যাবে এই নামের দুজন মানুষের। না পাওয়া যাওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক।'

'তাই নাকি? কেন?'

'কারণ মি. মাসুদ রানা এবং মিস সোহানা চৌধুরী নামসর্বস্ব পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে না,' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো যুবতীর। 'ইউ সি, আমরা খোঁজখবর নিয়েই মাঠে নামি।'

বিভ্রান্ত হবার অভিনয় করল রানা। 'কীসের কথা বলছেন,

বুঝতে পারছি না...'

'কাম অন, রানা! শুধু শুধু সময় নষ্ট কোরো না। আমরা সব জানি। জানি কীভাবে নিউয়ার্ক থেকে ড. আন্দালিব সিদ্দিকীকে উদ্ধার করে এনেছ, কীভাবে তাকে তোমার এজেন্সির সেফ-সাইটে নিয়ে গেছ...'

'জাস্ট আ মিনিট,' বাধা দিল রানা। 'এই আন্দালিব সিদ্দিকী-টা আবার কে?'

মুখের হাসি নিভে গেল যুবতীর, চেহারায় বিরক্তি ফুটল। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা ঝোঁকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে রানার তলপেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল লোকটা।

চোখে আঁধার দেখল রানা, নিঃশ্বাস আটকে আসছে ব্যথার তীব্রতায়। একে কুস্তিগীর ভাবা ঠিক হয়নি, ব্যাটা আসলে একটা চ্যাম্পিয়ন বক্সার... মাইক টাইসন আর মোহাম্মদ আলী ক্যালিবারের! নিজের অজান্তেই কুঁজো হয়ে গেল ও, ভারসাম্য হারিয়ে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

'শুধু ঘুসি দিয়ে মানুষ খুন করতে জানে অ্যান্থনি,' সঙ্গীকে দেখিয়ে বলল যুবতী। 'তাই ভাল হয় যদি ওকে কোনও অজুহাত না দাও। লুকাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তা ছাড়া... লুকাবার কিছু নেই-ও। তোমরা ড. সিদ্দিকীর ল্যাব দেখতে এসেছ তো? কোনও অসুবিধে নেই, এসো... আমিই দেখাচ্ছি।'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিমোট বের করে বোতাম চাপল সে। সঙ্গে সঙ্গে মোটর চলার চাপা গুমগুম শব্দ শোনা গেল, দুটো হাইড্রলিক পোল ঠেলে ধরল মেঝের আলগা স্ল্যাবটাকে, ট্র্যাপডোরের মত খুলে গেল ওটা। উন্মুক্ত হয়ে গেল একটা সিঁড়ি, ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচের অন্ধকারের দিকে। ল্যাবের প্রবেশপথ।

ব্যথাটা সয়ে নিল রানা, উঠে দাঁড়াল। অভিনয়ের ইতি

ঘটিয়েছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'হঠাৎ আমাদের খায়েশ মেটাতে উৎসাহী হলে কেন, জানতে পারি?'

'মিটুক না তোমাদের কৌতূহল! তাতে যদি ভালয় ভালয় মুখটা খোলো... অ্যান্থনিকে আর খাটতে হয় না তা হলে।'

'অশেষ দয়া তোমার! দয়াটা আগে দেখালে কী ক্ষতি হতো?' ডেমিয়েনের লাশটা দেখাল ও। 'বেচারাকে খুন করে ফেললে... দরকার ছিল কোনও?'

'আগাছা,' লাশটার দিকে হেলাফেলার দৃষ্টিতে তাকাল যুবতী। 'বাঁচিয়ে রাখার কোনও কারণ দেখতে পাইনি।'

'হুম, আমরা তা হলে ফলবতী বৃক্ষ?'

'তার চেয়েও বেশি। তোমরা হচ্ছো সোনার খনি।' সিঁড়িটা দেখাল যুবতী। 'এবার নামতে শুরু করো। নইলে অ্যান্থনি তোমাদেরকে ভিতরে ছুঁড়ে ফেলবে।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' রানা বলল। 'ছোঁড়াছুঁড়ি একেবারেই পছন্দ করি না আমরা।'

সোহানাকে ইশারা করল ও। দুজনে উল্টো ঘুরে এগিয়ে গেল প্রবেশপথের দিকে, নামতে শুরু করল। অস্ত্র হাতে বাকিরা অনুসরণ করল ওদেরকে। সামনের একজন টর্চলাইট জ্বেলে মাথার উপর দিয়ে আলো ফেলে রাখল।

'এখানে অবশ্য তোমরা কিছুই পাবে না,' বলল যুবতী, ভূ-গর্ভে নামবার টানেলের গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কণ্ঠ। 'আমরা পুরো জায়গাটাই একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছি।'

একটু পরেই সমতল মেঝেতে নেমে এল গোটা দলটা। বাতাস গুমোট হয়ে আছে জায়গাটায়। সৈনিকদের সবাই যার যার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। রানা-সোহানার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা কংক্রিটের করিডোর, দু'পাশের দেয়ালে পর পর বেশ

কয়েকটা ওপেনিং দেখা যাচ্ছে। দরজা ছিল বোধহয়, খুলে ফেলা হয়েছে। যুবতীর কথায় সেটার প্রমাণ মিলল।

'কম্পিউটার, সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, ফাইলপত্র... সব ধ্বংস করে ফেলেছি আমরা। সব ধরনের ফার্নিচার সরিয়ে ফেলেছি। হিটিং এবং এয়ার-কণ্ডিশনিং সিস্টেম ডিজ-অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। সমস্ত লাইট-ফিটিংস্, বাথরুমের বেসিন-কমোড, মেঝের কার্পেট, ফলস্ সিলিং, দরজা-চৌকাঠ... এমনকী দেয়ালের প্যানেলিং পর্যন্ত খুলে ফেলা হয়েছে।'

আলো ফেলে ছাদটা দেখানো হলো দুই বন্দিকে। অযত্নে-অবহেলায় ছেঁড়া-খোঁড়া ইনসুলেটেড ওয়ায়্যার ঝুলছে ওখান থেকে। কণ্ঠে আত্মতুষ্টি ফুটিয়ে যুবতী বলল, 'এরচেয়ে চমৎকার ক্লিনআপ আর কোথাও দেখতে পাবে না তোমরা। এ-জায়গা দেখে এখন আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কী করা হতো এখানে। রাইট?'

'হুঁ,' মুখ বাঁকিয়ে বলল রানা। 'বুঝতে পারছি, ভুল পেশায় এসেছ তোমরা। ঝাড়ুদার, কিংবা মেথর হিসেবে কাজে নামলে অনেক উন্নতি করতে।'

গালে চড় মারার মত অপমান। সবকিছু ভুলে যুবতী চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললে?'

উল্টো ঘুরে তার মুখোমুখি হলো রানা। শান্ত গলায় বলল, 'বলছি যে, দুনিয়ার সেরা ঝাড়ুদার তোমরা। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, এখানে এখনও কী করছ তোমরা? কী পাহারা দিচ্ছ? নিজেদের সেরা শিল্পকর্ম?'

আবারও চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল যুবতী, কোনোমতে নিজেকে সামলাল। বুঝতে পারছে, অধীনস্থদের সামনে এভাবে নিয়ন্ত্রণ হারানো ঠিক নয়। গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে সে বলল, 'আমরা এখানে কিছু পাহারা দিচ্ছিলাম না, গর্দভ! তোমাদের জন্য

অপেক্ষা করছিলাম!'

'শুনে খুব খুশি হলাম, নিজেদেরকে ভিআইপি মনে হচ্ছে,' রানা খেপিয়ে চলেছে প্রতিপক্ষকে।

'ভিআইপি? ঠিক আছে, ভিআইপি-র খাতিরই করা হবে তোমাদের।'

'খুব ভাল। তবে খাতির-যত্ন শুরু হবার আগে আমাদের আলাপ-পরিচয়টা ভালমত হয়ে যাওয়া উচিত নয়? তোমার নামটা কী?'

'আমার নাম জেনে তোমার কাজ নেই।'

'আছে, আছে,' হাসল রানা। 'নাম না জানলে পরে তোমাকে খাতির-যত্নের জন্যে পুরস্কার দেব কীভাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, নাম যদি না-ই বলো, তা হলে আমিই একটা দিয়ে দিই। ব্ল্যাক উইডো... পছন্দ হয়? বেশ মিলেছে কিন্তু! তুমি যেন ঠিক একটা বিষাক্ত মাকড়সা!'

জবাব দিল না যুবতী। কয়েক মুহূর্ত আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানার দিকে। হঠাৎই যেন সেই আগুনে পানি পড়ল। স্মিত হেসে সে বলল, 'নাইস ট্রাই, রানা। আমাকে আগেই বলা হয়েছে, তুমি কথার মারপ্যাঁচে ওস্তাদ। আমাকে খেপিয়ে মুখ খোলাতে চাইছিলে, তাই না? ভালই দেখিয়েছ বটে, আমি কিছুটা হলেও ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিলাম।'

'এর মানে কি আমি তোমাকে ব্ল্যাক উইডো বলে ডাকতে পারি?' রানা আগের মতই মুখের হাসি ধরে রেখেছে।

'আই ডোন্ট কেয়ার। যা খুশি বলো। সত্যি বলতে কী, আমি চাই তুমি... তোমরা দুজনেই কথা বলতে থাকো। প্রচুর কথা... ড. সিদ্দিকীর সম্পর্কে।'

'সবই বলব, মাই ডিয়ার ব্ল্যাক উইডো! কিন্তু আলাপ-সালাপ কি আর একতরফা হয়? তুমিও কিছু বলো! এই যেমন... আমরা

যে এখানে আসব, সেটা তোমরা কীভাবে জানলে...'

বক্সারের দিকে তাকাল যুবতী। 'একে একটু সবক দেয়া দরকার, অ্যান্থনি। বড্ড বেশি ফালতু কথা বলছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল বিশালদেহী লোকটা। আঘাতটা সামলাবার জন্য পেট শক্ত করে ফেলল রানা, তবে এবার তলপেটে নয়, থুতনিতে ঘুসি বসাল বক্সার। আবছা আলোয় মুঠিটাকে ঠিকমত ছুটে আসতে দেখল না ও, ফলে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খেল মাথাটা, মগজ বাড়ি খেল খুলির গায়ে, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও চিত হয়ে। কয়েক মুহূর্ত সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে রইল রানা, আচ্ছন্ন বোধ করছে। টের পেল, মুখের ভিতরটা ভরে গেছে রক্তে। লাল রঙের একদলা থুতু ফেলল ও, সোজা হয়ে বসে বলল, 'এসবের কোনও অর্থ হয় না। আমার সম্পর্কে যদি সব জেনে থাকো, তা হলে এটাও জানার কথা—টরচার করে আমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করা সম্ভব নয়।'

'ওই কথাটায় আমার বিশ্বাস নেই,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল *ব্ল্যাক উইডো।* 'সবারই একটা ব্রেকিং পয়েন্ট থাকে।' সোহানার দিকে ঘুরে গেল তার দৃষ্টি। 'ফাইলে পড়েছি, তুমি বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল। চোখের সামনে মিস সোহানার উপর অত্যাচার চালালে সেটা সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'যা খুশি করতে দাও ওকে, রানা,' বলল সোহানা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না। সয়ে নেব। কিন্তু তুমি ওকে কিচ্ছু বোলো না।'

হেসে উঠল ব্ল্যাক উইডো। 'দারুণ ভাষণ! তবে রানা এতে প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'সোহানাকে এসবের বাইরে রাখো,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ও কিছু জানে না, শুধু আমাকে সাহায্য করতে এসেছে।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল যুবতী। 'কিন্তু তুমি মুখ না খুললে আমি নিরুপায়। যেভাবে হোক, সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করতে হবে

আমাকে। সেজন্যে যে-কোনও পদক্ষেপ নেব আমি।'

'খামোকা আমাকে শত্রু ভাবছ,' রানা বলল। 'আমিও সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করতে চাই। ওর সঙ্গে আমারও বোঝাপড়া বাকি আছে।'

'ওকে যেভাবে উদ্ধার করে এনেছিলে, তাতে তো দুজনের গলায় গলায় ভাব থাকার কথা,' বলল ব্ল্যাক উইডো। 'হঠাৎ বোঝাপড়ার প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে ও—আমার বন্ধুদের খুন করেছে, আমাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে!' কথাটা আংশিক সত্য। রফিক আর শাহরিয়ার মারা গেছে এই যুবতীর দলের অ্যাসল্ট টিমের রকেটে। সিদ্দিকীর উপর ওর যত না ক্রোধ, তার চেয়ে এদের উপরও কোনও অংশে কম নয়। কিন্তু সেটা এখুনি বুঝতে দেয়া চলে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে এই ব্ল্যাক উইডোকে বোঝাতে হবে, রানা আসলে ওদেরই পক্ষে। সেটা প্রমাণের জন্য জোর গলায় বলল, 'আমি প্রতিশোধ নিতে চাই!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমরাও কিছুটা আন্দাজ করেছি... ক্যাটস্‌কিল মাউন্টেন রেঞ্জের ওই বাঙ্কারে ওর লাশ খুঁজে না পেয়ে,' বলল ব্ল্যাক উইডো, নিজের অজান্তেই রানার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে শুরু করেছে। 'আগুনে পোড়া দুটো লাশ পেয়েছি আমরা—একটা ছুরি-বেঁধা, অন্যটা গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। কাজটা সিদ্দিকী ছাড়া আর কারও হতে পারে না। তাই ধারণা করছি, ওখানকার লোকজনকে খুন করে পালিয়ে গেছে সে। তোমার লাশও ছিল না ওখানে, তাই চোখ রাখছিলাম তোমার বন্ধুবান্ধবের উপর। এজেন্ট এরিক স্টার্ন যে সিদ্দিকীর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে, সেটা দেখে বুঝলাম—ওর সাহায্য নিচ্ছ তুমি। ওর সঙ্গে বাতচিত করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই কয়েকজন লোক কিডন্যাপ করে বসল ওকে। ইচ্ছে করেই নাক গলাইনি ওর ভিতরে, যাতে

বন্ধুকে উদ্ধার করতে তুমি গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসো। কিডন্যাপারদেরকে এখানে ফাঁদ পাততে দেখলাম আমরা, তাই নিজেরাও ওঁৎ পেতে বসে ছিলাম তোমার আসার অপেক্ষায়। প্ল্যানটা মন্দ হয়নি, কী বলো? ঠিকই ধরা দিয়েছ তুমি।'

'তোমাদেরকে দেখতে পায়নি ওরা?'

'উঁহুঁ,' হাসল ব্ল্যাক উইডো। 'লিডারটা এক সঙ্গীকে নিয়ে আজ সকালে চলে যেতেই বাকি দুটোকে অ্যারেস্ট করেছি আমরা। তারপর ক্যামোফ্লাজ নিয়ে অ্যাসল্ট টিমকে লুকিয়েছি ফার্মহাউসের ধ্বংসস্তূপে।'

'হুম, ভালই কাজ দেখিয়েছ,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'তবে ওটা পণ্ডশ্রম হয়েছে। আমি তোমাদের শত্রু নই। আমারও উদ্দেশ্য ওই একই—ড. সিদ্দিকীকে শায়েস্তা করা!'

কথাটায় খুব একটা বিভ্রান্ত হলো না ব্ল্যাক উইডো। গম্ভীর গলায় বলল, 'ছেলে-ভুলানো কথা বলে লাভ নেই, রানা। তোমাকে আরও ঝেড়ে কাশতে হবে। ওই বাঙ্কারে সিদ্দিকীকে নিয়ে কী করছিলে তোমরা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ওটা আমাদের সেফ-সাইট। সিদ্দিকী উধাও হয়ে যেতে চেয়েছিল। ওখানে ওর আত্মগোপনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল... সেইসঙ্গে ট্রেইনিং চলছিল ওর।'

'উধাও!' ভুরু কোঁচকাল ব্ল্যাক উইডো। 'কোথায় উধাও হয়েছে ও?'

'জানি না,' রানা মাথা নাড়ল। 'কাজটা শেষ করতে পারিনি আমরা। ট্রেইনিং শেষ হতেই বদমাশটা বেঈমানী করেছে। তোমাদেরকে ডেকে এনে সেফ-সাইটে হামলা করিয়েছে... আমার সঙ্গীদের খুন করেছে... তারপর গোলমালের ভিতর পালিয়ে গেছে।'

'মেসেজটা সিদ্দিকীই দিয়েছিল?' ব্ল্যাক উইডো একটু অবাক

হলো। 'আমি তো শুনেছি অজ্ঞাতপরিচয় এক ইনফরমার সিদ্দিকীর খবর জানিয়েছিল...'

'ও-ই,' বলল রানা। 'লোকটা অত্যন্ত ধুরন্ধর। নিখুঁত ছক কেটে পুরো ব্যাপারটা ঘটিয়েছে।'

'সে যা-ই হোক,' কাঁধ ঝাঁকাল যুবতী, 'নিজ থেকে তো আর গায়েব হওয়া সম্ভব নয় লোকটার পক্ষে। নানা রকম কাগজপত্র প্রয়োজন হয়েছে ওর। সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা সাপ্লাই দিয়েছ?'

'ব্যাপারটা একটু জটিল,' বলল রানা। 'ক্লায়েন্টকে আমরা জোর করে কোনও পরিচয় গছিয়ে দিই না, ওটা সে তার নিজের পছন্দ অনুসারে বেছে নেয়। সেই মোতাবেক আমাদের ফর্জারি এক্সপার্ট কাগজপত্র তৈরি করে। সিদ্দিকী আগে থেকে পছন্দ-অপছন্দের কথা কিছুই বলেনি আমাদের। ট্রেইনিং শেষ হতেই সবাইকে মেরে সেফ-সাইট থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর গিয়েছিল আমাদের এক্সপার্টের কাছে। ওর কাছ থেকে জোর করে কাগজপত্র নিয়েছে শয়তানটা, তারপর খুন করেছে। আমি কিচ্ছু করতে পারিনি। সমস্যাটা বুঝতে পারছ? আমাদের এক্সপার্ট ওকে কী ধরনের ডকুমেন্ট আর ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করে দিয়েছে, সেটা জানবার কোনও উপায় নেই।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না,' থমথমে গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। 'নিউয়ার্ক থেকে উদ্ধারের পর চারদিন ওই সেফ-সাইটে ছিল সিদ্দিকী। তুমি বলতে চাইছ, এর মধ্যে একবারও তোমরা আলোচনা করোনি নতুন পরিচয়ের ব্যাপারে? একবারও জানতে চাওনি, লোকটা কোথায় যেতে চায়?'

'চেয়েছি, কিন্তু কিছুই বলেনি সে।'

'তুমি মিথ্যে বলছ!' খেঁকিয়ে উঠল যুবতী।

রানা শান্ত রয়েছে। বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো—সিদ্দিকী কোথায় গেছে, সেটা যদি জানাই থাকে, তা হলে

আমরা খামোকা বেইলি'জ রিজে আসব কী করতে? হাওয়া খেতে?'

'সেটা আমারও প্রশ্ন। কী আছে এখানে?'

'তিলকে তাল ভাবছ তুমি,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'আমরা কিছুই জানি না।'

চেহারায় হিংস্রতা ফুটল ব্ল্যাক উইডোর। বলল, 'সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনও প্রয়োজন নেই আমার কাছে। অ্যান্থনি, মেয়েটাকে গুলি করো।'

বক্সারের চেহারায় ভয়ঙ্কর হাসি ফুটল। উরুতে বাঁধা হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সে, কক করে তাক করল সোহানার দিকে। কপালে ঘাম দেখা দিল রানার—মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না ব্ল্যাক উইডো, সত্যিই গুলি করতে যাচ্ছে সোহানাকে। সোহানা অবশ্য নিষ্কম্প, ভীতিবোধটা উধাও হয়ে গেছে, নাকি চরম সীমায় পৌঁছে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—তা বোঝা যাচ্ছে না। মূর্তি হয়ে আছে ও, যেন পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অসহায় বোধ করল রানা, আবছা আলোয় ট্রিগারের উপর চেপে বসা অ্যান্থনির আঙুল সাদা হতে দেখল—এখুনি ফায়ার করবে লোকটা।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

একটু থমকাল অ্যান্থনি চিৎকারটা কানে যেতে, ঘাড় ফিরিয়ে নেত্রীর দিকে তাকাল নির্দেশনার আশায়।

'আমি এখনও সিদ্ধান্ত পাল্টাইনি, রানা,' বলল ব্ল্যাক উইডো। 'কিছু বলতে চাইলে তাড়াতাড়ি বলো।'

'আমাদেরকে খুন করলে মস্ত ভুল করবে তুমি,' যতটা পারে শান্ত থেকে বলল রানা। 'কারণ একমাত্র আমরাই তোমাকে সিদ্দিকীর খোঁজ বের করতে সাহায্য করতে পারি।'

'কিন্তু তুমি তো বলছ, কিছুই জানো না ওর ব্যাপারে।'

'তা ঠিক, কিন্তু লোকটার চরিত্র বুঝতে পেরেছি আমি। ওটা বিশ্লেষণ করেই বোঝা সম্ভব, কোথায় লুকিয়েছে ও।'

'হেঁয়ালি কোরো না। পরিষ্কার করে বলো, কী বলতে চাও।'

রানা ব্যাখ্যা করল, 'চারদিন ছিল সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গে। তখন ট্রেইনিঙের পাশাপাশি তার সাইকো-অ্যানালাইসিস করেছি আমরা। লোকটা অ্যারোগ্যাণ্ট... উদ্ধত। নিজেকে সবার চেয়ে চালাক মনে করে। ওর ধারণা, আমরা যেভাবে শিখিয়েছি, তার চেয়েও ভালভাবে উধাও হতে পারবে সে। ইচ্ছেমত নিয়ম ভাঙতে পারবে, এবং সবাইকে তারপরও নিজের মত করে ধোঁকা দিতে পারবে...'

'কাম টু দ্য পয়েণ্ট, রানা!' ধমক দিল ব্ল্যাক উইডো। 'তুমি সময় নষ্ট করছ।'

'আমি বলতে চাইছি, সিদ্দিকী উধাও হবার সমস্ত নিয়ম মানবে না। লোকটার মধ্যে কিছুটা একগুঁয়ে স্বভাব আছে... ট্রেইনিঙের সময় আমরা লক্ষ করেছি, কিছু কিছু জিনিস সে একেবারেই ছাড়তে রাজি নয়, রাজি নয় কিছু কিছু শখ আর স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে। আমি নিশ্চিত, নতুন পরিচয় নিয়েও ওগুলো বজায় রাখবে সে। কারণ তার ধারণা, এর পরও ওর নাগাল পাবে না কেউ... নিজেকে অত্যন্ত চালাক ভাবছে সে, পিছনের সমস্ত ট্রেইল মুছে দিয়ে যাচ্ছে।'

'তোমাকে আরও স্পেসিফিক তথ্য দিতে হবে, রানা। কী ধরনের শখের কথা বলছ তুমি?'

'আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে...'

'ত্রিশ সেকেণ্ড দেয়া হলো,' রুক্ষ গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। 'এরপর প্রথম গুলিটা চালাবে অ্যান্থনি।'

'দাঁড়াও...' একটু ভাবল রানা। 'সিদ্দিকী মদ পছন্দ করে।'

'অনেকেই করে। ওটা কোনও তথ্য হলো না।'

'রান্না-বান্নার ভক্ত সে, উঁচু মানের শেফের মত রেসিপি বিশ্লেষণ করতে পারে।' শাহরিয়ারের রান্না নিয়ে সিদ্দিকীর করা মন্তব্যগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে রানার।

'আমরা সবাই খুব ভাল করে জানি, সিদ্দিকী একজন ভোজনরসিক,' বিরক্ত গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। 'নতুন কিছু জানলে বলো। তোমার সময় কিন্তু ফুরিয়ে আসছে।'

আরেকটু ভাবল রানা। তারপর বলল, 'গলফ খেলতে ভালবাসে সিদ্দিকী। আমাদেরকে বলেছে, শারীরিক পরিশ্রম বলতে ওই একটা জিনিস-ই করে ও। গলফের পাগল।'

'তারমানে সিদ্দিকী নাপা ভ্যালিতে গেছে, কিংবা গেছে নিউ ইয়র্কের ওয়াইন ডিস্ট্রিক্টে... অথবা ফ্রান্সের বোর্দো-তে; ওখানে বসে সে ভূরিভোজন করছে, আর বাকি সময় গলফ খেলে বেড়াচ্ছে! এটাই বলতে চাইছ তুমি?' তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ পেল ব্ল্যাক উইডোর গলায়। খেপে গেল পরমুহূর্তে। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি, রানা! এক্ষুনি যদি তুমি কাজে লাগার মত তথ্য দিতে শুরু না করো, তা হলে সোহানার আশা ছেড়ে দিতে হবে।'

'আমাকে শেষ করতে দাও,' বলল রানা। 'আগেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলো না। এমনিতে গুরুত্বহীন মনে হলেও, এসব ছোট ছোট তথ্য জোড়া দিয়েই বিরাট একটা তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব।'

'লেকচার দিতে হবে না,' বিরক্ত গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো। 'যা বলার জলদি বলো। এবার কী শোনাবে—সিদ্দিকীর নখ কাটার স্টাইল?'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না রানা। বলল, 'নিউয়ার্কের ওয়্যারহাউসে আমি যখন ওকে উদ্ধার করতে যাই, তখন ওখানকার শেলফে কয়েকটা বই আর ভিডিওটেপ দেখেছি আমি। সংখ্যায় বেশি নয়, তবে ওখানে যদি ওই ক'টা জিনিস নিয়ে সে

তিন সপ্তাহ কাটিয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে—জিনিসগুলো তার জন্য অমূল্য সম্পদ। ওগুলোই তাকে অতটা সময় আনন্দ জুগিয়েছে... কিংবা তার ফ্যান্টাসি পূরণ করেছে।'

'ফ্যান্টাসি!' ব্ল্যাক উইডো ভুরু কোঁচকাল।

'ওর নতুন জীবনের কথা বলছি। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে লোকে দীর্ঘদিনের লালিত কোনও স্বপ্নপূরণ করতে চায়। কী পরিচয় নেবে, কোথায় আবাস গড়বে—দুটো ক্ষেত্রেই।'

'বই আর ভিডিওগুলোর নাম বলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সমস্যা ওখানেই—আমি মনে করতে পারছি না।' এবারও আংশিক সত্য বলছে ও। কবি রবিনসন জেফারসের প্রতি সিদ্দিকীর অনুরাগের কথা ফাঁস করছে না। তথ্য দিচ্ছে বাছাই করে, যাতে প্রতিপক্ষ আগ্রহী হয়ে ওঠে... আবার পুরোপুরি কাজেও লাগাতে না পারে। সবকিছু জানার জন্য ওকে আর সোহানাকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে ব্ল্যাক উইডো; আর বেঁচে থাকলে এদের হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ ঠিকই পাওয়া যাবে। 'পর্নোগ্রাফির একটা বই দেখেছি আমি, ভূ-তত্ত্বেরও একটা বই ছিল। ভিডিও কালেকশনটা অবশ্য আরও অদ্ভুত। ক্লিন্ট ঈস্টউডের একটা থ্রিলার ছিল, সঙ্গে ট্রয় ডোনাহিউ অভিনীত একটা টিনেজ রোমান্স...'

'ছবির নাম বলতে হবে তোমাকে।'

'বলেছি তো, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ম্যাডাম, ব্যাটাকে একটা ধোলাই দেব নাকি?' জিজ্ঞেস করল অ্যান্থনি। 'তাতে মগজটা খোলাসা হয়ে যেতে পারে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ব্ল্যাক উইডো। 'ঘাঘু লোক, মারধর করে কিছুই বের করতে পারবে না।'

সোহানার দিকে অ্যান্থনির দৃষ্টি ঘুরে যাচ্ছে দেখে রানা বলল, 'মিছেমিছি জোর-জবরদস্তি করছ তোমরা। সত্যিই আমার মনে

নেই, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। একটু সময় লাগবে। খামোকা টরচার করলে হিতে-বিপরীত হতে পারে।'

'ভেবো না,' বলল ব্ল্যাক উইডো। 'তোমার স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা করবার তরিকা জানা আছে আমাদের।' তুড়ি বাজাল সে, সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল গোটা অ্যাসল্ট টিম। রানা-সোহানাকে ফেলে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

যাবার পথে ব্ল্যাক উইডোকে সেলফোনে কথা বলতে শুনল ওরা। কাকে যেন বলছে, 'ড. হামফ্রে-কে খবর দাও... গোল্লায় যাক ব্যস্ততা! এখুনি ওকে এখানে চাই আমি!'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দলটার পদশব্দ। এরপর শোনা গেল মোটরের আওয়াজ—হাইড্রলিক পোলদুটো নীচে নেমে আসছে, নামিয়ে আনছে কংক্রিটের স্ল্যাবটাকে। তিন ফুট... দু'ফুট... এক ফুট... করে নেমে এল ওটা। কয়েক সেকেণ্ড পরই মৃদু একটা *ধুপ্* শব্দ করে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল প্রবেশপথ। ভূগর্ভের ল্যাবটার নিকষ আঁধার ছেয়ে ফেলল রানা-সোহানাকে।

বারো

পরিবেশ পাল্টে গেছে ল্যাবের ভিতরে। বাতাসটা আরও গুমোট মনে হলো রানার কাছে। আসলে আগের মতই রয়েছে, কিন্তু আচমকা নেমে আসা আঁধার আর নির্জনতা চাপ ফেলছে স্নায়ুর উপর। কানের কাছে সোহানার নিঃশ্বাসের শব্দ পেল রানা। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করল, মোটামুটি স্বাভাবিক তালেই দম ফেলছে ও।

তারমানে এখনও ভয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে।

'ড. হামফ্রে-টা কে?' কাঁপা গলায় জানতে চাইল সোহানা।

'ঠিক জানি না,' রানা বলল। 'তবে আমার মন বলছে, ব্যাগভর্তি সিরিঞ্জ আর কেমিক্যাল নিয়ে হাজির হবে সে। আমাদের মুখ খোলাবে ওষুধের সাহায্যে।'

হাতড়ে হাতড়ে রানাকে ধরল সোহানা, হাঁটু গেড়ে বসল। 'কতটা জোরে মেরেছে অ্যান্থনি?'

'আগামী ক'সপ্তাহ ভুবন-ভোলানো হাসি দিতে পারব না,' হালকা রসিকতা করল রানা। পরিবেশটায় প্রাণের ছোঁয়া দিতে চাইছে। 'তবে দাঁত ভেঙে ফোকলা বুড়ো হইনি, এই-ই যা সান্ত্বনা।'

একটু হাসল সোহানা। 'তুমি কথা জানো বটে!'

'তোমার কী অবস্থা? ভয় করছে?'

'ওটা তো সারাক্ষণই করছে, রানা। তবে একটা টেকনিক খাটাচ্ছি—হিপনোসিসের মাধ্যমে মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখছি, যাতে বিপদের চিন্তা মাথায় চেপে বসে না থাকে। অনেকটাই কাজ হয়েছে এতে।'

'দ্যাটস্ নাইস। এবার তা হলে বেরুবার একটা ব্যবস্থা করতে হয়, কী বলো?'

'ক্... কীভাবে?' সোহানা অবাক।

'সেটাই তো বের করতে হবে। দাঁড়াও, আগে আলো জ্বালি।'

ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল রানার হাতে। জ্বলন্ত কাঠিটা চারদিকে ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখল ও।

'দেশলাই পেলে কোথায়?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'পকেটেই ছিল, অ্যান্থনি নেয়নি। ব্যাটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। ভেবেছে সামান্য ক'টা ম্যাচের কাঠি দিয়ে কিছুই করতে পারব না আমরা।'

'হুম, ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। আমাদের বেল্টগুলোও তো খুলে নেয়নি। বেল্টের বাকল আর স্পাইক যে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, সেটা বোধহয় ভাবেইনি।'

আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা খেতেই কাঠিটা ফেলে দিল রানা। বলল, 'মশাল দরকার আমাদের। শার্টের হাতা ছিঁড়ে নিচ্ছি, তোমারগুলো দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

কাপড় ছেঁড়ার ফড় ফড় শব্দ হলো। একটু পরেই ব্লাউজের দুটো হাতা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোহানা। রানাকে অবশ্য একটু বেগ পেতে হলো—ওর শার্ট মোটা কাপড়ে তৈরি, শক্ত সেলাই সহজে হার মানতে চাইল না। রীতিমত টানাহেঁচড়া করে খুলতে হলো দুই হাতা।

একটু পরে সফল হলো ও। একটা হাতা রেখে বাকিগুলো চালান করল পকেটে। তারপর বেল্ট খুলে বাকলের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধল হাতাটা। জিনিসটা মেঝেতে রেখে দেশলাইয়ের সাহায্যে আগুন জ্বালল। ছোট্ট একটা স্তূপের মত জ্বলে উঠল ওটা, মোটা কাপড় বলে বেশি দ্রুত পুড়ছে না, আশা করা যায়—বেশ কয়েক মিনিট টিকবে।

'চমৎকার!' মন্তব্য করল সোহানা। 'আলোর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু এখান থেকে বেরুবে কীভাবে? যাবার রাস্তাটা তো ওরা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।'

'রাস্তা ওই একটাই আছে, তা বিশ্বাস হয় না আমার,' বলল রানা। 'এ-ধরনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড ইন্সটলেশনে বিকল্প রুট রাখতে হয়। নইলে মেইন ডোরের মোটর যদি কোনও কারণে বিকল হয়ে পড়ে, ভিতরের সবাই চিরতরে আটকা পড়বে না?'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল সোহানা। 'কিন্তু বিকল্প একজিট কোন্‌দিকে হতে পারে?'

'খোলা জায়গায় হবে না, আশপাশের লোকজন দেখে ফেলবে তা হলে। লজিক্যালি চিন্তা করলে ওটা ফার্মহাউসের ভিতরে হবার কথা।'

স্বল্প আলোয় চারপাশে তাকাল সোহানা। মনে মনে হিসেব করল, ফার্মহাউসটা কোন্‌দিকে হতে পারে। ওদিকে তাকাতেই একটা করিডোর চোখে পড়ল। আঙুল তুলে বলল, 'এটা।'

রানাও একমত। 'চলো।'

বেল্টের অপর দিকটা হাতে তুলে নিল ও, মেক-শিফট মশালটা টেনে নিয়ে চলল করিডোর ধরে। বেশ কিছুদূর যেতেই একটা দরজা চোখে পড়ল; পুরো ল্যাবের এই একটা দরজাই শুধু খুলে নেয়া হয়নি। কাছে গিয়ে হাতল ঘোরাল সোহানা, ওটা তালা দেয়া।

'ইন্টারেস্টিং!' বলে উঠল ও।

'কী ব্যাপার?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রুটটা সম্ভবত খুঁজে পেয়েছি আমরা। দরজাটায় তালা দেয়া।'

'ইস্‌স্‌... যন্ত্রপাতি থাকলে খুলে ফেলা যেত!' আফসোস করল রানা।

'এখুনি হতাশ হচ্ছ কেন?' হাসল সোহানা। 'ওভার-কনফিডেন্ট অ্যান্থনির কথা ভুলে গেছ?' চুলের ভিতর হাত দিয়ে দুটো হেয়ার-পিন বের করে আনল ও।

রানাও হেসে ফেলল। 'লোকটার আসলে আমাদের দলে থাকা উচিত ছিল।'

হাঁটু গেড়ে হাতলের সামনে বসে পড়ল সোহানা, হেয়ার-পিন দুটো ঢুকিয়ে দিল কী-হোলে। একটু চেষ্টাতেই খুট করে শব্দ হলো। নবে মোচড় দিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল ও।

পরমুহূর্তেই দুই বিসিআই এজেন্টের মুখ কালো হয়ে গেল।

ফার্মহাউসের ঠিক তলা ওপাশটা, তবে ওখান দিয়ে বেরুবার কোনও কায়দা নেই। অগ্নিকাণ্ডে বাড়িটার নীচতলার মেঝে... মানে রুটটার ছাদ ধসে পড়েছে। দরজার ওপাশটা কাঠ-কয়লা আর মাটি-পাথরে এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে আছে যে, ওগুলো ঠেলে এগোবার উপায় নেই।

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল সোহানা। 'এই জঞ্জাল সাফ করতে তো বুলডোজার লাগবে!'

'হুঁ,' বলল রানা। 'আমাদেরকে ভালমতই আটকেছে ওরা। সেজন্যেই বেল্ট, হেয়ার-পিন আর দেশলাই নিয়ে মাথা ঘামায়নি।'

মিটমিট করে নিভে গেল আগুনটা, তাড়াতাড়ি আরেকটা হাতা বের করে বাকলে জড়াল রানা, নতুন করে মশাল জ্বালল। আলোটা নিয়ে আবার প্রবেশপথের সামনের জায়গাটায় ফিরে এল ওরা।

রানা বলল, 'এত সহজে হাল ছাড়ছি না। একটা বন্ধ তো কী হয়েছে, অন্য আরেকটা খুঁজে বের করব।'

চিন্তায় ডুবে গেল দুই বিসিআই এজেন্ট। কয়েক মুহূর্ত পরেই সোহানার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'এয়ার-ভেন্টিলেশন, রানা! বাতাস চলাচলের জন্য ডাক্ট সিস্টেম আছে এখানে... একটা প্রান্ত সারফেসের কোথাও উঠেছে নিশ্চয়ই! ওটা ধরে বেরুনো যাবে!'

ছাতের দিকে চোখ ফেরাল রানা। ছোট্ট একটা ফোকর দেখা যাচ্ছে, ছাকনি নেই। ওটাই এয়ার-ভেন্টিলেশনের ডাক্ট, ওপাশে শাফট রয়েছে; ছাতের সমান্তরালে চলে গেছে ল্যাবের ভিতরদিকে, অন্ধকারে... কোথায় গিয়ে উঠেছে, কে জানে।

দু'হাতের আঙুল খাঁজে খাঁজে আটকে ঘোড়ার রেকাবের মত করে ধরল ও। সোহানাকে ইশারা করল উপরে উঠতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল সোহানা, রানার পাতা হাতে পা রেখে এক ঝটকায় উঠে গেল ডাক্টের মুখ বরাবর, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল কিনারা।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু জবাবটা শুনে খুশি হবে না,' সোহানা বলল। 'শাফটটা একেবারে সরু। তুমি তো দূরের কথা, এমনকী আমিও হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারব না। আটকে যাব।'

ওকে নামিয়ে আনল রানা। বিরক্ত সুরে বলল, 'আমেরিকান মুভি-মেকারদের ধরে চাবকানো দরকার। সিনেমার ডাক্টগুলো এত বড় দেখায় কেন? খামোকা মানুষকে ভুল ধারণা দেয়!'

'ওদের গালাগাল দিলে আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সোহানা। 'তোমার উর্বর মস্তিষ্কে অন্য কোনও আইডিয়া থাকলে শোনাও।'

'আইডিয়া নেই, তবে এটুকু বুঝতে পারছি—বেরুতে চাইলে সামনের দরজাটাই ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে,' বলল রানা।

'ওটা খুলছ কী করে?' জানতে চাইল সোহানা। 'বাইরে সেণ্ট্রি থাকবে, তাদেরকেই বা খালিহাতে সামলাবে কীভাবে?'

'একটা একটা করে সমাধান করি, কেমন? আগে দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করি, তারপর নাহয় বাইরের ওদের নিয়ে ভাবব।'

'দরজা খুলতে হলে ওই ডাইনিটার রিমোট-টা দরকার হবে তোমার।'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'আসল দরকার হলো ইলেকট্রিসিটি, সেটা এখানে আছে। রিমোট জিনিসটা মেইন কণ্ট্রোল হতে পারে না। ল্যাবের ভিতর-বাহির... দু'জায়গাতেই সুইচবোর্ড থাকবার কথা।'

'তুমি কি ভাবছ, সেটা আমাদের জন্য আস্ত রেখেছে ওরা?'

'দেখিই না, এসো।'

আলোটা টেনে নিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি গেল ওরা, ওখানে দেয়ালের গায়ে একটা খোলা কনসোল দেখা গেল। সুইচবোর্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে ভিতরে প্লাস্টিকের ক্যাপ লাগানো নানা রকম ওয়ায়্যারের সংযোগ রয়েছে।

শিস দিয়ে উঠল রানা। 'নাইস!' বুঝতে পারছে, সুইচবোর্ড না থাকলেও তারগুলোর সংযোগ এদিক-ওদিক করে খোলা যাবে দরজাটা।

সোহানাও বুঝেছে, কিন্তু খুশি হতে পারছে না। 'কিন্তু টেস্ট করতে গেলেই বাইরে দাঁড়ানো সেন্ট্রিরা স্ল্যাবের নড়াচড়া দেখতে পাবে।'

'পাবে না,' বলল রানা। 'আপাতত শুধু খোলার কায়দাটা বের করব। মোটরটা শব্দ করলেই সঙ্গে সঙ্গে কানেকশন কেটে দেব।'

'তাতে লাভ কী হবে? আমরা তো এখানেই থেকে যাচ্ছি।'

'পদ্ধতিটা সুযোগ বুঝে কাজে লাগাব আমরা... যখন সবকিছু অনুকূলে থাকবে।'

'তার আগেই কেমিক্যাল পুশ করে আমাদেরকে ভোঁতা করে ফেলবে ওরা।'

'সাহস রাখো, অমন কিছু ঘটবে না। আমি কথা দিচ্ছি!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল সোহানা। কনসোলের সামনে গিয়ে ওয়ায়্যারে হাত দিতে যাবে রানা, এমন সময় হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল মোটরে। প্রবেশপথের কংক্রিট স্ল্যাবটা সরে যেতে থাকল, ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যালোকের পটভূমিতে কয়েকটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল—ব্ল্যাক উইডো, অ্যান্থনি আর ছ'জন সৈনিক। নীচে নামতে যাচ্ছে ওরা।

তাড়াতাড়ি পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল রানা, বেল্টটা তুলে নিয়ে সোহানা-সহ পিছিয়ে গেল ছায়ায়, যাতে

ভিতরে ঢুকলেই ওদের দেখতে না পায় প্রতিপক্ষ। দ্রুত কিছু ভাবল ও, তারপর দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে কয়েকটা কাঠি সরাল, বাক্সের কিনার থেকে বারুদ মাখা কাগজও একটু ছিঁড়ে রাখল। সবশেষে বাক্সটা হাতের ভিতর দলামোচড়া করে ফেলল ও।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। একে একে লোকগুলো নেমে এল ল্যাবে। উঁচু গলায় ব্ল্যাক উইডো বলল, 'কোথায় তোমরা? বেরিয়ে এসো। নইলে কিন্তু ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করব!'

হুমকিটা অগ্রাহ্য করল না ওরা। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হলো প্রতিপক্ষের।

'ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি কেন?' নাক কোঁচকাল ব্ল্যাক উইডো, পরমুহূর্তে মেঝেতে পড়ে থাকা ছাইয়ের উপর দৃষ্টি গেল তার।

'অন্ধকার ভাল লাগে না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'তাই আলোর ব্যবস্থা করেছিলাম।'

'আগুন ধরিয়েছ কীভাবে?'

'দেশলাই।'

বিরক্ত চোখে অ্যান্থনির দিকে তাকাল ব্ল্যাক উইডো, দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা। একটু যেন কুঁকড়ে গেল বক্সার।

খোলা প্রবেশদ্বার দিয়ে আসা সূর্যের আভায় মোটামুটি ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে দলটাকে। তীক্ষ্ণ চোখে ওদের লক্ষ করল রানা। সৈনিকদের শরীরের আকার হঠাৎ করেই যেন কমে গেছে অনেকটা—ভিতরে পরা কেভলার ভেস্ট খুলে রেখে এসেছে তারা। কিছুটা গা-ছাড়া ভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে ওদের মধ্যে। ইউটিলিটি বেল্টে টু-ওয়ে রেডিও, বেরেটা পিস্তল, ফ্ল্যাশ-ব্যাং ক্যানিস্টার আর বাড়তি অ্যামিউনিশন প্রমাণ করছে যে, সাজসজ্জায় তেমন কমতি নেই; তারপরও ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে ধরা

তাদের সাব-মেশিনগান দেখিয়ে দিচ্ছে... কমতি রয়েছে উদ্যমে। লক্ষণটা শুভ, দুই বন্দিকে আর বড় কোনও থ্রেট ভাবছে না লোকগুলো। তাদের এই ভাবটাকে নিজেদের সুবিধায় ব্যবহার করা যাবে।

বক্সারের দিকে এবার নজর ফেরাল রানা। লোকটার ব্যাগি-প্যান্টের একটা পকেট ঝুলে রয়েছে ওজনে। রানা বা সোহানার সিগ-সাওয়ার সম্ভবত ওখানেই রেখেছে সে। আরেক পাশের পকেট থেকে বেরিয়ে আছে রানার এমারসন নাইফটার হাতল।

'ম্যাচটা দিয়ে দাও,' হুকুম দিল ব্ল্যাক উইডো।

দ্বিরুক্তি না করে মেয়েটার পায়ের কাছে ওটা ছুঁড়ে ফেলল ও। ভুরু কুঁচকে তোবড়ানো বাক্সটা তুলে নিল ব্ল্যাক উইডো। 'বাক্সটার এ-অবস্থা করেছ কেন?'

'পকেটে ম্যাচের বাক্স রেখে ক্রল করেছ কখনও?' হালকা গলায় বলল রানা। 'ওই অবস্থাই হয়।'

ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না যুবতী, বাক্সটা গুঁজে রাখল পকেটে। ওখান থেকে যে কাঠি এবং একটু কাগজ ছিঁড়ে রাখা হয়েছে, সেটা আর জানতে পারল না। বন্দিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরেকটা সুযোগ দিতে এসেছি। ডাক্তার এসে পড়লে কিন্তু ব্যাপারটা তোমাদের জন্য আর সুখকর থাকবে না...'

'হ্যাঁ, এমনিতে সুখের সাগরেই ভাসছি বটে!' বাঁকা উত্তর দিল রানা।

'ঠাট্টা বন্ধ করো!' ধমক দিল ব্ল্যাক উইডো। 'আমি রসিকতা পছন্দ করি না। তোমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছি, কাজেই আমাকে না-খ্যাপানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'বুঝলাম। তা... কী সাহায্য করতে এসেছ?'

'আমাদের সঙ্গে ল্যাপটপ কম্পিউটার আছে,' বলল ব্ল্যাক

উইডো। 'ইন্টারনেট ব্রাউজ করে কিছু তথ্য ডাউনলোড করে এনেছি। দেখো, এগুলো শুনে কিছু মনে করতে পারো কি না।' জ্যাকেটের পকেট থেকে কয়েকটা প্রিণ্টআউট বের করল সে। ট্রয় ডোনাহিউ। সোনালি-চুলের, সুদর্শন, লম্বা টিনেজ হার্টথ্রব; কাষ্ঠ-অভিনয়ের জন্য সমালোচিত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান। তাঁর সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবিগুলো হচ্ছে: *আ সামার প্লেস, সুজান স্লেড, প্যারিশ, রোম অ্যাডভেঞ্চার, পাম স্প্রিং উইকএণ্ড*... নাম কোনোটা তোমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে?'

'ছবির নাম আসলে ভাল করে দেখিনি আমি। তবে হ্যাঁ, নায়িকার নামটা বক্স থেকে পড়েছিলাম।'

'নায়িকাদের লিস্ট আছে আমার কাছে।' পাতা উল্টে পড়ল ব্ল্যাক উইডো, 'কনি স্টিভেনস্, স্যাণ্ড্রা ডি, সুজান প্লেশেট, স্টেফানি পাওয়ার্স...'

'স্যাণ্ড্রা ডি,' বলল রানা, মাঝে মাঝে সঠিক তথ্য দিয়ে শত্রুকে লেজে-খেলাচ্ছে ও। 'স্যাণ্ড্রা ডি-র সঙ্গে যে-ছবিটা করেছে।'

'*আ সামার প্লেস,*' প্রিণ্টআউট থেকে প্লট পড়ল ব্ল্যাক উইডো। 'মেইন-এর রিসর্ট শহরে ভালবাসার কাহিনি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'কী মনে হয় তোমার? সিদ্দিকী কি মেইনে যাবার স্বপ্ন দেখছিল?'

'সমস্ত ইনফরমেশন মিলিয়ে না দেখলে সেটা বলা মুশকিল,' নীরস গলায় জানাল রানা।

'হুম। ঠিক আছে, তা হলে ক্লিণ্ট ঈস্টউডের ছবি। থ্রিলার, তাই না?'

'অন্তত ওঅর মুভি বা ওয়েস্টার্ন ছিল না ওটা, আমি শিয়োর।'

নাম পড়তে শুরু করল ব্ল্যাক উইডো। '*ডার্টি হ্যারি?*'

'না।'

‘*ম্যাগনাম ফোর্স, দ্য এনফোর্সার, দ্য ডেড পুল।*’

‘উঁহুঁ।’

‘*দ্য আইগার স্যাঙ্কশন, প্লে মিস্টি ফর মি, থাণ্ডারবোল্ট অ্যাণ্ড লাইটফুট, টাইটরোপ।*’

‘একটাও না...’ বলতে বলতে মাথাটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল রানার। মনে পড়ে গেল ছবিটার নাম। চেহারায় অবশ্য এই আবিষ্কারের কোনও ছাপ ফুটতে দিল না, আগের মতই নির্বিকার রাখল মুখটাকে।

‘ভারি যন্ত্রণা তো!’ চেহারা বিকৃত করে ফেলল ব্ল্যাক উইডো। তারপর আবার পড়ল, ‘*দ্য গণ্টলেট, দ্য রুকি, ইন দ্য লাইন* অভ *ফায়ার।*’

‘নাহ্।’

‘*আ পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড, অ্যাবসলিউট পাওয়ার, ট্রু ক্রাইম, ব্লাড ওয়ার্ক।*’

আবার মাথা নাড়ল রানা।

রাগী ভঙ্গিতে কাগজগুলো জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ব্ল্যাক উইডো। হিসিয়ে উঠে বলল, ‘লিস্ট খতম, তোমাদের সঙ্গে আলোচনাও খতম। অসুবিধে নেই, আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে আমাদের ডাক্তার। তখন তুমি কীভাবে মুখ বন্ধ রাখো, তা-ই দেখব আমি।’

উল্টো-ঘুরে গটমট করে হেঁটে চলে গেল যুবতী, পিছু পিছু বাকিরা। প্রবেশপথের স্ল্যাবটা নেমে এসে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল ভিতরটা।

তেরো

এবার আগের চেয়েও গুমোট মনে হলো ভিতরটা। সোহানাকে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুনল রানা, যেন দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ স্বাভাবিক করবার জন্য ও বলল, 'যাক, অন্তত একটা সুখবর আছে।'

'আমার কল্পনাতে আসছে না, সেটা কী হতে পারে।' সোহানার কণ্ঠে হতাশা।

'আমাদের বেল্টগুলো নেয়নি ওরা।' দেয়াল হাতড়ে এগোতে শুরু করল রানা, যেখানে বেল্টটা ফেলে রেখেছিল, সেখানে গিয়ে থামল। পায়ের স্পর্শে জিনিসটা খুঁজে বের করল ও, তারপর নিচু হয়ে তুলে নিল হাতে। 'রিল্যাক্স,' সাহস জোগানোর সুরে বলল ও। 'আবার আলো জ্বালছি।'

'ম্যাচটা নিয়ে গেছে না?'

'সব কাঠি দিইনি।' আগুন জ্বালল রানা, তৃতীয় হাতাটা ব্যবহার করে আগের মত আবার মশাল তৈরি করল। কাঁপা কাঁপা আলোয় সোহানার ছাইবর্ণ চেহারাটা দেখতে পেল ও—মুখ শুকিয়ে গেছে দুশ্চিন্তায়। ওর ভিতরের সমস্ত আত্মবিশ্বাস আর সাহসে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে ফিয়ার-গ্যাস।

'খারাপ লাগছে?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'স্বাভাবিক, অ্যাড্রেনালিনের এফেক্ট ওটা।'

'মুখের ভিতরটা শুকিয়ে খটেখটে হয়ে আছে, রানা। একটু যদি পানি পেতাম... একটা যদি পানির কল থাকত...' বলতে বলতে থমকে গেল সোহানা। ওর চোখদুটোয় উজ্জ্বলতা ফুটতে দেখা গেল।

'কী?' সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'কল-টল সব খুলে নিয়ে গেছে ওরা, কিন্তু দেয়ালের ভিতরে বসানো পানির লাইন নিশ্চয়ই সরাতে পারেনি?'

'কী বলতে চাইছ?'

'কলের দরকার কী, রানা? শুধু লাইন দিয়ে পানি পেলেই একটা ফাঁদ তৈরি করতে পারি আমরা... ওদের জন্যে!'

সোহানার প্ল্যানটা এবার ধরতে পারল রানা। হেসে বলল, 'একেবারে ঠিক বলেছ।'

'কুইক, বাথরুমটা খুঁজে বের করতে হবে!'

মশাল নিয়ে দ্রুত পা চালাল ওরা, উঁকি দিয়ে দেখতে শুরু করল শূন্য ল্যাবের একটার পর একটা কামরা। করিডোরের শেষ মাথায় পাওয়া গেল বাথরুম। ভিতরে ফিক্সচার বলতে কিছু নেই, শুধু দেয়ালের গায়ে কয়েকটা লোহার ক্যাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওখানে শাওয়ার-ট্যাপ, ইত্যাদি লাগানো ছিল।

কাছে গিয়ে ক্যাপগুলো দেখল ওরা। বেশ শক্ত করে লাগানো হয়েছে, ভালমত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পানির পাইপের খোলা মুখ। খালি হাতে খোলা সম্ভব না কোনোমতেই। কী করা যায়, ভাবল রানা। একই সঙ্গে চোখ বোলাতে থাকল চারপাশে। সোহানার বেল্টের উপর নজর পড়তেই মুখে হাসি ফুটল। ছোট্ট বাকলটা মোটামুটি শক্তভাবেই এঁটে যাবে ক্যাপের চতুষ্কোণ মাথায়।

বাকলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। কাজটা সহজ নয়, ক্যাপের মাথায় আটকানো গেলেও চাপ দেয়ার মত যথেষ্ট জায়গা

নেই ছোট্ট জিনিসটাতে। চামড়ার বেল্টটাকে লিভারের মত ব্যবহার করল ও, কাজ যা হবার ওটুকুতে হচ্ছে। একটু পরেই কপালে ঘাম জমল ওর, হাতের মুঠি ব্যথা করতে শুরু করেছে, তবু হাল ছাড়ল না। অক্লান্ত চেষ্টার ফল মিলল একটু পরে। প্যাঁচ খুলে একটু ঢিল হলো ক্যাপটা, এরপর খালি হাতেই ঘুরিয়ে খুলে ফেলা গেল পুরোটা।

মুখ কালো হয়ে গেল সোহানার, খাটুনিটা মাঠে মারা গেছে, খোলা পাইপ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও বেরুচ্ছে না, ভিতরটা খটখটে শুকনো।

'মেইন ভালভ আছে নিশ্চয়ই,' অনুমান করল রানা। 'ওটা সম্ভবত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এসো খুঁজে দেখি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পাশের কামরায় উঁকি দিল ওরা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ওটাই ল্যাবের ইউটিলিটি রুম। মেঝে ফুঁড়ে উঠে আসা একটা মোটা পাইপ দেখা গেল, ছাতের কাছে গিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো পাইপের একটা নেটওয়ার্কে বিভক্ত হয়ে গেছে ওটা। ছোট পাইপগুলো চলে গেছে চারপাশের দেয়াল ভেদ করে।

'ওইত্তো!' আঙুল তুলে দেখাল সোহানা। মোটা পাইপের গায়ে মেইন ভালভটা দেখতে পেয়েছে।

ওটা ঘোরাতে বিশেষ শক্তি খরচ হলো না, দেড়-ফুট ব্যাসের হুইল ঘুরিয়ে সহজেই ভালভটা খুলে দেয়া গেল। পরমুহূর্তেই পানির প্রবাহের শব্দ শুনল ওরা, প্রথমে ধীরে... তারপর প্রবল বেগে বইতে শুরু করল পানি। কান পাতল দুই বিসিআই এজেন্ট, পাশের বাথরুম থেকে ভেসে আসছে মেঝেতে পানি ছলকানোর আওয়াজ—খোলা পাইপের মুখ দিয়ে পড়তে শুরু করেছে অঝোর ধারা।

মশালটা নিভে আসছে, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে শেষ হাতাটা বের করল রানা, বাকলে জড়িয়ে জ্বেলে দিল ওটা। সোহানার

দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কতটা সময় পেরিয়েছে?'

ঘড়ি দেখল সোহানা। 'দশ মিনিট।'

'তারমানে বিশ মিনিট পাব আমরা করিডোরটা পানিতে ভাসানোর জন্য। এসো।'

ইউটিলিটি রুম থেকে বেরিয়ে এল দুজনে, বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। দেখা গেল, খোলা পাইপ দিয়ে বেরুতে থাকা পানি শুধু মেঝের মাঝখানটা ভিজিয়েছে, তারপর বেরিয়ে যাচ্ছে এক কোণের ড্রেন দিয়ে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। তাড়াতাড়ি গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেটটা। সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমারটাও দাও।'

কথা না বলে খুলে দিল সোহানা। তারপর পাইপে মুখ লাগিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিল পানি।

জ্যাকেটদুটো নিয়ে ড্রেনের মুখের কাছে চলে গেল রানা, দলা পাকিয়ে বন্ধ করে দিল পানি বেরুনোর পথ। একটু পরেই ওখানটায় জমতে শুরু করল পানি, যাবার পথ না পেয়ে ছড়াতে শুরু করল পুরো বাথরুম জুড়ে, এদিকটা সয়লাব হয়ে গেলে খোলা দরজা দিয়ে করিডোরে বেরিয়ে যাবে।

ছড়াতে থাকা পানির দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত বোধ করল রানা—বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। শার্টটা খুলে সোহানার হাতে তুলে দিল ও, বলল, 'আগুনটা যেন না নেভে।' তারপর সোহানার বেল্ট নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। দ্রুত খুলে দিতে শুরু করল দেয়ালের গায়ে লাগানো সবক'টা ক্যাপ। একটু পরেই মোট চারটে পাইপ থেকে পানির ধারা বেরুতে শুরু করল। এবার খুব দ্রুতবেগে ছড়িয়ে যাচ্ছে পানি, করিডোর ভেসে যেতে সময় লাগবে না।

বাথরুম ছেড়ে আবার ইউটিলিটি রুমে ফিরে এল ওরা। একপাশের দেয়ালে ইলেকট্রিসিটির ব্রেকার-বক্স দেখেছে রানা

আগে, এগিয়ে গেল ওটার দিকে। দুটো তার বাছাই করল ও, তারপর টেনে সেগুলো বক্স থেকে বের করে আনতে শুরু করল। খেয়াল রাখল যেন ছিঁড়ে না যায়। তারদুটো মেঝের কাছাকাছি পৌঁছুতে থামল ও, দাঁত দিয়ে কামড়ে ডগার ইনসুলেশন কিছুটা আলাদা করল, খোলা জায়গাটায় হাত দিলে এবার শক খাবে যে-কেউ।

সোহানাও অবশ্য বসে নেই, রানার শার্ট ছিঁড়ে মশালটাকে টিকিয়ে রাখছে ও, মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে করিডোরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসা পানি নিজের পছন্দমত জায়গায় পা দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পর প্রস্তুতি শেষ হলো ওদের। কপাল ভাল বলতে হবে, কাজের মাঝখানে হাজির হয়ে বাগড়া দেয়নি ব্ল্যাক উইডো। ডাক্তার সম্ভবত দেরি করছে আসতে। শেষ বারের মত করিডোরটা দেখে ইউটিলিটি রুমে ফিরে এল রানা। নিভিয়ে ফেলল আগুন। ইতোমধ্যে ওখানেও পৌঁছে গেছে পানি, ব্রেকার-বক্সের নীচের মেঝে থইথই করছে। তারমধ্যে বিদ্যুতের তারদুটো ধরে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা।

মেইন ভালভ বন্ধ করে দিল রানা, তারপর এসে দাঁড়াল সোহানার পাশে। মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়া পাইপের সঙ্গে বেল্টদুটোর সাহায্যে দুটো লুপ তৈরি করল ও, সোহানার হাত থেকে এরপর নিয়ে নিল তারগুলো।

'সময় হয়েছে,' বলল রানা। 'তৈরি থাকো।'

'কী মনে হয়?' বলল সোহানা। 'কাজ হবে?'

'লেটস্ হোপ ফর দ্য বেস্ট।'

কচ্ছপের গতিতে গড়িয়ে চলল সময়। অস্বস্তিকর পরিবেশ, তা-ও কথা বলল না দুজনে। টেনশন বোধ করছে। এভাবে আরও দশটা মিনিট কাটবার পর নড়ে উঠল সোহানা। ফিসফিসিয়ে

বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

শুনেছে রানা। ল্যাবের প্রবেশপথের হাইড্রলিক মোটর জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, সরে যাচ্ছে স্ল্যাবটা। কংক্রিটের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে করিডোরে ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি দেখতে পেল ওরা। শোনা গেল ব্ল্যাক উইডোর কণ্ঠ।

'ডাক্তার এসে পড়েছে, বাছারা!'

সাড়া দিল না রানা-সোহানা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ওরা।

'কোথায় তোমরা?' বিরক্ত গলায় চেঁচাল ব্ল্যাক উইডো।

চুপ করে থাকল রানা-সোহানা।

'লুকোচুরি করলে কী ঘটবে, মনে আছে তোমাদের?'

জবাব দিল না ওরা।

'বেশ!' সরোষে বলল ব্ল্যাক উইডো। 'ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেডই তা হলে তোমাদের প্রাপ্য।'

করিডোর থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে বোঝা গেল, কানে ইয়ার-প্লাগ পরছে দলটার সবাই। আবছা আলোয় সোহানার দিকে তাকাল রানা, ইশারা করল দু'হাতে কান চেপে ধরে রাখতে। অবশ্য ইউটিলিটি রুমে যদি শেষ পর্যন্ত গ্রেনেড ফাটানো হয়, এই কান চেপে ধরায় কিছুই যাবে-আসবে না; ব্যাপারটা স্রেফ মনের শান্তির জন্য করা।

মহিলা এক কথার মানুষ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটল। প্রবেশপথের পাশের প্রথম কামরায় গ্রেনেড ফাটানো হয়েছে। এরপর সিরিজ বোমার মত ফাটতে শুরু করল ওগুলো। একটা-একটা করে কামরা পেরুচ্ছে শত্রুরা, আর গ্রেনেড ফাটাচ্ছে। প্রতিবারই বাড়ছে শব্দের প্রচণ্ডতা। একদিক থেকে খুশি হলো রানা। নিজেদের বাঁচানোর জন্য প্রতিপক্ষ ইয়ার-প্লাগ আর স্পেশাল গগলস্ ব্যবহার করছে। ওগুলোর

কারণে পানিতে পা ফেলার ছপছপ শব্দ শুনতে পাবে না ওরা, ফাঁদটা ঠিকমত দেখতেও পাবে না।

হঠাৎ থেমে গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। ব্ল্যাক উইডোর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। 'হোয়াট দ্য হেল... এখানে পানি এল কোত্থেকে? অ্যাই... ব্যাপারটা কী, দেখো তো!'

আর দেরি করা চলে না, সোহানার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা। এক লাফে যার যার মাথার উপরের লুপ আঁকড়ে ধরল দুজনে, জিমনাস্টের ভঙ্গিতে শরীর জাগিয়ে তুলল উপরে, হাঁটু ভাঁজ করে পানি থেকে দূরে রাখল পা। হাত থেকে তারদু'টো ফেলে দিল রানা।

দেখার মত একটা দৃশ্য সৃষ্টি হলো পানিতে। প্রথমে একটা-দুটো, তারপর শত-সহস্র আঁকাবাঁকা নীলচে রেখার ঝলকানি উঠল। জালের মত বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যেন, জীবন্ত সরীসৃপের মত নড়াচড়া করছে পানির বুকে। চোখের পলকে ইউটিলিটি রুম পেরিয়ে করিডোরে চলে গেল বিদ্যুতের রেখাগুলো।

গলা-ফাটানো আর্তনাদ শুনতে পেল রানা-সোহানা। করিডোর থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার, সেইসঙ্গে নানারকম শব্দ। খটাস খটাস করে মেঝেতে ধাতব শব্দ হলো—শত্রুপক্ষের হাত থেকে খসে পড়ছে মেশিনগান—ফ্ল্যাশলাইট থেকে শুরু করে সব ধরনের ইকুইপমেন্ট। গড়াতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের কাঁপা কাঁপা আলোয় করিডোরের দেয়ালে ছায়া দেখতে পেল রানা-সোহানা। একে একে ভূপাতিত হচ্ছে শত্রুদলের সদস্যরা, মেঝেতে পড়ে শরীর মোচড়াচ্ছে। একটা সাবমেশিনগানের টানা *ক্যাট-ক্যাট* শব্দে কানে তালা লেগে গেল, করিডোরের দেয়ালে ফুলকি তুলছে বুলেট-বৃষ্টি। হাত থেকে অস্ত্র ফেলেনি লোকটা, অদৃশ্য প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুঁড়ছে... কিংবা ইলেকট্রিক শকে নিজের অজান্তেই

ট্রিগারের উপর আঙুল চেপে বসেছে তার।

ম্যাগাজিন খালি হয়ে যেতেই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল। একটু অপেক্ষা করে ঝুলন্ত তারদুটো তুলে নিল রানা, তারপর নেমে এল মেঝেতে। ওর দেখাদেখি সোহানাও। তারদুটো গুটিয়ে ব্রেকার-বক্সের উপর তুলে রাখল রানা, বেরিয়ে এল ইউটিলিটি রুম থেকে।

ভেজা করিডোরে দশটা দেহ পড়ে থাকতে দেখল ওরা। ন'জনের গায়ে সামরিক পোশাক, শেষ লোকটা সুট-পরা। পাশে একটা ডাক্তারি ব্যাগ গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা এমপি-৫ সাবমেশিনগান তুলে নিল রানা, তাক করে রাখল অজ্ঞান শত্রুদের দিকে—যদি এখনও কারও হুঁশ থাকে, সে যেন কোনও ট্যাঁ-ফোঁ করতে না পারে। অ্যান্থনিকে দেখতে পেল ও, উপুড় হয়ে পড়ে আছে পানিতে। প্যান্টের পকেট ফুলে আছে যথারীতি।

'সিগ-সাওয়ারগুলো নাও,' সোহানাকে বলল রানা। 'আমার ছুরিটাও।'

পকেট হাতড়ে অ্যান্থনির কাছে একটামাত্র সিগ-সাওয়ার পেল সোহানা, অন্যটা সম্ভবত ব্ল্যাক উইডো নিয়ে গেছে। পিস্তলটা ওকে রাখতে বলল রানা, এমারসন নাইফটা গুঁজে রাখল নিজের কোমরে। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রানার, যখন খেয়াল করল—পড়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে কোনও নারী নেই। প্রমাদ গনল ও—যেভাবেই হোক, ব্ল্যাক উইডো ওদের ফাঁদটাকে ফাঁকি দিয়েছে।

আর দেরি করল না রানা, ছুট লাগাল ল্যাবের প্রবেশপথের দিকে। ওটা এখনও খোলা। সিঁড়ির উপরের ধাপে একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল ওর, প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। গুলি করল ও, মানুষটার পিছনে সিঁড়ির ধাপে ফুলকি তুলল বুলেট, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারল না।

ব্ল্যাক উইডোকে ডাইভ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল রানা, পরমুহূর্তেই গুঞ্জন উঠল ওপেনিং মেকানিজমে—স্ল্যাবটা নেমে আসতে শুরু করেছে। ডাইনিটা রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম চেপে দিয়েছে।

পাগলের মত ছুটল রানা, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশ। আর কিছুতেই বেরুতে পারবে না এই নরক থেকে। পিছনে সোহানার পায়ের শব্দ পেল ও, কিন্তু ওকে কিচ্ছু বলল না, সমস্ত মনোযোগ এখন বেরুনোর দিকে।

সিঁড়িতে পৌঁছে গেছে রানা, একেক লাফে দু-তিনটে করে ধাপ পেরুতে শুরু করল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্ল্যাবটাও নেমে আসছে। শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছুল, তখন ফাঁকাটার প্রস্থ মাত্র দু'ফুট। সার্কাসের অ্যাক্রোব্যাটের মত লাফ দিল ও, নিখুঁতভাবে জ্যা-মুক্ত তীরের মত পেরিয়ে গেল ফাঁকটা... আর ও পেরুতেই পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল স্ল্যাবের দরজা।

ঝট্ করে উঠে বসল রানা, উজ্জ্বল সূর্যালোকের সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করল না, চোখ ছোট করে তাকাল চারদিকে। হতচকিত চারজন সৈনিককে আবছাভাবে দেখতে পেল ও, চমক সামলে অস্ত্র তুলতে চেষ্টা করছে। তবে রানা ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত, নিমেষে হাতের সাবমেশিনগান সিধে করে গুলি চালাল।

কেভলার ভেস্ট-বিহীন বুকে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল একজন, উল্টে পড়ে গেল মাটিতে। আরেকজন অবশ্য অস্ত্র তুলতে পারল, তবে ট্রিগার চাপার আগেই রানার বুলেট তার থুতনি আর চোয়াল উড়িয়ে নিয়ে গেল। অবস্থা দেখে বাকি দুজন আর খোলা ময়দানে লড়াইয়ের চেষ্টা করল না। উল্টো ঘুরে সোজা ছুট লাগাল ফার্মহাউসের ধ্বংসস্তূপের পিছনে। রানাও উঠে দাঁড়াল, ছুটল কাভারের খোঁজে। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হবার আগে

ওদেরকে ধাওয়া করা, বা সম্মুখসমরে নামা-টা স্রেফ নির্বুদ্ধিতা হবে।

আস্তাবলের পাশে একটা পাথুরে চৌবাচ্চার পিছনে আড়াল নিল ও—ওটা ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করা হতো। জায়গাটায় পৌঁছেছে কি পৌঁছেনি, এমন সময় গর্জে উঠল মেশিনগান। দুই পলাতক পজিশন নিয়ে ফেলেছে ধ্বংসস্তূপে, ওখান থেকে ফায়ার শুরু করেছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, পাথরের চৌবাচ্চা সমস্ত বুলেট ঠেকাতে পারবে অবলীলায়, কাজেই অস্থির হবার কিছু নেই। একমাত্র চিন্তা ব্ল্যাক উইডোকে নিয়ে—ডাইনিটাকে দেখা যাচ্ছে না; কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে, কে জানে! দুই সৈনিক যেখানে পজিশন নিয়েছে, তার অন্যপাশ থেকে এগিয়ে এসে ওকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে হয়তো।

রানা বুঝতে পারল, চৌবাচ্চার পিছনে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। শত্রুরা ওকে ক্রসফায়ারে ফেলবার সুযোগ পেয়ে যাবে তা হলে। কিন্তু যাবেটা কোথায়? সোহানার জন্যও চিন্তা হচ্ছে। ল্যাবে আটকা পড়েছে ও, দরজাটা খুলতে হলে ব্ল্যাক উইডোর রিমোটটা প্রয়োজন হবে... এবং তাড়াতাড়ি। ভিতরের অচেতন সৈনিকরা জ্ঞান ফিরে পেলে মহাবিপদে পড়ে যাবে সোহানা। মিগ-সাওয়ারটা আছে বটে, হয়তো সৈনিকদের অস্ত্রগুলোও সরিয়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু সবাই মিলে হামলা করলে দুর্বল আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্দ্বিধায় গুলি চালাতে পারবে কি না সন্দেহ।

চৌবাচ্চার আড়াল থেকে একটু উঁকি দিল রানা। ব্ল্যাক উইডোর ফোর্ড এক্সপ্লোরার দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। পাশে একটা সবুজ রঙের স্টেশন ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে—ডাক্তার সম্ভবত ওটায় চড়ে এসেছে। ডাইনিটা কি ওগুলোর পিছনে লুকিয়েছে? এখান থেকে বোঝা সম্ভব নয়, গাড়িদুটো ওর বর্তমান

পজিশন থেকে বেশ দূরে। কাছে যাবার চেষ্টা করলে লুকানো দুই সৈনিকের সহজ শিকারে পরিণত হবে।

পরিস্থিতিটা বিচার করল রানা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ব্ল্যাক উইডোর দলের শুধু ওই দুই সৈনিকই এখন ওর প্রতিপক্ষ। বাকিরা ল্যাবের ভিতরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। তবে সংখ্যায় মাত্র দুজন হলেও এরা ঝানু লোক, সামলাতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে, সহায়তা লাগবে ভাগ্যেরও। হাতের এমপি-৫-টা পরীক্ষা করল রানা। ম্যাগাজিনে ত্রিশটা বুলেট থাকে, তবে এখন ক'টা আছে, সেটাই প্রশ্ন। ল্যাব থেকে বেরিয়ে তিনবার বার্স্ট চালিয়েছে ও, একেক বার্স্টে চারটার বেশি বুলেট খরচ হবার কথা নয়, ওভাবেই ট্রেইনিং পেয়েছে। তবে এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন—উত্তেজিত ছিল, হয়তো বা বেশি বুলেট ছুঁড়ে ফেলেছে। একটু বাড়িয়ে ধরল ও, তিন বার্স্টে আঠারোটা বুলেট খরচ হয়েছে বলে ভাবল। তারমানে আর বারোটা বুলেট রয়েছে ওর কাছে, দু-একটা বেশি হলে সেটা বোনাস। তবে আপাতত এগুলোই ওর সম্বল। সঙ্গে বাড়তি অ্যামিউনিশন নেই। হিসেব করে খরচ করতে হবে প্রত্যেকটি বুলেট।

সিলেকশন লিভারটা অটোমেটিক থেকে সিঙ্গেল-শটে নামিয়ে আনল রানা। তারপর চৌবাচ্চার পিছনের জমিতে নজর বোলাল। কয়েক গজ দূরত্বে একটা নালা চোখে পড়ল—আস্তাবলের ময়লা পানি আর পশু-বর্জ্য যাবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। খুব একটা গভীর নয়, তবে বুকে ভর দিয়ে ক্রল করলে শরীর লুকানো যাবে। ওটা ব্যবহার করেই পজিশন পাল্টাবে বলে ঠিক করল। তার আগে প্রতিপক্ষকে একটু ধোঁকা দেয়া দরকার, বোঝানো দরকার—ও এখানে থেকেই লড়াইয়ের পরিকল্পনা করছে।

মাটি থেকে এক মুঠো নুড়িপাথর তুলে নিল রানা, ছুঁড়ে দিল বামপাশে। এমনভাবে ওগুলো পড়ল, যেন পায়ের শব্দ হচ্ছে,

দৌড়ে পালাতে চাইছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে শরীর জাগাল এক সৈনিক, রানা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে ভুল দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না রানা। নিজের এমপি-৫ তুলে ফায়ার করল ও, তবে তাড়াহুড়োয় ঠিকমত নিশানা ভেদ করতে পারল না। কাঁধে গুলির আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, ধপ্ করে বসে পড়ল। ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা—লোকটাকে অচল করতে পারেনি। পারলে লড়াইয়ের ফলাফল ওর অনুকূলে চলে আসত অনেকটাই।

অবশ্য একেবারে ব্যর্থ হলো না পরিকল্পনাটা। গুলি খেয়ে খেপে গেছে সৈনিক আর তার অক্ষত সঙ্গী। তুমুল বর্ষণের মত চৌবাচ্চার দিকে গুলি ছুঁড়ছে তারা, রানা যে সটকে পড়তে পারে, সেটা আর ভাবছেই না। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে গেছে দুজন।

হামাগুড়ি দিয়ে নালায় নেমে পড়ল রানা, বুক মিশিয়ে সরে যেতে শুরু করল। অল্পক্ষণেই নালার শক্ত তলদেশে ঘষা খেয়ে বুকের চামড়ায় জ্বালাপোড়া শুরু হলো, তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও। দাঁতে দাঁত পিষে এগিয়ে চলল। ফার্মহাউসের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে নালাটা, সৌভাগ্যক্রমে ওটার কাছাকাছি পজিশন নেয়নি দুই সৈনিকের কেউ। ফাঁকি দিয়ে উল্টোদিকে চলে যেতে অসুবিধে হবে না।

মিনিট দশেক পরেই পোড়া ফার্মহাউসের সামনে পৌঁছে গেল ও, শুটারদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। নালা ছেড়ে উঠে পড়ল, সামনে দেখতে পেল ওর আর সোহানার টরাস গাড়িটা—পাহাড়ের ফাটল থেকে নিয়ে এসেছে শত্রুরা। মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল রানার—পালানোর জন্য নিজস্ব গাড়িটা নাগালের মধ্যে পেয়ে। তবে আগে সোহানাকে উদ্ধার করতে হবে।

বামদিক দিয়ে ফার্মহাউসের সামনে উঠে এসেছে ও, এবার

একছুটে চলে গেল ডানে। দেয়ালের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল। ফোর্ড এক্সপ্লোরার আর সবুজ স্টেশন ওয়্যাগনটা বেশ কাছে এখান থেকে, তবে গাড়িগুলোর আড়ালে কেউ আছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা, তাকাল গাড়িদুটোর তলা দিয়ে।

ব্ল্যাক উইডোর বুটজোড়া চিনতে পারল ও; জ্যাকেটের নীচটাও চোখে পড়ল। সামনের চাকার কাছে নিচু হয়ে বসে আছে মেয়েটা। বুদ্ধিমতী, জানে—বনেটের পাশটাই আড়াল নেবার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা; শক্তিশালী বুলেট ছুঁড়েও ইঞ্জিন এফোঁড়-ওফোঁড় করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় অন্যপাশে লুকানো কাউকে আহত করা। উইণ্ডশিল্ড আর জানালার কাঁচ ভেদ করে ব্ল্যাক উইডোর সোনালি চুল দেখা গেল একটু—মাঝে মাঝে মাথা তুলে পাথুরে চৌবাচ্চার দিকে তাকাচ্ছে সে।

চমৎকার একটা পজিশনে রয়েছে রানা, ওকে দেখতে পাচ্ছে না ব্ল্যাক উইডো, অথচ ও দেখছে। এমপি-৫-টা তুলে ধরল ও, সাবধানে নিশানা করল বনেটের উপরে। আবার ডাইনিটা মাথা তুললেই গুলি করবে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকল রানা, তারপর হঠাৎই আবার দেখতে পেল সোনালি চুল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার চাপল ও। বজ্রপাতের মত শব্দ তুলে ছুটল বুলেট, তবে ব্ল্যাক উইডোর কপাল ভাল, সেই সঙ্গে রিফ্লেক্সও... নড়ে উঠল শব্দটা কানে যেতে। বেঁচে গেল সেজন্যেই। তারপরও আহত হলো অবশ্য—খুলিতে আঁচড় কেটে চলে গেল গুলিটা।

চিত হয়ে ব্ল্যাক উইডোকে পড়ে যেতে দেখল রানা—ব্যথায় চেহারা কুঁচকে গেছে। খুশি-অখুশি কিছুই হলো না ও, শান্তভাবে দ্বিতীয় গুলিটা করবার জন্য তৈরি হলো। মাটিতে শুয়ে পড়ায় ফোর্ড এক্সপ্লোরারের তলা দিয়ে এখন যুবতীর শরীরের

বেশিরভাগটাই ক্লিয়ার ফায়ারিং লাইনে এসে গেছে।

তবে ব্ল্যাক উইডোও কম যায় না, শুয়ে পড়েই পিস্তল-ধরা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে গাড়ির তলা দিয়ে, সোজা রানাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গড়ান দিয়ে বুলেটটাকে ফাঁকি দিল রানা। সোজা হবার সময় পেল না, শুনতে পেল ব্ল্যাক উইডোর উন্মত্ত চিৎকার।

'বেজন্মাটা এদিকে! বাড়ির সামনে!'

দুই সৈনিকের মুখোমুখি হবার ঝুঁকি নিল না রানা, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে আবার চলে গেল ফার্মহাউসের বামদিকে—যেদিক দিয়ে এসেছে। থামল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পরপর দুটো কোনা পেরুল, চলে গেল বাড়ির পিছনে। অক্ষত সৈনিক ততক্ষণে নেত্রীর চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে, পায়ে পায়ে এগোচ্ছে বাড়ির ডানদিকে। লোকটার পিছনে গিয়ে উদয় হলো ও।

পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠল লোকটা, উল্টো ঘুরে ঠেকাতে গেল আক্রমণ, তবে দেরি করে ফেলেছে। পর পর তিনটে গুলি ছুঁড়ল রানা—কপাল, বুক আর তলপেট লক্ষ্য করে। নাইন মিলিমিটারের তিন আঘাতে মাটিছাড়া হলো সৈনিক, কয়েক হাত দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

গুলি থামাল না রানা, পালা করে ব্ল্যাক উইডো আর আহত সৈনিকের অবস্থান লক্ষ্য করে ফায়ার করতে থাকল, সেই সঙ্গে এগিয়ে গেল মৃত সৈনিকের দিকে। ওখানে পৌঁছে হাতের এমপি-৫-টা ফেলে দিল, তুলে নিল অন্যটা, লোকটার কোমর থেকে বাড়তি ম্যাগাজিন-ও নিয়ে পকেটস্থ করল। তারপর আবার গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছিয়ে এল বাড়ির কোনায়।

এতক্ষণে একটু দম ফেলবার ফুরসত মিলল। তাড়াহুড়োয় গেল না রানা—দুই শত্রু অবশিষ্ট রয়েছে, দুজনকেই আহত

করেছে ও। কাজেই রক্তক্ষরণে ওদেরকে একটু দুর্বল হতে দেয়া যাক, তারপর নাহয় আবার হামলা করা যাবে। ততক্ষণ বিশ্রাম নেবে বলে ঠিক করল।

বিশ্রামটা দীর্ঘ হলো না। হঠাৎ মোটরের গুঞ্জন শুনে চমকে উঠল রানা।

ল্যাবের প্রবেশপথের স্ল্যাবটা সরে যেতে শুরু করেছে!

চোদ্দো

এক মুহূর্তের জন্য স্থির রইল রানা, তারপরই শঙ্কিত হয়ে পড়ল। বাইরে বেরুলেই বিপদে পড়বে সোহানা। সেজন্যেই নিশ্চয়ই রিমোটের বোতাম চেপেছে ব্ল্যাক উইডো—ওকে বেরিয়ে আসার জন্য প্ররোচিত করছে। বেরুলেই খুন, কিংবা জিম্মি করবে।

স্ল্যাবটা সরে যেতেই সিঁড়ির মাথায় সামান্য নড়াচড়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় চেঁচাল রানা, 'সোহানা! বেরিয়ো না!'

চিৎকারটা দিয়েই ঝট্ করে বসে পড়ল ও। প্রায় একই সঙ্গে দুই পশলা গুলি ছুটে এল—একটা সাব-মেশিনগানের, অন্যটা পিস্তলের। ওর অবস্থান বুঝতে পেরে গুলি চালিয়েছে ব্ল্যাক উইডো আর আহত সৈনিক। ফার্মহাউসের পোড়া, দুর্বল দেয়াল এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে গেল বুলেটগুলো, বসে না পড়লে লাশ হয়ে যেত রানা।

হামাগুড়ি দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল ও। আবার চেঁচাল, 'সোহানা! শুনতে পাচ্ছ? বেরিয়ো না ওখান থেকে!'

এবার আর গুলি হলো না—ব্ল্যাক উইডো ও তার সঙ্গী অ্যামিউনিশন বাঁচাচ্ছে।

সোহানার গলা আবছাভাবে শোনা গেল আস্তাবলের দিক থেকে, বাংলাতে কথা বলছে ও-ও। 'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একা তুমি ওদেরকে সামলাতে পারবে?'

'পারব। মাত্র দুজন ওপরে। তুমি ওখানেই থাকো। বেরুলেই ডাইনিটা গুলি করবে তোমাকে। সেজন্যেই খুলে দিয়েছে এণ্ট্রান্স।'

'ও খোলেনি, আমিই খুলেছি।'

'কী?' বিস্মিত হলো রানা।

'ওই যে, ইলেকট্রিকের ওয়ায়্যার জোড়া দিয়ে খোলার প্ল্যান করেছিলে না?'

'খুব ভাল। মাথা নামিয়ে রাখো... আরও ভাল হয় যদি নীচে চলে যাও। নইলে এণ্ট্রান্সের দিকে ওরা গুলি করলে রিকোশেটে আহত হবে।'

একটু নিশ্চুপ রইল সোহানা, কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'নীচে যেতে হবে না, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ওরা দুজন কোথায় আছে, বলতে পারবে?'

'ডাইনিটা তোমার ডানে, ওর গাড়ির পিছনে। সঙ্গের লোকটা ল্যাবের এণ্ট্রান্স থেকে একটু বাঁয়ে ফার্মহাউসের আড়ালে।'

'ওদের গাড়িটা কি আগের জায়গাতেই আছে? মানে... যেখানে পার্ক করেছিল?'

'হ্যাঁ। কেন?'

খুলে বলল সোহানা। শেষে যোগ করল, 'কয়েক মিনিট সময় দাও আমাকে। তারপর ইশারা দিলেই ফায়ার করতে রেডি থেকো।'

এমপি-৫-এর ম্যাগাজিন খুলে অ্যামিউনিশন চেক করে নিল

রানা। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল নালায়। ফার্মহাউসের আড়াল থেকে ওর উদয় হবার অপেক্ষায় আছে প্রতিপক্ষ, নালা থেকে নয়। ওদেরকে চমকে দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে চাইছে।

একটু পরেই শোনা গেল সোহানার ডাক, 'তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

'এক থেকে পাঁচ গোনো।'

দম আটকে কাউণ্টডাউন শুরু করল রানা, গোনা শেষ হতেই ল্যাবের এণ্ট্রান্স থেকে দুটো ডিমের মত বস্তু উড়ে বেরুল—সোজা গিয়ে পড়ল আহত সৈনিকের পজিশনের কাছাকাছি। *ধাম্ ধাম্* করে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল, সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো! ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ছুঁড়ছে সোহানা।

প্রথম দুটো বিস্ফোরণের রেশ না মিটতেই আরও দুটো ছুঁড়ল ও। প্রথমবার টার্গেট থেকে একটু দূরে পড়েছিল, তবে এবার থ্রোয়িঙে প্রয়োজনীয় কারেকশন দিয়ে নিয়েছে, তাই বলতে গেলে লোকটার পায়ের কাছে পড়ল গ্রেনেডদুটো।

দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণের সঙ্গে আর্তনাদ শুনতে পেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। দেখল, দুহাতে কান চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে সৈনিক, ফ্ল্যাশ-ব্যাং বিস্ফোরণে সাময়িকভাবে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে সে। তবে লোকটা দুনিয়ার সেরা ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধা... স্পেশাল-অপসের সদস্য... তাই কিছু দেখতে-শুনতে না পেলেও শুধু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝে ফেলল রানার অবস্থান। কান ছেড়ে দিয়ে মাতালের মত কাঁধে-ঝোলানো সাবমেশিনগান তুলতে শুরু করল।

নির্দ্বিধায় গুলি ছুঁড়ল রানা। সৈনিকের বুকে তিনটে ক্ষত সৃষ্টি হলো, বুলেটের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ভিতর আছড়ে পড়ল ওর শরীরটা।

সোহানা অবশ্য হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর এবারকার টার্গেট

ব্ল্যাক উইডো। জোড়ায় জোড়ায় ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড ছুঁড়ছে ও পার্ক-করা ফোর্ড এক্সপ্লোরারের অবস্থান আন্দাজ করে। একের পর এক বিস্ফোরণে কান ঝালাপালা, ওদিকে এগোনোও যাবে না। তাই নালা ছেড়ে ছুটতে শুরু করল রানা, আগেরবারের মত ফার্মহাউসের পাশ ঘুরে সামনের দিক দিয়ে চলে গেল অপরপ্রান্তে। ওখান থেকে ব্ল্যাক উইডোর অবস্থা দেখবে, প্রয়োজনে ঘায়েল করবে।

ততক্ষণে গ্রেনেড-বর্ষণ কমিয়ে ফেলেছে সোহানা, রানা যখন ফার্মহাউসের পাশ থেকে গাড়িটার দিকে উঁকি দিল, তখন আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না কারও। চেঁচিয়ে সোহানাকে থামতে বলল ও, তারপর বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে। পায়ে পায়ে এগোল ফোর্ডের দিকে। যতই কাছে গেল, ততই বিস্মিত বোধ করল—আমেরিকান যুবতীটির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। যেভাবে গ্রেনেড ছুঁড়েছে সোহানা, তাতে পালাবার কোনও সুযোগ ছিল না। এতক্ষণে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবার কথা। কিন্তু নেই তো! গেল কোথায়?

হঠাৎ চমকে উঠল রানা—ব্ল্যাক উইডোকে দেখতে পেয়েছে। ফোর্ডের ড্রাইভিং সিটের উপর শুয়ে ছিল মেয়েটা, ও কাছাকাছি পৌঁছুতেই উঠে বসেছে। মাথার একপাশের চুল সামান্য রক্তে ভেজা, রানার বুলেট আঁচড় কেটেছিল ওখানটায়, নইলে পুরোপুরি সুস্থ সে। কারণটা ব্যাখ্যা করবার জন্যই যেন কানে হাত দিল ব্ল্যাক উইডো, বের করে আনল একটা ইয়ার-প্লাগ। অন্য হাতে একটা স্পেশাল গগলস্ তুলে দেখাল। চালু মেয়ে, রানা-সোহানার বাংলা কথোপকথন বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু সতর্ক হয়ে গিয়েছিল ওরা কোনও ফন্দি আঁটছে বুঝতে পেরে। সোহানা প্রথম গ্রেনেড-জোড়া ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার-প্লাগ আর গগলস্ পরে ফেলেছিল। কিন্তু এতক্ষণ অপেক্ষা করল কেন? আরও আগেই

পালিয়ে যেতে পারত না?

জবাবটা পরমুহূর্তে পাওয়া গেল। ইগনিশন-কি ঘুরিয়ে ফোর্ড এক্সপ্লোরারের ইঞ্জিন চালু করল ব্ল্যাক উইডো, গিয়ার দিয়ে সবেগে ছুটে এল রানার দিকে, ওকে চাপা দিতে চাইছে। এই মতলবেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, ওকে খতম করার জন্য ফাঁদ পেতে বসে ছিল।

ছুটে আসা ফোর্ডের সামনে নিজেকে নাঙ্গা মনে হলো রানার, পুরোপুরি উন্মুক্ত জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ও ব্ল্যাক উইডো ঘায়েল হয়েছে ভেবে; নাগালের মধ্যে একটুও আড়াল নেই। এমপি-৫ তুলে গুলি করল... ইঞ্জিন বিকল করে দিতে চায়, কিন্তু ফুলকি তুলে ছিটকে গেল বুলেট। মিলিটারি ভেহিকেলটার সমস্ত শরীর আর্মার-প্লেটে মোড়া। আবার গুলি করল ও—এবার উইণ্ডশিল্ডে। শুধু সামান্য চিড় ধরল কাঁচে—ওটাও বুলেটপ্রুফ। তবে হাল ছাড়ল না রানা, জানে—যত শক্তিশালী কাঁচই হোক, ছ'ইঞ্চি ব্যাসের মধ্যে পর পর পাঁচটা গুলি করলে তা গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য। দক্ষ মার্কসম্যান ও, কাজটা ওর জন্যে কঠিন কিছু নয়।

প্রায় গায়ের উপর চড়ে বসা ফোর্ড এক্সপ্লোরারের উইণ্ডশিল্ডে গুলি করতে থাকল রানা, চোখের সামনে কাঁচের গায়ে মাকড়সার জালের মত ফাটল ধরতে দেখল। তবে ভাগ্য মন্দ থাকলে যা হয়, চারটে গুলি করবার পরেই খালি চেম্বারে ঠকাস করে পড়ল হ্যামার—উত্তেজনায় ম্যাগাজিন বদলাতে ভুলে গেছে ও, ফুরিয়ে গেছে অ্যামিউনিশন।

আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রানাকে চাপা দেবে ব্ল্যাক উইডো। হাত থেকে এমপি-৫-টা ফেলে দিল ও, উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল, পিছু পিছু ধাওয়া করে এল ফোর্ড। রাগবি খেলোয়াড়ের মত ডানে কাটাল রানা... বাঁয়ে কাটাল, কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। ব্ল্যাক উইডো দক্ষ চালক, ঘন ঘন ব্রেক

কষে আর স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ট্র্যাকে রাখল গাড়ি।

ইঞ্জিনের তীব্র গর্জন বেড়ে যেতে শুনে এক পলকের জন্য পিছনে তাকাল রানা; আঁতকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর শরীরের উপর উঠে আসছে ফোর্ড। মরিয়া হয়ে ডানে ঝাঁপ দিল ও, গড়ান দিয়ে সরে গেল গাড়ির সামনে থেকে। ওর শরীরের ছ'ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল ফোর্ডের চাকা, এক ঝলকের জন্য টায়ারের খাঁজগুলোও স্পষ্ট দেখা গেল।

মাটি থেকে উড়তে থাকা ধুলো নাকে-মুখে ঢুকতেই কাশতে শুরু করল রানা। চোখেও ঝাপসা দেখছে। উঠে বসে ধাতস্থ হলো ও, হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখ রগড়াল। ধুলো সরে যেতেই আবার দেখতে পেল ফোর্ড গাড়িটাকে—টার্ন নিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, ইঞ্জিন আইডলে রেখে। ইঁদুর-বেড়াল খেলতে শুরু করেছে ব্ল্যাক উইডো—ফাটা উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে তার মুখে হিংস্র হাসি দেখা গেল। শিকারকে বাগে পেয়েছে সে—রানা এখন নিরস্ত্র, ক্লান্ত এবং খোলা ময়দানের মাঝখানে।

অ্যাকসেলারেটর চেপে ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনাল ব্ল্যাক উইডো, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে। উঠে দাঁড়াল রানা, সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুটে এল ফোর্ড... তীরবেগে! এঁকে-বেঁকে ফার্মহাউসের দিকে দৌড়াতে থাকল ও, ওখানে পৌঁছুতে পারলে একটা আড়াল পাওয়া যাবে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই পরিষ্কার হয়ে গেল, পৌঁছুনো সম্ভব নয়। হাপরের মত উঠছে নামছে রানার বুক, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। পিছনে ফোর্ডের ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে যেতে শুনল ও, সরে যাবার মত শক্তি অনুভব করল না।

ঠিক তখুনি ফার্মহাউসের পাশ থেকে একটা নারীমূর্তি উদয় হতে দেখল রানা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শুনতে পেল—'রানা! ক্যাচ!!'

সোনালি রোদে ঝিলিক দিয়ে সিগ-সাওয়ারটাকে উড়ে আসতে দেখল রানা, নিখুঁত নিশানায় একেবারে ওর গায়ে পড়তে যাচ্ছে। ঝাঁপ দিল ও, খপ করে ধরল পিস্তলটা; তারপর দক্ষ অ্যাক্রোব্যাটের মত শূন্যেই মোচড় খাওয়াল শরীরকে। দর্শনীয় ভঙ্গিতে ফোর্ডের দিকে ঘুরে গেল রানা, মাটিতে পড়তে পড়তে গুলি ছুঁড়ল।

উইণ্ডশিল্ডে পঞ্চম শট এটা, ব্ল্যাক উইডোর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে চুরমার হয়ে গেল বুলেটপ্রুফ গ্লাস, বিশাল একটা ফোকর সৃষ্টি হলো ওখানে। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে ওই ফাঁক দিয়ে আরও দুটো গুলি ঢোকাল রানা।

চমৎকার রিফ্লেক্স আরেকবার জীবন বাঁচাল ব্ল্যাক উইডোর। ঝট্ করে নড়ে গিয়ে বুলেটকে ফাঁকি দিল সে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে ঘুরিয়ে ফেলল স্টিয়ারিং—বিপদ থেকে সরে যাবার চেষ্টা। স্কিড করে ঘুরে গেল ফোর্ড, মাটিতে পড়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করছিল রানা, গাড়ির রিয়ার-এণ্ড এসে ধাক্কা দিল ওকে। উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়ল ও।

ব্যথাটা নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, ঝট্ করে উঠে বসে আবার গুলি চালাল। ফোর্ডের পিছনের উইণ্ডশিল্ডে কামড় বসাল সিগ-সাওয়ারের বুলেট, তবে তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারল না। হাত কাঁপছে রানার, নির্দিষ্ট বৃত্তে থাকছে না গুলি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার গাড়ির মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করল ব্ল্যাক উইডো, রানার দিকে আবার ছুটে আসার ইচ্ছে।

ইচ্ছেটাতে বাদ সাধল নতুন করে ছুটে আসা এক পশলা গুলি। দ্বিতীয় সৈনিকের এমপি-৫-টা জোগাড় করেছে সোহানা, ওটা ব্যবহার করছে। বেগতিক পরিস্থিতি বুঝতে কষ্ট হলো না ব্ল্যাক উইডোর—দ্বিমুখী আক্রমণে ফোর্ডের একটা কাঁচও টিকবে না; তারমানে মোরব্বা হয়ে যেতে হবে তাকে। কাজেই দুঃসাহস

দেখাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার পথে উঠল ফোর্ড, ধুলো উড়িয়ে চলে গেল দৃষ্টিসীমা ছেড়ে। পিছন থেকে খামোকাই গুলি ছুঁড়ল রানা-সোহানা, ফায়ারিং-সার্কেল মেইনটেন করতে না পারায় বুলেটপ্রুফ কাঁচ আর আর্মার-প্লেটেড চেসিসে মাথা কুটে মরল বুলেটগুলো।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই চাপা একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল, ব্ল্যাক উইডো পালিয়ে যেতেই বেড়ে গেল শব্দটা—রোটরের ভারী আওয়াজ চিনতে পারল রানা, একটা হেলিকপ্টার আসছে। শঙ্কা ভর করল মাথায়, কে আসছে... ব্ল্যাক উইডোর দলের রি-এনফোর্সমেন্ট নয়তো! বুকটা ব্যথায় দপ্ দপ্ করে উঠল হঠাৎ করে—ফোর্ড এক্সপ্লোরারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল যেখানটায়। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে কি না, কে জানে।

আবার গাড়ির আওয়াজ পেল রানা, কয়েক মুহূর্ত পর পাশে এসে থামল টরাস, সোহানা ড্রাইভিং সিটে। 'উঠে এসো,' বলল ও। 'হেলিকপ্টার আসছে...'

'শুনেছি।' দেরি না করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, প্যাসেঞ্জার সিটে বসল সোহানার পাশে। 'চালাও!'

অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল সোহানা, টায়ারের কর্কশ শব্দ উঠল শক্ত মাটিতে, ধুলো উড়ল। তীরের মত সামনে বাড়ল টরাস। ব্ল্যাক উইডোর পথ ধরে বেরিয়ে এল উপত্যকা থেকে। আঁকা-বাঁকা রাস্তায় ঘন ঘন টার্ন নিতে শুরু করল সোহানা, যত দ্রুত পারে এলাকা থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে।

'সাবধানে চালাও,' সতর্ক করল রানা। 'অ্যাকসিডেন্ট কোরো না।'

'কেন, আমার ড্রাইভিঙে তোমার আস্থা নেই?'

জবাব না দিয়ে গ্লাভ-কম্পার্টমেন্ট খুলল রানা, ওখান থেকে

স্পেয়ার-ক্লিপ বের করে হাতের সিগ-সাওয়ারটা রিলোড করল। বলল, 'আমি এ-পাশটা দেখছি, তুমি তোমার সাইডে চোখ রাখো। ডাইনিটা আমাদের জন্য অ্যামবুশ পেতে বসে থাকতে পারে।'

এক পলকের জন্য পাশে তাকাল সোহানা। পেরোতে থাকা ঘন গাছগাছালি আর আগাছার জঙ্গল দেখে শুকনো গলায় বলল, 'লুকানোর জায়গার অভাব হবে না ওর। অবস্থা দেখেছ? এ-জঙ্গলে গোটা এক প্লাটুন সৈন্য লুকালেও বোঝার উপায় নেই।'

'আছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'পিছনে চিহ্ন রেখে গেছে ও।' আঙুল তুলে সামনে দেখাল—রাস্তার উপরে ব্ল্যাক উইডোর ফোর্ডের উড়িয়ে যাওয়া ধুলো এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, ব্যাপারটা খেয়াল করেনি আগে।

একটু পরেই একটা ইন্টারসেকশনে পৌঁছুল গাড়ি। উপত্যকার রাস্তা ওখানে মেইন রোডের সঙ্গে মিশেছে। পিচ-ঢালা রাস্তা একেবারে ফকফকে পরিষ্কার, তাই ধুলো ওড়েনি; বোঝা যাচ্ছে না—ব্ল্যাক উইডো ডানে, নাকি বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। টায়ার ট্র্যাক আছে কি না, দেখল রানা; তবে লাভ হলো না। ডান-বাম দু'দিকেই বেশ কিছু ধুলোমাখা চাকার দাগ চলে গেছে। ওর ভিতর কোনটা যে ব্ল্যাক উইডোর, তা বোঝা সম্ভব নয়।

গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে সোহানা, রানার মত ও-ও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

'বাঁয়ে যাও,' বলল রানা, সিদ্ধান্তটা অনুমান-নির্ভর।

মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল সোহানা, টার্ন নিল বামদিকে। রাস্তায় উঠে এসেই মেঝেতে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। মসৃণ রাস্তায় দেখতে দেখতে একশো কিলোমিটারে পৌঁছে গেল গতি, দু'পাশের গাছপালা এখন সাঁই সাঁই করে সরে যাচ্ছে পিছনে, ঘোলাটে দেখাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করল রানা, এই গতিতে ছুটতে

পারলে অ্যামবুশ পেতে সুবিধে করতে পারবে না কেউ। চোখের পলকে যে-কোনও ফাঁদ পেরিয়ে যেতে পারবে ওরা, ঝড়ের বেগে ছুটতে থাকা টার্গেটে গুলিও লাগাতে পারবে না শত্রুপক্ষ।

খানিক দূর যেতেই আবার ইণ্টারসেকশন উদয় হলো। এবারেরটা আগের চেয়ে জটিল—চারদিকে চলে গেছে চারটে রাস্তা। দ্বিধা ভর করল সোহানার চেহারায়। রানার দিকে আবার তাকাল সিদ্ধান্তের আশায়।

'বাঁয়ে,' স্থির গলায় বলল রানা।

'বার বার বাঁয়ে যাবার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ আছে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'জুয়া খেলছি বলতে পারো। ডাইনিটাকে পেলে ভাল, না পেলেও কিছু করার নেই।'

শ্রাগ করে আবার বাঁয়ের পথটা ধরল সোহানা। টানা দশ মিনিট সাপের মত আঁকা-বাঁকা রাস্তা পাড়ি দেয়ার পর পার্বত্য এলাকা থেকে বেরিয়ে এল টরাস, নেমে এল সমতল ভূমিতে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর দেখতে পেল ওরা, মাঝখানটা চিরে চলে গেছে উঁচু হাইওয়ে। যতদূর দৃষ্টি যায়, আতিপাতি করে খুঁজল ওরা, কিন্তু ব্ল্যাক উইডো বা তার ফোর্ড এক্সপ্লোরারের চিহ্নও দেখা গেল না কোথাও।

'কী করব?' হাঁপিয়ে উঠে জানতে চাইল সোহানা।

মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা—কাঁপতে শুরু করেছে সোহানা। এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে ঢিল পড়ায় আবার ভীতিবোধটা ফিরে আসছে ওর মধ্যে। নরম গলায় রানা বলল, 'কিছু না। ডাইনিটা পালিয়ে গেছে, আপাতত কিছু করার নেই ও-ব্যাপারে। এক্ষুনি মাথা না ঘামিয়ে বরং একটু সুস্থির হয়ে নিই। নার্ভগুলোর বিশ্রাম প্রয়োজন।'

'হেলিকপ্টারটা যদি এদিকে চলে আসে?'

মিলিয়ে আসা রোটরের শব্দ নিয়ে বিচলিত হলো না রানা।

মনে হচ্ছে ওটা উপত্যকায় ল্যাণ্ড করেছে। বলল, 'ওটাতে ব্ল্যাক উইডোর দলের কেউ এসেছে বলে মনে হয় না। তা হলে ডাইনিটা পালাত না।'

'তা হলে?'

'সম্ভবত এফবিআই,' আন্দাজ করল রানা। 'আমাদের দেরি দেখে এরিক হয়তো খোঁজ নিতে এসেছে।'

'ওখানে ফিরে যেতে চাও?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'লড়াইটা আমাদের, এরিককে এর ভেতর জড়ানো আর উচিত হবে না। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলায় ফেলেছি ওকে।'

'ওখানে ও বসে থাকবে ভেবেছ? তোমাকে-আমাকে না পেয়ে ঠিকই খুঁজতে বেরুবে। হেলিকপ্টার আছে, আমাদের ট্র্যাক করতে পারবে। ঠিকই এসে জুটে যাবে তোমার সঙ্গে।'

'ল্যাব, ওখানে পড়ে থাকা অজ্ঞান লোকজন, আর লাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ও; এখুনি আমাদের খোঁজে বেরুতে পারবে না। তার আগেই গা-ঢাকা দেব।' হাত নাড়ল রানা। 'ওসব বাদ দাও। তুমি ঠিক আছ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

'এখনও না। তুমি? ডাইনিটার গাড়ি ধাক্কা দিয়েছিল... বেশি লেগেছে?'

'সিরিয়াস কিছু নয়। তবে তুমি কিন্তু দারুণ দেখিয়েছ!' রানার গলায় প্রশংসা। 'ওয়ায়্যার জোড়া দিয়ে দরজা খোলা... তারপর ফ্ল্যাশ-ব্যাং দিয়ে ডাইভারশন... এ-অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে এতকিছু করতে পারবে ভাবিনি।'

'মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল আসলে,' বলল সোহানা। 'আমি আটকা পড়ে রইলাম, আর তুমি ওপরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একা লড়াই করছ... নিজের অসহায়ত্ব দেখে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।'

'রাগ জিনিসটা একটা চমৎকার মোটিভেটর,' মন্তব্য করল

রানা। 'বিশেষ করে ভয় মোকাবেলার জন্যে। এক্কেবারে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে সাহায্য করেছে তোমাকে।'

'থাক, আর মোমপালিশ দিতে হবে না,' কপট রাগ দেখাল সোহানা। 'নার্ভ ঠাণ্ডা হয়েছে? তা হলে বলো, এখন কী করতে চাও।'

'যা করছিলাম, তা-ই। সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করব। ব্ল্যাক উইডোর ইণ্টারোগেশনে একটা উপকার হয়েছে। ওকে খোঁজার ব্যাপারে নতুন কয়েকটা ক্লু পেয়েছি। আগে ওগুলোর কথা ভাবিনি আমি।'

'সিদ্দিকীর পছন্দ-অপছন্দ?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিছুটা সময়ের জন্য সাইকোলজিস্ট হতে হবে আমাদেরকে—লোকটার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য। তবে তার আগে লজিস্টিকসের অবস্থা দেখা দরকার...'

'একটা পিস্তল খুইয়েছি আমরা,' সোহানা বলল। 'ওটা সম্ভবত ব্ল্যাক উইডো নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তোমার-আমার ওয়ালেট, টাকা-পয়সা, নকল আই.ডি.—সব।'

'ব্যাকআপের কী অবস্থা, দেখে নিই।'

সিটের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, একটা গোপন খোপ থেকে বের করে আনল এক তাড়া কাগজপত্র আর ডলারের বাণ্ডিল। শিস দিয়ে উঠল ও। 'যাক, এগুলো ওদের হাতে পড়েনি। গাড়িটা ঠিকমত সার্চ করেনি বোধহয়।'

'বাঁচা গেছে!'

'চলো তা হলে, একটা মোটেল খুঁজে বের করি।'

'যাচ্ছি, তবে তোমার চেহারা-সুরত ঠিক করা দরকার,' বলল সোহানা। 'লোকজনের চোখে পড়ে যাবে নইলে।'

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, ওর সারা শরীর ধুলোবালিতে মাখা। শার্ট নেই, খোলা বুকটা ভরে আছে নানা রকম আঁচড় আর

কাটাছেঁড়ায়—রক্ত জমে কালচে হয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও—পিছনের সিটে এখনও কয়েকটা মিনারেল ওঅটরের বোতল পড়ে আছে। তাই বলল, 'মুখ-হাত ধুতে অসুবিধে হবে না। তবে জামা-কাপড় দরকার। সামনে কোথাও দোকান পেলে দাঁড়িয়ো।'

পিছনের সিটে চলে গেল রানা। টরাস-টা ছুটতে শুরু করল হাইওয়ে ধরে।

'ইয়ে... সোহানা...' একটু পরে পিছন থেকে ডাকল রানা।

'শুনছি, বলো।'

'তোমার এখন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার...'

'ভুলে যাও, আমি তোমার সঙ্গেই থাকছি,' কঠিন গলায় বলল সোহানা।

'কিন্তু এই অবস্থায়...'

'আমি সামলে নেব,' বলল সোহানা। 'দেখো, আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না। অথর্বের মত হাসপাতালে পড়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাতে তো লাভ-ও নেই। সিদ্দিকীর নিউট্রালাইজার-টা দরকার আমার, সেটা তোমার সঙ্গে থাকলেই বরং তাড়াতাড়ি পাবো।'

'কিন্তু সামনে আরও অনেক বিপদ মোকাবেলা করতে হবে আমাদেরকে। তুমি এই নার্ভ নিয়ে তার ভেতর পড়লে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে যেতে পারে।'

'আর আমাকে ছাড়া তুমি একা বিপদ মোকাবেলা করলেই বুঝি কাজটা সহজ হয়ে যাবে?' পাল্টা যুক্তি দিল সোহানা। 'কথা বাড়িয়ো না। আমাকে তোমার দরকার... আর তোমাকে আমার। ক্লিয়ার?'

আর কিছু শুনতে চায় না, এই ভঙ্গিতে আলোচনা শেষ করল সোহানা। অ্যাকসেলারেটর চেপে গতি বাড়িয়ে দিল টরাসের। রানা অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

পনেরো

দু'ঘণ্টা চলে পেনসিলভেনিয়ার হ্যারিসবার্গে পৌঁছুল রানা ও সোহানা, ওখানেই একটা মোটেলে উঠল। বেইলি'জ রিজ থেকে বহু দূরে জায়গাটা, ওদের খোঁজে কেউ এতদূর পর্যন্ত আসবে বলে মনে হয় না। আরেকটা সুবিধে হলো, হ্যারিসবার্গ রাজ্যটার রাজধানী... বড় শহর। বিভিন্ন প্রকার দোকানপাটের পাশাপাশি প্রচুর ভিডিও-রেন্টাল স্টোর আছে... বিশাল কালেকশন। ওখান থেকে ড. সিদ্দিকীর পছন্দের ছবিগুলো খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

হলোও না। মোটেলে খানিক বিশ্রাম নিয়ে বেরুল ওরা। ক্লিন্ট ঈস্টউডের ছবি তো সবখানে পাওয়া যায়; ট্রয় ডোনাহিউ একটু পুরনো আমলের নায়ক বটে, তবে মাত্র তিনটে দোকানে ঢুঁ মেরেই *আ সামার প্লেস*-এর ক্যাসেট পাওয়া গেল।

মোটেলে ফিরে ওটাই প্রথমে দেখবে বলে ঠিক করল ওরা। বক্সের পিছনটা পড়ল সোহানা, '*মেইন-এর এক রিসোর্ট শহরে দুই দুর্ভাগা প্রেমিক-প্রেমিকা!* হুম, বস্তাপচা প্রেমের ছবি মনে হচ্ছে।'

একটা ভিসিআর ভাড়া করে এনেছে রানা, ওটায় টেপটা ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'সিদ্দিকীকে রোমান্টিক মানুষ বলে মনে হয়নি আমার কাছে। এই ছবিটা দেখার পেছনে ওর নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ ছিল।'

'ব্ল্যাক উইডোর ধারণা হয়তো ঠিক,' মন্তব্য করল সোহানা।

'সিদ্দিকী হয়তো মেইনে রিলোকেটেড হতে চেয়েছিল।'

'দেখা যাক!' বলল রানা।

শুরু হলো সিনেমাটা। টেপটা অনেক পুরনো, বহু-ব্যবহারে জীর্ণ। ছবি কাঁপছে প্রায় সারাক্ষণ, রঙ-ও জায়গায় জায়গায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবে ওসব পরের সমস্যা। সিনেমা-হলের ওয়াইড-স্ক্রিনের জন্য তৈরি হয়েছিল ছবিটা, টিভি-র পর্দায় দু'পাশের অনেকটা অংশ কাটা পড়ে গেছে—পরিচালক প্রকৃতির যে-অপরূপ শোভা সেলুলয়েডে তুলে এনেছিলেন, তার বলতে গেলে কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

'মিউজিক মন্দ নয়,' কিছুক্ষণ পর মন্তব্য করল সোহানা।

'হ্যাঁ, ওই একটা জিনিসই মন্দ না,' বিরক্ত গলায় বলল রানা, 'বাকি সবই থার্ড-ক্লাস।'

সোহানার ভাষ্যমতে *বস্তাপচা* প্রেমের কাহিনিই চলছে পর্দায়। ট্রয় ডোনাহিউ ও সান্ড্রা ডি হলো দুই অল্পবয়েসী তরুণ-তরুণী—পরস্পরকে ভালবাসে। অযথাই তাদের প্রেমে বাধা দিচ্ছে সমাজ, প্রেমিক-প্রেমিকাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। অভিনয় একেবারে যা-তা, পাত্র-পাত্রীদের মুখে কোনও অভিব্যক্তিই ফুটছে না। সেটা নিয়ে পরিচালক তেমন মাথাও ঘামায়নি বোধহয়, ফালতু এক কাহিনির অজুহাতে আমেরিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখানোর মিশনে নেমেছিল যেন। খানিক পরপরই পাইন-গাছে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর এক সৈকত, এবং তাতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দৃশ্য ভাসছে পর্দায়... মনে হচ্ছে পর্যটনের কোনও বিজ্ঞাপন চলছে।

'সুন্দর বাড়ি তো!' হঠাৎ বলে উঠল সোহানা।

পর্দায় একটা পাথরের তৈরি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সাগরের ধারে, উঁচু একটা রিজের উপর সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আকৃতিটা অনেকটা জাহাজের গলুইয়ের মত। চমৎকার স্থাপত্য,

মনে মনে স্বীকার করল রানা। ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট নামে এক বিখ্যাত মার্কিন স্থপতির করা বেশ কিছু ডিজাইনের ছবি দেখেছে ও—অনেকটা এরকমই ছিল সেগুলো।

পীড়াদায়ক টানা দু'ঘণ্টা দশ মিনিটের মেলোড্রামা করে শেষ হলো ছবিটা। তিতিবিরক্ত ভঙ্গিতে রানা বলল; 'ধ্যাত্তেরি! এমন জঘন্য সিনেমা খুব কম দেখেছি জীবনে।'

'এটা যেন অমন না হয়!' বলে দ্বিতীয় ক্যাসেটটা তুলে নিল সোহানা। ক্লিণ্ট ঈস্টউডের *প্লে মিস্টি ফর মি।* পড়ল বক্সের পিছনটা: *'এক ডিস্ক জকির জীবন বিষিয়ে তোলে উন্মাদিনী ভক্ত। পরিচালক হিসেবে ক্লিণ্ট ঈস্টউডের অভিষেক চলচ্চিত্র। তাঁর জন্ম-শহর কারমেল-এ চিত্রায়িত।'*

বক্সের সামনের পোস্টারটাও দেখল ও—অভিনেত্রী জেসিকা ওয়াল্টার ছুরি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'হুম, দেখে তো মন্দ হবে বলে মনে হচ্ছে না। খুনোখুনির ব্যাপার আছে... ইণ্টারেস্টিং!'

'আমি দেখেছি ছবিটা,' ভিসিআরে ক্যাসেট ঢুকিয়ে বলল রানা। 'বহুদিন আগে অবশ্য। কাহিনি-টাহিনি কিচ্ছু মনে নেই। তবে ছবিটা যে ভাল লেগেছিল, তা মনে আছে।'

'যাক, ভাল খবর দিলে!'

রিওয়াইণ্ড বাটন চেপে রানা বলল, 'কী যেন মিলছে না। এটার পটভূমি ক্যালিফোর্নিয়া, আর *সামার প্লেস* ছিল মেইনে। আমেরিকার দু'প্রান্তে দুটো রাজ্য। এর মধ্যে কমন কিছু থাকে কী করে?'

'থাকবেই, তা কীভাবে শিয়োর হচ্ছো?' সোহানা জিজ্ঞেস করল।

'সিদ্দিকী বলেছে,' নিউয়ার্কের ওয়্যারহাউসে বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথোপকথন স্মরণ করল রানা। 'আমার সঙ্গে হেঁয়ালি

করছিল—ওই কমন জিনিসটার জন্যই নাকি ছবিদুটো তার পছন্দ।'

'কী হতে পারে?'

'দেখি, বের করতে পারি কি না।' টেপটা শুরুতে পৌঁছে গেছে, *প্লে* বাটন চাপল রানা।

ছবিটা শুরু হলো একটা ওভারহেড হেলিকপ্টার-শট দিয়ে। আঁকাবাঁকা একটি তটরেখা ফুটে উঠল পর্দায়, সাগরের উদ্দাম স্রোত এসে আছড়ে পড়ছে বালি-পাথরে; সৈকতের ধারের পাইন গাছের সারি মাথা নোয়াচ্ছে তীব্র বাতাসে। ত্রিশ সেকেণ্ড না যেতেই রানা-সোহানার পিঠ খাড়া হয়ে গেল। দৃশ্যটা অতি-পরিচিত।

'হায় খোদা!' বিস্মিত গলায় বলল সোহানা। 'এটা... এটা...' কথা আটকে যাচ্ছে ওর।

'হ্যাঁ, একটু আগে দেখা বিচ-টাই,' বলল রানা, বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। 'সামার প্লেসের কাহিনি মেইনের হলেও ওটার শুটিং আসলে হয়েছে কারমেলে।'

'ওইতো বাড়িটা,' আঙুল তুলে দেখাল সোহানা।

আর কোনও সন্দেহ নেই, পর্দার এক কোণে ভেসে উঠেছে জাহাজের গলুইয়ের ডিজাইনে তৈরি বাড়িটা। তারমানে একই লোকেশনে শুটিং হয়েছে দুটো ছবির।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল ওরা দুজন। রিমোটের বোতাম চেপে ভিসিআর বন্ধ করল সোহানা, তাকাল রানার দিকে। 'বইয়ের কথা বলছিলে তুমি। ওয়্যারহাউসে কী কী বই ছিল সিদ্দিকীর কাছে?'

'ফটোগ্রাফি... একটা দেখে মনে হচ্ছিল সফ্‌ট্‌ পর্নোগ্রাফি। জিয়োলজির বই ছিল; আর ছিল কবিতা—রবিনসন জেফারসের।'

হ্যারিসবার্গ পাবলিক লাইব্রেরির রেফারেন্স সেকশন অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

বইয়ের তো অভাব নেই-ই, দ্রুত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বেশ কিছু কম্পিউটারও রয়েছে ওখানে। মোটেল থেকে সোজা ওখানে ছুটে গেল রানা ও সোহানা। কম্পিউটার, সেই সঙ্গে লাইব্রেরি ক্যাটালগ মিলিয়ে ঠিক করে নিল—কী কী বই দরকার ওদের।

এক কোনার একটা টেবিল দখল করল ওরা, তারপর পালা করে বিভিন্ন র‍্যাক থেকে বই আনতে শুরু করল। একটু পরেই ছোটখাট একটা স্তূপ জমে গেল টেবিলে, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনে।

'শোনো, এখানে কী লিখেছে,' খানিক পর ফিসফিসাল সোহানা, মোটাসোটা একটা বই ওর সামনে। 'শহরের আসল নাম কারমেল-বাই-দ্য-সি; মানে, সাগরপারের বাগান। সংক্ষেপে শুধু কারমেল ডাকা হয়। শহরটা আসলে একটা আণ্ডারওয়াটার ক্যানিয়নের ডগায় বসে আছে—পানির তলার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন বলে ওটাকে। জায়গাটা নিয়ে অনেক জিয়োলজিস্টেরই ফ্যাসিনেশন আছে।'

'হুম, তা হলে একটা বইয়ের রহস্য ভেদ হলো,' বলল রানা।

'আরও আছে,' বলল সোহানা। 'সৃজনশীল মানুষদের তীর্থপীঠ কারমেল। ওখানকার লেখক, আর্টিস্ট আর ফটোগ্রাফারদের খ্যাতি দুনিয়া-জোড়া।' *ফটোগ্রাফার* শব্দটার উপর জোর দিল ও। 'অ্যানসেল অ্যাডামস্ থাকতেন ওখানে; থাকতেন এডওয়ার্ড ওয়েস্টন-ও।'

'অ্যাডামসের নাম শুনেছি,' রানা বলল। 'বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। কিন্তু ওয়েস্টন-টা কে?'

'ফটোগ্রাফির একটা বইয়ে তুমি নগ্ন ছবি দেখেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কভারে। ভিতরটা উল্টে দেখিনি অবশ্য।'

'নাম কী ছিল—*প্যাশন?*'

'কী জানি, ঠিক খেয়াল নেই। কেন?'

‘এডওয়ার্ড ওয়েস্টনও নামকরা ফটোগ্রাফার। তাঁর একটা বিখ্যাত ফটোগ্রাফির বই হচ্ছে—*প্যাশন।* শুধুমাত্র কারমেল এবং আশপাশের ছবি ওটাতে।’

‘এখানে আছে?’

স্তূপ থেকে বাড়তি মলাট দেয়া একটা বই বের করে দিল সোহানা। ওটা নিয়ে মলাটটা খুলে দেখল রানা—সম্পূর্ণ নগ্ন একটি মেয়ের ছবি প্রচ্ছদে; তবে বসার ভঙ্গিটা এমন, যাতে শরীরের গোপন অংশগুলো দৃষ্টিগোচর না হয়। দু’পা একত্র করে বুকের সামনে ভাঁজ করে বসেছে মেয়েটি।

‘হ্যাঁ, এই বইটাই দেখেছি।’ রানা মাথা ঝাঁকাল।

‘ভিতরটা দেখো।’

পাতা উল্টে আর একটা নগ্ন ছবিও পেল না রানা। সব প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় হয়ে উঠেছে টুকরো টুকরো স্বর্গ। প্যাশন জাগাবার মত জায়গাই বটে। রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে প্রচ্ছদের ছবিটা। পাতা উল্টাতে উল্টাতে মাঝামাঝি গিয়ে থেমে গেল রানা। আবার সেই বিচ... একপাশে উদ্দাম ঢেউ, অন্যপাশে পাইনের সারি।

‘সিদ্দিকী যে এই জায়গাটার বিষয়ে অবসেসড্—এ-ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ আছে তোমার?’ সোহানা ভুরু নাচাল।

মাথা নাড়ল রানা। নেই।

তারপরও সোহানা বলল, ‘গলফ ভালবাসে সিদ্দিকী, তাই না? *পেবল বিচ* হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত গলফ কোর্সগুলোর একটা, কারমেল থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে ওটা। ওখানকার রেস্টুরেণ্টগুলোও খাবার-দাবারের জন্য বিখ্যাত—ঠিক যেমন সিদ্দিকীর পছন্দ। শুধু রবিনসন জেফারসের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না...’

‘এক মিনিট।’ হাত তুলে সোহানাকে থামাল রানা।

জেফারসের জীবনীর একটা বই নিয়ে বসেছে ও, দ্রুত পাতা উল্টাল। শেষে পেয়ে গেল যা খুঁজছে। বলল, 'এই যে... ১৯১৪ সালে রবিনসন জেফার্স ও তাঁর স্ত্রী ইউনা কারমেলে বেড়াতে আসেন। জায়গাটা তাঁদের এতই ভাল লেগে যায় যে, ওখানেই বসত গড়েন; জেফারস্ ওখানে জমি কেনেন, তারপর সাগরপার থেকে সংগ্রহ করা পাথর দিয়ে একটা বাড়ি আর চল্লিশ-ফুট উঁচু টাওয়ার তৈরি করেন। বাড়িটার নাম—*টর হাউস;* টাওয়ারের নাম—*হক টাওয়ার।* জেফারস্ ও ইউনা ওখানেই মারা যান।'

নিউয়ার্কের ওয়্যারহাউসে পড়া কবিতাটা মনে পড়ে গেল রানার: *আই বিল্ট হার আ টাওয়ার, হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং...।* হক টাওয়ারের কথাই লেখা হয়েছে ওখানে।

সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে রানার মন থেকে। বইপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। সোহানাকে বলল, 'চলো, কারমেলে যাবার সময় হয়েছে।'

সড়কপথে রওনা হলো ওরা। বিমানে গেলে দ্রুত পৌঁছুনো যেত, কিন্তু তাতে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি অনেক বেশি। এয়ারপোর্টে হাজার রকমের চেকিঙের মুখে পড়তে হয়, সিকিউরিটি ক্যামেরায় ছবি ওঠে। এ-মুহূর্তে আমেরিকান সরকারের খুব ক্ষমতাবান একটি মহলের শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে ওদের উপর, এয়ারপোর্টে গেলে তাদের সামনে ধরা পড়ে যাবে। তাই গাড়িতেই যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

ইন্টারস্টেট-৮০ ধরে এগোল ওরা। ওহাইও, ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয় এবং আইওয়া হয়ে নেব্রাস্কায় পৌঁছুল। ওখানে একবেলা বিশ্রাম নিয়ে আবার নামল পথে। পালা করে ড্রাইভ করল দুজনে—ওকলাহোমা পেরুল, তারপর পেরুল ওয়াইওমিং। অবশেষে... চারদিনের মাথায় স্যান ফ্রান্সিসকো পৌঁছুল ওরা;

ওখান থেকে দক্ষিণমুখী প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে অনুসরণ করল, কারমেলে ঢুকল রাত দুটোয়।

একটা মোটেলে উঠল ওরা—রাতের মত বিশ্রাম নেবার জন্য। তবে বিশ্রাম পেল না রানা, নানা রকম চিন্তায় জেগে থাকল সারা রাত। সকালে মোটেলের ডাইনারে নাস্তা সারতে সারতে সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে তল্লাশি শুরু করতে চাও?'

'সেটা এখনও ভাবিনি,' রানা মাথা নাড়ল। 'আমি অন্য জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—লোকটাকে চিনব কী করে?'

'মানে? ওকে না-চেনার কী আছে?'

'আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ওকে ছদ্মবেশের ব্যাপারে ট্রেইনিং দিয়েছি আমরা সেফ-সাইটে। তা ছাড়া দু'সপ্তাহের বেশি হয়েছে, ওকে শেষবার দেখেছি। এর মধ্যে শরীরের গঠন বদলে ফেলতে পারে সে।'

'কীভাবে?' সোহানার চেহারায় বিস্ময়।

'প্রচুর সময় পেয়েছে ও,' রানা ব্যাখ্যা করল। 'এর ভিতর লাইপোসাকশন সার্জারির মাধ্যমে মেদ কমাতে পারে। ক্র্যাশ-ডায়েট ফলো করলেও দু'সপ্তাহে বিশ কেজি ওজন কমানো সম্ভব। এত দ্রুত ওজন কমানো রিস্কি, শরীরের ক্ষতি হয়... তবে সেটা নিয়ে সিদ্দিকী মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।'

'ইয়াল্লা! ওকে তা হলে চেনা যাবে কী করে?'

'কঠিন তো বটেই। খাটতে হবে আমাদের। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে—আমরা ওকে হয়তো চিনব না, কিন্তু ও আমাদেরকে ঠিকই চিনতে পারবে...'

'ভুল বললে,' বাধা দিল সোহানা। 'তোমাকে চিনবে, আমাকে নয়। ওর মুখোমুখি হইনি আমি একবারও। অন্তরার বাড়িতে যে-টুকু দেখেছে, সেটা সন্ধেবেলায়... দূর থেকে।'

'হুম, তা অবশ্য ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল রানা। মুখে হাত

বোলাল, গত কয়েকদিন দাড়ি কামায়নি ইচ্ছে করে, তবে এটুকু ছদ্মবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। 'একটু বাইরে যেতে পারবে?' সোহানাকে বলল ও। 'দু-একটা জিনিস দরকার আমার।'

ষোলো

পুরো কারমেলে একটাই রাস্তা সৈকতের দিকে গেছে—ওশন অ্যাভিনিউ। হাইওয়ে থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওটা, বেশ চওড়া। রাস্তার দু'পাশ আর মাঝখানের আইল্যাণ্ডে নানা রকম গাছ লাগিয়েছে মিউনিসিপ্যাল কমিটি—দেখতে খুবই ভাল লাগে। পিচ-ঢালা পথে চলা সত্ত্বেও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার মত একটা অনুভূতি সৃষ্টি হয়। অবশ্য জঙ্গলের নির্জনতা নেই এখানে; পুরো রাস্তা জুড়ে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে নানা ধরনের দোকান—পর্যটকদের ভিড় সবখানে।

ধীর গতিতে ওশন অ্যাভিনিউ ধরে গাড়ি চালাচ্ছে সোহানা, প্যাসেঞ্জারস্ সিটে বসে জানালা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রানা—কপাল ভাল হলে টুরিস্টদের মাঝে সিদ্দিকীকে পেয়ে যেতে পারে। ভারী ছদ্মবেশ নেবার মত সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি আশপাশে, তাই হালকা ছদ্মবেশ নিয়েছে ও—মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের পাশাপাশি একটা বড় সানগ্লাস পরেছে; মাথার চুল ঢেকেছে হিপ্পিদের মত একটা পরচুলা দিয়ে।

একটু পরেই রাস্তার শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল টরাস। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক-মাইল দীর্ঘ অর্ধ-চন্দ্রাকার সৈকতটা, বালি ওখানে অস্বাভাবিক রকমের সাদা। এখানে-সেখানে উঁচু হয়ে

আছে প্রবাল; ফেনায়িত ঢেউকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কয়েকজন সার্ফার সেই ঢেউয়ের মাথায় উঠে পড়েছে সার্ফবোর্ড নিয়ে। বিচের আশপাশের গাছপালা দুলছে মৃদু বাতাসে, কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের গর্জন আর উড়ন্ত গাংচিলের কোলাহলে। মানুষেরও অভাব নেই—পানিতে নেমে গা ভেজাচ্ছে; হেঁটেও বেড়াচ্ছে অনেকে।

একটা বিনকিউলার কিনে এনেছে সোহানা, সেটা চোখে লাগিয়ে লোকজনের উপর দৃষ্টি বোলাল রানা। কিন্তু সিদ্দিকীর মত কাউকে দেখতে পেল না।

বিচের ধারের রাস্তা ধরে এগোল সোহানা; রাস্তার অপরপাশে বেশ কিছু বাড়িঘর আছে—সেগুলোর দিকে নজর। একটু পরেই আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই যে বাড়িটা।'

তাকাল রানা। জাহাজের গলুই আকৃতির বাড়িটা একলা দাঁড়িয়ে আছে ক্লিফের উপর, কালের আবর্তনে সারা দেহ বিবর্ণ। 'পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল ও। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিনকিউলার নিয়ে।

সময় নিয়ে পুরো বিচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। শেষে হাল ছেড়ে দিল। এখানে নেই সিদ্দিকী। সোহানাকে গাড়ি ঘোরাতে বলল ও।

নির্জন, সবুজে-ঘেরা একটা রাস্তা ধরে রবিনসন জেফারসের প্রপার্টিতে পৌঁছুল ওরা। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একটু হতাশ হলো রানা—ছিমছাম, ছোট্ট বাড়িটা দেখে। বইতে কবি জেফারসের এই বাড়ি নিয়ে যেভাবে মাতামাতি করা হয়েছে, তাতে আরও আলিশান কিছু আশা করেছিল ও। এমনিতে অবশ্য জায়গাটা বেশ মনোরম; পুরো এলাকা জুড়ে বাগান করা হয়েছে—রঙ-বেরঙের ফুল ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্য এলাকার কথা মনে

করিয়ে দেয়।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের তৈরি কটেজটা—*টর হাউস।* টাওয়ারটা একটু বাঁয়ে; চিমনি, চওড়া সিঁড়ি, টারেট আর ব্যাটেলমেণ্ট দেখা যাচ্ছে ওটাতে—ঠিক যেন মধ্যযুগের কোনও স্থাপনা।

গাড়িটা পার্ক করে ইঁট-বিছানো ওয়াকওয়ে ধরে এগোল রানা-সোহানা। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই বয়স্ক এক ভদ্রলোক উদয় হলেন, নিজের পরিচয় দিলেন ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি হিসেবে—সম্পত্তির দেখাশোনা করেন। 'আপনারা কি বাড়িটা ঘুরে দেখতে চান?' জানতে চাইলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'টাওয়ারটাও।'

'কোনও অসুবিধে নেই। আসুন।'

বয়স্ক ভদ্রলোককে অনুসরণ করল ওরা। সোহানা বলল, 'ভেবেছিলাম অনেক ভিড় হবে এখানে। এখন তো দেখছি, আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

'দুঃখজনক ব্যাপারই বটে,' বললেন ভদ্রলোক। 'রবিনসন জেফারসের অনুরাগীর সংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। আগে সারাদিনই ব্যস্ত থাকতাম টুরিস্টদের নিয়ে, এখন কালে-ভদ্রে দু'একজন আসে... এই যেমন আপনারা।'

'কারণটা কী?'

'দিনকাল প্পাল্টে গেছে। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় মানুষের? আমার তো ধারণা, খুব শীঘ্রি কারমেলের শৈল্পিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। স্রেফ একটা টুরিস্ট স্পটে পরিণত হবে শহরটা।'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখালেন ভদ্রলোক। রুমগুলো ছোট ছোট, বাতাস চলাচল কম। জানা গেল, শুরুর ত্রিশ বছর ইচ্ছে করেই ইলেকট্রিসিটির সংযোগ নেননি জেফারস বা ইউনা, নিখাদ

প্রকৃতির কাছে থাকতে চেয়েছেন। দুটো ছেলে হয়েছিল তাঁদের, ওরা বড় হবার পর পরিবেশটাতে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে।

বাড়ি দেখা শেষে টাওয়ারে চলল রানা-সোহানা। দেখার মত একটা জিনিস বটে ওটা! মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অবয়বটা স্রেফ বাহ্যিক নয়, ভিতরেও একই নকশা বজায় রাখা হয়েছে। স্ত্রী'র অবসর কাটানোর জায়গা, আর ছেলেদের খেলাঘর ছিল টাওয়ারটা—তাই উঁচু ব্যালকনি, অ্যাটিক, গোপন সিঁড়ি থেকে শুরু করে মাটির নীচে পুরোদস্তুর একটা ডানজন-ও আছে টাওয়ারে। খুবই আকর্ষণীয়। ছাদ আর ব্যালকনি থেকে সমুদ্রের চোখ-জুড়ানো দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

'১৯৫০-এ ক্যান্সারে মারা যান ইউনা; জেফারস্ মারা যান '৬২-তে,' বললেন বয়স্ক ভদ্রলোক। 'স্ত্রী'কে খুবই ভালবাসতেন তিনি, জীবনের শেষ বছরগুলোয় শুধু স্মৃতিচারণ করেই কবিতা লিখেছেন। ওগুলোই সবচেয়ে বিখ্যাত। দু'একটা নমুনা দেখলে বুঝবেন...' ফটোস্ট্যাট করা দু'টো ব্রোশিয়ার রানা-সোহানার হাতে তুলে দিলেন।

পাতা উল্টাতে গিয়ে থেমে গেল রানা, একটা গাড়ি থামার শব্দ পেয়েছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, তাড়াতাড়ি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল পার্কিং স্পেসের দিকে। একটা ভ্যান এসে থেমেছে, চার সদস্যের একটা পরিবার এসেছে *টর হাউস* দেখতে। ভাল করে দেখল রানা—পুরুষ সদস্য একজনই রয়েছে দলটাতে, তবে সে সিদ্দিকী নয়। পেশিতে ঢিল দিল ও।

ফাউণ্ডেশনের ভদ্রলোকও দেখেছেন পরিবারটাকে, চেহারায় খুশি-খুশি ভাব ফুটল—টুরিস্ট পেলে ভাল লাগে তাঁর। রানা-সোহানার ট্যুর শেষ হয়েছে, তাই তড়িঘড়ি করে বললেন, 'যদি আর কিছু জানতে চান...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'জিজ্ঞাস্য একটা আছে আমার, তবে সেটা রবিনসন জেফারস্ সম্পর্কে নয়।'

'তা হলে?' ভদ্রলোক একটু বিস্মিত।

'একজন লোককে খুঁজছি আমরা। মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, এখানে এসেছিল সে। লোকটা জেফারসের একজন অন্ধভক্ত... ফ্যানাটিকও বলতে পারেন।'

'নাম?'

'আন্দালিব সিদ্দিকী। তবে এখন ভুয়া নাম ব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশি।'

'দুঃখিত, ও-নামে কাউকে চিনি না। দেখতে কেমন?'

'বয়স ধরুন চল্লিশের মত। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। এমনিতে গোঁফ-দাড়ি রাখে না, তবে এখন রাখতে পারে...'

'কী সব যে বলছেন না!' একটু বিরক্ত হলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। 'এটুকু দিয়ে কি মানুষ চেনানো যায়? স্পেসিফিক কিছু থাকলে বলুন।'

'আগে খুব মোটা ছিল ও। কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে ওজন কমিয়েছে। এভাবে শুকালে যা হয়... থুতনির নীচের চামড়া ঝুলে যায়, ওটা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে কিনা... তো, অমন কাউকে দেখেছেন?'

'মনে পড়ছে না। দেখলে কী করব, ওকে আপনার কথা বলব?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লোকটা ভুয়া নামে তিনটে বিয়ে করে সটকে পড়েছে। সেজন্যেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'আর এই লোক রবিনসন জেফারসের অন্ধভক্ত?' বয়স্ক লোকটার চোখে অবিশ্বাস। 'সেই কবির... যিনি ভালবাসার মূর্ত প্রতীক?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অদ্ভুত, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটাকে যদি দেখেন, তা হলে নাম জানবার চেষ্টা করবেন, কিংবা লাইসেন্স প্লেটের নাম্বারটা টুকে রাখবেন। পারবেন না?'

'পারব। কিন্তু আপনাকে জানাব কী করে?'

'বার্ডি'স্ মোটেলে উঠেছি আমরা; আমার নাম মোরশেদ খান।' রেজিস্টারে লেখা ভুয়া নামটা জানাল রানা। 'ক্লার্ককে বললে মেসেজ দিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে,' একটা ব্রোশিয়ারের পিছনে তথ্যটা টুকে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর একটু ইতস্তত করলেন। 'ইয়ে, আপনারা আবার বেআইনী কিছু করাচ্ছেন না তো আমাকে দিয়ে?'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি কোনও বিপদে পড়বেন না। বরং সাহায্যের জন্য পুরস্কার পাবেন।'

কয়েক মুহূর্ত রানা-সোহানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'আপনাদের কথা আমার বিশ্বাস হয়েছে। ঠিক আছে, লোকটাকে দেখলেই খবর দেব আমি।'

টর হাউস থেকে পেবল্ বিচে গেল ওরা—গলফ কোর্সে। টিকেট কেটে ঢুকতে হলো ভিতরে। গাড়ি নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুপাশে চোখ রাখল রানা-সোহানা—গলফারদের মধ্যে সিদ্দিকী আছে কি না, বোঝার জন্য। তবে বিশেষ লাভ হলো না।

এলাকাটা বেশ বড়, অনেকগুলো কোর্স আছে। সবগুলোকে ঘিরে রেখেছে নানা ধরনের গাছগাছালি, রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। ফলে সোহানাকে স্পিড বাড়াতে বলল রানা, গলফ কোর্সের অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নেবে।

ক্লাবের মূল বিল্ডিং, সেইসঙ্গে অফিসটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। ওখানে গিয়ে হাজির হলো ওরা, আধঘণ্টা অপেক্ষা

করার পর একজন কর্মকর্তার দেখা পেল। ভদ্রলোক যা বললেন, তা শুনে হতাশ হতে হলো। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য—পেবল্ বিচের গলফ কোর্সে খেলতে হলে রীতিমত অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। তারপরও অন্তত বছরখানেকের আগে শিডিউল পাওয়া সম্ভব নয়, এতই লম্বা ওয়েইটিং লিস্ট। অবশ্য প্রভাবশালী, এবং গণ্যমান্য মানুষদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় না, তবে অমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য।

'অসম্ভব! সিদ্দিকীর পক্ষে কিছুতেই এক বছর আগে এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া সম্ভব নয়,' অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বলল সোহানা। 'অতদিন আগে নিশ্চয়ই জানত না, তাকে এখানে এসে গা-ঢাকা দিতে হবে?'

রানা একমত। বলল, 'ঠিকই বলেছ। তবে এই এলাকায় আরও গলফ কোর্স আছে। ওগুলোর কোনোটায় যেতে পারে।'

'কমপক্ষে এক ডজন গলফ কোর্স আছে কারমেলের আশপাশে,' সোহানা বলল। 'গলফারের সংখ্যা অন্তত হাজারখানেক হবে। এত লোকের খোঁজ নেয়া আমাদের দুজনের পক্ষে কি সম্ভব?'

'তোমার মাথায় অন্য কোনও আইডিয়া আছে?'

'এরিকের কথা ভাবছিলাম। এফবিআই চাইলে খুব অল্প সময়েই সমস্ত গলফ কোর্সের মেম্বারদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পারে।'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'এরিককে আর জড়াব না।'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, রানা,' সোহানা অনুরোধ করল। 'এফবিআই ছাড়া সিদ্দিকীকে ট্র্যাক করা স্রেফ অসম্ভব।'

'না,' রানা অনড়। 'যা করার আমরাই করব।'

বিকেল বেলা। কারমেল বিচের উত্তর-পূর্ব কোণে, একটা সাইপ্রেস

গাছের ছায়ায় বসে আছে রানা-সোহানা। দুজনেরই হাতে বিনকিউলার, ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাচ্ছে সৈকতে আনাগোনা করতে থাকা মানুষের উপর।

'অভিযোগ করছি না,' হঠাৎ বলল সোহানা, 'সমুদ্র আমার কাছে ভালই লাগে, কিন্তু এভাবে এখানে কতক্ষণ বসে থাকব আমরা, জানতে পারি? কীভাবে নিশ্চিত হব, সিদ্দিকী এখানে আসবে?'

'ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে,' বলল রানা। 'অল রোডস্ লিড টু রোম।'

'মানে?' সোহানা ভুরু কোঁচকাল।

বিনকিউলার নামিয়ে ওর দিকে ফিরল রানা। 'কারমেলে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই বিচ-টা। সিদ্দিকীর ফ্যাসিনেশন-ও এটাকে ঘিরে। এখানে না এসে ও পারবে না। আমার তো ধারণা, নিয়মিতই এখানে আসে ও।'

'তা আমিও বুঝতে পারছি। কিন্তু এত লোকের ভিতর সহজেই ও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।'

'একবার-দু'বার এড়াতে পারে, বার বার পারবে না।'

'তারমানে দিনের পর দিন এখানে বসে থাকবে তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তোমার মাথায় কোনও বিকল্প বুদ্ধি থাকলে বলতে পারো।'

'আছে একটা,' বলল সোহানা। 'সিদ্দিকী এখানে পার্মানেণ্টলি থাকতে চাইছে... তারমানে নিশ্চয়ই কোনও বাড়ি কিনেছে। গত দু'সপ্তাহে এখানে নতুন কারা বাড়ি-ঘর বা সম্পত্তি কিনেছে, সেটার খোঁজ নিতে পারি আমরা।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' রানা স্বীকার করল। 'কিন্তু টাউন হল্ আমাদের মত দুজন বহিরাগত মানুষকে ওই তথ্য দেবে না।'

'আমরা যদি...' বলতে গিয়ে থেমে গেল সোহানা।

রানার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আবার এরিকের সাহায্য নিতে বলছ?'

'তুমি এমন গোঁ ধরেছ কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না,' সোহানা বিরক্ত। 'বিপদে যদি সাহায্য না নেবে, তা হলে ওর মত বন্ধু থেকে লাভ কী?'

'সাহায্য নিতে গিয়ে ওকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিছু মনে কোরো না, এমনিতেই ব্যাপারটায় যারা জড়িয়েছে, তারাই মারা গেছে। মনসুর, মারুফ, রফিক, শাহরিয়ার, অন্তরা... সবার চেহারা চোখে ভাসছে আমার, সোহানা। নতুন করে আর কাউকে ওদের সঙ্গে যোগ করতে চাই না আমি। দেখেছই তো, এরিক সামান্য একটু সাহায্য করতে চেয়েছিল, তাতে ওকেও মেরে ফেলতে যাচ্ছিল টেরোরিস্টরা। আর তোমার কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম...'

'গত কয়েকদিনে আমার কিন্তু একটুও ভয় করেনি,' মনে করিয়ে দিল সোহানা।

'কারণ বেইলি'জ রিজ থেকে পালাবার পর এখন পর্যন্ত নতুন কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়িনি আমরা। ভিতরে ভিতরে তোমার শরীরে কী ঘটছে, জানি না আমরা। নতুন একটা বিপদ শুরু হলে তুমি যে ভেঙে পড়বে না, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

'আমার কথা বাদ দাও। তখন আমরা গ্যাসটার ব্যাপারে, কিংবা কারা পুরো ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত... সেসব কিছুই জানতাম না। যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না আমাদের। কিন্তু এখন বিপদটার সত্যিকার রূপ জানি; জানি কী কী মোকাবেলা করতে হতে পারে। আমাদেরকে, বা আমাদের বন্ধুদেরকে এখন আর সহজে ঘায়েল করতে পারবে না কেউ।'

'না সোহানা, আমি ঝুঁকি নেব না।' রানা কনভিন্সড্ হয়নি।

'নিউট্রাইলাজারটা না-পাওয়া পর্যন্ত এ-অ্যাসাইনমেণ্টে কোনও প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়।' বিনকিউলারটা আবার চোখে লাগাল ও।

সোহানাও চুপ হয়ে গেল, কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে বোধহয়।

পরিবেশ হালকা করবার জন্য রানা বলল, 'চিন্তা কোরো না, সারাদিন বিচে বসে থেকে বোর হতে হবে না তোমাকে। বই পড়তে পছন্দ করে সিদ্দিকী, আমরা বড় বড় বুকস্টোরগুলোর উপরও নজর রাখব। আর সন্ধ্যার পর নজর রাখব ভাল রেস্টুরেণ্টগুলোয়, সিদ্দিকী যেখানে খেতে আসতে পারে। সুখবর বলতে পারো, আগামী কয়েকদিন নিয়মিত ডিনার-ডেটে পাচ্ছ আমাকে!'

'ও-সুখ আমার কপালে নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সোহানা। 'সিদ্দিকী ডায়েট করছে। ভেবেছ, রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ভূরিভোজন করে বেড়াবে ও?'

'ভোজনরসিক-রা যতই ডায়েট করুক, খাবারের লোভ ছাড়তে পারে না। আমি শিয়োর, পেট ভরে না খাক, অন্তত এখানকার মেনু-গুলো চেখে দেখার জন্যে হলেও রেস্টুরেণ্টে যাবে সিদ্দিকী।'

ওদের সামনে দিয়ে একজন জগার দৌড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠ খাড়া করে ফেলল সোহানা।

'কী ব্যাপার?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'একটা ব্যাপার চিন্তা করোনি তুমি,' উত্তেজিত গলায় বলল সোহানা। 'শুধু ডায়েট, কিংবা সার্জারির মাধ্যমে শরীরকে শেপে আনা সম্ভব নয়। মেদ কমায় ঝুলে পড়া চামড়াকে দ্রুত ঠিক করতে চাইলে... দ্রুত ফিটনেস ফিরে পেতে চাইলে... ব্যায়াম দরকার সিদ্দিকীর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যায়াম!'

জিমনেশিয়ামের অভাব নেই কারমেলে। টেলিফোন ডিরেক্টরি

ঘেঁটে অন্তত বিশটা নাম পাওয়া গেল। কোন্‌টাতে যে ভর্তি হয়েছে সিদ্দিকী, বলা মুশকিল। তবে ভর্তি যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। একা একা ব্যায়াম করে শরীরকে ফিট করা কঠিন, বিশেষ করে সময়সীমা যেহেতু কমিয়ে আনতে চাইছে সে। জিমনেশিয়ামের দক্ষ ইন্সট্রাকটররাই শুধু সঠিক নিয়ম বাতলাতে পারে তাকে, নানা রকম ব্যায়ামের ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করতে পারে।

সংখ্যা বেশি বলে দু'ভাগে কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিল রানা-সোহানা। জিমনেশিয়ামগুলোর তালিকা করল প্রথমে, তারপর ঠিকানা দেখে শহরকে দুটো ভাগ করল... দুজন দুদিকে খোঁজ নেবে ঠিক করল। পরদিন সকালে কাজ শুরু করল ওরা, দুপুর নাগাদ অর্ধেকের মত জিমনেশিয়ামে ঘুরে এল রানা। তবে উল্লেখযোগ্য কোনও তথ্য আবিষ্কার করতে পারল না। শেষে বেলা দুটোয় মিশন স্ট্রিটে চলে গেল ও, ওখানেই একটা রেস্টুরেন্টে দুজনে মিলিত হবে বলে ঠিক করে রেখেছে—একসঙ্গে লাঞ্চ সারবে।

আড়াইটা বাজল, সোহানার দেখা নেই। চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা, এত দেরি করবার কথা নয় ওর। ছোট্ট শহর, রাস্তাঘাটেও তেমন ভিড় নেই যে যানজটে আটকা পড়বে। আরেকটু দেখবে বলে ঠিক করল ও। পেরিয়ে গেল আরও দশ মিনিট। এবার সত্যিই টেনশনে পড়ে গেল রানা। কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই কোনও।

রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। সোহানার জন্য বরাদ্দ করা জিমনেশিয়ামগুলোর ঠিকানা জানা আছে ওর, মিশন স্ট্রিটের কাছাকাছি যেটা, সেটায় চলে গেল প্রথমে।

জিমনেশিয়ামটা দোতলায়, সিঁড়ি ভেঙে ওখানে উঠে গেল রানা। দরজা খুলে ঢুকল ভিতরে। লবি, আর পিছনের বিশাল

এক্সারসাইজ হলে নজর বোলাল, কিন্তু দেখতে পেল না সোহানাকে। সিদ্দিকীর মতও কেউ নেই। রিসেপশনে অল্পবয়েসী এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে, সারা গায়ে কিলবিল করছে পেশি। ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা।

'এক্সকিউজ মি,' বলল ও। 'আমার স্ত্রী-র এখানে আসবার কথা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। এসেছিল কি না, জানা দরকার। দেখেছেন নাকি... ভারতীয় চেহারা, খুব একটা লম্বা নয়, সুন্দরী...'

চোখ তুলে তাকাল যুবক। 'আপনার নাম কি মাসুদ রানা?'

চমকে গেল রানা, অচেনা এই যুবকের মুখে ওর সত্যিকার নাম শুনতে পাবে—আশা করেনি। পেটের ভিতর প্রজাপতি উড়তে শুরু করল। কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল ও।

'দুঃখিত, সার। আপনার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'দুঃসংবাদ!' চমকে গেল রানা।

'হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন এখানে। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না, ওঁর বন্ধুরা ছিলেন... ওঁকে নিয়ে গেছেন সঙ্গে।'

'বন্ধু!'

'হ্যাঁ... ওই সোনালিচুলের মহিলা, আর ওঁর স্বামী।'

কথা বলতে পারল না রানা, পাথর হয়ে গেছে।

'আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে চেয়েছিলাম অবশ্য,' বলে চলেছে যুবক। 'তবে ওঁরা মানা করলেন। আপনার স্ত্রী'র নাকি ব্লাড-প্রেশারের সমস্যা আছে, মাঝে মাঝেই এমন হয়। ব্যাপারটা নাকি সিরিয়াস কিছু না।'

'কী করল ওরা তখন?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরাধরি করে ওঁকে দাঁড় করাল; একটা ড্রিঙ্ক খেতে দিল... আপনার স্ত্রী অবশ্য তারপরও পুরোপুরি সুস্থ হননি, ওঁর বন্ধুরা

ধরাধরি করে নিয়ে গেছেন ওঁকে।'

'দুজন বন্ধু?'

'হ্যাঁ। সোনালিচুলের মহিলার নিজের অবস্থাও বেশি ভাল না বোধহয়, চেহারা ফ্যাকাসে দেখলাম... মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজও ছিল... কীভাবে ব্যথা পেয়েছে, কে জানে!'

রানার সামনে দুনিয়া দুলতে শুরু করেছে। ওর জানামতে একজনই সোনালিচুলো মেয়ে আছে, যে কয়েকদিন আগে মাথায় আঘাত পেয়েছে।

'আপনার মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন, সার? দুশ্চিন্তার তো কিছু নেই। ওই মহিলা আপনার জন্য একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন।' কাউন্টারের তলা থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে দিল যুবক।

কাঁপা কাঁপা হাতে খামটা ছিঁড়ল রানা। ভিতর থেকে একটা চিরকুট বেরুল। তাতে শুধু পাঁচটা শব্দ লেখা:

টর হাউস। কাল সকাল আটটা।

সতেরো

সকালটা কুয়াশায় মোড়া, সূর্য উঠলেও ঠিকমত আলো ফোটেনি। এক ঘণ্টা আগেই জায়গামত পৌঁছুল রানা, সাতটায়। টর হাউস থেকে এক ব্লক দূরে পার্ক করল গাড়ি, হেডলাইট নিভিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল, তারপর নেমে পড়ল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, গাড়িতে হিটারের কারণে আরামদায়ক একটা উত্তাপ ছিল, কিন্তু বাইরে

বেরুতেই গা কেঁপে উঠল। স্পোর্টস জ্যাকেটের চেইনও বন্ধ করা যাচ্ছে না, বিপদ দেখা দিলে শোলডার হোলস্টার থেকে দ্রুত পিস্তল ড্র করতে হবে।

হাঁটতে শুরু করল রানা। ঘন কুয়াশার কারণে দৃষ্টিসীমা কমে গেছে, ঠিকমত চোখে পড়ছে না দশ ফুট দূরের জিনিসও। কেমন একটা স্তব্ধতা চারপাশে, পাকা রাস্তায় পা ফেলার শব্দও বড় বেশি কানে বাজছে। রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘাসে নেমে এল ও, এবার আর ততটা আওয়াজ হচ্ছে না।

গতকাল জিমনেশিয়াম থেকে বেরিয়ে কয়েক ঘণ্টা পাগলের মত ছোটাছুটি করেছে রানা—সোহানা এবং ওর কিডন্যাপারদের খোঁজে। জিমনেশিয়ামের পিছনে পার্কিং লটে সোহানার রেখে যাওয়া গাড়িটাই শুধু পেয়েছে, আর কোনও লাভ হয়নি খোঁজাখুঁজিতে। ব্ল্যাক উইডো নিজের ট্রেইল মোছায় দক্ষ, পিছনে একটা সূত্র-ও রেখে যায়নি। চিন্তায় চিন্তায় মাথা খারাপ হবার দশা হয়েছিল ওর, অসতর্ক থাকার কারণে নিজেকে গালমন্দ করেছে সারাক্ষণ। সন্দেহ নেই, ট্রয় ডোনাহিউ আর ক্লিন্ট ঈস্টউডের ছবিদুটোর কানেকশন ধরে ফেলেছে ব্ল্যাক উইডো—কাজটা সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব ছিল না তার জন্য। তারপর কারমেলে এসে খুঁজে বের করেছে ওদেরকে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে ডাইনিটা, প্রথম সুযোগেই ধরে নিয়ে গেছে সোহানাকে। এমন কিছু ঘটতে পারে, সেটা মাথায় রাখা উচিত ছিল রানার, আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল, কিছুতেই সোহানাকে একা পাঠানো উচিত হয়নি। সেই অসতর্কতার মাশুল যে এবার কীভাবে চুকাতে হবে—সেটা ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছে ও।

সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্ফল ছোটাছুটির পর ভাগ্যকে মেনে নেয় রানা। বুঝতে পারে, পুরো ব্যাপারটার নিয়ন্ত্রণ এখন প্রতিপক্ষের হাতে;

চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারবে না। তারচেয়ে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেখা যাক, কী চায় ব্ল্যাক উইডো। সোহানাকে উদ্ধার করবার মত কোনও সুযোগ আছে কি না, সেটা তখনই বোঝা যাবে।

টর হাউসের দিকে এগিয়ে চলল রানা। এক ঘণ্টা আগে এসে খুব একটা উপকার হয়নি। ঘন কুয়াশা মস্ত এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে ফাঁদ পাততে পারছে না, আবার শত্রুরা হামলা করে বসলে কাভার নেবার মত ভাল জায়গাও বাছাই করে রাখতে পারছে না। কিছুটা অসহায় বোধ করল ও, প্রকৃতির উপর ক্রুদ্ধ হলো ওকে এমন অবস্থায় ফেলায়।

গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও খুব শীঘ্রি। ততক্ষণে শরীরের অস্থিমজ্জাতেও কামড় বসিয়েছে ঠাণ্ডা, স্নায়ুগুলো অসাড় হবার জোগাড়। হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে আসতেই স্থির হয়ে গেল ও, কে যেন আসছে! রাস্তার পাশ থেকে সরে গেল রানা, একটা গাছের আড়ালে গিয়ে পিস্তলটা হাতে নিল।

একটু পরই কুয়াশার আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল, দৃষ্টিসীমার মধ্যে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেসে এল মৃদু হাসির আওয়াজ, সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠ। 'এক ঘণ্টা আগেই এসে পড়েছ, না?'

ব্ল্যাক উইডো। মাথায় একটা পট্টি বাঁধা, সেদিনের মতই খাকি প্যান্ট-সুট আর বুট পরেছে। বাড়তি পোশাক বলতে রয়েছে একটা ফটোগ্রাফারস্ জ্যাকেট, ওটার পকেটগুলো কনসিলড্ ওয়েপন আর বাড়তি অ্যামিউনিশন রাখবার জন্য আদর্শ।

মেয়েটার কথার জবাব দিল না রানা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'বেরিয়ে এসো,' বলল ব্ল্যাক উইডো। 'লুকিয়ে লাভ নেই, তুমি যে আগে এসে ফাঁদ পাতার চেষ্টা করবে, সেটা জানতাম।

সে-কারণে কাল রাত থেকেই অপেক্ষা করছি আমরা, সব ধরনের প্রস্তুতি-সহ।'

আর লুকানোর মানে হয় না, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। রাস্তায় উঠে এল। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মন পড়তে শুরু করেছ তুমি।' ওর কণ্ঠে বাঁকা সুর। 'লোকে শুনলে ভাববে, আমাদের মধ্যে আত্মার সংযোগ আছে। খুব খারাপ হবে সেটা; তোমার মত একটা বিষাক্ত কীটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কোনও ধরনের গুজবও শুনতে চাই না আমি।'

হেসে উঠল ব্ল্যাক উইডো। 'জিভের ধার কমেনি দেখছি! এনিওয়ে, আমি আত্মার সংযোগে বিশ্বাস করি না। যা করেছি, তা হলো চরিত্র বিশ্লেষণ। তোমার ফাইলটা মুখস্থ করে ফেলেছি আমি; বোঝার চেষ্টা করেছি, কোন্ পরিস্থিতিতে কী করো তুমি।'

'খুব সম্মানিত বোধ করছি কথাটা শুনে।'

'পিস্তলটা নামাবে? পরিস্থিতির সঙ্গে মানাচ্ছে না ওটা। আর যা-ই করো, আমাকে তুমি এখন গুলি করবে না।'

সিগ-সাওয়ারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রানা। বলল, 'ঠিকই বলেছ। সেদিন একবার বুলেট নষ্ট করেছি, আজ আবার করার কোনও মানে হয় না। এরপর যখন গুলি করব, তখন যমের বাড়ি পাঠাবার জন্যই করব। মেয়ে বলে কোনও রকম দয়া-মায়া আশা কোরো না।'

'কে কাকে যমের বাড়ি পাঠায়, আগেভাগেই ঘোষণা কোরো না—যখনকারটা তখন দেখা যাবে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল ব্ল্যাক উইডো। 'এসো কাজের কথা শুরু করা যাক।'

'আমার কানদুটো খোলা আছে।'

'এখানে? সেটা বোধহয় উচিত হবে না। কে কখন এসে পড়ে... তারচেয়ে চলো বিচে যাই। পরিষ্কার বাতাস পেলে তোমার মগজটা হয়তো কাজ করতে শুরু করবে। বুঝতে পারবে,

আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করাটা কত বড় বোকামি।'

'সেটা বোঝার জন্য বিচে যাবার দরকার নেই। এমনিতেই বুঝতে পারছি—ঠাট্টা-তামাশা না, তোমাকে আসলে বিশ্রি ভাষায় গালিগালাচ দেয়া উচিত।'

বিরক্ত চোখে রানার দিকে তাকাল যুবতী। বলল, 'এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে আসবে কি না, বলো।'

'চলো।'

রাস্তা ছেড়ে বিচের দিকে হাঁটতে শুরু করল ব্ল্যাক উইডো, রানা পিছু নিল ওর। কিছুদূর গিয়ে মেয়েটা আলাপচারিতার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কিন্তু খুব খেপে আছি তোমার ওপর।'

'তোমাকে গুলি করেছিলাম বলে?' রানা জানতে চাইল।

'না, ওটা মেনে নিতে রাজি আছি আমি। তবে আমাকে ট্রয় ডোনাহিউ-র জঘন্য ছবিগুলো দেখতে বাধ্য করায় তোমার শাস্তি হওয়া দরকার।'

'ছবিগুলো! আমি তো মাত্র একটার কথা বলেছিলাম।'

'আরে... ওটা সত্যি বলেছ, না মিথ্যে—তা বুঝব কী করে? তাই ডোনাহিউ-র কালেকশন নিয়ে বসতে হয়েছিল আমাকে। *রোম অ্যাডভেঞ্চার? প্যারিশ? পাম স্প্রিং উইকএণ্ড?* ওফ্, বমি করে দিয়েছিলাম প্রায়। একটার চেয়ে একটা...'

মুচকি হাসল রানা। 'তা... *সামার প্লেস*-এর বিচটাই যে সবকিছুর চাবিকাঠি, সেটা বুঝলে কী করে?'

'*প্লে মিস্টি ফর মি* দেখে। তবে তার জন্য ক্লিণ্ট ঈস্টউডের প্রত্যেকটা ছবি দেখতে হয়েছে আমাকে। লোকটা আমার খুব পছন্দের নায়ক ছিল, কিন্তু অনবরত বিরিয়ানি খেলে কী হয়, জানো তো? পেটের অসুখ। বিতৃষ্ণা এসে গেছে ঈস্টউডের ওপরেও। পছন্দের তালিকা থেকে এই যে লোকটাকে বাতিল তালিকায় পাঠিয়ে দিলাম, সেটা তোমার আরেকটা অপরাধ।'

‘বুঝতে পারছি, গুরুতর সব অপরাধ করে ফেলেছি,’ হাসি চেপে বলল রানা। ‘তা, আমাদেরকে খুঁজে পেলে কীভাবে?’

‘কারমেলে এসে গলফ ক্লাবগুলোর উপর নজর রাখতে শুরু করেছিলাম, সিদ্দিকীর জন্যে। পেবল বিচের ক্লাবে যেতে দেখেছি তোমাদের। এরপর পিছনে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছি... বাকিটা তো আন্দাজ করতেই পারছ।’

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। মনে মনে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করছে। চোখ-কান আরও খোলা রাখা উচিত ছিল, তা হলে ফেউ লাগার ব্যাপারটা ধরতে পারত। যদিও এরা প্রফেশনাল, নিজেদের অদৃশ্য করে রাখতে জানে; তবে সেটা ওর মত অভিজ্ঞ এজেন্টের জন্য কোনও অজুহাত হতে পারে না। জিজ্ঞেস করল, ‘সোহানাকে কবজা করলে কীভাবে? জিমনেশিয়ামের ওরা সন্দেহ করল না কিছু?’

‘কাম অন, এসব ছোটখাট বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত হচ্ছে না তোমার,’ হাসল ব্ল্যাক উইডো। ‘তারপরও জিজ্ঞেস যখন করেই ফেলেছ, তা হলে বলি। চুপিসারে তোমার বান্ধবীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই আমরা, একটা ইঞ্জেকশন পুশ করি। আমার মাথার পট্টিটাও খুব কাজ দিয়েছে... আহত সুন্দরী মেয়েকে কেউই সন্দেহ করে না। ওকে নিয়ে সহজেই বের হয়ে আসতে পেরেছি, কেউ বাধা দেয়নি, প্রশ্ন তোলেনি।’

‘কী বললে? সুন্দরী, আবার মেয়ে? তুমি নিজেকে তা-ই মনে করো? আমরা তো তোমাকে পাজি, ত্যাঁদোড়, হতচ্ছাড়া মেয়েমানুষ বলে জানি।’

‘দায়িত্ব নিলে সেটা আমি পালন করি, কে কী জানে বা কী ভাবে তার তোয়াক্কা রাখি না।’

‘ওর কোনও ক্ষতি করোনি তো?’

‘প্রশ্নই ওঠে না। সোহানা বহাল তবিয়তেই আছে... তবে

শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না, সেটা তোমার উপর নির্ভর করবে।'

'মানে?'

জবাব না দিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ব্ল্যাক উইডো। একটু পরেই ওরা পৌঁছে গেল টর হাউসের পাশের বিচে। সাত-সকালে জায়গাটা একেবারে নির্জন, শুধু ঢেউয়ের আছড়ে পড়া ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। একটা বিচ চেয়ারে গিয়ে বসল মেয়েটা, পাশের আরেকটা দখল করল রানা। চুপ করে রইল, সময় দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে মুখ খোলার।

'সিদ্দিকীকে আমার দরকার, রানা,' খানিক পর বলল ব্ল্যাক উইডো। 'জ্যান্ত, না মৃত—তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু ওকে যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছি, বসদের চোখে আমি একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নই। ওঁরা বোঝা পছন্দ করেন না।'

'কাদের কথা বলছ... সিদ্দিকীর কণ্ট্রোলারদের কথা?'

মাথা ঝাঁকাল ব্ল্যাক উইডো। 'আমিও ওদের একজন ছিলাম। পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমার ওপর। সিদ্দিকী যতক্ষণ বেঁচে আছে, কাজটা ততক্ষণ অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। ওঁরা দিন দিন অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, আমার জন্যে লক্ষণটা মোটেই শুভ নয়। আমার ক্যারিয়ার খতম হওয়ার জোগাড় হয়েছে।'

'সহানুভূতি জানাচ্ছি,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানা। 'যদিও আমার সেটা জানানো উচিত নয়। তোমার মত একটা নিষ্ঠুর মানুষের সহকর্মীদের হাতে খুন হয়ে যাওয়াই তো ভাল মনে করি।'

গরম চোখে ওর দিকে তাকাল ব্ল্যাক উইডো। রাগী গলায় বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে! মিছরির ছুরি চালাবার জন্য তোমাকে ডেকে আনিনি এখানে। আরও বড় একটা কাজ রয়েছে তোমার জন্যে।'

'সম্ভবত আন্দাজ করতে পারছি, সেটা কী হতে পারে।'

'ইয়েস, মাসুদ রানা! আমি চাই, তুমি ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করবে! এবং তা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে!'

'আমি কেন? কারমেল পর্যন্ত পৌঁছে গেছ, এখন তো কাজটা তুমি নিজেই করতে পারো।'

'না, রানা। সিদ্দিকীর সঙ্গে পাল্লা দেয়া শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব। তুমি ওকে শিখিয়েছ কীভাবে অদৃশ্য হতে হবে, তাই তুমিই শুধু পারবে ওকে আবার দৃশ্যমান করতে।'

'বুঝলাম। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টায় ওকে খুঁজে বের করা তো অসম্ভব একটা কাজ!'

'যদি সোহানাকে জ্যান্ত পেতে চাও, অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে তোমার, রানা! আমার হাতে সময় নেই!' কঠিন গলায় বলল ব্ল্যাক উইডো।

চুপ হয়ে গেল রানা। কী বলবে—সময়সীমা বাড়াবার জন্য চাপাচাপি করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হবে না। ব্ল্যাক উইডো নিজেও সম্ভবত একটা ডেডলাইন পেয়েছে, সেজন্যেই এভাবে খেপে উঠেছে।

ওকে নীরব হয়ে যেতে দেখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'কাল সকালে... ঠিক এই সময়ের মধ্যে আবার তোমাকে দেখতে চাই আমি। সিদ্দিকীর লাশ-সহ।'

'ভুল করছ তুমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আমি ভাড়াটে খুনি নই যে, খুন করে লাশ এনে দেখাব তোমাকে। সিদ্দিকীকে জ্যান্ত এনে দেয়ার চেষ্টা করতে পারি, খুনোখুনির কাজটা তুমি নিজেই কোরো।'

'আমার আপত্তি নেই।' বলে একটা চিরকুট রানার হাতে তুলে দিল ব্ল্যাক উইডো। 'এতে আমার ফোন নাম্বার আছে, সিদ্দিকীকে হাতে পাবার পর জানিয়ো। আমি বলে দেব, কোথায়-কীভাবে ওকে ডেলিভারি দিতে হবে।'

'আর সোহানা?'

'ওকেও একই সঙ্গে তুলে নিতে পারবে তুমি,' বলল ব্ল্যাক উইডো। 'তবে সময় কিন্তু ওই চব্বিশ ঘণ্টাই, সেটা মনে রেখো। যদি ব্যর্থ হও, সোহানার চিহ্নও খুঁজে পাবে না আর।'

আর কিছু বলার বা শোনার প্রয়োজন মনে করল না সে। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পিছন থেকে ডাকল রানা, 'শোনো!'

থামল ব্ল্যাক উইডো।

'কাজটা তুমি ঠিক করলে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'আমাকে যারা এভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে, আজ পর্যন্ত তাদের জন্য ফলাফলটা ভাল হয়নি।'

হেসে উঠল ব্ল্যাক উইডো। 'চব্বিশ ঘণ্টা, রানা। গুডবাই!'

চলে গেল যুবতী। তার পিছনে অনেকগুলো ছায়াকে নড়তে দেখল রানা, দলের বাকিরাও ফিরে যাচ্ছে। ভূতের মত এতক্ষণ কুয়াশায় মিশে ছিল ওরা, উপস্থিতির সামান্যতম চিহ্নও দেখা যায়নি।

ওরা চলে যাবার পরও শূন্য সৈকতে অনেকক্ষণ বসে রইল রানা। মনে মনে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করল ও। ছাড়বে না ওদের!

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন,' ওপাশ থেকে অতি-পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'তুমি কি এখনও চাইনিজ খাবার অপছন্দ করো?' জিজ্ঞেস করল রানা। একটা গ্যাস স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ও, কথা বলছে পে-ফোনে।

'অবশ্যই! আমার দু'চোখের বিষ,' বলল এরিক। একটা মুহূর্তের বিরতি নিল। 'রীতিমত একটা যুদ্ধক্ষেত্র রেখে গেছেন

আপনি আমাদের জন্য।'

'আত্মরক্ষা।'

'কথাটা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতো, যদি আপনি ব্যাপারটা সশরীরে ব্যাখ্যার জন্য বেইলি'জ রিজে অপেক্ষা করতেন। ঝামেলা এড়ানো যেত। জানেন, এখন কতজন এফবিআই এজেন্ট আপনার খোঁজে বের হয়েছে? জানেন, কতগুলো আইন ভেঙেছেন এ-পর্যন্ত?'

'আমাকেই খুঁজছে?'

'নামটা আমি বলিনি। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওই ল্যাব থেকে উদ্ধার হওয়া লোকেরা বলেছে। আপনি নাকি ওদেরকে শক ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন?'

'ওটা ওদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ব্যাটারা এখন কোথায়?'

'বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে গেছে। পেন্টাগন থেকে নির্দেশ এসেছে, ওদের আটকে রাখা যাবে না। আমাদের কিছু করার ছিল না।'

'তারমানে ব্যাপারটা ওখানেই খতম?'

'মোটামুটি ওরকমই বলতে পারেন। আমরা অবশ্য জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে সব জানিয়েছি; কিন্তু ওরা প্রমাণ ছাড়া কিছু করতে নারাজ। সমস্যাটা বুঝতেই পারছেন... ল্যাবটা খালি, সিদ্দিকী গায়েব... ওখানে যে অবৈধ বায়ো-কেমিক্যাল ওয়েপনের গবেষণা চলছিল, সেটা প্রমাণ করার কোনও রাস্তা নেই। গ্যাসটা যে সিভিলিয়ান এবং মিলিটারি পার্সোনেলের উপর অবৈধভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটা প্রমাণ করা তো আরও অসম্ভব।'

'তারমানে এই নয় যে, এর সঙ্গে যারা জড়িত, তারা পার পেয়ে যাবে। আমি তা হতে দেব না।'

'আবার যুদ্ধ বাধাবার প্ল্যান করছেন নাকি? সেই র‍্যামডাইনের ঘটনাটার মত? সেজন্যেই ফোন করেছেন আমাকে?'

'উঁহুঁ, তোমাকে এসবের মধ্যে আর জড়াতে চাই না। ফোন করেছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে, ছোট্ট একটা সাহায্যের জন্য। আমি একটা সমস্যায় পড়েছি...'

'সমস্যায় তো আপনি শুরু থেকেই আছেন। এখন আবার নতুন কী ঘটল?'

'সোহানাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। কাল সকালের মধ্যে যদি সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করে ওদের হাতে তুলে না দিই, তা হলে ওকে খুন করা হবে।'

'মাই গড!' শুধু দুটো শব্দই বেরুল এরিকের গলা থেকে।

'এরিক, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?' বলল রানা। 'এত অল্প সময়ে আমার একার পক্ষে কিছুতেই ওকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।'

'নিশ্চয়ই করব,' হড়বড় করে বলল এরিক। 'এক্ষুণি চলে আসছি। কোথায় আপনি?'

'কারমেল, ক্যালিফোর্নিয়া। তবে তোমাকে এখানে প্রয়োজন নেই আমার। সাহায্যটা, আমি চাই, তুমি তোমার অফিসে বসেই করবে।'

'কার বিরুদ্ধে লেগেছেন, আপনি বুঝতে পারছেন না, মি. রানা। এরা র‍্যামডাইনের চেয়েও বহুগুণ ভয়ঙ্কর। ভেবেছেন, সিদ্দিকীকে ওদের হাতে তুলে দিলেই আপনাকে, বা মিস সোহানাকে ছেড়ে দেবে? ইম্পসিবল, আপনাদের দুজনকেই খুন করবে ওরা। যদি বাঁচতে চান, আমাকে আপনার দরকার হবে।'

'না! লড়াইটা আমার, শেষটাও আমাকেই দেখতে হবে। তুমি শুধু আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করো।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। বুঝতে পারছে, রানাকে টলানো যাবে না। তাই বলল, 'ঠিক আছে, বলুন কী জানতে চান।'

'কারমেল থেকে মণ্টেরি পর্যন্ত যত গলফ কোর্স আছে, সবগুলোতে খোঁজ নিতে হবে তোমাকে—গত তিন সপ্তাহে যত নতুন গলফার ক্লাবগুলোতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে, কিংবা মেম্বার হয়েছে, তাদের তালিকা চাই আমি।'

'অমন লোক হাজারখানেক হতে পারে!'

'আরও আছে। কারমেল এলাকার সমস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—গত তিন সপ্তাহে তারা যত ধরনের নতুন কেনা-বেচা বা লিজের কণ্ট্র্যাক্ট করেছে, সব জোগাড় করতে হবে। লিস্ট-দুটো হাতে পেয়ে মেলাতে শুরু করো। দুটোতেই ক'টা কমন নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়, তা-ই জানতে চাই আমি, ব্যস।'

খসখস করে কাগজে কাজদুটো লিখে নিল এরিক। বলল, 'ঝামেলার কাজ... সময় লাগবে।'

'চব্বিশ ঘণ্টাও আমার হাতে নেই, এরিক। খোদার দোহাই, যত তাড়াতাড়ি পারো, লিস্টদুটো জোগাড় করো। আমি বিকেলে আবার ফোন করব তোমাকে।'

আর তর্ক করল না এরিক। বলল, 'বুঝেছি, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি। কিন্তু বিকেল হতে তো দেরি আছে, এই সময়টা কী করবেন আপনি।'

'আমি জিমনেশিয়ামে যাব।' বলে ফোন রেখে দিল রানা, এরিককে হতভম্ব করে দিয়ে।

আঠারো

সাংবাদিক সেজে কাজ শুরু করল রানা। গতকাল যেগুলোয় যায়নি সেই জিমনেশিয়ামগুলোতে ঢুঁ মারতে শুরু করল এক এক করে। সবাইকে একই গল্প বলছে—দ্রুত শরীরের ওজন কমানোর সুফল ও কুফল নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করছে। কতটা দ্রুত শুকানো একজন মানুষের জন্য নিরাপদ, সেটা জানাতে চায় জনসাধারণকে। শুধু তত্ত্বকথা নয়, প্রতিবেদনকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য জিমনেশিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে বাস্তব কেসের রেফারেন্সও চেয়ে বেড়াচ্ছে।

গত কয়েকদিনে এই প্রথমবারের মত ভাগ্যদেবী কিছুটা সদয় হয়ে উঠলেন ওর প্রতি। চতুর্থ জিমনেশিয়ামটাতে যেতেই ওখানকার ম্যানেজার বলল, 'আপনার প্রতিবেদনের জন্য একেবারে আদর্শ একটা কেস আছে আমার হাতে—ভদ্রলোককে আপনি এক কথায় বিকারগ্রস্ত বলতে পারেন, ওজন কমাবার জন্য কাউকে এমন পাগল হয়ে যেতে দেখিনি আমি।'

'কী রকম?' সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'আর বলবেন না, ভীষণ মোটা ছিল লোকটা... যখন প্রথম এখানে এল আর কী। ক্লাবে ভর্তি হবার দু'দিনের মধ্যে লাইপোসাকশন সার্জারি করাল। ওটার ধকল কাটতে না কাটতে পুরোদমে ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। দু'সপ্তাহের কিছু বেশি হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে ত্রিশ কেজির বেশি ওজন কমিয়ে ফেলেছে লোকটা।'

'বলেন কী! কাজটা রিস্কি না?'

'শুধু রিস্কি নয়, মারাত্মক।' বলল ম্যানেজার। 'কী হারে যে শরীরকে শেপে নিয়ে আসছে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। শুরুর দিকের চেহারা-সুরতের সঙ্গে এখনকারটার বিন্দুমাত্র মিল নেই। ইদানীং তো তাকে দেখে মনে হচ্ছে, স্টেরয়েডও ব্যবহার করতে শুরু করেছে। নইলে মেদ সরে গিয়ে এত দ্রুত পেশি গজাতে পারে না।'

'ভদ্রলোককে বলেছেন এ-কথা?'

'বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছি। এক কথায় জানিয়ে দিয়েছে, তার ভাল-মন্দ নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ব্যাটা একটা পাগল, বুঝলেন? নইলে এমন করত না... এই রে, আপনি তো সাংবাদিক, কথাটা বলে দিয়ে ভাল করলাম না বোধহয়...'

'নিশ্চিন্ত থাকুন,' রানা আশ্বাস দিল, 'আপনার বা এই জিমের রেপিউটেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কোনও রিপোর্ট লিখব না আমি।'

'বাঁচালেন!'

'লোকটার নাম জানতে পারি? দেখতে কেমন?'

'রবার্ট ফস্টার। নামটা শুনতে আমেরিকান মনে হলেও চেহারায় এশিয়ান ছাপ আছে। গায়ের রং অবশ্য ফর্সা, ছ'ফুটের মত লম্বা। বয়স ধরুন... চল্লিশ-টল্লিশ হবে। এখনও পুরোপুরি স্লিম হয়নি অবশ্য, তবে পুরনো বন্ধু-বান্ধব কেউ হঠাৎ দেখলে যে তাকে চিনতে পারবে না, সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।'

'হুম, খুবই ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করল রানা। 'ওঁকে কখন পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ম্যানেজার। 'ব্যায়াম-ট্যায়াম আজকাল বাড়িতেই করে, ওখানে যন্ত্রপাতি বসিয়ে নিয়েছে শুনলাম। এখানে আসে শুধু ডায়েট আর এক্সারসাইজ টেকনিক রিভিউ করাতে...

খুবই অনিয়মিত।'

'বাড়িটা কোথায়?'

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করল ম্যানেজার। পাতা উল্টে ফস্টারের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বের করল, তারপর বলল, '৭৮, ভিস্তা লিণ্ডা। মন্টেরির ওদিকে... নতুন আবাসিক এলাকা, বড়লোকদের জায়গা। তবে ওখানে গিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। ফস্টার খুবই মুখচোরা টাইপের মানুষ, কারও সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে না। সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকার দেবে... সেটা তো আরও অবিশ্বাস্য।'

'চেষ্টা করে দেখি। আর কিছু জানাতে পারেন?'

'একটা সাদা রঙের *পোর্শ* গাড়ি চালায় লোকটা। লাইসেন্স নাম্বার: *সিএমএল-এক্স-২৯২০।*'

'আপনি দেখি মুখস্থ করে বসে আছেন!' রানা অবাক হলো।

'মুদ্রাদোষ বলতে পারেন,' হাসল ম্যানেজার। 'ছোটবেলা থেকেই নতুন কোনও গাড়ি দেখলে লাইসেন্স নাম্বার মুখস্থ করে ফেলি।'

'ভাল, খুব ভাল,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

আধঘণ্টা পর।

পঞ্চাশ। একান্ন। বাহান্ন...

ভিস্তা লিণ্ডার রাস্তা ধরে ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, ব্যস্ত দৃষ্টি বোলাচ্ছে দু'পাশের বাড়িঘরের নামফলকের দিকে, নম্বর দেখছে। জিমনেশিয়ামের ম্যানেজার ভুল বলেনি, আসলেই ধনীদের আবাসিক এলাকা এটা। ছবির মত সুন্দর প্রত্যেকটি বাড়ি, একেকটার দাম অন্তত দশ-পনেরো লাখ ডলারের কম হবে না; বেশিও হতে পারে। কাছেই পুরনো একটা পরিত্যক্ত গলফ

কোর্স আছে, নামঃ *ব্ল্যাক হর্স।* ওটাকেও আবাসিক এলাকায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে—বানানো হচ্ছে নানা ধরনের বাড়ি আর রাস্তাঘাট, দূর থেকে দেখতে পেল রানা।

বাষট্টি। তেষট্টি। চৌষট্টি...

কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করছে রানা, কারমেল ছেড়ে সিদ্দিকী মণ্টেরি পেনিনসুলায় বাড়ি নিতে গেল কেন? যদি বাড়তি সতর্কতার কারণে পছন্দের শহর থেকে দূরে আবাস গড়েও থাকে, তা হলে ওখানে আবার দামি গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? ওখানকার জিমনেশিয়ামেই বা ভর্তি হয়েছে কেন?

সত্তর। একাত্তর। বাহাত্তর...

স্নায়ু টান টান হয়ে গেল রানার। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সিদ্দিকী বাড়িতে আছে কি নেই, বলা যাচ্ছে না। তাই সাবধানে থাকতে হবে। শয়তানটা ওকে চিনে ফেললে সর্বনাশ। কী করবে, মনে মনে ঠিক করে ফেলল রানা। বাড়ির সামনে দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলে যাবে দূরে, লেআউট দেখে নেবে; ফিরে আসবে পায়ে হেঁটে। তারপর সবার চোখ এড়িয়ে ঢুকবে বাড়ির ভিতর। সিদ্দিকীকে এখুনি পেলে তো ভাল, নইলে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না সে ফেরে।

চুয়াত্তর। পঁচাত্তর...

আটাত্তর নম্বর বাড়িটা ঠিক সামনে। হিসপ্যানিক নকশায় গড়া একটা দোতলা বাড়ি, ছাতটা লাল টালি বসানো। লনটা বেশ বড়, নিচু পিকেট-ফেন্স দিয়ে ঘেরা। ওদিকে তাকিয়েই থমকে গেল রানা। একটা সাইনবোর্ড বসানো হয়েছে লনের মাঝখানে, তাতে বড় করে লেখাঃ

বাড়ি বিক্রি হইবে।
যোগাযোগ করুন...

ফোন-নম্বর-সহ বিক্রেতার নাম দেয়া আছে, তবে সেটা রবার্ট

ফস্টার, মানে সিদ্দিকীর ছদ্মনাম নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষঃ মহিলা!

কিছু একটা গোলমাল আছে, বুঝতে পারছে রানা। ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ও, নেমে পড়ল। আটাত্তর নম্বরের মুখোমুখি আরেকটা বাড়ি আছে, ওটার দরজায় গিয়ে বেল বাজাল। মায়াময় চেহারার এক বৃদ্ধা উদয় হলেন জবাব দিতে। 'ইয়েস?'

'মাফ করবেন,' বলল রানা। 'আমি এখানে বাড়ি কেনার কথা ভাবছি। জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম, ওই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল।' আঙুল তুলে দেখাল ও। 'বাড়িটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বৃদ্ধা। 'এলিজাবেথকে বলেছিলাম, বিক্রি করতে চাও, করো। তবে এভাবে সাইনবোর্ড বসিয়ো না, দেখতে ভাল দেখায় না। মুখে মুখে কথা ছড়ালেই তো চলে...'

'এক্সকিউজ মি,' বাধা দিল রানা। 'কীসের কথা বলছেন?'

'বাড়িটার মালিক ছিল আমার বন্ধু—হেনরি স্যামসন,' জানালেন বৃদ্ধা। 'তিনদিন আগে মারা গেছে ও। এলিজাবেথ... মানে, ওর মেয়ে। আরে, অন্তত একটা হপ্তা ওয়েট কর্, না; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বিক্রি করতে উঠেপড়ে লেগেছে। দেখছ না, সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে? আরে, মরা বাপটাকে অন্তত একটু সম্মান তো দেখা!'

'হেনরি স্যামসন?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কতদিন থেকে থাকতেন তিনি এখানে?'

'এই এলাকার বয়স তো বেশি নয়, ধরো আড়াই বছর... শুরু থেকেই ছিল হেনরি। ও আর আমি এখানকার একেবারে প্রথম দিককার বাসিন্দা।'

'আর কেউ কি থাকত ওঁর সঙ্গে?'

'একা মানুষ ছিল হেনরি। বউ মারা গেছে অনেক বছর আগে, বিয়ের পর এলিজাবেথ চলে গেছে প্যাসাডেনায়। শুধু এক হাউসকিপার ছাড়া আর কেউ থাকত না ওর সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' রানা বলল। 'আর কিছু জানার নেই আমার।'

'কিনবে বাড়িটা? তোমার মত ইয়াং ম্যানকে প্রতিবেশী হিসেবে পেলে মন্দ হয় না।'

হাসল রানা। 'আপনাকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ভেবে দেখি।'

ভিস্তা লিণ্ডা থেকে ফিরতে ফিরতে ড. সিদ্দিকীর কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে রানা—এই লোক যে কতটা ধুরন্ধর, তা টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। এক অর্থে প্যারানয়েড-ও বলা চলে তাকে। মিথ্যে পরিচয়ের ভিতর আরেকটা মিথ্যে পরিচয় তৈরি করেছে সে। রানা নিশ্চিত, রবার্ট ফস্টারের পরিচয়টা অন্তরার দেয়া নয়; এটা সিদ্দিকী নিজেই বানিয়ে নিয়েছে, অন্তরার দেয়া নিখুঁত পরিচয়টাকে আড়াল করবার জন্য। এটা তার জন্য স্রেফ একটা ফেইল-সেফ ব্যবস্থা। যেখানে একটা নকল পরিচয়ের পর্দাই সরানো কঠিন, সেখানে দুটো পরিচয়ের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে সে—যাতে একটা ফাঁস হয়ে গেলেও দ্বিতীয়টা অক্ষত থাকে। মনে মনে কৌশলটার তারিফ না করে পারল না রানা—অন্যদের চাইতে নিজেকে চালাক ভাবা-টা স্রেফ সিদ্দিকীর অহঙ্কার নয়, প্রতিটি কাজে-কর্মেও তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অন্তরার দেয়া পরিচয়টা সে সযত্নে রেখে দিয়েছে, দ্বিতীয়টা... মানে রবার্ট ফস্টারের-টা ব্যবহার করছে প্রথমটায় আবির্ভূত হবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করবার জন্য—জিনিয়াস প্ল্যানই বটে!

কিন্তু লোকটা এই দ্বিতীয় পরিচয়টা ম্যানেজ করল কীভাবে?

বাড়ির ঠিকানা নাহয় ভুয়া হলেও অসুবিধে নেই, কিন্তু জিমে ভর্তি হবার জন্য অথেনটিক সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আইডি দেখাতে হয়েছে নিশ্চয়ই; সেটাই এদেশের নিয়ম। ওগুলো দেখাল কীভাবে?

একটু ভাবতেই জবাবটা পেয়ে গেল রানা। অথেনটিক পরিচয় কীভাবে জোগাড় করতে হবে, সেটা জানা আছে সিদ্দিকীর; জেনেছে ওর কাছ থেকেই। সেফ-সাইটের প্রথম ব্রিফিঙে মৃত বাচ্চার সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার চুরি করার ব্যাপারে জানানো হয়েছিল সিদ্দিকীকে, সেটাই কাজে লাগিয়েছে সে। অন্যান্য সব স্টেটের মত ক্যালিফোর্নিয়াতেও বার্থ-রেকর্ড ও ডেথ-সার্টিফিকেট হচ্ছে পাবলিক ডকুমেন্ট—চাইলেই যে-কেউ দেখতে পারে। *হল্ অভ রেকর্ডস্*-এ গিয়ে নিজের জন্ম-তারিখের কাছাকাছি কোনও মৃত শিশুর সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার জোগাড় করেছে সে, সেটার মাধ্যমে আইডি নিয়েছে, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

অসহায় বোধ করল রানা, এমন একজন মিসগাইডেড জিনিয়াসের সঙ্গে কীভাবে পাল্লা দেবে, বুঝতে পারছে না। উধাও হয়ে গেছে লোকটা ওরই শেখানো পথে, ওকেই ধোঁকা দিয়ে... যা শেখানো হয়েছে, তার চাইতেও নিখুঁতভাবে! তাকে কি আদৌ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে? তা-ও আবার কাল সকালের মধ্যে?

আনমনে মাথা নাড়ল ও।

বিকেল বেলা একটা পে-ফোন থেকে আবার এরিকের নাম্বারে ডায়াল করল রানা।

'এজেন্ট স্টার্ন।' এরিকের গলা শোনা গেল।

'চাইনিজ খাবার...'

'খুবই অপছন্দ আমার,' বাধা দিয়ে বলল এরিক।

'লিস্টগুলো হাতে পেয়েছ?' সরাসরি কাজের কথা পাড়ল

রানা।

'হেডকোয়ার্টারের এক ডজন এজেন্টকে কাজে লাগিয়েছি আমি,' এরিক বলল। 'ফোনে খোঁজখবর নিচ্ছে ওরা। কারমেল-মণ্টেরি এলাকায় একজন রেসিডেন্ট এজেন্ট আছে, তাকে মাঠে নামিয়েছি। ওকে সাহায্য করতে স্যান ফ্রান্সিসকো আর স্যান হোসে থেকেও এজেন্ট গেছে। তবে এখনও অনেক রিয়াল এস্টেট এজেন্ট আর গলফ কোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। বুঝতেই পারছেন, সময় খুব একটা পাইনি আমরা।'

'আমি জানি, তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করছ,' বলল রানা। 'তবু... আরেকটু তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করো।'

'আমি এখুনি তাড়া দিচ্ছি সবাইকে।'

'খুব ভাল। বাই দ্য ওয়ে, তোমার সামনে কোনও কম্পিউটার আছে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'একটা লাইসেন্স নাম্বার দিচ্ছি। গাড়িটার মালিকের নাম জানা দরকার।'

'বলুন।'

'ক্যালিফোর্নিয়ার নাম্বার। *সিএমএল-এক্স-২৯২০।* গাড়িটা *পোর্শ*, রঙ সাদা।'

'জাস্ট আ মিনিট। আমি এখুনি ক্যালিফোর্নিয়া ডিএমভি-র ডেটাবেজে খুঁজে দেখছি।'

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। তারপর এরিক বলল, 'পেয়েছি। গাড়িটা একটা অটো কোম্পানির। তবে এখন এক মাসের লিজে আছে। লিজ নিয়েছে রবার্ট ফস্টার নামে এক লোক। ঠিকানা: ৭৮, ভিস্তা লিণ্ডা, মণ্টেরি। ওখানে খোঁজ নিতে কাউকে পাঠাব?'

'দরকার নেই। ফস্টার ওখানে থাকে না। আমি অলরেডি ঘুরে এসেছি ওখান থেকে।'

'ঘুরে এসেছেন!' এরিক অবাক হলো। 'তা হলে আবার ডেটাবেজ দেখতে বললেন কেন?'

'ভেবেছিলাম অন্য কোনও ঠিকানা পাব।'

'হুম! এক কাজ করুন। ঘণ্টাদুয়েক পর আবার ফোন করুন। দেখি, এর মধ্যে লিস্টগুলো কালেক্ট করতে পারি কি না।'

'আমার হাতে এত সময় নেই, এরিক। যা করার এখুনি করতে হবে। যতটুকু লিস্ট পেয়েছ, ওটাই নিয়ে এসো। দেখো, কমন নাম আছে কি না ওগুলোর ভিতরে।'

'ঠিক আছে, দেখছি। তবে তারপরও একটু সময় দিতে হবে কিন্তু। এখনও নাম মেলানো শুরু করিনি কি না।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশি না, মেলানোর কাজটা কম্পিউটারে করব তো, শুধু লিস্টগুলো আগে কম্পাইল করে নিতে হবে। এই ধরুন... বিশ-পঁচিশ মিনিট।'

'ঠিক আছে, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আবার কল করছি।'

ফোন রেখে দিল রানা।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট অস্থিরতার মধ্যে কাটল রানার। বার বার ঘড়ি দেখল, কিন্তু সময় যেন ফুরোতেই চায় না। গ্যাস স্টেশনের পাশে একটা ডাইনার আছে, ওখানে গিয়ে কফি খেল ও, বাথরুমে গেল, জুকবক্সে পয়সা ফেলে পুরনো দিনের দুটো গান শুনল। এতকিছুর পরও দেখা গেল, মাত্র বিশ মিনিট পেরিয়েছে। শেষে ডাইনারের ভেণ্ডিং মেশিন থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল ও। বেশ কিছুদিন হলো ধূমপান ছেড়েছে, কিন্তু টেনশনে সেটা আর মনে রইল না। পর পর দুটো সিগারেট টেনে ঘড়ি দেখল—হ্যাঁ, হয়েছে আধঘণ্টা।

পে-ফোন থেকে আবার ডায়াল করল রানা। এবার আর কোড-ওয়ার্ডের ঝামেলায় গেল না, সরাসরি এরিককে জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর?'

'খবর বেশি ভাল না,' বিমর্ষ গলায় বলল এরিক। 'আংশিক লিস্ট মিলিয়ে দেখেছি আমরা, তাতেই ছাপ্পান্নটা নাম পাওয়া গেছে। পুরোটা মেলালে সংখ্যাটা যে কী পরিমাণ বাড়বে, সেটা কল্পনাও করতে পারছি না।'

'ছাপ্পান্ন?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'হ্যাঁ। এক জায়গাতেও নেই লোকগুলো। প্যাসিফিক গ্রোভ, মন্টেরি, সি-সাইড, কারমেল, কারমেল ভ্যালি, কারমেল হাইল্যাণ্ডস্... সবখানে ছড়িয়ে আছে। এতসব জায়গায় গিয়ে ফিজিক্যালি ওদের ভেরিফিকেশন করতে অনেক সময় আর লোকবল দরকার।'

'হুম! কারমেলে ক'জন আছে?'

'মাত্র একজন। অবশ্য ভ্যালি আর হাইল্যাণ্ডসে আরও চারজনের খোঁজ পাওয়া গেছে।'

মোট লোকের তুলনায় সংখ্যাটা নগণ্য। একটু বিস্মিত হয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এসব জায়গায় নতুন লোকের সংখ্যা এত কম হয় কী করে?'

'কারমেলে রিয়াল এস্টেটের দাম খুব চড়া। সবার পক্ষে এত দাম দিয়ে জমি বা বাড়ি কেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওখানকার লোকজন সহজে বিষয়-সম্পত্তি বিক্রিও করে না। স্বাভাবিক, এমন চমৎকার জায়গা কে ছাড়তে চায়, বলুন?'

'হুঁ,' একটু ভাবল রানা। টাকার অভাব নেই ড. সিদ্দিকীর, কাজেই কারমেলে বাড়ি বা জমি কিনতে অসুবিধে হবার কথা নয় তার। সারাজীবনের স্বপ্ন ওটা, কিছুতেই বিসর্জন দেবে বলে মনে হয় না। তাই বলল, 'ওই পাঁচটা নাম বলো তো।'

'অ্যাবনার ডিন, জেমস পিভেন, লুথার স্টিগওয়েল, হোরেশিও কেইন, আর লায়াল...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' উত্তেজিত গলায় বলল রানা। 'শেষ নামটা কী বললে?'

'লায়াল ম্যাসন?'

'না, না, তার আগেরটা।'

'হোরেশিও কেইন।'

'হ্যাঁ, ওটাই!' ভাবনায় ডুবে গেল রানা। ব্যাপারটা কি নিছক কাকতাল, নাকি...

'কী হলো, মি. রানা? চুপ হয়ে গেলেন যে?'

'হোরেশিও কেইন... নামটা চেনা আমার...'

'চেনেন ওকে? তা হলে তো বাদ...'

'না, এরিক। হোরেশিও কেইন নামটা শুনেছি আমি আগে, মানুষটাকে চিনি না।'

'কার কাছে শুনেছেন?'

'আমার এজেন্সির একজন... অন্তরার কাছে!'

'অন্তরা... মানে, যে-মেয়েটাকে সিদ্দিকী খুন করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভাবছেন, কারমেলে এই নামটা খুঁজে পাবার মধ্যে কোনও কানেকশন আছে?'

'কো-ইনসিডেন্স হবার সম্ভাবনা কতটুকু, এরিক? হোরেশিও নামটা বেশ আনকমন না? তার সঙ্গে যদি সারনেম-ও মিলে যায়, তা হলে কি আর একে কাকতালীয় ঘটনা বলা যায়?'

'কিন্তু সামান্য একটা নামের ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। অন্তরা নিশ্চয়ই আপনাকে সারাজীবনে ওই একটা নামই শোনায়নি?'

'হোরেশিও কেইন সাধারণ কেউ ছিল না, এরিক। অন্তরার

জীবনের প্রথম এবং একমাত্র প্রেম ছিল ও। পরস্পরকে ভালবাসত ওরা, বিয়ে করার কথা ছিল। যে-অ্যাকসিডেন্টে অন্তরা পঙ্গু হয়ে যায়, ওই একই অ্যাকসিডেন্টে হোরেশিও প্রাণ হারায়। লং-ড্রাইভে বেরিয়েছিল ওরা, একটা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছিল, হোরেশিও ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্তরার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ঘটনাটা।'

'বুঝলাম। কিন্তু ওর প্রেমিকের নামটা সিদ্দিকী নিতে যাবে কেন?'

'এখনও বুঝতে পারছ না তুমি, এরিক? অন্তরার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নকল পরিচয়ের কাগজপত্র তৈরি করিয়েছিল সিদ্দিকী। ও জানত, কাজ শেষ হলেই ওকে খুন করে ফেলবে শয়তানটা। তাই মরার আগে একটা সূত্র রেখে গেছে ও... এমন সূত্র, যেটা দুনিয়াতে শুধু আমি বুঝতে পারব। সিদ্দিকীর ভুয়া পরিচয়ের কাগজপত্রে ওর মৃত প্রেমিকের নাম বসিয়ে দিয়ে গেছে। শয়তানটার চোখে ওটা স্রেফ একটা নাম, কিন্তু আমার জন্য ওটা অনেককিছু!'

'বুঝতে পেরেছি!' এবার এরিকের গলাতেও উত্তেজনা ফুটল। তাড়াতাড়ি কাগজ ঘাঁটল ও। বলল, 'ঠিকানাটা লিখুন। ৩৯, কারমেল হাইল্যাণ্ডস্। সাগরের পাশে, একটা ক্লিফের উপর জায়গাটা—পুরো চার একরের সম্পত্তি। দোতলা একটা বাংলো আছে, বাকিটা ফলের বাগান।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে খসখস করে লিখে নিল রানা। 'আমি ঋণী হয়ে রইলাম, এরিক...'

'আরে রাখুন আপনার ঋণ! আমি আপনাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি। সিদ্দিকী লোকটা ভয়ঙ্কর। কোণঠাসা হয়ে পড়লে আরও যে কী করবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওখানে আপনার একা যাওয়া উচিত হবে না। আমাকে একটু সময় দিন, দেখি একটা

সোয়াট টিম পাঠাতে পারি কি না...'

'না, এরিক,' কড়া গলায় বলল রানা। 'আর কেউ না, আমি একাই যাব।'

'এটা গোঁয়াতুর্মির সময় নয়, মি. রানা। সিদ্দিকীর মত ম্যানিয়াককে সামলাতে হলে আপনার ফায়ার-পাওয়ার, আর ম্যান-পাওয়ার—দুটোই প্রয়োজন হবে।'

'ভুল বললে। লোক বেশি দেখলে ও বরং আরও সতর্ক হয়ে যাবে। আমি একা গেলে লুকিয়ে পৌঁছতে পারব, ওর চোখে পড়ব না। তোমাকে শুধু আর একটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

'সিদ্দিকীর খবরটা তোমার অফিসের কাউকে জানিয়ো না। এফবিআই ব্যাপারটায় নাক গলাক, তা আমি চাই না।'

'সেটা সহজ হবে না। লোকজনকে যে কাজে লাগিয়েছি, সেটা বসদের কাছে জাস্টিফাই করব কীভাবে?'

'যা-খুশি বলো। উদ্ভাবনী শক্তি খাটাও। আগামীকাল পর্যন্ত সময় দরকার আমার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। 'ঠিক আছে। তবে একটা কথা, মি. রানা। আমাকে ডোবাবেন না কিন্তু!'

উনিশ

রাত বারোটা। কারমেল হাইল্যাণ্ডস্।

হাতঘড়িতে বিপ্ বিপ্ করে অ্যালার্ম বাজতেই চোখ মেলল

রানা। ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছে ও, অভিযানে বেরুনোর আগে চোখ মুদে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

গাড়ির সিটে সিধে হয়ে চোখ রগড়াল রানা, মিনারেল ওঅটরের বোতল তুলে দু'ঢোঁক পানি খেল। তারপর হ্যাভারস্যাক নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ওর পরনে কালো রঙের পোশাক, মুখেও কালো ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট মেখেছে। গাড়ি পার্ক করেছে ড. সিদ্দিকীর সম্পত্তি থেকে এক মাইল দূরে। সব মিলিয়ে ওর উপস্থিতি টের পাবার কোনও উপায় নেই।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, হাত দিয়ে ডলে শরীর গরম করল রানা; তারপর অন্ধকারে মিশে এগোতে শুরু করল। পিঠে হ্যাভারস্যাক-টা রয়েছে, তাতে নানা রকম দরকারি জিনিস। এক মাইল দূরত্ব পেরুতে বেশি সময় লাগল না। অল্পক্ষণেই সিদ্দিকীর বাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেল ও। সামনেই কাঁটাতারের বেড়া, ওপাশে ফলের বাগান। স্ট্রবেরি, পিচ, কমলা-সহ নানা জাতের গাছ লাগানো হয়েছে সার বেঁধে। ভালই হলো গাছপালা থাকায়, মনে মনে ভাবল রানা, খোলা জমিন হলে বরং গা-ঢাকা দিয়ে এগোতে কষ্ট হতো।

পকেট থেকে একটা ওয়ায়্যার-কাটার বের করল ও, কাঁটাতারের বেড়ার একটা অংশ কেটে জায়গা বের করল, সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বাগানের ভিতর অন্ধকার আরও ঘন... যেন কালির দোয়াত উপুড় করে ঢেলে দেয়া হয়েছে ওখানে। গাছের আড়াল ব্যবহার করে এগোচ্ছে রানা। সাবধানে পা ফেলছে, বাগানের জমি শুকনো পাতায় ভরা, সামান্য চাপেও মড় মড় শব্দ হচ্ছে। যতটা সম্ভব চেষ্টা করছে কম শব্দ করে এগোতে।

আসার আগে এখানকার ম্যাপ দেখে এসেছে রানা, তাই নিকষ আঁধারেও পথ চিনতে অসুবিধে হলো না। পনেরো মিনিট পর বাগানের প্রান্তে পৌঁছে গেল, শেষ গাছটার আড়াল থেকে

সাবধানে উঁকি দিল বাংলোর দিকে। দোতলা ভবনটা ইঁটের তৈরি, একপাশে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ফায়ারপ্লেসের চিমনি—ডিজাইনটা অন্তত বিশ বছরের পুরনো। তবে কেনার পর সম্ভবত মেরামত ও রং করিয়েছে সিদ্দিকী, নতুনের মত ঝকঝক করছে। বাইরের দিককার দেয়ালে তো নতুন রঙ করা হয়েছেই; বারান্দার রেলিং, দরজা-জানালার পাল্লা... সবকিছু লাগানো হয়েছে নতুন করে। বাইরের দিকটাতে আলোরও অভাব নেই, বেশ কয়েকটা সিকিউরিটি ল্যাম্প জ্বলছে—তাতে আলোকিত হয়ে আছে বাগান ও বাড়ির মধ্যবর্তী পঞ্চাশ গজের মত ফাঁকা জায়গাটা। পুরো বাড়ি অবশ্য অন্ধকার, একটা জানালাতেও আলো দেখা যাচ্ছে না। সিদ্দিকী সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিনকিউলার বের করল রানা, চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বাংলোটা। খেয়াল করল, বেশ কয়েকটা ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা রয়েছে দেয়ালের গায়ে, ওগুলোর লেন্স বাগানের দিকে তাক করা। একটু ভাবল রানা, ড. সিদ্দিকীর মত প্যারানয়েড লোক শুধু ক্যামেরা বসিয়ে ক্ষান্ত হবে না। নিউয়ার্কের হাইডআউটের কথা মনে পড়ল, ওখানে বুবি-ট্র্যাপ রেখেছিল লোকটা। এখানেও নিশ্চয়ই আছে। কী হতে পারে? ট্রিপ-ওয়ায়্যার? অদৃশ্য রশ্মি? ডেথ-পিট?

পিছিয়ে গেল রানা, চিন্তায় পড়ে গেছে। বাংলো আর বাগানের মধ্যবর্তী জায়গাটা কাভার করছে সিকিউরিটি ক্যামেরা, চোখ এড়িয়ে ও-টুকু পেরুনো সম্ভব নয়। চেষ্টা করলে হয়তো গুলি করে, কিংবা পাথর ছুঁড়ে দু-একটা ক্যামেরা নষ্ট করে দেয়া যায়; কিন্তু তাতে সিদ্দিকী সতর্ক হয়ে যাবে। তা ছাড়া শুধু ক্যামেরা নষ্ট করলেই চলছে না, মাটিতে যে-সব বুবি-ট্র্যাপ পাতা আছে, সেগুলোকে ফাঁকি দেবে কীভাবে?

গম্ভীর হয়ে বাংলো আর বাগানের উপর পালা করে নজর

বোলাল রানা, হঠাৎই আশার আলো দেখতে পেল। ক্যামেরাগুলো সব বাংলোর নীচতলা বরাবর বসানো হয়েছে, কিন্তু দোতলার লেভেলটা অরক্ষিত। তারমানে...

ঝটপট হ্যাভারস্যাক থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করল ও। সঙ্গে বের করল গ্র্যাপলিং হুক আর পিটন-শুটার। হুকের সঙ্গে দড়ি বেঁধে শুটারে বসাল, তারপর জিনিসদুটো নিয়ে উঠে পড়ল একটা গাছে। ডাল বেয়ে পঁচিশ ফুট উচ্চতায় উঠে গেল ও, তাকাল বাংলোর দিকে। সন্তুষ্ট বোধ করল, উচ্চতাটা যথেষ্ট।

পিটন-শুটারটা বাংলোর পাথরে তৈরি চিমনির দিকে তাক করে ফায়ার করল ও। মৃদু শব্দ করে ছুটে গেল গ্র্যাপলিং হুকটা, ওটার শরীর রবারে মোড়া; বাংলোর ছাদে আছড়ে পড়লেও আওয়াজ হলো না। নিশানাটাও নিখুঁত হয়েছে, দড়ি ধরে টানতেই চিমনির কিনারে বেধে গেল হুকের বাহু, টানাটানি করে খোলা গেল না, শক্ত হয়েই আটকেছে। দড়ির এ-প্রান্তটা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে টানটান করে বাঁধল রানা, তারপর ঝুলে পড়ল—হাত-পা ব্যবহার করে র‍্যাপেলিঙের মাধ্যমে এগোচ্ছে বাংলোর দিকে।

দেড়শো ফুট প্যারালাল র‍্যাপেলিং—সহজ কাজ নয়। পিঠ আর হাতের পেশি ব্যথা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে, শীতবোধ উধাও হয়ে গেছে, পরিশ্রমে সারা শরীর ঘামছে দরদর করে। থামল না ও, এগিয়ে চলল। শেষে যখন ছাতে পা রাখল, তখন সারা শরীর কাঁপছে।

ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল রানা, তারপর বাংলোর পিছনদিকে গিয়ে ছাতের কিনারা থেকে উঁকি দিল। একটা টেরেস রয়েছে ওখানে, সাগরের দিকে মুখ করা। সাবধানে ওখানে নেমে পড়ল ও।

টেরেস থেকে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য ফ্রেঞ্চ-ডোর আছে, পাল্লাদুটো তালা দেয়া এখন। পকেট টর্চ বের করে তালাটা দেখল

রানা, অ্যালার্ম সিস্টেম আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করছে। কিছু দেখতে না পেয়ে স্বস্তি বোধ করল, হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে আনল লক-স্মিথ কিট। কয়েক মিনিটের চেষ্টাতেই খুলে ফেলা গেল তালাটা। ফ্রেঞ্চ-ডোরের পাল্লা সরিয়ে সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকে পড়ল ও।

সতর্ক ভঙ্গিতে তল্লাশি শুরু করল রানা—সাবধানে পা ফেলছে, কড়া নজর রাখছে দেয়াল আর বাড়ির আনাচে-কানাচে... আর কোনও ক্যামেরা আছে কি না সেটা বুঝতে চাইছে। তবে দেখা গেল না কিছু। শুধু বাইরেই ক্যামেরা বসিয়েছে সিদ্দিকী, ভিতরে নয়। হয়তো আশা করেছে, ওখানটা পেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে।

মাস্টার বেডরুমটা খুঁজে বের করল রানা। দরজা খোলা ওটার, এমনকী ভিড়িয়েও রাখা হয়নি। ভিতরে ঢুকে বিছানার উপর আলো ফেলল ও, কিন্তু পরমুহূর্তে হতাশ হলো। শূন্য বিছানা পরিপাটি করে সাট করা। কেউ ওটাতে শুয়েছিল বলে মনে হচ্ছে না। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। ঘরের বাকি অংশের উপর নজর বোলাল। রুমটা বেশ বড়। সাজানো হয়েছে সুন্দর করে। এককোণে একটা আটচল্লিশ-ইঞ্চির বিশাল ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টিভি রয়েছে, সেইসঙ্গে মিউজিক সিস্টেম। ছোট একটা র‍্যাকে অল্প কিছু বই, দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা পেইন্টিং, মেঝেটা কার্পেটে মোড়া। মাথার উপর সুদৃশ্য ঝাড়বাতি, একপাশের দেয়ালে রয়েছে ক্লজিট। ওটা খুলে ভিতরে ঝোলানো কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমে গেল ও, ওটাও ফাঁকা... কেউ নেই ভিতরে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। পরের রুমটাতে গেল। এটাও বেডরুম... এবং একই রকম ফাঁকা। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল ওর। তাড়াতাড়ি বাংলোর বাকি অংশ

তল্লাশিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লিভিং রুম, কিচেন, লণ্ড্রি রুম, লাইব্রেরি, গেস্টরুম, স্টাডি, গ্যারাজ... সব দেখল এক এক করে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ড. সিদ্দিকীকে। বাড়িতে মানুষ বাস করবার চিহ্ন আছে, তারপরও সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বিস্মিত বোধ করল রানা—লোকটা গেল কোথায়? তার পরিচয় যে ফাঁস হয়ে গেছে, সেটা কি টের পেয়ে গেছে? পালিয়ে গেছে?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। না, পালায়নি সিদ্দিকী। গ্যারাজে পড়ে রয়েছে তার প্রিয় *পোর্শ* গাড়িটা, পালালে ওটা নিয়ে পালাত। কিন্তু পালিয়ে যদি না গিয়ে থাকে, তা হলে গেল কোথায়?

কী যেন খুঁতখুঁত করছে রানার মনে, ঠিক ধরতে পারছে না। ঝড়ের বেগে মাথা খাটাল, হঠাৎ ধরতে পারল অসঙ্গতিটা। দোতলায় ফিরে গেল ও, আবার দেখতে শুরু করল ওখানকার সবক'টা রুম। মাস্টার বেডরুমের পাশের স্পেয়ার বেডরুমটাতে যেতেই থমকে দাঁড়াল। তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট এ-রুমটা। ওর হিসেব অনুসারে আরও বড় হবার কথা এটার। তাড়াতাড়ি মাস্টার বেডরুমে ফিরে গেল ও, এক হাতে পিস্তল ধরে খুলে ফেলল ক্লজিটটা। দুই বেডরুমের মাঝে পড়েছে ওটা, ও-পাশের রুমটার যা আকৃতি, তাতে ক্লজিটটা আরও অনেক বড় হওয়া উচিত। স্রেফ দেয়াল আলমারির মত নয়, এটা হওয়া উচিত ওয়াক-ইন সিস্টেমের, মানে ছোট-খাট একটা রুমের মত... যার ভিতরে হেঁটে ঢুকে পড়া যায়। অথচ চোখের সামনে মাত্র দু'ফুট গভীরতা দেখতে পাচ্ছে, একটা করে হ্যাঙ্গারের বেশি কিছুই ঝোলানো সম্ভব নয় ক্লজিটটাতে।

কাপড়গুলো বের করে ফেলে ক্লজিটের পিছনদিককার দেয়ালটা পরীক্ষা করল রানা। কাঠের তৈরি, তবে ক্লজিটের দরজার চেয়ে নতুন দেখাচ্ছে। মেঝের দিকে তাকাল, বাঁকা একটু

আঁচড়ের দাগ ফুটে রয়েছে। মুখে হাসি ফুটল ওর, জিনিসটা আসলে একটা গোপন দরজা। ওপাশে, ওয়াক-ইন ক্লজিটের বাকি অংশটাকে একটা লুকানো কামরায় পরিণত করেছে সিদ্দিকী।

ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজাটার সুইচ খোঁজার ধৈর্য হলো না, তাই হ্যাভারস্যাক থেকে বের করল সি-ফোর বিস্ফোরকের একটা ব্লক। পুরোটা ব্যবহার করলে বাংলোর অন্তত অর্ধেকটা উড়ে যাবে। সামান্য একটু অংশ ছুরি দিয়ে কাটল ও। হাতে পাকিয়ে পাতলা স্ট্রিপের মত করল, তারপর ওটা বসাল ক্লজিটের পিছনের দেয়ালে। ডিটোনেটর আর টাইমার সেট করে বিছানার পিছনে এসে আড়াল নিল। সিগ-সাওয়ারটা হাতে নিয়ে রিস্টওয়াচের লিউমিনাস ডায়ালে চোখ রাখল।

ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড পর ঘটল বিস্ফোরণ। হিসেব করে সি-ফোর ব্যবহার করেছে রানা, চোখ-ঝলসানো আলোর সঙ্গে মৃদু আওয়াজ হলো শুধু। একইসঙ্গে ক্লজিটের পিছনের দেয়াল ভেঙেচুরে উড়ে গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, একছুটে গিয়ে ঢুকল ছোট্ট কামরাটায়।

ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে, আবছাভাবে একপাশে একটা কনসোল দেখতে পেল ও—নিউয়ার্কের সেই হাইডআউটেও অনেকটা এরকমই একটা ছিল। নানা রকম বোতামের পাশাপাশি কয়েকটা ছোট ছোট মনিটর আছে—সিকিউরিটি ক্যামেরার ফিড দেখাচ্ছে ওগুলো। কনসোলের ঠিক পাশেই একটা সিঙ্গেল খাট, আর কিছু নেই কামরায়।

ড. সিদ্দিকীকে দেখার আশায় নজর বোলাল রানা, কিন্তু ঘন ধোঁয়ার কারণে দেখতে পেল না কিছু। কামরার ভিতরে আলোও জ্বলছে না। লোকটা ঠিক কোথায় রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। সিগ-সাওয়ারটা তুলল ও। কড়া গলায় বলল, 'বেরিয়ে আসুন, ডক্টর। আপনার খেলা শেষ!'

'না, মি. রানা!' ধোঁয়ার ভিতর থেকে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ। 'খেল্ খতম হয়েছে আপনার!'

পরমুহূর্তে ঘাড়ের কাছে ঘ্যাচ করে বিঁধল কী যেন, টান দিয়ে ওটা খুলে আনল রানা। চোখের সামনে আনতেই দেখল, জিনিসটা একটা ট্র্যাঙ্কুলাইজার ডার্ট। প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় পেল না, চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। হাতের মধ্যে সিগ-সাওয়ারটা কাঁপতে শুরু করেছে।

ধোঁয়া ভেদ করে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল ও—সুঠামদেহী একজন মানুষ, মেঝেতে শুয়ে ছিল এতক্ষণ। তীব্র আক্রোশ নিয়ে লোকটার দিকে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল, পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল রানার চোখের সামনে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল রানার। চোখের সামনে থেকে সরে গেল ধূসর একটা পর্দা, মাথাটা দপদপ করছে। কয়েক সেকেণ্ড কেমন যেন বিভ্রান্তিতে কাটল, তারপর মনে পড়ে গেল সব। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে আগুন জ্বেলে দিল ক্রোধ, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল ও। কিন্তু নড়তে পারল না একচুল। এতক্ষণে খেয়াল করল, একটা চেয়ারে বসিয়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ।

ঝট করে মাথা সোজা করল রানা, দেখতে পেল শত্রুর চেহারা। ওর মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসে আছে সিদ্দিকী, মুখে হাসি ফুটিয়ে পাইপ ফুঁকছে। ক্রোধের পাশাপাশি বিস্ময় ভর করল রানার ভিতরে। জিমনেশিয়ামের ম্যানেজার ভুল বলেনি, সত্যিই অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে লোকটার বাহ্যিক অবয়বে। মোটাসোটা, স্থূল দেহ আর নেই এখন; তার বদলে অনেকটাই

ছিপছিপে হয়ে গেছে। তিন সপ্তাহের কম সময়ে এভাবে শুকানো সম্ভব—তা কল্পনাই করা যায় না। চেহারায়ও পরিবর্তন এনেছে লোকটা, ক্লিনশেভের পরিবর্তে গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছে; চুলও ছেঁটেছে ছোট করে।

'কী?' হাসল সিদ্দিকী। 'চিনতে পারছেন না?'

জবাব দিল না রানা, তাকাল চারপাশে। বাংলোর স্টাডিরুমে বসানো হয়েছে ওকে। জানালা নেই এ-ঘরে, বাতিও জ্বালা হয়নি; একপাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, ওখান থেকে আসা মৃদু আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ঘরটা। একটা দেয়াল ঘড়ি ঝুলছে একপাশে—তাতে দেখা যাচ্ছে, দু'টা বাজে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিল ও।

'আপনার পরামর্শটা গ্রহণ করেছি,' বলল সিদ্দিকী। 'শুকাতে বলেছিলেন না? চেহারাও পাল্টাতে বলেছিলেন। সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।'

'তাতে বিশেষ লাভ নেই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনার চেহারা-সুরত এমনভাবে আমার মাথায় গেঁথে গেছে যে, নরকে গিয়েও ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

'তা হলে সেটা আপনার ব্যর্থতা বলে গণ্য হবে,' হাসিটা ধরে রাখল সিদ্দিকী। 'বলব, উধাও হবার টেকনিকে গলদ আছে আপনার।'

'গলদ শোধরানোর জন্যই খুন করেছেন আমার বন্ধুদেরকে?' থমথমে গলায় জানতে চাইল রানা।

'অনেকটা সেরকমই বলতে পারেন,' পাইপে আবার টান দিল সিদ্দিকী। 'আমি ভেবে দেখলাম, নিখুঁতভাবে উধাও হতে গেলে পিছনে কোনও সূত্র রেখে যাওয়া ঠিক না। এমন কাউকে রেখে যাওয়া ঠিক না, যার কাছ থেকে নতুন পরিচয়টা ফাঁস হতে পারে। বুঝতেই পাচ্ছেন, কথাটা ভুল নয়। আপনি বেঁচে যাওয়ায়

আমাকে খুঁজে বের করে ফেলতে পেরেছেন।'

'মনসুরের টিম, কিংবা আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে এ-কথা বলছেন। আমরা মরে গেলেও কিছুতেই আপনার খোঁজ দিতাম না কাউকে।'

'ওসব আশ্বাসে বিশ্বাস নেই আমার,' হাত নাড়ল সিদ্দিকী। 'দুনিয়ায় সবাইকেই মচকানো সম্ভব। দরকার শুধু তার দুর্বল জায়গাটায় চাপ প্রয়োগ করা...'

'আপনার অনেক ডিগ্রির কথা শুনেছি,' ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। 'কিন্তু ওগুলোর মধ্যে যে সাইকোলজি-ও আছে, তা কেউ বলেনি আমাকে।'

'মানুষের মন পড়তে সাইকোলজির প্রয়োজন হয় না, মি. রানা। শুধু একটু বিশ্লেষণী শক্তি থাকলেই চলে। আপনার ব্যাপারটাই ধরুন। অনেক আয়োজন করে এসেছিলেন আমাকে ধরতে... কিন্তু কই, পেরেছেন? উল্টো নিজে ধরা পড়ে গেছেন। কারণ আমি জানতাম, আপনি আসবেন। সে-জন্য প্রস্তুত ছিলাম।'

'কীভাবে জেনেছেন?'

'আপনাকে চেনা হয়ে গেছে আমার, মি. রানা। পাঁচ-পাঁচজন বন্ধু খুন হয়ে যাবে, অথচ আপনি প্রতিশোধ নিতে চাইবেন না... তা-ই কি হয়? আমি জানতাম, আগে হোক, বা পরে, আমার কাছে ঠিকই পৌঁছে যাবেন আপনি। তাই গোপন কামরা বানিয়েছি বাড়িতে, ক্যামেরা বসিয়েছি...'

'ক্যামেরাগুলোকে ফাঁকি দিতে পারিনি?' জানতে চাইল রানা।

'বাইরেরগুলোকে দিয়েছেন। কিন্তু বেডরুমেও একটা ছিল, সেটা বোধহয় জানতেন না, তাই না? ইনফ্রা-রেড মিনিয়েচার ক্যামেরা, দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিঙের ফ্রেমে লুকানো... অন্ধকারেও সব দেখতে পায়। ওটাতে আপনাকে দেখতে পাই আমি। বিস্ফোরক বসাচ্ছেন দেখে বিছানার তলায় গিয়ে

লুকিয়েছিলাম, আপনি ভিতরে ঢুকতেই ট্র্যাঙ্কুলাইজার-গান দিয়ে ফায়ার করেছি। প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ ছিল না আপনার, তবে এলিমেণ্ট-অভ-সারপ্রাইয হারানোয় কাজে লাগেনি।'

'কপাল খারাপ—আর কী বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'একটা জিনিস শুধু বুঝতে পারছি না। ক্লজিটের ভিতর যে আরেকটা কামরা আছে, সেটা কীভাবে বুঝলেন?'

'খুব সহজ,' রানা বলল। 'বাইরে এতগুলো ক্যামেরা, অথচ ওগুলোর কোনও মনিটর দেখলাম না ভিতরে। বুঝতে পারলাম, কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো। বেডরুমের কাছাকাছিই হবার কথা। পাশের রুমটার সঙ্গে মেলাতেই মনে হলো, ক্লজিটটা আরও বড় হওয়া উচিত। হয়নি, কারণ ওটার একটা অংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'আপনার পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা না করে পারছি না,' হেসে বলল সিদ্দিকী।

'আমারও একটা প্রশ্ন আছে, ডক্টর,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! যে-কোনও প্রশ্নের জবাব পাবার অধিকার অর্জন করেছেন আপনি। অন্তত ওটুকু যদি না করি, তা হলে মস্ত অন্যায় হবে।'

'আমি জানতে চাই, আপনি এতসব কেন করেছেন? কেন আমার বন্ধুদেরকে খুন করেছেন? এতক্ষণ যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করি না এক বিন্দুও। শুধু গায়েব হতে চাইলে পিছনে সূত্র মুছে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। আপনার আরও বড় কোনও উদ্দেশ্য আছে... কী সেটা?'

'এ-কথা কেন ভাবছেন?' ভুরু কোঁচকাল সিদ্দিকী।

'আপনার মহামূল্যবান আবিষ্কারের কথা জানা হয়ে গেছে আমার। ড্রাগ-ট্রাগ কিছু নয়, আপনি আসলে একটা বায়ো-কেমিক্যাল ওয়েপন আবিষ্কার করেছেন... ফিয়ার-গ্যাস।

ওটা নিয়ে কী মতলব আপনার?'

থমকে গেল সিদ্দিকী। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'দেখা যাচ্ছে, আপনাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করেছি আমি। স্রেফ একজন প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ নন আপনি, সত্যান্বেষীও বটে!'

'আমার প্রশ্নের জবাব হলো না ওটা।'

'কী জবাব দেব? আপনি তো মনে হচ্ছে সবই জানেন। অসাধারণ একটা আবিষ্কার করেছি আমি, অথচ পরিণামটা দেখুন! আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে উঠে-পড়ে লেগেছে ওরা। পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইছে! বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলে আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন?'

'আপনার ওই ছেলে-ভুলানো গল্প অন্য কোথাও গিয়ে শোনান। শুধু জীবন বাঁচাতে চাইলে আমাকে শুরুতেই সত্যি কথাটা বলতেন আপনি। কাউকে খুন করতেন না।'

'ভাবছেন আরও কোনও উদ্দেশ্য আছে আমার?'

সরাসরি হ্যাঁ-না বলল না রানা। শুধু বলল, 'ডেমিয়েনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

এক মুহূর্ত ওর চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকল সিদ্দিকী, তারপরই হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে। এতক্ষণের মুখোশটা খসে পড়ল চেহারা থেকে। বলল, 'ওই গাধা আর ওর দলটাকে স্রেফ ব্যবহার করেছি আমি। তবে হ্যাঁ, ও যদি বলে থাকে—ফিয়ার-গ্যাসের ফর্মুলা আমি বিক্রি করতে চেয়েছি, তা হলে ভুল বলেনি। আপনিই ভাবুন, এমন চমৎকার একটা আবিষ্কার... আমেরিকানরা কাজে লাগাতে চায় না বলে কি হারিয়ে যেতে দেয়া উচিত? আমার জীবনের সেরা আবিষ্কার ওটা, নিজের উপকারেই যদি না লাগল, তা হলে আর কীসের জন্যে? ফিয়ার-গ্যাস আমাকে টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি... সব এনে দিতে পারে। এমন সুযোগ আমি ছেড়ে দেব কেন?'

‘কিন্তু ওটা যদি টেরোরিস্ট বা মন্দ লোকেরা কিনতে চায়? পৃথিবীতে কী ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হবে, সেটা ভেবেছেন?’

‘টাকা থাকলে যে-কেউ কিনে নিতে পারে, আমার আপত্তি নেই। আজকালকার জামানায় বিবেক-টিবেক হলো অচল বস্তু, মি. রানা। আমাকে ওসবের দোহাই দিয়ে লাভ নেই।’

‘আপনি একটা পিশাচ!’

‘যা খুশি ভাবুন,’ মুখ বাঁকাল সিদ্দিকী। ‘তবে এই পিশাচ-ই কিছুদিনের মধ্যে অঢেল ক্ষমতার মালিক হবে। জীবন কাটাবে রাজা-বাদশার মত। আপনি নন!’

‘এতটা নিশ্চিত হবেন না। আপনার আসল উদ্দেশ্য আগেই আঁচ করতে পেরেছি আমি, শুধু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম। এখন আর আপনাকে শাস্তি দিতে বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করব না আমি।’

‘ফাঁপা বুলি বন্ধ করুন, রানা। দৌড়-ঝাঁপ শেষ হয়েছে আপনার, মরবেন খুব শীঘ্রি। কাউকে শাস্তি দেয়ার মত অবস্থায় আর নেই আপনি।’

‘আমি না থাকলেও আরও অনেকে আছে, ডক্টর। ওরা আপনার গোপন পরিচয় জেনে ফেলেছে, গা-ঢাকা দিয়ে আর থাকতে পারবেন না।’

‘হাহ্!’ অবহেলার ভঙ্গিতে বলল সিদ্দিকী। ‘একটা আইডেণ্টিটি ফাঁস হয়েছে তো কী? নতুন পরিচয় নেয়ার সমস্ত কলাকৌশল আমি শিখে নিয়েছি, আরেকটা আইডেণ্টিটি বানাতে কোনও অসুবিধে হবে না। এনিওয়ে, গল্প-গুজবের সময় শেষ। এবার আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হয়।’

‘কী করবেন?’

‘ভেবেছিলাম তো ক্লিফ থেকে নীচে ফেলে দেব, তবে এখন মনে হচ্ছে ওটা পরে করলেও হয়। ফিয়ার-গ্যাসের কথা যখন

জেনে ফেলেছেন, তখন মরার আগে আবিষ্কারটার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হওয়া দরকার আপনার। ওই ফর্জারের বাড়িতে একটা ক্যানিস্টার ফাটিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাতে তো দেখছি কাজ হয়নি। এখন তা হলে একটা সত্যিকার ডোজ দিই, কী বলেন? ক্লিফ থেকে হয়তো নিজেই ঝাঁপ দিতে চাইবেন, আমাকে আর খাটতে হবে না।'

জবাব দিল না রানা। চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল সিদ্দিকীর দিকে।

'একটু অপেক্ষা করুন,' হাসল ধুরন্ধর বিজ্ঞানী। 'আমি যাব, আর আসব।' স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। মোচড়ামুচড়ি করল শরীর, কিন্তু একচুল আলগা হলো না দড়ির বাঁধন। চেয়ারটার উপর নজর দিল ও, খুব শক্ত কাঠের নয়, কৌশল খাটিয়ে ভেঙে ফেলা যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো—শরীর বাঁধা আষ্টেপৃষ্ঠে, দু'পা-ও একত্র করে বেঁধে রাখা হয়েছে; দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর দাঁড়ানো না গেলে কৌশলটা খাটানো যাবে না।

চারপাশটা জরিপ করল রানা, ফায়ারপ্লেসের দিকে চোখ পড়তেই আশার আলো দেখতে পেল। চেয়ারসহ বসা অবস্থায় লাফাতে শুরু করল ও, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছে। ফায়ারপ্লেসের ঠিক সামনে পৌঁছে থামল, দ্বিধা না করে দু'পা ঢুকিয়ে দিল অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে।

প্যান্টে আগুন ধরে গেল চোখের পলকে, চামড়ায় কামড় বসাল তীব্র উত্তাপ—পা ঝলসে যেতে শুরু করেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ব্যথাটা সহ্য করল রানা, একটু টিকে থাকতে পারলেই হয়, প্যান্টের পাশাপাশি দড়িতেও আগুন লেগেছে, ওটা দুর্বল হয়ে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে। পা'দুটো দুদিকে প্রসারিত করার ভঙ্গিতে দড়িতে চাপ দিয়ে চলেছে ও, একটু পরেই প্রেশারটা আর

সহ্য করতে পারল না জ্বলন্ত বাঁধন। ফুলকি তুলে ছিঁড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি পা বের করে ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে সরে এল রানা। প্যান্ট জ্বলছে এখনও, তবে বিপজ্জনকভাবে নয়। দু'পায়ে ভর দিয়ে কুঁজো হবার ভঙ্গিতে দাঁড়াল ও, চেয়ারের সামনের দুই পায়া কোনাকুনিভাবে লেগে রইল মেঝেতে। অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিল রানা, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নেমে এল মাটিতে। ফলাফলটা হলো দেখার মত। ওর শরীরের পুরো টান গিয়ে পড়ল দুই হাতল আর ব্যাকরেস্টে। মড়মড় করে উঠল ওগুলো, ওজনটা সইতে পারল না, শব্দ তুলে ভেঙে গেল। ধপাস করে ভাঙা চেয়ারসহ মাটিতে পড়ে গেল রানা।

ঝটকা দিয়ে চেয়ারের বাকি অংশ থেকে ভাঙা ব্যাকরেস্ট আর হাতল আলাদা করল ও, উঠে দাঁড়াল। এবার ঢিল হয়ে গেছে বাঁধন, মালার মত গলার উপর দিয়ে তুলে আনতে একটুও অসুবিধে হলো না। এরপর চাপড় দিয়ে প্যান্টের আগুন নেভাল ও।

মুখে নির্দয় হাসি ফুটল রানার। মুক্ত হয়ে গেছে, এবার ড. সিদ্দিকীর কপালে খারাবি আছে। ভাঙা চেয়ারের একটা পায়া খুলে নিল ও, ওটাকে মুগুরের মত বাগিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে।

একটু পরেই পায়ের শব্দ হলো। শিস দিতে দিতে আসছে বিজ্ঞানী। দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'গেট রেডি, মি. রানা। অভূতপূর্ব একটা অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে আপনা...'

কথা শেষ হলো না তার, সামনে ভাঙা চেয়ার দেখে বাকশক্তি [illegible]। পরমুহূর্তেই সজোরে তার ঘাড়ে পায়াটা দিয়ে মুগুর [illegible] রানা। টলে উঠল বিজ্ঞানী, আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ল [illegible]; হাত থেকে ছুটে চলে গেল ফিয়ার-গ্যাসের ক্যানিস্টার।

লোকটাকে চিত করল রানা, বুকের উপর চড়ে বসল, হাঁটু [illegible] আটকে রেখেছে দু'হাত। নড়াচড়ার উপায় রইল না

সিদ্দিকীর, চেয়ারের পায়াটা আড়াআড়িভাবে কণ্ঠার উপর নেমে আসতেই বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল।

'কী, ডক্টর?' টিটকিরির সুরে বলল রানা। 'অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে তো?'

'প্লিজ... মি. রানা...' চিঁ চিঁ সুর বেরুল বন্দি বিজ্ঞানীর গলা থেকে।

'জোরে বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

'খোদার দোহাই! মারবেন না আমাকে!!'

'আমাকে তো মারতেই যাচ্ছিলেন আপনি। একই সৌজন্য আমারও দেখানো উচিত না?'

'প্লিজ... আ... আমাকে মাফ ক্... করে দিন...' কথা আটকে যাচ্ছে সিদ্দিকীর।

পায়ার উপর থেকে চাপ কমাল রানা, শান্ত হয়ে এসেছে। বলল, 'রিল্যাক্স! আপনাকে খুন করব না আমি, অন্তত এখুনি নয়।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সিদ্দিকী, কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনোমতে বলল, 'সত্যিই বাঁচতে দিচ্ছেন আমাকে? কেন?'

'কারণ আপনাকে দাবার গুটি হিসেবে প্রয়োজন আমার। কিন্তু তার আগে বলুন, কথামত কাজ করবেন কি না।'

'এনিথিং, মি. রানা! এনিথিং!'

'আমার বান্ধবীকে আপনার কণ্ট্রোলাররা ধরে নিয়ে গেছে। ওদের সম্পর্কে ইনফরমেশন চাই আমি।'

'কে নিয়েছে?'

'সোনালিচুলো একটা মেয়ে...'

'মেজর লারিসা মরগান,' বুঝতে পেরে বলল সিদ্দিকী। 'ভয়ঙ্কর মহিলা! বান্ধবীর আশা ছেড়ে দিন। ওই ডাইনির হাত

থেকে কিছুতেই তাকে উদ্ধার করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে জানটা খোয়াবেন।'

'উঁহুঁ, আমার হাতে একটা ট্রাম্পকার্ড আছে—আপনি। আমার বান্ধবীর বদলে আপনাকে চেয়েছে ওরা।'

'ভুলে যান! আমার জন্য বলছি না, আপনার জন্যই বলছি। কাউকেই ছাড়বে না মেজর মরগান। আমাকে হাতে পাওয়ামাত্র খুন করবে আপনাকে আর আপনার বান্ধবীকে।'

'তবু যেতে হবে আমাকে। আমার বান্ধবী ফিয়ার-গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে, ওকে উদ্ধার করে অ্যান্টিডোট দিতে হবে। নিউট্রালাইজার-টা কোথায় রেখেছেন?'

'আমার কাছে নেই, মি. রানা।'

'মিথ্যে বলবেন না!' ধমক দিল রানা। মাটিতে গড়াতে থাকা ক্যানিস্টারটা দেখাল। 'গ্যাস রেখেছেন সঙ্গে, অথচ অ্যান্টিডোট রাখেননি? ইম্পসিবল! হতেই পারে না।'

'সত্যি বলছি, নেই!' পায়াটা আবার গলার উপর নেমে আসছে দেখে আতঙ্ক ফুটল সিদ্দিকীর চেহারায়। 'প্লিজ, মি. রানা। আমার কথা শুনুন! নিউট্রালাইজারটা আমি রাখিনি, কারণ ওটার দরকার পড়ে না আমার। ওটা একবার শুঁকলেই অনেকদিন শরীরে সক্রিয় থাকে। তবে... তবে... দরকার হলে আমি আপনাকে ফর্মুলাটা দিতে পারি...'

'ফর্মুলা না, আমার ওষুধ দরকার। স্টকে যদি না থাকে, বানিয়ে দেবেন।'

'তা হলেও ফর্মুলাটা দরকার হবে। ওটা আমার মুখস্থ করা নেই।'

'কোথায় ফর্মুলা?'

'ফিয়ার-গ্যাস আর নিউট্রালাইজার... দুটোরই ফর্মুলা আমি নিরাপদ এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। এখান থেকে দূরে।'

'বি স্পেসিফিক, ডক্টর।'

খুলে বলল সিদ্দিকী।

ভুরু কোঁচকাল রানা, কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। 'আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি চালাকি খাটাবার চেষ্টা করছেন।'

'কী? না, না!' আতঙ্কিত ভঙ্গিতে বলল সিদ্দিকী। 'বিশ্বাস করুন, আমার মনে কোনও কুমতলব নেই। বাঁচতে চাই আমি, তার জন্য আপনি যা বলবেন, তা-ই করব! শুধু একটাই অনুরোধ, মেজর মরগানের হাতে আমাকে তুলে দেবেন না।'

'হুম, সেক্ষেত্রে একটা ছক সাজানো দরকার,' কলার ধরে বিজ্ঞানীকে দাঁড় করাল রানা। 'রওনা হবার আগে একটা ফোন করতে হবে আপনার!'

বিশ

বেশ কয়েকবার রিং বাজার পর ফোন ধরল মেজর লারিসা মরগান ওরফে ব্ল্যাক উইডো। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো?'

'মাসুদ রানা বলছি।'

ঘুমটা চটে গেল গেল লারিসার চোখ থেকে। বেডসাইড টেবিল থেকে হাতঘড়ি তুলে সময় দেখল। চারটা বাজে। ভুরু কুঁচকে বলল, 'এত রাতে... কী ব্যাপার?'

'সব ভুলে গেছ নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'আমার ফোন করবার কথা ছিল!'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' বিছানায় উঠে বসল লারিসা। 'এত

তাড়াতাড়ি করবে, ভাবিনি। বলো, কী খবর?'

'সুসংবাদ আছে, ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'গুড! কোথায় ও?'

'আছে... আমার সঙ্গেই। বন্দি করেছি ওকে।'

'খুন করতে বলেছিলাম...'

'আগেই বলেছি, আমি পেশাদার খুনি নই। তা ছাড়া সিদ্দিকীকে যদি মেরেই ফেলি, তা হলে সোহানাকে ফিরিয়ে দেবার কোনও বাধ্যবাধকতাও থাকে না তোমার।'

'আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছ না?' হাসল লারিসা।

'আমি সোহানার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'এক মিনিট।'

রিসিভারে খসখস শুনল রানা, তারপর দরজা খোলার শব্দ; সম্ভবত আরেকটা রুমে যাচ্ছে ব্ল্যাক উইডো। একটু পরে আবছাভাবে ভেসে এল তার কণ্ঠ। 'ওকে বলো, তুমি ঠিক আছ।'

নিরুত্তর রইল অপরপক্ষ।

আবার শোনা গেল ব্ল্যাক উইডোর গলা, এবার খেপে গেছে। 'কথা বলো! নইলে কিন্তু ভাল হবে না!'

দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল রিসিভারে, তারপর সোহানার কাঁপা কাঁপা গলা। 'রানা...'

আবেগ উথলে উঠল রানার ভিতর, কোনোমতে সেটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে মারধর করেনি তো ওরা?'

'এখনও না। ক্... কিন্তু আমার খুব ভয় করছে, রানা...'

'শান্ত থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে...'

কথা শেষ হলো না, তার আগেই আবার ফোনটা কেড়ে নিয়ে [illegible] কানে ঠেকাল লারিসা। বলল, 'হয়েছে এবার? তোমার [illegible] আছে... এখন পর্যন্ত আর কী। কাজের কথায় এসো,

নইলে ওর আয়ু খুব শীঘ্রি ফুরিয়ে যাবে।'

'ওর গায়ে যদি একটা টোকাও পড়ে,' থমথমে গলায় বলল রানা, 'তা হলে তোমাকে সেটার খুব চড়া মাশুল গুনতে হবে।'

'হুমকি দেয়ার পজিশনে তুমি নেই, রানা,' খ্যাপাটে শোনাল লারিসার গলা। 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বন্ধ করে শোনো, কীভাবে সিদ্দিকীকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে...'

'জাস্ট আ মিনিট,' বাধা দিল রানা। 'ওটা আমি ঠিক করব। তোমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করি না আমি, কাজেই তোমার নিয়মে চলবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'স্মার্টনেস দেখাতে চেষ্টা কোরো না, রানা! কথা শুনতে হবে তোমাকে, নইলে...'

'সোহানাকে খুন করবে?' একটু হাসল রানা। 'এবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বোধহয় তুমিই বলছ। সিদ্দিকী আমার হাতে আছে, সোহানার কিছু হলে ওর মাধ্যমে তোমার আর তোমার বস্‌দের সমস্ত গোমর ফাঁস করে দেব আমি, মেজর *লারিসা।*' নামটার উপর জোর দিল ও।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে গেল ব্ল্যাক উইডো, কথা ফুটল না তার মুখে।

রানা বলল, 'বুঝতেই পারছ, খুব একটা খারাপ পজিশনে নেই আমি। তোমাদের সবার নাম-ধাম ইতোমধ্যে সিদ্দিকীর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। এখন যদি আমার কথা না শোনো, তা হলে *মহামান্য* কন্ট্রোলারদের সমস্ত কুকীর্তির খবর মিডিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে যাবে গোটা আমেরিকার সবার কাছে।'

'কী চাও তুমি?' চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল লারিসা।

'তুমি যা চাইছিলে, তা-ই। সিদ্দিকীর বিনিময়ে সোহানা... তবে সেটা আমার ঠিক করা জায়গায়, আমার নিয়মে।'

একটু চুপ করে থাকল লারিসা। তারপর বলল, 'কেউ আমার

উপর জোর খাটালে আমি তা ভালভাবে নিই না, রানা।'

'সেক্ষেত্রে আমার উপর জোর খাটাবার চেষ্টা করাও উচিত হয়নি তোমার,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আমিও ভালভাবে নিই না। যাক গে, আমার প্রস্তাবে রাজি কি না, বলো।'

জবাব দিল না লারিসা।

রানা বলল, 'ভেবে দেখো, আমি কিন্তু খুব একটা খারাপ প্রস্তাব দিইনি। কথা শুনলে তোমারও লাভ আছে। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলে, কিন্তু তার আগেই সিদ্দিকীকে হ্যাণ্ডওভার করতে যাচ্ছি আমি। শিডিউলে এগিয়ে যাচ্ছ... কণ্ট্রোলারদের কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেখাতে পারছ...'

কিছু চিন্তা করল লারিসা। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আসতে হবে? কখন?'

'হাইওয়ে ওয়ান ধরে কারমেলের দক্ষিণে পনেরো মাইল যাবে। ওখানে একটা সাইড-রোড পাবে—পাহাড়ের ভিতরে চলে গেছে। একটা ঐতিহাসিক সাইটে যাওয়া যায় ও-পথে, সাইনবোর্ড দেখতে পাবে।'

'কীসের ঐতিহাসিক সাইট?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল লারিসা।

'একটা স্টোন-চ্যাপেল। ১৯০৬ সালে এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তৈরি করেছিলেন ওটা। ভদ্রলোক ব্যাংকার ছিলেন, স্যান ফ্র্যান্সিসকোর ভূমিকম্পে ওঁর পুরো পরিবার মারা যায়। তারপর থেকে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে ধর্মকর্মে নেমে পড়েন তিনি। এখন অবশ্য গির্জাটা পরিত্যক্ত।'

'এতকিছু তুমি জানলে কী করে?'

'গির্জাটায় আগেও একবার গেছি আমি। খুবই নির্জন, আমাদের এক্সচেঞ্জ-জবের জন্যে আদর্শ।' অম্লানবদনে মিথ্যে বলল রানা। আসলে ওটার কথা ও শুনেছে সিদ্দিকীর মুখে,

ওখানেই ফিয়ার-গ্যাস আর নিউট্রালাইজারের ফর্মুলা লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। তবে সেকথা প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যায় না।

'তোমার ঠিক করে দেয়া জায়গায় যেতে স্বস্তি বোধ করছি না আমি,' সোজাসাপ্টা ভাষায় জানাল লারিসা।

'খামোকা ভয় পাচ্ছ,' রানা বলল। 'আমি একা মানুষ, তোমার তো লোকলস্করের অভাব নেই। কী-ই বা করতে পারব আমি? বরং তোমার খুশি হওয়া উচিত, চমৎকার একটা জায়গা বেছে দিয়েছি বলে। সিদ্দিকীকে হাতে পাবার পর ওখানে বসে তুমি যা-খুশি-তাই করতে পারবে। বাগড়া দেবার কেউ থাকবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লারিসা। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না, কিন্তু তার হাতে সময় কম, পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে যত দ্রুত কণ্ট্রোলারদের কাছে রিপোর্ট দিতে পারবে, ততই প্রমাণ হবে তার যোগ্যতার। শেষে ব্যবস্থাটা মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, কখন আসতে হবে?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে পারি আমি...'

'এত তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' বলল লারিসা। 'দু'ঘণ্টা পর এসো... ঠিক আছে?'

'যা তোমার ইচ্ছে।'

'ওকে। বাই দ্য ওয়ে, রানা... কোনও রকম চালাকি খাটাতে যেয়ো না। ফলাফলটা মোটেই ভাল হবে না।'

'জানি। দু'ঘণ্টা পর দেখা হচ্ছে তা হলে আমাদের।'

'হ্যাঁ, যার-যার মাল সহ।' লাইন কেটে দিল লারিসা।

সেলফোনটার ফ্ল্যাপ বন্ধ করে পকেটে ভরে রাখল রানা, হাতের কাজে মন দিল। ওর কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে, মাটিতে বসে আছে ড. আন্দালিব সিদ্দিকী, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। টেলিফোনের কথোপকথন শেষ হতেই আতঙ্ক ফুটল তার চোখে।

জিজ্ঞেস করল, 'দু'ঘণ্টা পর আসছে ওরা?'

'না, আরও আগেই আসবে,' বলল রানা। 'আমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দু'ঘণ্টার কথা বলেছে। আগে এসে ফাঁদ পাততে চাইছে।'

'নিশ্চয়ই কল্পনাও করেনি, আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'না,' মুচকি হাসল রানা। জ্বেলে রাখা টর্চলাইটের আলোয় চোখ বোলাল গির্জার অভ্যন্তরে, একটু আগেই এখানে পৌঁছেছে ও বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে। ফোন করেছে প্রার্থনাকক্ষের ভিতরে বসে। গির্জাটা মাঝারি আকারের, প্রার্থনাকক্ষটা তুলনামূলকভাবে বড়। দেয়াল, পিলার, ছাদ—সব আজও মজবুত। অক্ষত রয়েছে পাথরের তৈরি বেদিটাও, ওখান থেকে পাদ্রীরা প্রার্থনা পরিচালনা করতেন। তবে পুরনো আমলের বেঞ্চ-টেঞ্চ যা ছিল, সব ভেঙেচুরে কয়েকটা স্তূপ হয়ে রয়েছে মেঝেতে। এমনি একটা স্তূপের ভিতর ফায়ারক্র্যাকার বসাচ্ছে রানা, ওগুলোর কানেকশন দিচ্ছে একটা হাতে-বানানো রিমোট কন্ট্রোলড্ ডিটোনেটরের সঙ্গে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে রানার কাজ দেখছে সিদ্দিকী। জিজ্ঞেস করল, 'কী করছেন, জানতে পারি?'

'সময় হলে দেখতেই পাবেন।' কাজ শেষ হয়েছে রানার, উঠে দাঁড়াল। 'চলুন, হাতে সময় কম।'

বেদির পিছনে ওকে নিয়ে গেল সিদ্দিকী। মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন হিসেব করল, তারপর গোড়ালি ঠুকল একটা টালির উপরে। বলল, 'এটা সরাতে হবে।'

ছুরি বের করে টালির কিনারে চাড় দিল রানা, সহজেই উঠে এল ওটা। নীচে একটা খোপ দেখা গেল, তাতে প্লাস্টিকে মোড়া এক বাণ্ডিল কাগজ দেখা গেল। ওগুলো বের করল ও, মোড়ক সরিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল। নানা রকম বৈজ্ঞানিক সূত্রে ভরা

সবক'টা পাতা, কিচ্ছু বোঝা গেল না।

'এগুলোই সব?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সিদ্দিকী। 'দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

'হুম!' টালিটা আবার জায়গামত নিয়ে বসিয়ে দিল রানা। 'টানেলটা কোথায়?'

বেদির পিছনে দেয়াল ঘেঁষে আরেকটা জায়গা দেখাল সিদ্দিকী। ওখানকার কয়েকটা টালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা সুড়ঙ্গের মুখ—গির্জায় গোপনে ঢোকা আর বেরুনোর জন্য খুঁড়ে রেখেছে বিজ্ঞানী। সুড়ঙ্গের অন্যপাশটা বেরিয়েছে গির্জার পিছনদিকে... পাহাড়ি ঢালে, গাছগাছালির আড়ালে। আলো ফেলে পথটা দেখল রানা—হামাগুড়ি দিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। সন্তুষ্ট হয়ে বিজ্ঞানীকে নিয়ে বেদির আড়ালে গিয়ে বসল ও, নিভিয়ে দিল টর্চটা। নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল গির্জার অভ্যন্তরটাকে।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটল, তারপর মুখ খুলল সিদ্দিকী। 'মি. রানা...'

'বলুন।'

'আপনি কি সত্যিই মেজর মরগানের হাতে তুলে দেবেন আমাকে?'

'কেন, সন্দেহ আছে?'

'ও... ও আমাকে মেরে ফেলবে!'

'সেটা আরও আগেই ভাবা উচিত ছিল আপনার—আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার আগে... আমার বন্ধুদেরকে, আমার প্রিয় মানুষদের খুন করবার আগে। এখন আপনার কপালে কী ঘটল না-ঘটল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কোন দুঃখে?'

'প্লিজ! আ... আমি মস্ত ভুল করেছি! একটা সুযোগ দিন আমাকে... বাঁচতে দিন... আমি সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব...'

ফুঁপিয়ে উঠল বিজ্ঞানী।

'মায়াকান্না বন্ধ করুন!' বিরক্ত গলায় ধমক দিল রানা। 'আপনাকে ওদের হাতে তুলে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

'তারমানে... তারমানে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন?'

'না, ডক্টর। ক্ষমা আপনি পাবেন না। আপনাকে আমি ওদের হাতে তুলে দেব না অন্য কারণে। ফর্মুলা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু ওগুলো যে কাজ করবে, তার গ্যারান্টি পাইনি। কোথাও কোনও গলদ হলে সেটা সামাল দেবার জন্যই আপনাকে আমার দরকার।'

'ক্... কিন্তু আমাকে বাঁচাবেন কীভাবে আপনি? মেজর মরগান বোকা নয়, যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে আসবে ও। ওকে ধোঁকা দিতে পারবেন না। তা ছাড়া আমাকে দিয়ে ফোন করিয়ে ডবল বিপদ ডেকে এনেছেন আপনি...'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। সবকিছু জানবার প্রয়োজন নেই আপনার। ঝামেলা বাধলে স্রেফ মেঝেতে শুয়ে পড়বেন, ঠিক আছে? বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'মেঝেতে শুয়ে পড়ব!' বিস্ময় ফুটল বিজ্ঞানীর কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, তা হলে গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা কমে যাবে।'

আরও কিছু জিজ্ঞেস করবার চেষ্টা করল সিদ্দিকী, কিন্তু জবাব দিল না রানা। মৃদু ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল তাকে। এ-মুহূর্তে নীরবতা প্রয়োজন।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

একুশ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রয়োজন হলো না, বিশ মিনিটের মাথায় সচকিত হয়ে উঠল রানা—ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কয়েকটা গাড়ি আসছে গির্জার দিকে। বেদির আড়াল থেকে বেরিয়ে উঁকি দিল জানালা দিয়ে, তিন জোড়া হেডলাইট দেখতে পেল। ভুরু কোঁচকাল ও, ছিল কোথায় ডাইনিটা? এত তাড়াতাড়ি পৌঁছুল কী করে? বেশি আগেই এসে পড়ছে না? একটু উদ্বিগ্ন বোধ করল: প্ল্যানটা কাজে লাগবে তো! বুঝতে পারছে, কিছুটা সময় নষ্ট করতে হবে, নইলে সমূহ বিপদ।

আগের জায়গায় আবার ফিরে এল ও। সিদ্দিকী কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এসে গেছে ওরা, না?'

শান্ত গলায় রানা বলল, 'হ্যাঁ। রেডি থাকুন। আমার কথামত কাজ করবেন, ঠিক আছে? আর ওই যে বললাম... গোলমাল শুরু হলেই শুয়ে পড়বেন মেঝেতে।'

'ওহ্ গড!'

গির্জার সামনে এসে থামল গাড়ি তিনটে। ঝটপট ওগুলো থেকে নামল বারোজন সৈনিক, পুরোদস্তুর ব্যাটল গিয়ার পরে আছে সবাই। মেজর লারিসা ওরফে ব্ল্যাক উইডোর হাঁকডাক শোনা গেল, পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখে সুরক্ষিত করবার নির্দেশ দিচ্ছে। একটু পরেই বুটের শব্দ তুলে প্রার্থনাকক্ষে ঢুকল কয়েকজন। তল্লাশি শুরু করল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর গলা চড়িয়ে

বলল, 'যে-যেখানে আছ, ওখানেই স্থির হয়ে যাও, বাছারা! আর এগোবার চেষ্টা কোরো না।'

থমকে গেল লোকগুলো। কী করবে, বুঝতে পারছে না।

'তোমাদের মক্ষিরানী আছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'না থাকলে ডেকে নিয়ে এসো। তল্লাশি-টল্লাশিতে সময় নষ্ট কোরো না, আমার হাতে সময় কম।'

ছুটে বেরিয়ে গেল একজন। একটু পরেই দলের সবাইকে নিয়ে প্রার্থনাকক্ষে উদয় হলো মেজর। চেঁচিয়ে বলল, 'রানা! কোথায় তুমি?'

বেদির আড়াল থেকে মুখে হাসি ফুটিয়ে বেরিয়ে এল রানা। প্রার্থনামঞ্চে দাঁড়াল নায়কের ভঙ্গিতে। দ্রুত দেখে নিল প্রতিপক্ষকে। সৈনিকদের সবার হাতে ফ্ল্যাশলাইট আছে, সেই আলোয় মোট তেরোজন মানুষ দেখা গেল—মেজর লারিসা, আর তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী সেই বক্সার রয়েছে সবার সামনে।

'নাইস টু সি ইউ এগেইন,' বলল রানা। 'বিশেষ করে অ্যান্থনি... তোমাকে দেখে। ইলেকট্রিক শকে তোমার ঘিলু কতটা ফ্রাই হয়েছে, তা জানার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছি আমি।'

চেহারায় হিংস্রতা ফোটাল বক্সার। 'নাগালে এসো, তারপর টের পাবে। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে, মিস্টার!'

'তোমার সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় কাটাবার ইচ্ছে আমারও আছে, অ্যান্থনি,' বলল রানা। 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিচুয়েশন পারমিট করছে না।'

'তোমার বোলচাল বন্ধ করো, রানা!' চেঁচিয়ে উঠল লারিসা। 'সিদ্দিকী কোথায়?'

'এখনও পৌঁছায়নি,' হালকা সুরে বলল রানা। 'তুমি তো দু'ঘণ্টা পরে আসবে বলেছিলে।' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল ও। 'খু-উ-ব খারাপ, আমাকে ধোঁকা দিয়েছ তুমি।'

'তুমি দাওনি?' পাল্টা অভিযোগ করল লারিসা। 'আমাদের আগেই তো এসে বসে আছ!'

'বাজে একটা অভ্যাস বলতে পারো—সুন্দরী কোনও মেয়ের সঙ্গে ডেইট থাকলে অস্থির হয়ে পড়ি। আগেভাগেই রওনা হয়ে যাই, যাতে কিছুতেই দেরি করে না ফেলি।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' খ্যাপাটে ভঙ্গিতে বলল লারিসা। 'তোমার এসব ফালতু কথা শোনার মুড নেই আমার, রানা। সিদ্দিকীকে হাজির করো, নইলে ডিলটা এখানেই খতম।'

'বড্ড বেরসিক তুমি!' গলায় কপট অভিমান ফোটাল রানা।

'রানা!'

'আচ্ছা, আচ্ছা! খবর দিচ্ছি ওকে। কিন্তু তার আগে সোহানাকে দেখতে চাই আমি।'

পিছন ফিরে ইশারা করল লারিসা। দুজন সৈনিক বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ফিরে এল সোহানাকে নিয়ে। ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল রানা—চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে রক্ত গড়াচ্ছে, হাঁটতেও পারছে না ঠিকমত, হাতদুটো বেঁধে রাখা হয়েছে শরীরের সামনে।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রানার। লারিসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করেছ তুমি ওকে নিয়ে?'

'নাথিং সিরিয়াস,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল ব্ল্যাক উইডো। 'টোকা দিতে মানা করেছিলে তো, তাই একটু দিয়ে দেখলাম কী হয়।'

'কাজটা ঠিক করোনি।'

'মেরে ফেলিনি সেজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যাক ওসব, এবার সিদ্দিকীকে হাজির করো, রানা। নইলে সোহানার সঙ্গে এটাই তোমার শেষ দেখা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বেদির পিছন থেকে কলার ধরে টেনে

তুলল বিজ্ঞানীকে, সামনে নিয়ে এল। লোকটাকে বর্মের মত করে ধরল ও, এক হাতে শোলডার হোলস্টার থেকে বের করে আনল সিগ-সাওয়ার। বলল, 'সন্তুষ্ট, মেজর?'

ভুরু কুঁচকে গেল লারিসার। 'তুমি কি মশকরা করছ, রানা? এ-লোক ড. আন্দালিব সিদ্দিকী নয়!'

'চোখে ধাঁধা লেগেছে তোমার, মেজর। ভাল করে দেখো, এ-ই সিদ্দিকী। শুধু নাম-পরিচয় না, শরীরের গঠনও পাল্টে ফেলেছে।'

'ইম্পসিবল! এ সিদ্দিকী হতেই পারে না!'

সিগ-সাওয়ার দিয়ে বিজ্ঞানীর পিঠে খোঁচা মারল রানা। 'কথা বলুন, ডক্টর। মেজরের ভুল ভাঙিয়ে দিন।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সিদ্দিকী। তারপর বলল, 'হাই, মেজর মরগান! আপনার বেড়ালদুটো কেমন আছে? কী যেন নাম... মিমি আর মিসি, তাই না?'

চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে লারিসার। কোনোমতে বলল, 'হা যিশু! সিদ্দিকীই তো! ক্... কিন্তু কীভাবে...'

'ইচ্ছাশক্তি, এবং কঠোর পরিশ্রম,' বলল রানা। 'ডক্টরের কাছ থেকে ভাল ভাল অনেক জিনিস শিখতে পারবে তুমি। যদি চাও আর কী! এনিওয়ে... এবার সোহানাকে পাঠাও।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল লারিসা। 'সেটি হচ্ছে না। আগে সিদ্দিকী, তারপর সোহানা।'

'অন্যায় আবদার করছ। এমনিতেই একগাদা লোক নিয়ে এসেছ, আমি একা। তারওপর আবার সিদ্দিকীকেও আগে চাইছ? এটা ঠিক না।'

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, রানা। পাঠাও ওকে।'

'এসো, সমঝোতা করি। একসঙ্গে অদল-বদল হোক, ওদিক থেকে তুমি সোহানাকে ছাড়ো, এদিক থেকে আমি সিদ্দিকীকে।

কী বলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্ল্যাক উইডো। 'ঠিক আছে।' ইশারা করল সে।

সোহানাকে ছেড়ে দিল দুই সৈনিক, টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করল ও। রানাও ড. সিদ্দিকীকে ছেড়ে দিয়ে পজিশন নিল বেদির আড়ালে। ধীর পায়ে পরস্পরকে অতিক্রম করল দুই বন্দি, খানিক পরেই পৌঁছে গেল যার যার গন্তব্যে। সোহানাকে টান দিয়ে বেদির পিছনে নিয়ে এল রানা। সিদ্দিকীকে ঘিরে ফেলল আমেরিকান সৈনিকরা।

'ওর সমস্ত বার্থমার্ক চেক করো,' নির্দেশ দিল লারিসা। 'শিওর হও—সত্যিই সিদ্দিকী, নাকি অন্য কেউ আমার বেড়ালের নাম জেনে ধোঁকা দিতে এসেছে।'

রানাও সোহানাকে পরীক্ষা করছে। খুব দুর্বল দেখাচ্ছে ওকে। নার্ভ সম্ভবত সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, পরিস্থিতির ধকল সামলাতে পারছে না বেচারি। কেঁপে উঠছে বার বার।

'রিল্যাক্স!' নরম সুরে বলল রানা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে...'

'কিছুই ঠিক হবে না, রানা,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল সোহানা। 'এখন কী ঘটবে, জানো না তুমি? আমাদের সবাইকে খুন করে রেখে যাবে ওরা!'

ওর আশঙ্কাটাকে সত্য প্রমাণ করবার জন্যই যেন জোরে হেসে উঠল লারিসা। বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা। জেনুইন সিদ্দিকীকেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছ তুমি। এর পুরস্কার দেব তোমাকে... সিদ্দিকীর সঙ্গী করে পরপারে পাঠিয়ে!'

'আমাদের চুক্তিটা এমন ছিল না,' রাগী গলায় বলল রানা।

'চুক্তির শর্ত আমি একটু পাল্টে ফেলেছি। দুঃখিত, তোমাদের কাউকে জ্যান্ত ছাড়তে পারব না আমি। বেরিয়ে এসো, মরার আগে অন্তত একটা আনন্দ নিয়ে যাও। তোমার জানের শত্রু সিদ্দিকীকে তোমার চোখের সামনে গুলি করব আমি।'

দৃষ্টিতে আতঙ্ক ফুটল বিজ্ঞানীর, চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে অনুনয় করল সে, 'প্লিজ মেজর...'

'উঁহুঁ, তোমার কোনও কথা শুনছি না আমি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল লারিসা। 'রানা, বেরুচ্ছ নাকি? আমি কিন্তু গুলি করতে যাচ্ছি!' পিস্তল বের করে বিজ্ঞানীর দিকে তাক করল সে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা, পরিকল্পনাটা মাঠেই মারা পড়ছে বোধহয়। পকেটের ভিতর রিমোটটা আঁকড়ে ধরল ও, এটা এখুনি ব্যবহার করতে হবে, আর উপায় নেই। বেদির আড়াল থেকে উঁকি দিতেই দেখল, এগিয়ে গিয়ে সিদ্দিকীর খুলিতে পিস্তল ঠেকিয়েছে ব্ল্যাক উইডো, এখুনি গুলি করবে।

'গুডবাই, ড. সিদ্দিকী!'

কাঁপছে বিজ্ঞানী, আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। পকেট থেকে রিমোটটা বের করল রানা। বোতামে চাপ দিতে যাবে, ঠিক এই সময় শোনা গেল একটা গমগমে কণ্ঠ।

'পিস্তলটা সরিয়ে নিলে ভাল করবে, ম্যা'ম। নইলে ড. সিদ্দিকীর সঙ্গী তুমিও হতে যাচ্ছ।'

থমকে গেল লারিসা, চোখে বিস্ময় ফুটল তার। চমকে গেছে তার সঙ্গীরাও। সবগুলো টর্চ ঘুরে গেল কণ্ঠটার উৎসের দিকে। দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দীর্ঘদেহী মানুষকে দেখতে পেল ওরা, একটা উজি সাবমেশিনগান তাক করে রেখেছে জটলাটার দিকে।

'হ্যালো, মেজর!' বলল লোকটা। 'দুঃখিত, তোমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে হচ্ছে বলে।'

চমকটা সামলাতে পারছে না লারিসা। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'হোয়াট দ্য হেল... কে তুমি?'

'আমার পরিচয় জেনে কাজ নেই তোমার,' ইয়োরোপিয়ান উচ্চারণে বলল লোকটা। 'পিস্তলটা সরাও, নইলে ঝাঁঝরা হয়ে

যাবে।'

'ঝাঁঝরা!' বোকা বোকা কণ্ঠে বলল লারিসা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল—এই লোক একা নয়, সঙ্গীসাথী নিয়ে এসেছে। ঝট্ করে আশপাশে তাকাতেই দেখল, ভাঙ্গাচোরা ফার্নিচার, ময়লার স্তূপ, আর পিলারের আড়াল থেকে উদয় হয়েছে বেশ ক'জন অস্ত্রধারী লোক, সবার হাতে উজি... তাক করে রেখেছে তার দলের দিকে। অন্ধকার, সেই সঙ্গে রানার সঙ্গে ওর বাতচিতের সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে এরা; কোন্ ফাঁকে যেন গির্জার ভাঙা জানালা গলে ঢুকে পড়েছে ভিতরে, ওদের অজান্তে পজিশন নিয়ে ফেলেছে।

'পিস্তল নামাও, মেজর,' আবার বলল দীর্ঘদেহী লোকটা। 'শেষবারের মত বলছি আমি!'

বিজ্ঞানীর মাথা থেকে অস্ত্রটা সরিয়ে নিল লারিসা, ইশারায় নিজের লোকজনকে শান্ত থাকতে নির্দেশ দিল, তারপর তাকাল নবাগতের দিকে। বলল, 'আমি জানি, তোমরা কারা। সিদ্দিকীর ফর্মুলা কেনার জন্যে তোমরাই তো টাকা ঢেলেছিলে, ওকে উদ্ধারের জন্যে বেইলি'জ রিজে হামলা চালিয়েছিলে, তাই না? এখানে পৌঁছুলে কী করে?'

'ড. সিদ্দিকী মত পাল্টেছে। তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ধরা দিতে রাজি হয়েছে। ফোন করে ও-ই খবর দিয়েছে আমাদেরকে।'

ভুরু কুঁচকে বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল লারিসা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল চেহারাটা। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল আসল ঘটনা। বলল, 'সিদ্দিকী না, তোমাদেরকে আসলে ডেকে এনেছে আরেকজন। ঠিক বলেছি, রানা?'

বেদির পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কী করব? তোমার কাছে যেহেতু আমাদের প্রাণের কোনও

মূল্য নেই, তাই ওদেরকে ডাকতেই হলো।'

গাল দিয়ে উঠল লারিসা, কৌশলটা ধরতে পেরেছে। সিদ্দিকীকে জ্যান্ত চায় টেরোরিস্টরা, কিছুতেই লোকটাকে খুন হতে দেবে না, আমেরিকানদের বাধা দেবে—জানত রানা। নিজেকে, সোহানাকে আর বিজ্ঞানীকে বাঁচাতে তাই খবর দিয়ে এনেছে এদের। চমৎকার টেকনিক খাটিয়েছে বটে বাঙালিটা, ওরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতে ভিতরে ডেকে পাঠিয়েছে, বাইরের দিক ঘিরে ফেলতে দেয়নি। এখানে ঢোকার পরও নানা রকম কথাবার্তা বলে ওদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে, যাতে চুপিসারে দ্বিতীয় দলটা ঢুকতে পারে গির্জাতে, ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। ইচ্ছেমত ওকে খেলিয়েছে রানা, লারিসা কিছুই বুঝতে পারেনি।

'কে খবর দিল না দিল, তাতে কিছু যায়-আসে না,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল টেরোরিস্ট দলের নেতা। 'ড্রপ দ্য আর্মস্, মেজর। তারপর ড. সিদ্দিকীকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।'

'ইম্পসিবল!' হিসিয়ে উঠল লারিসা। 'দুনিয়া উল্টে গেলেও সিদ্দিকীকে পাবে না তোমরা!'

'দুনিয়া উল্টানোর প্রয়োজন নেই, তোমাদেরকে খতম করেই ওকে কেড়ে নিতে পারি আমরা। আমাদের আগের গ্রুপটার সঙ্গে তুমি যা করেছ, তাতে এমনিতেই হাত নিশপিশ করছে আমার।'

'কেড়ে নেবে? হাহ্, সিদ্দিকীকে যদি এখুনি গুলি করে দিই?' ঝট করে পিস্তল তুলে আবার বিজ্ঞানীর দিকে তাক করল লারিসা। তার সঙ্গীরাও অস্ত্র তাক করল টেরোরিস্টদের দিকে।

'বোকামি কোরো না, মেজর,' শান্ত গলায় বলল দীর্ঘদেহী লোকটা। 'খামোকা রক্ত ঝরিয়ে কারও কোনও লাভ হবে না।'

'সেক্ষেত্রে কেটে পড়ো এখুনি,' বলল লারিসা। 'বলা যায় না, তোমাদেরকে হয়তো মাফ করে দিতে পারি আমি।'

প্রত্যুত্তর দিল না টেরোরিস্টদের নেতা। গরম চোখে তাকিয়ে

রইল আমেরিকান মেজরের দিকে। লারিসার চোখ দিয়েও আগুন ঝরছে। দুই দলের সবাই অস্ত্র তাক করে রেখেছে পরস্পরের দিকে। দমবন্ধ করা একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে গির্জার ভিতর।

শান্তচোখে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করল রানা, রিমোট ধরা হাতটা শরীরের পিছনে রেখেছে ও। একটু অপেক্ষা করল, থমথমে নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠতেই টিপে দিল বোতামটা।

সঙ্গে সঙ্গে ফাটল লুকিয়ে রাখা ফায়ারক্র্যাকারগুলো। এমনভাবে শব্দ হলো, যেন গুলি ছোঁড়া হয়েছে। বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিটাকে চরমে নিয়ে যেতে ওটুকুই যথেষ্ট ছিল। কে গুলি করেছে... আদৌ গুলি করেছে কি না... এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ; বাজি-পটকার আওয়াজ শুনেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল সবার, নিজের অজান্তেই ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল।

গুলিবর্ষণের আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠল পুরো গির্জা। চোখের সামনে দু'পক্ষেরই কয়েকজনকে ঘায়েল হতে দেখল রানা, ছিটকে পড়ে গেল লোকগুলো। অন্যেরাও ঝাঁপ দিল মেঝেতে, ক্রল করে কাভার খুঁজে নিচ্ছে লড়াই চালাবার জন্য। এক পলকের জন্য ড. সিদ্দিকীকে দেখতে পেল রানা, ওর কথামত শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। পরমুহূর্তে সমস্ত টর্চলাইট নিভিয়ে ফেলল সৈনিকরা, অন্ধকার ছেয়ে ফেলল প্রার্থনাকক্ষকে। থেকে থেকে শুধু ঝলসে উঠছে মাজলফ্ল্যাশ।

বেদির পিছনে রানাও ঝাঁপ দিয়েছে। সোহানার হাতে সিগ-সাওয়ারটা গুঁজে দিল ও, টালি সরিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বের করল। বলল, 'এখান দিয়ে বেরিয়ে যাও। গাছপালার ভিতরে আমাদের গাড়িটা দেখতে পাবে। ওটায় উঠে অপেক্ষা করো আমার জন্য।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল সোহানা।

'সিদ্দিকীকে আনতে। ওকে দরকার আমাদের।' প্লাস্টিকে মোড়া কাগজগুলো ওর হাতে তুলে দিল রানা। 'এখানে ফিয়ার-গ্যাস আর নিউট্রালাইজারের ফর্মুলা আছে, নিয়ে যাও। আমি যদি ফিরতে না পারি...'

'তোমাকে ফেলে যাব না আমি,' সোজাসাপ্টা ভাষায় জানাল সোহানা।

'যেতে হবে তোমাকে!' ধমকের সুরে বলল রানা।

'না, রানা,' সোহানার কণ্ঠ আশ্চর্যরকম শান্ত। 'এখানে রীতিমত যুদ্ধ চলছে। তোমার ব্যাকআপ প্রয়োজন।'

মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেল রানা। বুঝতে পারছে, জোরাজুরি করে লাভ হবে না। কিছুতেই পাঠানো যাবে না সোহানাকে, মাঝখান থেকে সময় নষ্ট। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও। বলল, 'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট থাকতে পারো। কিন্তু কথা দাও, এরপর তুমি বেরিয়ে যাবে এখান থেকে।'

'আর তুমি?'

'পাঁচ মিনিটে যদি ফিরতে না পারি, তা হলে আর ফেরা হবে না আমার। ব্যাকআপ যদি প্রয়োজন হয়, ওই সময়ের ভিতরেই হবে।'

'না-ই বা গেলে তা হলে! ফর্মুলা পেয়ে গেছ, এখন আর সিদ্দিকীকে দরকার কী?'

'দরকার আছে। ভয়ানক ধূর্ত লোক, ফর্মুলায় যদি কাজ না হয়, ওকে আবার প্রয়োজন হবে আমাদের।'

সোহানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ দিল না রানা, ক্রল করে নেমে গেল প্রার্থনামঞ্চ থেকে। বিরতিহীনভাবে চলছে গোলাগুলি, আমেরিকান টিম আর টেরোরিস্টরা পরস্পরকে ঘায়েল করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ডানদিক থেকে একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল ও—একজন পটল তুলল বোধহয়।

মাথা নুইয়ে এগিয়ে চলল রানা, গির্জার ভিতরটা চিনে রেখেছে আগেই, অন্ধকারে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। ড. সিদ্দিকীকে যেখানটায় শুয়ে পড়তে দেখেছিল, সেখানে পৌঁছে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই। ব্ল্যাক উইডো আর ওর সঙ্গীরা কাভার নিয়েছে আশপাশে, বিজ্ঞানীও সরে গেছে কোথায় যেন।

'ডক্টর!' গোলাগুলির মাঝে চাপা গলায় ডাকল রানা। জবাব পাওয়া গেল না। তল্লাশি চালাবার ভঙ্গিতে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে শুরু করল ও, সিদ্দিকীকে পাবার আশায়। হঠাৎ হাতে ঠেকল কী যেন। জিনিসটা চোখের সামনে তুলে আনল ও—ছেঁড়া দড়ি। এটা দিয়েই বিজ্ঞানীর হাত বেঁধেছিল। লোকটা নিশ্চয়ই ভাঙাচোরা কোনও ফার্নিচারের সঙ্গে ঘষে খুলে ফেলেছে। খুলেছে ভাল কথা, কিন্তু গেল কোথায়?

জবাবটা আন্দাজ করতে পারল রানা সঙ্গে সঙ্গে। পালাচ্ছে সিদ্দিকী, নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গটার দিকে গেছে... সোহানার দিকে! তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরল ও, ফিরে চলল প্রার্থনামঞ্চের দিকে।

হঠাৎ সামনে এক জোড়া পা দেখতে পেল রানা। পাশ কাটাবার চেষ্টা করল, কিন্তু লোকটা হামাগুড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছে। গোড়ালি ঘষার আওয়াজে রানা বুঝতে পারল, ওর দিকে ঘুরছে প্রতিপক্ষ... পরমুহূর্তে গর্জে উঠল সাবমেশিনগান!

গড়ান দিয়েছে রানা আগেই, ঠিক মুখের সামনে মেঝেতে কামড় বসাল বুলেট। উড়তে থাকা ধুলো নাকে-মুখে ঢোকায় কাশতে শুরু করল ও। আবার গুলি করতে চাইল লোকটা, কিন্তু মাজল-ফ্ল্যাশ দেখে তার প্রতিপক্ষ গুলি করতে শুরু করেছে, বাধ্য হয়ে বসে পড়তে হলো তাকে। সুযোগটা নষ্ট করল না রানা, উঠে দাঁড়িয়ে ছুট লাগাল বামপাশের দেয়ালের দিকে, ওখানে একসারিতে অনেকগুলো পিলার আছে, ওগুলোর পিছনে কাভার

নিতে পারবে।

ছুটন্ত রানার পিছনে গর্জে উঠল কয়েকটা সাবমেশিনগান, ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে। তবে অন্ধকারে নিশানা ঠিক রাখতে পারল না শুটাররা, এঁকেবেঁকে গুলির ধারা ফাঁকি দিল রানা, সামনে দুটো পিলার দেখতে পেয়েই ডাইভ দিল, পিলারের সারি পেরিয়ে গেল—বিল্ডিঙের দেয়াল আর সারিবদ্ধ পিলারের মাঝখানে ওখানটায় চওড়া একটা প্যাসেজ সৃষ্টি হয়েছে।

সোজা হতেই আঁতকে উঠল রানা, ওর ঠিক কয়েক ফুট দূরেই একটা বিশালদেহী ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়েছে—অ্যান্থনি... সেই বক্সার! ছোট্ট একটা লাইট জ্বেলে ওর মুখের উপর আলো ফেলল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। বলল, 'বেশ, বেশ! মাসুদ রানা! তোমাকেই তো খুঁজছিলাম।'

বাইশ

বাধা দেয়ার সময় পেল না রানা, তার আগেই সজোরে লাথি হাঁকাল অ্যান্থনি। পেটের পাশে তীব্র সেই আঘাতে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, গুঙিয়ে উঠল, গড়িয়ে চলে গেল কিছুদূর। হিংস্র ভঙ্গিতে ওর দিকে এগোতে এগোতে বক্সার বলল, 'আমাদেরকে ধাপ্পা দেয়ার শাস্তি পেতে হবে তোমাকে এখন, রানা!'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ব্যথাবোধটা দূর করবার চেষ্টা করল রানা, তাকাল প্রতিপক্ষের দিকে। লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরে। তবে এ-মুহূর্তে

বলপ্রয়োগের বিষয়ে মোটেই আগ্রহী মনে হচ্ছে না অ্যান্থনিকে। হাত থেকে ছোট্ট টর্চটা ফেলে দিল সে; মেঝে থেকে ছড়িয়ে পড়া ম্লান আলোয় তাকে হাতের সাবমেশিনগান তুলতে দেখল রানা, গুলি করেই খতম করতে চায় শত্রুকে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার শরীরে, মেঝে থেকেই চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিল অ্যান্থনির দিকে। শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল বক্সার, কিন্তু তার আগেই গায়ের উপর এসে পড়ল রানা, মুঠো করে ধরে ফেলল সাবমেশিনগানের ব্যারেলটা। অ্যান্থনি আশা করল, টান দিয়ে ওটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে, কিন্তু তা না করে সাবমেশিনগানটা সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা। তাল হারিয়ে ফেলল বক্সার, পড়ে গেল পিছনদিকে, হাত থেকে ছুটে গেল অস্ত্র। হয় ডিগবাজি খেত সে, নাহয় তার ঘাড় মটকে যেত; কিন্তু দুটোর কোনোটাই ঘটল না। শেষ মুহূর্তে কনুই দুটো মেঝেতে বাধিয়ে দিয়ে পতনটা যতটুকু পারল সামলাল।

মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, সাবমেশিনগানটা তুলে নিল। ওটা ভূপাতিত শত্রুর দিকে ঘোরাতে চাইল ও, কিন্তু পারল না। অ্যান্থনি অত্যন্ত ক্ষিপ্র, চোখের পলকে সিধে হলো সে, হাতদুটো বিদ্যুৎ গতিতে বাড়িয়ে দিল রানার গলার দিকে। ধস্তাধস্তির মধ্যে পিছিয়ে গেল রানা, পিঠ ঠেকল গির্জার দেয়ালে গিয়ে। দুটো শরীরের মাঝখানে পড়ে গেছে সাবমেশিনগান ধরা হাতটা, কাজেই গুলি করার কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। ইস্পাতের মত শক্ত দুটো হাত ওর গলা টিপে ধরেছে। হাঁসফাঁস করতে শুরু করল ও, দম নিতে পারছে না। অসুরের শক্তি অ্যান্থনির গায়ে, রানা তার সাথে পেরে উঠছে না। দেয়ালের উপর পিষ্ট হচ্ছে শরীর, অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করছে প্রতিটি স্নায়ু। একটু অক্সিজেনের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস, কিন্তু সরবরাহ নেই। বিকৃত হয়ে উঠল ওর

চেহারা।

শত্রুর কোন আশা নেই, নেতিয়ে পড়েছে সে, আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না বুঝতে পেরে সাবমেশিনগানের ব্যাপারে মাথা ঘামাল না বক্সার। রানার গলার ওপর হাতের চাপ আরও বাড়াল সে। আবছা আলোয় চোখের সামনে দেখতে পেল, শত্রুর মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে।

ধস্তাধস্তি না করে শরীরটাকে একটু ঢিল করে দিল রানা, কিন্তু সাবমেশিনগানটা দুই শরীরের মাঝখানে সামান্য যেটুকু আটকে আছে বের করার জন্যে টানাটানি শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড চেষ্টা করার পর সফল হলো বটে, কিন্তু এখনও সেটা ব্যবহার করার সুযোগ হলো না। অ্যান্থনি যেভাবে টিপে ধরেছে গলা, তাতে হাঁসফাঁস অবস্থা রানার, মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করছে; কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। হঠাৎ মুক্ত সাবমেশিনগানটা রানার হাতে দেখতে পেয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল বক্সারের। রানার গলা থেকে ডান হাতটা নামিয়ে ছোঁ দিল সেটা ধরার জন্যে। মুঠোর ভেতর একবার নিতে পারলে রানার সাধ্য নেই নিজের দখলে রাখে ওটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত থেকে সেটা ছেড়ে দিল ও। মেঝেতে খটাস শব্দে আছড়ে পড়ল অস্ত্রটা।

সাবমেশিনগানটা কেড়ে নিতে না পেরে রাগে অন্ধ হয়ে গেল অ্যান্থনি। হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা উপরে তুলল সে, তারপর বুটটা সজোরে নামিয়ে দিল রানার পায়ের উপর। তীব্র ব্যথাটা ইলেকট্রিক শকের মত ছড়িয়ে পড়ল রানার সারা শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে উঠল ও। ডান হাত তুলে লোকটার মাথার চুল খামচে ধরল, চুলের গোছা চার আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে একপাশে টানতে শুরু করল সমস্ত শক্তি দিয়ে। মনে হলো, গোড়া থেকে উঠে আসবে ওগুলো। গলার ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ কমে

গেল, তারপর একেবারেই থাকল না। ফুসফুস ভরে পরিষ্কার বাতাস টেনে নিল রানা। জানে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নেবে শত্রু। চুল ছেড়ে দিয়ে হাতটা মুঠো পাকাল ও। তারপর বক্সারের মুখ এদিক ফিরতেই ঘুসি চালাল।

এটা আশা করেনি লোকটা। মুখ বাঁচাবার জন্যে দ্রুত পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মেঝেটা ওখানে ভেঙে উঁচু হয়ে থাকায় তাতে পা বেধে গিয়ে টালমাটাল অবস্থা হলো তার। পতনটা ঠেকাবার চেষ্টা করছে, এই সময় মাথা নিচু করে ধেয়ে এল রানা। ডান কাঁধ দিয়ে অ্যান্থনির পেটে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল ও। প্রায় উড়ে যাবার ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেও হোঁচট খেল রানা।

উঠে দাঁড়াবার জন্যে হামাগুড়ি দেবার পজিশনে পৌঁছেছে, এই সময় দেখল, ফিরে এসেছে বক্সার। লাথি মারার চেষ্টা করল রানাকে। হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় থেকে তার ডান পায়ের গোড়ালি আঁকড়ে ধরল রানা, ঝটকা দিয়ে ব্যালান্স নষ্ট করে দিল লোকটার। ধপাস করে ভারী শরীর নিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল অ্যান্থনি, ককিয়ে উঠল ব্যথায়—পতনের ধাক্কায় বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে তার।

নিজেকে সামলে নিতে এবারও বেশি সময় নিল না বক্সার। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, তবে হামলা চালাল না আর। লোকটার চোখে শঙ্কার মেঘ দেখল রানা। ব্যাটা ভাল করেই বুঝতে পারছে, শক্ত প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়েছে সে; এই বাঙালি যুবক আকার-আয়তনে ছোট হলে কী হবে, ফাইটার হিসেবে তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, বরং কয়েক গুণ দক্ষ। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল অ্যান্থনি, খালি হাতের লড়াইয়ে আর গেল না, কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে আনল নিজের পিস্তল। গুলি করে মারবে শত্রুকে।

ঝলসে উঠল রানার হাত, গোড়ালির উপর বাঁধা এমারসন নাইফটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল ও অ্যান্থনির দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওটা তার হৃৎপিণ্ড বরাবর আমূল গেঁথে গেল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল বক্সারের, ট্রিগার চাপার চেষ্টা করল, কিন্তু একবিন্দু শক্তি পেল না আঙুলে। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল, আছাড় খাবার আগেই আজরাইল তার জান কবচ করে ফেলেছে।

সোজা হতে গিয়ে চমকে উঠল রানা। গোলাগুলির শব্দ পাল্টে গেছে—এতক্ষণ একটা ছন্দ ছিল, হিসেবি ভঙ্গি ছিল... কিন্তু এখন হঠাৎ করেই যেন উন্মাদনা পেয়ে বসেছে সবাইকে। পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে সবাই, যে-যেদিকে পারে বুলেট ছুঁড়ে চলেছে। একের পর এক আর্তচিৎকার করে ঘায়েল হতে শুরু করেছে লড়াইরত মানুষগুলো।

পরমুহূর্তে নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ পেল ও... এবং বুঝে ফেলল ব্যাপারটা! ফিয়ার-গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে গির্জার ভিতর, সবাই আক্রান্ত হয়েছে তাতে। নিজেরাই নিজেদের খুন করতে শুরু করেছে আমেরিকান সৈনিক আর টেরোরিস্টরা। কিন্তু গ্যাসটা ছড়াল কীভাবে?

সত্যটা অনুধাবন করে তিক্ততায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর। গির্জাটা স্রেফ সিদ্দিকীর ফর্মুলা লুকানোর জায়গা নয়, এটা একটা ফাঁদ-ও! ফর্মুলার টোপ দেখিয়ে শত্রুদের এখানে নিয়ে আসবার প্ল্যান ছিল লোকটার আগে থেকেই, নিশ্চয়ই ভবনটার বিভিন্ন জায়গায় ফিয়ার-গ্যাসের ক্যানিস্টার লুকিয়ে রেখেছিল। এখন ফাটিয়ে দিয়েছে।

ভাবনাটা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করল না রানা। এ-ধরনের পরিস্থিতি সামলাবার জন্য তৈরি রয়েছে ও, জ্যাকেটের ভিতর দিককার পকেট থেকে বের করে আনল একটা মিনিয়েচার

ব্রিদিং-অ্যাপারেটাস—স্বল্প সময়ের ডাইভে এগুলো ব্যবহার করে ডুবুরিরা। জিনিসটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, ফুসফুসে যাচ্ছে এখন বিশুদ্ধ বাতাস।

সোহানার কথা মনে পড়তেই সচকিত হয়ে উঠল ও। গোলাগুলির প্রমত্ত ঝড় এড়িয়ে ছুটতে শুরু করল প্রার্থনামঞ্চের দিকে।

সোহানাও বিপদে পড়েছে। রানা চলে যেতেই বেদির আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে নজর রাখছিল ও, হঠাৎ একটা সাবমেশিনগান গর্জে উঠল ওকে লক্ষ্য করে। বেদির পাথুরে শরীরে আঘাত হানল বুলেটগুলো, চলটা আর ধুলো ওড়াল। কাশতে কাশতে মাথা টেনে নিল সোহানা, আরেকটু হলেই লাশ হয়ে যেত।

আবার গুলি হলো। বুলেটগুলো বুক পেতে নিল প্রার্থনামঞ্চের বেদি। প্রমাদ গুনল সোহানা। মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ চলছে ওকে লক্ষ্য করে, তারমানে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে কেউ। এখানে পৌঁছেই খুন করবে ওকে। সিগ-সাওয়ারটা চোখের সামনে তুলে ধরল ও, হাত কাঁপছে ভীষণ, কিছুতেই স্থির থাকছে না। অচেনা শত্রু সামনে এসে দাঁড়ালে সুবিধে করতে পারবে না। আতঙ্কে বুকটা শুকিয়ে গেল ওর, কী করবে বুঝতে পারছে না।

গুলির শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, কাছাকাছি পৌঁছে গেছে শত্রু... এ-অবস্থায় হঠাৎ মনের মধ্যে জেগে উঠল বাঁচার ইচ্ছে। প্রচণ্ড সে-প্রেরণা দূর করে দিল ভয়কে, চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল সোহানা চারদিকে। বেরিয়ে যাবার সুড়ঙ্গটা পড়ল চোখে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল ও। সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল উল্টো ফিরে, গা-ঢাকা দিল।

একটু পরেই মঞ্চে পায়ের শব্দ পেল ও, ব্যারেলের উপর টর্চ বসানো একটা সাবমেশিনগান হাতে গুলি করতে করতে একজন

মানুষ এসে উঠেছে। মাথাটা একটু জাগিয়ে উঁকি দিতেই ব্ল্যাক উইডোকে চিনতে পারল। রাগে মুখটা লাল হয়ে গেছে মেজরের, রানার হাতে পরাজিত হবার জ্বালা সইতে পারছে না, উন্মাদ হয়ে গেছে প্রতিশোধ নেবার জন্য। বেদির পিছনে পৌঁছেই অবশ্য বোকা বনে গেছে সে, ওখানে আলো ফেলতেই শূন্য জায়গাটা যেন ব্যঙ্গ করতে শুরু করেছে তাকে।

'কোথায় তোমরা, রানা?' চেঁচাল লারিসা। 'বেরিয়ে এসো!'

কোমর-পর্যন্ত শরীর জাগাল সোহানা, শান্ত গলায় বলল, 'এখানে।'

পাঁই করে ঘুরল লারিসা, গুলি করবার চেষ্টা করল, তবে সোহানা ওর চেয়ে এগিয়ে আছে। আগেই কর্মপন্থা ঠিক করে রেখেছে ও। বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট পরে আছে মেজর, তাই বুকে গুলি করল না, করল পায়ে। ধাঁই ধাঁই করে তিনটে বুলেট ছুটে গেল মেঝের ছ'ইঞ্চি উপর দিয়ে, ব্ল্যাক উইডোর শিনবোনে আঘাত হানল ওগুলো।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লারিসা, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। তবে হাত থেকে সাবমেশিনগানটা ছাড়েনি। বুকে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো সে, অস্ত্রটা তাক করল সোহানার দিকে।

তাড়াহুড়ো করল না সোহানা, সিগ-সাওয়ারের নিশানা ঠিক করল শান্তভাবে, তারপর গুলি করল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল লারিসার মাথা, তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হয়েছে, খুলির পিছন দিয়ে রক্ত আর মগজ ছিটিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল সোহানা, হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল লাশটার দিকে। কাছে গিয়ে দেখল, শয়তান মহিলাটা সত্যিই মরেছে কি না। যখন নিশ্চিত হলো, অদ্ভুত একটা অবসাদ গ্রাস করল ওর শরীরকে। আর কিছু করবার শক্তি পাচ্ছে না।

চোখদুটো মুদে এল নিজের অজান্তে।

হঠাৎ নতুন করে পায়ের শব্দ শুনতে পেল সোহানা। শরীর সাড়া দিতে চাইছে না, অনেক কষ্টে জোর করে খুলল চোখের পাতা। ড. সিদ্দিকীকে দেখতে পেল ও, মঞ্চের পিছনদিকের একটা টালি সরিয়ে কী যেন করছে সে।

'কী করছেন আপনি?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল সোহানা।

'তেমন কিছু না,' হাসল সিদ্দিকী। 'একটা মেকানিজম চালু করলাম। আপনি বিশ্রাম নিন, মিস সোহানা। কিচ্ছু করতে হবে না, একটু পর আপনাআপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন সব কষ্ট থেকে।'

লোকটার হাসিটা কেমন যেন বিষাক্ত মনে হলো সোহানার কাছে, সিগ-সাওয়ারটা তুলতে চাইল, কিন্তু সাড়া পেল না হাতে। মুচকি হেসে এগিয়ে এল সিদ্দিকী। ওর হাত থেকে নিয়ে নিল পিস্তলটা, লারিসার লাশের পাশ থেকে সাবমেশিনগানটাও তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে গেল সুড়ঙ্গ ধরে।

কয়েক মুহূর্ত পরই পরিচিত একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ঝাপটা মারল সোহানার নাকে। চমকে উঠল ও, চিনতে পারছে গন্ধটা—সিদ্দিকী গির্জার ভিতর ফিয়ার-গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে! সবাইকে মেরে পালিয়ে যাচ্ছে লোকটা!

মনের গহীনে তীব্র ক্রোধ গর্জে উঠল ওর। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে শরীরকে নড়তে বাধ্য করল। এভাবে একটা পিশাচকে পালিয়ে যেতে দেয়া যায় না। দুর্বল শরীরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল ও, ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

টানেলটা সংকীর্ণ, ভিতরে কোনও আলো নেই। নিঃসীম অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। বুক কাঁপছে সোহানার, কী যেন খামচে ধরেছে হৃৎপিণ্ডটাকে। থামল না ও, এগিয়ে চলল একটু একটু করে। অল্পক্ষণেই টানেলের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেল, মুখ গলে বেরিয়ে এল আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া পাহাড়ি ঢালে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সোহানা। দ্বিতীয় দফা ফিয়ার-গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে ও, সমস্ত নার্ভ বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে। কিন্তু হার মানল না দুঃসাহসী বাঙালি মেয়ে, ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে—সিদ্দিকীকে খুঁজছে। টলমল পায়ে এগোতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, সামনেই গাছাগাছালির জঙ্গল, ওখানেই নিশ্চয়ই ঢুকেছে শয়তানটা।

মাত্র দশ গজ এগিয়েছে, এমন সময় বজ্রপাতের মত একটা শব্দ খান খান করে দিল পাহাড়ের নির্জনতা। কাঁধের কাছে ঘুসির মত একটা আঘাত পেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সোহানা, আছড়ে পড়ল নরম মাটিতে। আবার গুলি হলো, তবে আগাছার আড়ালে ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না আততায়ী, বুলেটগুলো বাতাসে শিস কেটে চলে যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে।

উষ্ণ তরল ভিজিয়ে দিচ্ছে শরীরকে, হাত দিয়ে ক্ষতটা স্পর্শ করল সোহানা, আঙুল চটচটে হয়ে গেল ঘন রক্তে। এতক্ষণে ব্যথা অনুভব করল, বুঝতে পারল—গুলি লেগেছে ওর। চেষ্টা করেও আর চেতনা ধরে রাখতে পারল না সোহানা, নিথর হয়ে গেল ওর দেহটা।

নিহত এক সৈনিকের সাবমেশিনগান নিয়ে রানা যখন প্রার্থনামঞ্চে পৌঁছুল, তখন জায়গাটা খালি; মেজর লারিসা মরগানের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। এস্কেপ-টানেলের খোলা মুখটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর, বুঝতে পারল—ওখান দিয়েই বেরিয়ে গেছে সোহানা আর ড. সিদ্দিকী। তাড়াতাড়ি পিছু নিল ও-ও।

সুড়ঙ্গ ধরে অর্ধেকের মত এগিয়েছে, এমন সময় কানে ভেসে এল গুলির আওয়াজ... তবে এটা গির্জার ভিতর থেকে নয়, আসছে টানেলের অন্যমুখটা দিয়ে। ক্রল করার গতি বাড়িয়ে দিল ও, কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল পাহাড়ি ঢালে।

ব্রিদিং অ্যাপারেটাসটা ফেলে দিয়ে এক ঝলকে পরিস্থিতি দেখে নিল রানা—গাছগাছালির আড়াল থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে; আর ওর সামনে... কয়েক গজ দূরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সোহানার নিথর দেহ। অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল রানার বুক। ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল ও, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সোহানার দিকে।

'সোহানা! সোহানা!!'

জবাব পাওয়া গেল না, তাড়াতাড়ি ওকে চিত করল রানা, দেখতে পেল বুলেটের ক্ষতটা। পালস চেক করল—বেঁচে আছে সোহানা, তবে নাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। তীব্র আক্রোশে রানার ভিতরটা জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হলো ড. সিদ্দিকীকে খুঁজে বের করে এক্ষুনি ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে। কিন্তু সে-সময় নেই হাতে, এক্ষুণি হাসপাতালে না নিতে পারলে মারা যাবে সোহানা। অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিল ও, উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলির শব্দ হলো। একপাশে ছিটকে সরে গিয়ে পরবর্তী বুলেটগুলোকে ফাঁকি দিল রানা, ছুটতে শুরু করল। একইসঙ্গে ঘুরিয়ে ফেলল হাতের সাবমেশিনগানটা, যেখানে মাজলফ্ল্যাশ দেখা গেছে, সেদিকে পাল্টা গুলি করল।

গাছগাছালির সারি বেশি দূরে নয়, সাপ্রেসিভ ফায়ার করতে করতে ওখান পর্যন্ত খুব দ্রুত পৌঁছে গেল ও। লুকিয়ে রাখা টরাসে পৌঁছুতে সময় নিল মাত্র দু'মিনিট; ততক্ষণে ওর সাবমেশিনগানের অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে। অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোহানাকে প্যাসেঞ্জারস্ সিটে বসাল, নিজে গিয়ে উঠল চালকের আসনে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে আগে বাড়াল গাড়িকে। পিছনে গুলির শব্দ হলো, ঠ্যাক্ ঠ্যাক্ করে রিয়ার এণ্ডে বিঁধল কয়েকটা বুলেট। তবে ওখানটায় আর্মার প্লেট বসানো থাকায় গাড়ির ভিতরে ঢুকল না গুলি।

গাড়ি থেকে নেমে খুনে বিজ্ঞানীকে মোকাবেলার ঝোঁকটা বহু কষ্টে সামলাল রানা। লড়াইয়ে নামবার সময় নেই, যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছুতে হবে। অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ও, ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে এল গাছগাছালির আড়াল থেকে। ঝড়ের বেগে গির্জাটাকে অতিক্রম করল টরাস, ভিতরে গোলাগুলির শব্দ কমে এসেছে ততক্ষণে।

একটু পরেই রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। পাহাড়ি ঢালে তৈরি হয়েছে পথ—আঁকাবাঁকা; একপাশে পাহাড়ের শরীর, অন্যপাশ নেমে গেছে ঝপ্ করে... প্রায় তিনশো ফুট গভীর গিরিখাদে। রেলিং আছে অবশ্য, তবে জোরালো ক্র্যাশে ওটা টিকবে না। সাবধানে ড্রাইভ করতে হয় এ-ধরনের রাস্তায়, কিন্তু সেসব মাথায় রাখল না রানা। তীব্র গতিতে একেকটা বাঁক পেরোচ্ছে ও, একটাই চিন্তা মাথায়—সোহানাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

মিনিট দশেক নিরাপদেই কাটল, কিন্তু আঁকাবাঁকা পথ ফেলে মোটামুটি সরল একটা রাস্তায় পৌঁছুতেই আবার সাবমেশিনগানের গর্জন শুনতে পেল রানা। রিয়ারভিউ মিররে একটা ফোর্ড এক্সপ্লোরারকে উদয় হতে দেখল ও। মিলিটারি ভেহিকেল, মেজর লারিসার বাহন... ওটা নিয়েই ওদের ধাওয়া করছে ড. সিদ্দিকী। এখনও দূরে আছে গাড়িটা, তবে টরাসের চেয়ে ওটার গতি বেশি, মাঝখানের দূরত্ব কমে আসছে ক্রমেই।

গুলি করল সিদ্দিকী, টরাসের পিছনে কামড় বসাল বুলেট, তবে এবারও আর্মার-প্লেট বাঁচাল ওদেরকে। বিজ্ঞানীর ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলো রানা, একহাতে গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা, অন্যহাতে জানালা দিয়ে হাত বের করে গুলি ছুঁড়ছে... লক্ষ্যভেদ-ও করছে! কাজটা সহজ নয় মোটেই। লোকটা আসলেই জিনিয়াস! নইলে মাত্র তিন সপ্তাহের কম সময়ে ড্রাইভিং এবং ফায়ারিঙে এই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শঙ্কিতও বোধ করল ও। অ্যামেচারের মত লড়বে না সিদ্দিকী, নিউয়ার্ক থেকে পালাবার সময় রানা যেসব গাড়ির কৌশল খাটিয়েছিল, সব দেখেছে লোকটা... শিখে ফেলেছে। কার-ফাইটিঙে তাকে হারানো সহজ হবে না।

এই সময়ে নড়ে উঠল সোহানা। চোখ মেলে পিট পিট করে তাকাল, দুর্বল গলায় জানতে চাইল, 'কী হচ্ছে?'

'সিদ্দিকী তাড়া করেছে আমাদেরকে, মেরে ফেলার চেষ্টা করছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা।

'কেন?' সোহানা যেন কিছু বুঝতে পারছে না।

'কারণ আমরাই ওর জীবনের শেষ ছেঁড়া সুতো। লারিসার টিম আর টেরোরিস্টদের খতম করে দিয়েছে শয়তানটা। এখন যদি আমাদেরকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারে, তা হলে ওর পিছনে লাগার মত আর কেউ থাকে না। বাদ দাও ওসব, তুমি কেমন বোধ করছ?'

'কী জানি!' ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল সোহানা। 'আমি সম্ভবত মারা যাচ্ছি, রানা।'

'না!' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'মরবে না তুমি... অন্তত আজ না। মাথা নামিয়ে রাখো, গুলি যেন না লাগে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

গুটিসুটি মেরে সিটে প্রায় কুণ্ডলী পাকাল সোহানা, নীরব হয়ে গেল... সম্ভবত আবার জ্ঞান হারিয়েছে। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা, অনেক কাছে এসে গেছে সিদ্দিকীর ফোর্ড এক্সপ্লোরার। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও অবসর পেল না ও—পিছনের উইণ্ডশিল্ড এক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল, সামনের উইণ্ডশিল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল ঝাঁকটা। চোখের সামনে অনেকগুলো ফুটো দেখতে পেল রানা, কিনারাগুলো এবড়োথেবড়ো। সিদ্দিকী বুঝে ফেলেছে টরাসের

ট্রাঙ্কের কলাকৌশল, এখন উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে গুলি ছুঁড়ছে সে।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রানা, কিছু একটা করতে হবে এখুনি, নইলে সমূহ বিপদ। ওর কাছে এখন কোনও অস্ত্র নেই, এ-অবস্থায় ওদের গাড়িটাকে যদি থামিয়ে দিতে পারে সিদ্দিকী, বাঁচার কোনও আশা থাকবে না। দ্রুত মাথা খাটিয়ে একটা প্ল্যান ঠিক করল ও, অ্যাকসেলারেটর থেকে কমিয়ে আনল চাপ। আসুক হারামজাদা, কাছে আসুক।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টরাসের ঠিক পিছনে এসে গেল সিদ্দিকীর ফোর্ড এক্সপ্লোরার, রিয়ারভিউ মিররে লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা—হাসছে। নির্বিকার রইল রানা, সিদ্দিকীকে পজিশন নিতে দেখল—নিউয়ার্কের ওয়্যারহাউস থেকে পালাবার সময় ও যেভাবে প্রেসিশান ইমোবিলাইযেশন টেকনিক বা পিআইটি ব্যবহার করে শত্রুদের একটা গাড়িকে রাস্তার বাইরে ছিটকে ফেলেছিল, ঠিক সেভাবেই টরাসকেও ঘায়েল করতে চাইছে লোকটা। বাধা দিল না রানা, শুধু নিজের গাড়িকে কায়দামত এদিক-সেদিক করল, যাতে রাস্তার সামনেটা সিদ্দিকী ঠিকমত দেখতে না পায়।

চরম মুহূর্তটা এসে গেল কিছুক্ষণের ভিতর। পজিশন নেয়া হয়ে গিয়েছিল খুনে বিজ্ঞানীর, আচমকা অ্যাকসেলারেটর পুরোপুরি চেপে ধরে এক্সপ্লোরারকে আগে বাড়াল সে, টরাসের রিয়ার-এণ্ডের ডানপাশে গুঁতো দেবে। তবে তৈরি ছিল রানা, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল ও, ব্রেক চাপল... সেইসঙ্গে টিপে দিল ড্যাশবোর্ডে লাগানো একটা বোতাম।

দপ করে জ্বলে উঠল টরাসের পিছনে লাগানো হাজার পাওয়ারের ফগ-ল্যাম্পদুটো। অন্ধকারের মাঝে হঠাৎ এই আলোর ঝলকানি ঝলসে দিল সিদ্দিকীর চোখ, চেঁচিয়ে উঠল সে—আক্ষরিক অর্থেই সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গেছে, কিছু

দেখতে পাচ্ছে না আর। বেচারা ব্যর্থও হয়েছে একই সঙ্গে, টরাসকে আগের পজিশন থেকে সরিয়ে ব্রেক চাপায় সংঘর্ষ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে এক্সপ্লোরার, তুমুল গতিতে চলে গেল রানার গাড়ির পাশ ঘেঁষে।

আবছাভাবে সামনে রাস্তার রেলিং দেখতে পেল সিদ্দিকী, স্থবির হয়ে গেল আতঙ্কে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে—টোপ ফেলে ওকে প্ররোচিত করেছে রানা, নিয়ে এসেছে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকের কাছে, মোড় ঘুরতে দেয়নি। কিন্তু বোঝাবুঝিতে লাভ নেই আর, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তুমুল বেগে রেলিঙের উপর আছড়ে পড়ল এক্সপ্লোরার, ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল অনেকটা, অর্ধেকের মত গিয়ে আটকে গেল। বিপজ্জনকভাবে ঢেঁকিকলের মত দুলছে এখন।

ড্যাশবোর্ডে ঠোকর খেয়ে কেটে গেছে সিদ্দিকীর কপাল। সোজা হয়ে মাথা ঝাড়া দিল সে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল চারপাশে। লাফ দিয়ে নামতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু দরজা বরাবর শূন্যতা থাকায় সেটা অসম্ভব। তা ছাড়া নড়লেই কেঁপে উঠছে গোটা গাড়ি, পাহাড়ের কিনার থেকে খসে পড়তে চাইছে।

জানালা দিয়ে তাকাতেই রানাকে এগিয়ে আসতে দেখল সিদ্দিকী। ঠিক গাড়ির পাশে এসে থামল ও, নিজেকে আড়াল করে রেখেছে চেসিসের পিছনদিকে। চেঁচিয়ে উঠল বিজ্ঞানী, 'আমাকে সাহায্য করুন, মি. রানা!'

'মেশিনগানটা ফেলে দিন আগে,' শান্ত গলায় বলল রানা।

দ্বিরুক্তি করল না সিদ্দিকী, জানালা দিয়ে ফেলে দিল অস্ত্রটা, গিরিখাদের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। এবার দৃষ্টিসীমায় দেখা দিল রানা। মুখে নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কী... কেমন বুঝছেন এখন?'

'প্লিজ, সাহায্য করুন আমাকে!'

'আপনার সাহস আছে বলতে হবে,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'এতকিছুর পরেও আমার সাহায্য চাইছেন?'

'সাহায্য করতেই তো এসেছেন, নাকি? নইলে গাড়ি থেকে নেমেছেন কেন? বান্ধবীকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে যেতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু নিউট্রালাইজারটা না নিয়ে ওখানে গিয়ে লাভ কী, বলুন? ওকে দু'দফা ইনফেক্ট করেছেন আপনি, এ-অবস্থায় ডাক্তাররা কিছুই করতে পারবে না।'

'কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। নিউট্রালাইজারের ফর্মুলা তো পেয়েছেন আপনি!'

'সাধু সেজে লাভ নেই, ডক্টর। আমি ভাল করেই জানি, গির্জার কাগজগুলোতে আসল ফর্মুলা নেই। ওগুলো স্রেফ নিজের প্রাণ বাঁচানোর ফর্মুলা। বিপদে পড়লে গছিয়ে দেবার জন্যে রেখেছিলেন, যাতে ওগুলো উদ্ধারের অজুহাত দেখিয়ে শত্রুকে নিয়ে যেতে পারেন ওখানে, খুন করতে পারেন। করেছেনও!'

'দেখুন... আমি...'

'নিউট্রালাইজার, ডক্টর,' হাত পাতার ভঙ্গি করল রানা। 'আসলটা। নইলে আপনার জীবনের কোনও দাম নেই আমার কাছে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সিদ্দিকী, তারপর হার মানল। নিচু হয়ে নিজের জুতোর হিল খুলে ফেলল সে, ভিতরের ফাঁপা জায়গা থেকে বের করে আনল একটা ছোট্ট শিশি—বর্ণহীন তরলে ভরা। রানার দিকে ওটা ছুঁড়ে দিল সে। বলল, 'এই নিন আপনার নিউট্রালাইজার। লিকুইড ফর্ম এটা, মিস সোহানাকে খাইয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

খপ করে শিশিটা ধরল রানা। বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস নেই। আমি দেখে আসছি কাজ হয় কি না।'

‘আর আমি?’

‘দুলতে থাকুন। এই ওষুধের কার্যকারিতা দেখে সিদ্ধান্ত নেবঃ আপনাকে বের করে আনব, নাকি ছুঁড়ে ফেলে দেব পাহাড়ের খাদে।’ উল্টো ঘুরল রানা।

তীব্র ঘৃণায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে সিদ্দিকীর। ছোঁ মেরে পাশের সিট থেকে তুলে নিল সিগ-সাওয়ারটা—সোহানার কাছ থেকে যেটা কেড়ে নিয়ে এসেছিল। চেঁচিয়ে ডাকল, ‘রানা!’

পাঁই করে ঘুরল রানা, পিস্তলটা দেখে থমকে গেল। শীতল গলায় বলল, ‘ওটা আমার।’

‘নট এনিমোর!’ খ্যাপাটে গলায় বলল সিদ্দিকী। ‘ইউ আর আ ডেড ম্যান, রানা। আপনি—সেইসঙ্গে মিস সোহানাও! আসল অ্যান্টিডোট আদায় করে নিয়েছেন বটে, কিন্তু ওটা কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন না। ভেবেছেন আপনার সাহায্য না পেলে এই গাড়ি থেকে বের হতে পারব না? হাহ্, ফিজিক্সের সামান্য সূত্র প্রয়োগের ব্যাপার... ব্যালান্স শিফট করে বেরিয়ে যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না। আই অ্যাম আ জিনিয়াস, ইউ নো, আমি সব করতে পারি...’

‘তা হলে দেখি, উড়তে পারেন কি না!’ বলেই সজোরে লাথি হাঁকাল রানা এক্সপ্লোরারের গায়ে। বিশাল বাহনটার তুলনায় সামান্য একটা আঘাত... কিন্তু ওটাই ব্যালান্সটা নষ্ট করে দিল পুরোপুরি। ধাতব একটা শব্দ তুলে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল গাড়িটা, পিছলাতে শুরু করল।

গুলি করল সিদ্দিকী, কিন্তু ডাইভ দিয়ে তার আগেই সরে গেছে রানা। বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চলে গেল একদিকে। পরমুহূর্তেই কিনার থেকে খসে পড়ল এক্সপ্লোরার, আরোহীকে নিয়ে নামতে শুরু করল তিনশো ফুট গভীর গিরিখাদের তলায়। অন্যের মৃত্যু সামান্যতম দাগ কাটে না সিদ্দিকীর মনে, কিন্তু

নিজের মৃত্যু এত কাছে চলে এসেছে টের পেয়ে আঁৎকে উঠল সে, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। চিৎকার করে উঠল, 'না-আ-আ-আ!!!'

'হ্যাঁ, সিদ্দিকী,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'সোজা নরকে চলে যাও!'

তিনশো ফুট নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ল এক্সপ্লোরার, নাক সোজা পড়ায় ফ্রন্ট-এণ্ড থেঁতলে গেল; তারপরই একপাশে আছাড় খেয়ে গড়াতে শুরু করল, প্রতি পাকের সঙ্গে ভেঙেচুরে তুবড়ে যাচ্ছে ওটার ইস্পাতের শরীর। গড়ানো যখন থামল, তখন আর গাড়ি বলে চেনার উপায় নেই ওটাকে, স্রেফ একটা লোহার তালে পরিণত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে গেছে, পাথুরে জমির সঙ্গে ঘষা খেয়ে ইস্পাতের ছড়ানো ফুলকির সংস্পর্শে ছোট ছোট আগুন ধরে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল উল্টে থাকা গাড়িটাকে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল।

রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল রানা, তারপর দৌড়াতে শুরু করল টরাসের দিকে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে ছোট্ট শিশিটা। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছুতে হবে ওকে।

তেইশ

তিনদিন পর।

আবার মিটিঙে বসতে যাচ্ছে কণ্ট্রোলাররা। সরু একটা

করিডোর ধরে সভাকক্ষের দিকে এগোচ্ছে সবাই—উচ্চপদস্থ লোকটা রয়েছে সামনে, তাকে অনুসরণ করছে জেনারেল আর মিলিটারি অ্যানালিস্ট; সবশেষে রয়েছে দুই লেফটেন্যান্ট কর্নেল। নেই শুধু ওদের একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত লারিসা।

'ট্র্যাজেডি একটা,' হাঁটতে হাঁটতে বলল উচ্চপদস্থ লোকটা। 'মেজর মরগানের কথা বলছি। আমাদের জন্য একটা অ্যাসেট ছিল ও। অকালে মারা পড়ল... খুব ক্ষতি হলো কিন্তু!'

'সুখবরও আছে,' বলল জেনারেল। 'ড. সিদ্দিকীও খতম হয়ে গেছে। আমাদের কোনও টেনশন রইল না। আর লারিসা... ওর মত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, একরোখা আর অ্যাবসলিউটলি লয়্যাল মানুষ পাওয়া যদিও কঠিন, তবে ওর রিপ্লেসমেন্ট পেতে খুব অসুবিধে হবে না। ইন ফ্যাক্ট, এলিজিবল ক্যাণ্ডিডেটদের একটা শর্ট-লিস্টও নিয়ে এসেছি আমি।'

'দ্যাটস্ গুড,' মন্তব্য করল মিলিটারি অ্যানালিস্ট। 'তবে পুরো ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি কিন্তু। আমাদের ওই প্রজেক্টটার খবর মিডিয়ার কাছে প্রমাণ সহ ফাঁস করে দিতে পারে, এমন অন্তত দুজন মানুষ এখনও বেঁচে আছে।'

'মাসুদ রানা, আর সোহানা চৌধুরীর কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল উচ্চপদস্থ লোকটা।

'হ্যাঁ। ওদের রেকর্ড জানা আছে আমাদের সবার। দ্রুত মুখ বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে ওরা।'

'রিল্যাক্স!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল জেনারেলের কণ্ঠে। 'কবর থেকে কেউ কারও বিপদ ডেকে আনতে পারে না। খুব শীঘ্রি ওদের ব্যবস্থা নেব আমরা।'

'রাইট!' একমত প্রকাশ করল উচ্চপদস্থ লোকটা। 'আমি তো ভাবছি, একটা পুরস্কার ঘোষণা করব—ওদের কল্লা কেটে এনে যে

আমাকে দেখাতে পারবে, তাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে!'

হেসে উঠল দুই লেফটেন্যান্ট কর্নেল। একজন তোয়াজের ভঙ্গিতে বলল, 'চমৎকার আইডিয়া, সার! দুনিয়ার সমস্ত পেশাদার খুনিরা লেগে যাবে ওদের পিছনে।'

'আমি অবশ্য আরেকটু সূক্ষ্ম চিন্তা করছিলাম,' বলল জেনারেল। 'ওদেরকে একটা মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দিলে কেমন হয়? আমাদেরকে কিছুই করতে হবে না; সিআইএ, এফবিআই... এরাই আমাদের হয়ে খতম করে দেবে ওদেরকে...'

'বুদ্ধিটা মন্দ না অবশ্য,' স্বীকার করল মিলিটারি অ্যানালিস্ট। 'আমরা লাইমলাইটের বাইরে থাকতে পারব ওভাবে।'

'এসো, তা হলে এ-বিষয়টা নিয়ে আজকের মিটিঙে বিশেষ আলোচনা করি, একটা সিদ্ধান্ত নিই—কীভাবে দুনিয়াছাড়া করা হবে ওই দুই বাঙালিকে,' প্রস্তাব দিল উচ্চপদস্থ লোকটা।

রাজি হলো সবাই।

সভাকক্ষের সামনে পৌঁছে গেছে কন্ট্রোলাররা, দরজা খুলে ঢুকল প্রায়ান্ধকার রুমটার ভিতরে। ঘরের মাঝখানে রাখা বড় টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সবাই, নিজ নিজ আসনে বসবে... কিন্তু থমকে গেল কাছে গিয়ে।

সাদা রঙের একটা খাম পড়ে আছে টেবিলের উপর, ঠিকানার জায়গায় লেখা: *কন্ট্রোলারদের জন্য।* ভুরু কোঁচকাল জেনারেল: 'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস?'

'দেখো তো।' নির্দেশ দিল উচ্চপদস্থ লোকটা।

খামটা তুলে নিল মিলিটারি অ্যানালিস্ট, ভিতর থেকে বের করল একটা চিঠি। জোরে জোরে পড়ল। সম্বোধন-টম্বোধন কিছু নেই, গোটা গোটা অক্ষরে টাইপ করা রয়েছে কয়েকটা বাক্য:

জিনিসটা আমাকে দিতে চেয়েছিল ড. আন্দালিব সিদ্দিকী।

কিন্তু ভেবে দেখলাম, যা-কিছু ঘটেছে, তার পরে এটা শুধু একমাত্র তোমাদেরই প্রাপ্য হয়। তা ছাড়া আমার ধারণা, এটা পেলে আমাকে বা আমার বান্ধবীকে আর বিরক্ত করবে না তোমরা। তাই পাঠিয়ে দিলাম। টেবিলের তলায় পাবে ওটা, কেমন লাগল জানিয়ো।

'মানে কী এসবের!' রাগী গলায় বলল জেনারেল। 'কেউ তামাশা করছে নাকি? চিঠিটা এখানে পৌঁছুল কী করে?'

টেবিলের তলায় উঁকি দিচ্ছিল মিলিটারি অ্যানালিস্ট, হঠাৎ আঁৎকে উঠল সে, সভয়ে পিছিয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে বাকিরাও উঁকি দিল, জিনিসটা দেখে একই অবস্থা হলো তাদেরও। নিরীহদর্শন একটা ক্যানিস্টার আটকানো টেবিলের তলায়, সঙ্গে একটা রিমোট কণ্ট্রোলড্ ডিটোনেটর।

'বেরুতে হবে... এক্ষুনি বেরুতে হবে...!' চেঁচিয়ে উঠল মিলিটারি অ্যানালিস্ট। ছুটে গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি শুরু করল, কিন্তু খুলতে পারল না। ওরা ঢোকার পর ওপাশ থেকে কে যেন তালা মেরে দিয়েছে, অনড় রইল দরজা।

এমনি সময়ে বিপ্ বিপ্ করে শব্দ হলো... দরজার ওপাশ থেকে অচেনা মানুষটা রিমোটের বোতাম চেপে দিয়েছে। চোখ-ধাঁধানো আলো-টালো কিছুই দেখা গেল না, শুধু শোনা গেল ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘর ভরে গেল ঝাঁঝালো গন্ধে। শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বয়ে যেতে শুরু করল প্রতাপশালী মানুষগুলোর। কাঁপুনি দেখা দিল শরীরে, বুক খামচে ধরল অচেনা আতঙ্ক। দৃষ্টিতে উন্মাদনা ফুটল, একে একে পিছিয়ে গেল সবাই—কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না আর।

ভয়ার্ত ও সন্দিহান দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা। মাথা কাজ করছে না আর। তারপর.. হঠাৎ করেই যেন খেয়াল করল

ওরা—ওদের সবার কাছেই পিস্তল আছে...

উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সোহানার বিছানার পাশে বসে আছে রানা। এখানে আসবার পর থেকে ঘুমোয়নি ও, বিশ্রামহীনভাবে রয়েছে একই জায়গায়, সতর্ক প্রহরীর মত। রেসপিরেটর-টা খুলে নেয়া হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে, এখন নিয়মিত তালে বুক ওঠানামা করছে সোহানার। নানা রকম রেখা আর শব্দ করতে থাকা যন্ত্রপাতিগুলো অবস্থার উন্নতি নির্দেশ করছে।

গায়ে একটা ছায়া পড়তেই চোখ তুলে তাকাল রানা, এরিক এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন উনি?'

'বিপদ কেটে গেছে,' বলল রানা। 'আশা করছি খুব শীঘ্রি জেগে উঠবে।'

'নিউট্রালাইজারটা খাঁটি ছিল?'

'মনে তো হয়। ওর হরমোন লেভেল স্বাভাবিকে নেমে এসেছে। যাক গে, তোমার খবর বলো।'

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে,' বলল এরিক। 'ব্যাপারটা সামলাতে একটু ঝামেলা হয়েছে বটে... হবারই কথা, গির্জায় এতগুলো লাশ পাওয়া গেল... ঝামেলা হবে না তো হবে-টা কী! তবে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। পুলিশ কিংবা এফবিআই আপনাদেরকে আর বিরক্ত করবে না।'

'গুড, তা হলে তো সব সামালই দিয়ে ফেলেছ।'

'মোটেই না,' গোমড়ামুখে বলল এরিক। 'সিদ্দিকীর কন্ট্রোলাররা রয়ে গেছে, ওরা চুপ করে বসে থাকবে না। আপনার এবং মিস সোহানার উপর খুব শীঘ্রি হামলার আশঙ্কা করছি আমি।'

মুচকি হাসল রানা। 'ওদের নিয়ে ভেবো না। ব্যবস্থা নিয়ে

লেছি আমি, একটা ফিয়ার-গ্যাসের ক্যানিস্টার পাঠিয়ে দিয়েছি দের কাছে। আমার এজেন্সির খুব যোগ্য একজন অপারেটর নিয়ে গেছে ওটা।'

'ফিয়ার-গ্যাস কোথায় পেয়েছেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এরিক। 'আপনার কাছে যে-ফর্মুলা আছে, ওটা তো ভুয়া!'

'কারমেলের বাড়িতে আমার ওপর একটা ক্যানিস্টার ফাটাতে চেয়েছিল সিদ্দিকী... পারেনি। ওটা রয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।'

'হুম! তা হলে তো ভাল কাজ করেছেন। ব্যাটাদের উচিত সাজা হবে।'

'ঠিক।' একটা মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল।

হেসে ফেলল রানা। চোখ মেলেছে সোহানা। রানার দিকে তাকাল ও, হালকা একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। উঠে গিয়ে ওর হাত ধরল রানা।

'কেমন লাগছে?'

'ভাল,' আস্তে করে বলল সোহানা।

'ভয় করছে না তো?'

'হ্যাঁ... করছে। তোমাকে হারাবার!'

'পাশে আছি আমি,' বলল রানা, চুমু খেল সোহানার কপালে 'হারাব না কোনওদিন। ভয় নেই তোমার।'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

সেলিনা
মিরপুর, ঢাকা।

আচ্ছা, আপনি প্রথমে গল্পের কোন্ বইটি পড়েছিলেন? মনে আছে?

❋স্পষ্ট মনে নেই, তবে খুব সম্ভব বইটির নাম: 'কিশোর বীরদের কাহিনী'—বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট কিশোরদের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের চমকপ্রদ কয়েকটি গল্প। তখন সবে শৈশব থেকে পা দিয়েছি কৈশোরে। বইটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয় সর্দার ভাইয়া (প্রফেসর সর্দার ফজলুল করিম)।

আবদুল্লাহ আল হারুন
প্রযত্নে: উদয়ন লাইব্রেরি, সদর রোড, উপজেলা+জেলা: পটুয়াখালী।

নতুন প্রকাশিত বই 'অন্তর্ধান-১'-এর জন্য শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বইটি পড়তে অত্যধিক ভাল লেগেছিল সোহানা থাকার জন্য। 'ব্ল্যাকমেইলার' বইটিতে সোহানার উপস্থিতিতে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল, 'অন্তর্ধান-১' বইটির মাধ্যমে তা অব্যাহত রাখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রানাকে বরফের দেশে পেয়েছিলাম 'মৃত্যুশীতল স্পর্শ' বইটিতে। যত শীঘ্র সম্ভব রানাকে আবার বরফের দেশে পাঠান। সবশেষে সেবা সংশ্লিষ্ট সবার দীর্ঘায়ু কামনা করছি ও কাজীদা'র সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

❋আপনার জন্যও আমাদের সবার শুভকামনা রইল।

শাওন
প্রযত্নে: মিজান উকিল, নারায়ণপুর, শেরপুর।

আপনার লেখা 'বিগ ব্যাঙ' ও 'মাদক চক্র' বই দুটি পড়লাম। এত ভাল লেগেছে যে বলে—থুক্কু—লিখে বোঝাতে পারব না। এরকম বই আরও আশা করছি। অনেক দিন পর লিখছি। এর অবশ্য কারণও আছে। সেটা শুধু

আপনাকেই জানানো যায়। আর ভণিতা না করে কারণটা লিখেই ফেলি। কারণ হচ্ছে: বর্তমানে ডাকে পাঠানো বই-এ খরচ বেশি পড়ে এবং লেখাপড়ার চাপ। তো, পরবর্তী খবর এই যে আমার কাছে আপনাদের নতুন কোন মূল্যতালিকা নেই। আশা করছি, চিঠি পাওয়া মাত্রই ৩ কপি মূল্য-তালিকা পাঠিয়ে দেবেন।

❋ বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্যতালিকা পেতে হলে আপনার নিকটস্থ সেবা-বইবিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নতুন তালিকা ছাপা হলেই আগ্রহী পাঠককে দেবার জন্য তাঁদের কাছে পাঠানো হয়।

শিমুল হাসান শিশির
থানা-পোস্ট: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর। মোবা: ০১৬৭১-০৯৫৯০৫

অন্তর্ধান-১ হাতে নিয়েই পড়লাম দাঙ্গার মাঝে। তারপর-ই দাঙ্গা রূপান্তরিত হলো ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়ায়। কাহিনির প্রতিটা অংশ উত্তেজনায় ভরপুর। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অ্যাকশনঅ্যাডভেঞ্চার-রহস্য। অন্তর্ধান-১-এর জন্য আপনাকে নীলপদ্মের শুভেচ্ছা। নজর কাড়া প্রচ্ছদের জন্য শিল্পীকে একটা লাল গোলাপ। দ্বিতীয় খণ্ডের আশায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি। যদি একটু তাড়াহুড়ো করে বইটা...

❋এই তো, আপনার হাতে পৌঁছে গেছে।

হীরক
৪৫/১, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা। মোবা: ০১৯১১০৩৪৪৮৩

সাত-আট বছর আগে যখন প্রথম 'মাসুদ রানা' পড়া শুরু করি, তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ ছিলাম। এরপর বেশ কিছু সময় বয়ে গেছে। জীবনে অনেক রূঢ় বাস্তবতা দেখেছি। মানবিক অনুভূতিগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এখনও 'মাসুদ রানা'র প্রতি ভালবাসা তেমনি আছে। এখনও প্রতিটি বই পড়ে মনে মনে ওর সমালোচনা করি। আজ 'অন্তর্ধান-১' পড়লাম। আপনাকে আর কতভাবে ধন্যবাদ জানাব! 'অন্তর্ধান-২'-এর জন্য অপেক্ষা করছি। লাখো মানুষের ভালবাসায় আপনি দীর্ঘায়ু হোন, এই প্রার্থনা করি। আর 'মাসুদ রানা'র পাঠকেরা চাইলে আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

❋ আপনার ভালবাসার কথা জেনে আমরা—মানে রানা ও আমি—মুগ্ধ। ...আশা করি বন্ধু পেয়ে যাবেন। ...সমালোচনা কীসের জন্য জানালে সুখী হতাম।

আশরাফুল ইসলাম
৫৩/১ মনির হোসেন লেন (৬ তলা), নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

পত্রের প্রথমেই আমার অফুরন্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নেবেন। আশা করি অসংখ্য পাঠকের অপরিসীম ভালবাসায় সিক্ত হয়ে ভালই আছেন, দোয়া করি এমনটি থাকবেন বহু দিন।

বহু সংকোচ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখলাম। কাজী দা, আমি সেবার প্রায়-নতুন পাঠক। মাত্র তিন বছর আগে মাসুদ রানার 'কালপুরুষ' বইটি দিয়ে যাত্রা শুরু। রানার প্রতি আমার ভালবাসার কথা আপনাকে লিখে বোঝাতে পারব না। টিফিনের পয়সা জমিয়ে রানার বই কিনতাম। সর্বসাকুল্যে পড়েছি রানার তিন

তাধিক বই, সংগ্রহে আছে দুইশত পঁচাশিটি।

তবে, আপনাকে লেখার কারণ শুধু আমার চিঠি ছাপানো বা রানার প্রতি আমার ভালবাসা প্রকাশই নয়। আমি লিখেছি রানার 'মুক্ত বিহঙ্গ' বইটির একটি উদ্ধৃতি সম্পর্কে। বইটির দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৫ কপিটির ১৬২ পৃষ্ঠায় রানা ও প্রিন্সের কথোপকথনে জন ডনের যে উদ্ধৃতিটি আছে তা কি সম্পূর্ণ? আমার মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নয়। যদি না হয়ে থাকে সম্পূর্ণটি কী? জানালে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব। প্লিজ, চিঠিটি ফেলে দিয়ে আমাকে বিমুখ করবেন না। সবশেষে সেবার সকল কলাকুশলীর প্রতি আমার সালাম রইল। ভাল থাকবেন, সবসময়।

❋সম্পূর্ণ কি না বলতে পারব না, আগে-পরে আরও কিছু থাকতে পারে। ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখতে পারেন।

মোঃ শোয়েব হাসান, মোবা: ০১৭২২-৬৯৯১৯৬, ০১৬৭০-৬৯৭৮৭৩

সরকারি সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ, বাংলা শাখা, পিরোজপুর, বরিশাল।

মাসুদ রানা ৩৯০ ও ৩৯১ অচেনা বন্দর প্রসঙ্গে আজকের চিঠি । অনেক দিন পর মনের মত বই পেলাম। রানা যেন সেই প্রথম দিকের রানা, এমনটাই মনে হলো। অতিথি গিল্টি মিয়াও ছিল। ভালই! তবে মিশ্রি খানকে না মারলে কি চলত না? প্রথমটার চাইতে দ্বিতীয়টার প্রচ্ছদ বেশি ভাল। বিপ্লব ভাইকে ধন্যবাদ।

❋ধন্যবাদ পৌঁছে গেল যথাস্থানে।

জিসান আহমেদ নীল, মোবা: ০১৭২৩-৫৪০০৬৫

প্রযত্নে: পোস্টার গ্যালারি, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

প্রকাশ পেলেও তখনও 'অচেনা বন্দর-২' বোয়ালমারী এসে পৌঁছে নাই। অতঃপর অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্যচ্যুত হওয়ার দশা, তখনই খবর পেলাম আমার এক বন্ধু ঢাকা বই মেলায় যাচ্ছে। দেরি না করে তখন বন্ধুটির কাছে টাকা দিয়ে দিলাম এবং অপেক্ষায় থাকলাম কবে ঢাকা থেকে ফেরে। অবশেষে দুদিন পর যখন সে ফিরল এবং 'অচেনা বন্দর-২' হাতে পেলাম খুশিতে তখন নাচতে ইচ্ছা করছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্টক থেকে 'অচেনা বন্দর-১' বের করে পড়তে শুরু করলাম। একে একে দুটি বই শেষ করলাম। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখি উত্তেজনা ঘাম হয়ে বের হচ্ছে। আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি কী এক জাদু বলে যেন ঘণ্টার কাঁটা ৪ ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে। ওফ! অসাধারণ হয়েছে বই দু'টি। সেই পুরনো রানাকে যেন আবার আমাদের মাঝে ফিরে পেলাম। সেই সাথে আতাসী, মার্সিয়া ও মিশ্রি খানকে পেয়ে খুব ভাল লাগল। আর সোহেল ও গিলটি মিয়া তো আছেই। চমৎকার একটি অভিযানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কাজীদাকে একটা রিমোট কন্ট্রোল্‌ড্‌ বোমা পাঠালাম। ওহ্‌, সরি, রিমোটটা পাঠাতে ভুলে গেছি। 'ব্ল্যাকমেইলার' বেরোতে দেরি হলে বলা যায় না ভুল করে রিমোটের লাল বোতাম দাবিয়ে দিতে পারি।

❋তারপর কী ঘটবে, সে-খেয়াল আছে?

মোঃ আছিফুর রহমান

দোহার, ঢাকা-১৩২১। মোবা: ০১৯১৩০০৬১১১

কাজীদা, জানি না অন্তর্ধান ২য় খণ্ডে আমাদের জন্য কী বিস্ময় রেখে